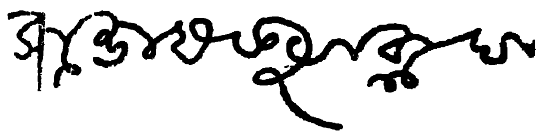
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি :



সম্পাদনা : তুষার কান্তি পাণ্ডে, এম. এ. (ড

গ্রন্থনা

৮বি কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশনা :
গ্রন্থনা—৮বি কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪

মুদ্রাকর :
অমরনাথ দে
শ্রীবাণী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬/২ বেনিয়াটোলা লেন কলিঃ-৯

শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ভৌতিক কাহিনী
শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী
শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চ কাহিনী
শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সরস কাহিনী
শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কাহিনী
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই ঃ
ইত্যাদি ঃ প্রকাশিত হল ॥

'আমার প্রাণের গল্প ধীরে ধীরে মুছে যাবে'

'পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল',

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প ও কাহিনী

॥ ব্যাবিলনিয়, সুমেরিয় অথবা মহেঞ্জদোরিয় না হলেও বাংলা ভাষার বিস্মৃত প্রায় হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের কিশলয়ের দিনগুলির সুপ্রাচীন রহস্যের জাল ভেদ করে যে সব রোমাঞ্চকর রহস্য ও রোমান্সের বর্ণাঢ্য কাহিনী ইতিহাসের গহ্বর হতে নিষিক্ত হয়েছে **শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী** তার পরম্পরার এক বিশ্বস্ত ও মনোজ্ঞ দলিল।

বর্তমান খণ্ডে গ্রন্থটি এই ধারাবাহিকতার বহমান স্রোতের সমুদ্রসঙ্গমের মোহনায় দাঁড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সায়াহ্নের অন্তিমকাল হতে এই শতকের গোয়েন্দা কাহিনীর নান্দনিক এক জৈব স্বাদ এনে দিয়েছে. —এনেদিয়েছে বাঙ্গলাভাষী পাঠক-পাঠিকার আগ্রহানুকূল তৃষ্ণার্ত রসানুভূতির তৃষিত অমর্ত্যলোকে। ॥

ভু. কা. পা.

সন্তোষকুমার ঘোষের ভূমিকা

। এক ।

রহস্য গল্প ঃ— যার ডাক নাম গোয়েন্দা কাহিনী। নাক-উঁচু সাহিত্যের সমাজে ভঙ্গ-কুলীন। ইদানীং এই তার পরিচিতি। লোকের মন পায় অথচ মান পায় না। অপরাধটা কি অপরাধমূলক রচনার, না আমাদের অনেকের ভ্রান্ত-উদভ্রান্ত রসবোধ আর রুচির? ঠিক ঠিক যাচাই একালে হয়তো ক'রে উঠতে পারিনে। তাতে ওই ধরনের লেখা কি ঠকে? না। বরং আমরা আমাদেরই চোখ ঠারি, তলে তলে ঠকাই। যেমন বাড়িতে কেউ এল তো অমনই তাকে তাক লাগাতে ডাক-সাইটে থান-ইট মারকা একটা ওজনদার বোবা বইকে বোরখা বানিয়ে মুখ-ঢাকা দিলুম। যাতে ভিজিটারের মনে একটা সেলামের হাত আপনা থেকেই ওঠে আর-নামে। অথচ যদি প্লেনে চড়ি, (প্লেন? দূর ছাই এমন কি ট্রেনেও যদি লম্বা পাড়ি দিতে হয় তবে নির্ঘাত নিরালায় একটা ছমছমে বই—আরল্ স্ট্যানলি গার্ডনার অথবা নিক্ কারটার তো নিক্ কারটারই সই, আজকাল পেপার ব্যাকের কল্যাণে এ সব শয়নসঙ্গী একটু শস্তাই বলতে হয় বৈকি! রোমাঞ্চ, পুলক, ভয়, বিষাদ, কী হয়, কী হয়, এই কৌতূহল আর দরদর ঘামই সব। বিনিময়ে বড়ো জোর পাঁচ, সাত কি দশ টাকা নগদ দাম।

এইখানেই আমাদের আত্মখণ্ডন! পড়াশুনোর ব্যাপারে অন্তত সেই সবেরই ঝাণ্ডা ওড়াই, যেসব আমরা আসলে চাই না। আর যাদের চাই, তাদের পাই আড়ালে, বিদগ্ধ লোক আর চোখ লুকিয়ে। আজকাল অবিশ্যি এই ঢঙ আর ভড়ংটা কিছুটা কম। অনেক জাত-লেখক রহস্য গল্পকে জাতে তুলে দিয়েছেন কিনা সেইজন্যেই এই লাজলজ্জা শিকেয় তোলার দুঃসাহস।

তবু আমরা মূলটাই বুঝি ভুলে যাই। সাহিত্য-সমাজপতিদের উঁচ-কপালে চাউনি না থাকলে রহস্য-গল্প হয়তো ব্রাত্য বা পতিত বলে গণ্য হত না। আর দশ-পাঁচটা ভালো-মন্দ-মাঝারি লেখার পাশাপাশি তার পাত পড়ত। যে-বর্ণাশ্রম দেখি, সেটা পরবর্তী কালের।

নইলে জীবন থাকে, জীবন যায়। আঘাত সয়েও থাকে, আবার অপঘাতে যায়। এই বিচারে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোনও তফাত, কোনও মাথা-তোলা চীনের প্রাচীর নেই। একাকার, সব একাকার। আর তাই বুঝি আদি মানুষও সাদামাটা জীবন আর তার যাপনের মধ্যেই বারে বারে কোনও অদ্ভুত, কিম্ভূত (এমন কি ভূত) এবং রহস্য খুঁজে ফিরেছে। বারে বারে। হাস্য নেই, থাকলেও হাসি দিয়ে সব ভরে না, তাই রহস্যের ফরমাস। যে-জিনিস রোজ নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে, যে-জিনিস ঘটনে-অঘটনে কখনও সত্য, কখনও সত্যেরই প্রায়—অনেক সৎ সৃষ্টিতে তার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিকে নিবদ্ধ দেখতে পাই।

এখানে কোনও আরম্ভ অথবা অন্তিমতার নয়, পরিবেশেরও সবিশেষ ভূমিকা। আধুনিক রহস্য-কাহিনীর সম্ভবত আদি পুরুষ যিনি (বলা বাহুল্য আমি এখানে পঞ্চবিংশতি বেতালকে ভুলছি না। বিদেশী কোনও কোনও পণ্ডিত এমন কি বালজাককেও টিকিশুদ্ধ টেনে এনেছেন—তাও না হয় কালাতিক্রান্ত বলে খারিজ) সেই এডগার য়্যালেন পো-র কথাই বিশেষ করে স্মরণ করি। পরিবেশে যে মৃতুর ছায়া-ছায়া কালো কাঁপা ভূষা আর বেশ, সেটা নিপুণ কলমে তিনি ধরতে পারেন বলেই তো অনেক দূর দেশের অনেক কাল বয়ে যাওয়ার পরেও পাষাণকে ক্ষুধিত দেখি, রবীন্দ্রনাথকেও পাই। চিনি। চিনি মৃত্যুকে। যা কিনা চার পাশে অপর্যাপ্ত, জীবনের ঝকঝকে অভ্রক্ষেতে ছোট ছোট কালো ফোঁটার মতো অযাচিত। চমকে উঠি কেউ কেউ তাই "ওকে, ওকে, ও কে গো" বলে একই সঙ্গে ঘন আর তরল অনর্গল এক-একটা "নিশীথে" চেঁচাই।

॥ দুই ॥

আমরা রহস্য গল্প পড়ি কেন? উত্তরটা অদূরে। সেটা মনের গহনে। জীবনে তো না-রহস্য না-রোমাঞ্চ অথবা অধিকাংশ জীবন অতিশয় সমতল। মেয়েদের যেমন রাঁধার পরে চুল বাঁধা বেশির ভাগ পুরুষেরও তাই। চুল বাঁধাবাঁধি দূরে যাক, রসে কম নিত্য প্রাতঃকৃত্যের পরে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজারে ছোটা কিংবা রেশন কেরোসিন টেরোসিনের জন্যে লাইন তো দেওয়া চাই। এত কষ্ট, তাই মুক্তির জন্য পড়া। বেশির ভাগ লোকেরই ভোট হালকা পাঠ্য। মানে হাঁফ ছাড়ার মতো বাতাস যদি মেলে। ছেলেবেলায় ওই কারণেই থাকে রূপকথা আর—দুপুর থেকে বিকেলে, যা নেই বা অবাস্তব সেই রোমাঞ্চ, হত্যা—নিদেন ভৌতিকতা। আমাদের মনের চাহিদা মেটাতেই এসব এসেছে। প্রকৃতকে জব্দ করে তার ওপরে সওয়ার হয়েছে

অপ্রাকৃত অথবা অতি প্রাকৃত—ইংরেজিতে যাকে বলে সুপারন্যাচারাল। ভূত? কদাচ দেখি না বলে তাকে দেখতে চাই—সত্য হোক মিথ্যে হোক অন্তত লেখায়। স্বাভাবিক মৃত্যু? মানে রোগ ভোগের পর সবশেষ? মন জানে, তবে মানতে চায় না বলে একটা অবশেষের লোভলিপ্সা থাকে। মৃত্যু অবশ্যই। তবে একটু আলাদা জাতের মৃত্যু। যাকে অভিধানে বলে হত্যা।

মৃত্যু তো আমাদের বশ নয়, ইচ্ছা মৃত্যু পৌরাণিক কারো কারো জীবনে ঘটেছিল এই সংবাদ পুরাণে কয়, তাই অনেকেই আমরা অন্য রকম মৃত্যুকে কল্পনা করি। মরতে যখন পারছি না তখন কেউ কাউকে মারছে অর্থাৎ মরার চেয়ে মারাটাকেই বেশ জুলজুল চোখে (চাউনিরও যদি লালা থাকে, তবেই) দেখতে চাই। আরও সোজাসুজি বলব? আমি না ফ্রয়েড না ইউং বা অ্যাডলার—তথাপি বলি আমরা গড়পড়তা মানুষেরা না চাই মরতে, না পারি মারতে। তাই কি মারণ উচাটনের কাহিনী পাঠে এতো অভিলাষী? মনোবিকলনবিলাসীরাই এই প্রশ্ন চিহ্নটার উত্তর দিন।

পাপবোধ তো খৃষ্টীয় ধর্মধারণায় ছিলই। সেই পাপকে পরবর্তীকালের রাষ্ট্র আর সমাজ “অপরাধ” এই নামে অভিষিক্ত করে। যতো না ঘটে তার চেয়ে বেশি লেখা হয়, যতো না লেখা তার চেয়ে বেশি বলা। যেহেতু ক্যাথলিক কনফেশনের ধারা সর্বজনীন নয়, তাই অন্য বিশ্বাসের অনুবর্তীরা কথনের চেয়ে লিখনকেই বেশি বিশ্বাসযোগ্য ঠাউরে থাকবে বেশি আলবৎ। আর ক্রাইম বা ডিটেকটিভ কথা ও কাহিনী কি তাঁরই ফল আর ফসল?

যদি বিকল্পও হয় তবু মানি জিনিসটা জোরদার। অথবা আফিঙের মতো আবেশ। ছদ্মবেশী খুনীর কথা তো আকছার পড়ি। আমরা কখনও কি টের পাই বানানো গল্পের মধ্যেও ফুটে উঠছে ছদ্মবেশী আমাদের কোনও অবচেতন ইচ্ছা? হত হতে অথবা হত্যা করতে? দুনিয়ার যাবৎ ক্রাইম নভেলে জিঘাংসার সঙ্গে একটা জাত-যাওয়া ভালোবাসা কেমন মিলে গেছে দেখুন।

॥ তিন ॥

মনস্তত্ত্ব এই পর্যন্ত। এর কতটা পাপ কতটা অপরাধ কতটাই বা হিংসা আর কতখানি পুলিশী কেরামতি বা বোকামির সংবাদ এই ভূমিকায় তার মধ্যে যাব না। কোনও বিদেশী লেখক যা বলেছেন, সবটাই হয়তো তাই, এই সাহিত্যটাই হাইব্রিড। সবই শেষ হয়ে যায় তবু বিশ্লেষণের এতো ভান আর ভড়ং। মানে শেষ যদি শেষ হয় তো হোক, তবে একটা অবশেষ থাক।

যদি গোয়েন্দা গল্পকে আলাদা করে নিই, চাল থেকে ডাল বেছে নেওয়ার মতো, তবে দেখব, গোয়েন্দা গল্পও কিন্তু আসলে কোথাও পুরাণ-পন্থী। অথবা ধর্ম-ধর্মী বললে কি খুব কথার চালাকি হবে? কথার যদি-বা হয়, সত্যের নয়। যে-কোনও মহাকাব্য বা পুরাণের মোদ্দা ব্যাপারটা কী, অর্থাৎ উপসংহারের উপদেশ? ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়।—এই না? যারা অসুর, যারা রাক্ষস, তারা শেষ পর্যন্ত হারবেই। আর হার নেই কার? সত্যমেব—এই সুস্থ ইচ্ছা বা উচ্চারণটার!

গোয়েন্দা গল্পেও তাই। হত্যাকারীকে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হয়। শাস্তি? সব সময়ই যে খুনী পায়, এমন নয়, বিষের বড়ি আছে, জানালার আলগা শিক আছে আর একালে হেলিকপটার থেকে ডুবো-জাহাজ—কত কিছুই তো! তবু খুনের মানে রক্তের দাগ। সেটা লেগে থাকে, আমরা মানে সামাজিক মানুষেরা তাতেই খুশী, তাই আরামে একটা আহ্লাদিত সিগারেট ধরাই। সোজা কথায়, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, সামাজিক ভারসাম্য সব যে-কোনও তথাকথিত সিরিয়াস সাহিত্যের চেয়ে গোয়েন্দা গল্প বজায় রাখে। রাখতে চায়। কী উচিত, কী অনুচিত, কী হিত কী গর্হিত, সে স্পষ্ট সীমারেখা আঁকে।

সেই জন্যেই তাকে বলছি পুরাণ আর মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী। জাতে মহৎ হোক বা না-ই, হোক আঁতে সে সর্বাংশে সৎ। হানাহানির বিরুদ্ধে তার অঘোষিত সংগ্রাম অবিরাম। জনমানসে এই স্বীকৃতিটুকু সে পায়নি? তো বয়েই গেল। সেকালে রাজ্য যখন আক্রান্ত হত, তখন রাজারা তলব করতেন কাদের? মন্তর-পড়া পুরুতদের, না ঢালিদের? সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প হল সেই প্রতিরক্ষার ঢালি।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের গোয়েন্দা কাহিনী এই শর্ত পূরণ করে, নিশ্চিত। কিন্তু তার কতটা ধার-করা তার কতটাই বা আপনা-আপনি, মানে মৌলিক? লজ্জা নেই, যদি ঋণ হয়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপও তো স্রেফ মারশাল এইড্-এর দৌলতে উঠে গায়ে-গতরে দাঁড়াবার মতো ক্রাচ্ পায়! সত্যি বলতে কি, মোদের গরব, মোদের আশা এই বাংলা ভাষার গত শ-খানেক কি শ-দেড়েক বছরের যে ইতিহাস, তারও অনেকটাই কিন্তু ঠেক্‌নো। ঋণ করে? হলই বা। তবু ঘৃত তো? তাই তো দুর্গেশনন্দিনী। তাই তো সনেট চতুর্দশপদী, ট্রাজেডির কৃষ্ণচ্ছায়া নিয়ে বাংলার প্রথম কৃষ্ণকুমারী এবং হোমর মিল্টনের এপিক ধাঁচে তিলোত্তমা থেকে মেঘনাদ বধ বা বীরাঙ্গনা। শেষেরটা অবিশ্যি ওভিড্-এর হিরোইক এপিস্‌লস্-এর ধরনে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি "হট্ অ্যাণ্ড কপার স্কাই"-কে দস্তুরমত দিগন্ত করে থাকেন, তবে গোয়েন্দা গল্পেরও লজ্জা নেই। কিংবা এইটুকু ঘাটতি: যেমন মোটর বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরিতে; আমরা তেমনই যতটা না নিজেরা বানাই, তার চেয়ে বেশি প্রোটোটাইপ চাই। অবশেষে যা দাঁড়ায় তা শুধুই অ্যাসেম্বলিং? মানে যন্ত্রপাতি জোড়াতালি দেওয়ার কারিকুরি? যেমন অন্যান্য শিল্পে, হয়তো বা গোয়েন্দা গল্পেও তারই কাছাকাছি। সেক্সটন ব্লেককে দীনেন্দ্রকুমার রায় না হয় রবার্ট করলেন, তবু ছ পেনি থ্রিলারকে তাঁর উৎকৃষ্ট স্টাইল আর যথা-প্রযোজন ইঙ্গ সংলাপকে ব্র্যাকেটে রেখে চমৎকার বঙ্গজ করলেন। আমরা, অর্থাৎ আমাদের বয়সীরা মজলাম। আর পর কাল? তেমন মনেও রাখল না।

প্রিয়নাথ বাবুর দারোগার দপ্তরকে কি কারও মনে আছে? কারও? অথবা পাঁচকড়ি দে-র দেবেন্দ্র বিজয়কে? রুমেলিয়া না হয় রুমালের মতো হাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু দেবেন্দ্র? সে উত্তরকালীন ব্যোমকেশ, প্রতুল লাহিড়ী, কিরীটি, এমন কি মোহনের আলোয় ছায়া তো ছায়া, একেবারে কালো হয়ে হয়ে গেল। কালো মানে ব্ল্যাকআউট। পাঠকের স্মৃতিতে। এখন তো ধরে নিচ্ছি ব্যোমকেশকেও হঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফেলুদা। সময় বহতা!

যা কালকের, তা আজকের নয়। এই কথা বলে যেই এই অংশটায় দাঁড়ি টানতে যাব ভাবছি, তক্ষুনি মনে পড়ল, প্রিয়নাথবাবুর মূল ছাঁচটাও ছিল শারলক হোমস্। আর আজ কেউ কি বিশ্বাস করবেন স্যার আরথার কোনান ডয়েল এক সময় তথাকথিত সিরিয়াস লেখক হতে চান? একের পর এক প্রকাশক যেই প্রত্যাখ্যান করলেন অমনি তিনি হঠাৎ অপরাধমূলক লেখায় ঢুকে কি নিজের অপরাধটাকে ঘোচাতে চাইলেন? যার নাম "সাইন অফ ফোর" সেটাও দু-তিন বার "না-না, চলবে না" শোনবার পর (আমাদের দেশের কনে দেখার মতই আর কি) এক প্রকাশকের কাছে পান মোটে কত বলুন ত? স্যর আরথার কোনান ডয়েল তাঁর প্রথম অন্য জাতের লেখার জন্য পান স্রেফ পঁচিশটি পাউণ্ড। সর্বস্বত্ব বিক্রীত। কার? কোনান ডয়েলের না শার্লক হোমসের?

বিশ্বাস হয়না। এই শার্লক হোমসকে নিয়েই না পরে কত সাজানো জাদু-শালা; বানানো চরিত্র নিয়ে বানানো ব্যাপার। অথচ বানানো তো সবই। শার্লক তাঁর যত মেধা বেধ বোধ আর বুদ্ধি থাকনা কেন, একালের পাঠকদের মনে কি হয় না যেন একটু অ-মানবিক? মানে, মানবীয় কোনো প্রকার শ্লেষ্মা, সর্দি-কফ ইত্যাদি নরম-নরম, তুলো তুলো তুল-তুলে ভাব ব্যাপারস্যাপার তাঁর মেধাবী ডিডাকশনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। ফলত চিরশ্রুত তিনি, হয়ত এক অর্থে হয় অতি-মানব; নয়তো না-মানব হয়েই থাকবেন।

সেই থেকে গোয়েন্দা গল্পে একটা প্যাটার্ন বরাবর বহাল। ছিল। খুন এবং তার কিনারা। কিন্তু নর ও নারীর প্রেম-ট্রেম কক্ষনো নয়। পরের লেখকেরাও মেনে নিয়েছিলেন যে প্রেম অর্থাৎ হৃদয়গত তুরতুরে ব্যাপারস্যাপার ঢোকালে মূল বিষয়টি পাঠকের লক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। যদি খুনটাই ঘটনা হয় তবে বুকে রগে যে সব বেদনা বইল তা ফাউ। তা নিয়ে সাতকাহন কথা ফেঁদে বসলে পড়ুয়ার মন, পড়ুয়ার চোখ অন্যদিকে লেপটে যাবে।

চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউনও ভালবাসা টাসায় বাসা বিশেষ বাঁধতে চাননি। এবং ক্রাইম স্টোরিতে যিনি ভিক্টোরিয়াপ্রতিমা সেই আগাথা ক্রিষ্টিও না। আড় চোখে প্রেমের উইংসের দিকে তাকালেও তিনি মোটামুটি গোটা ব্যাপারটার দিকেই দৃষ্টি পাত করে গেছেন! সেখানে যদি বা পতি-সোহাগিনী তাঁর লেখায় কদাচ বা প্রভৃতত্ত্ব এসেছে, হৃদয়ের উদয় তেমন ঘটেনি। তা ছাড়া এই ক্রাইম স্টোরির সম্রাজ্ঞী একটি সংজ্ঞা হঠাৎ লঙ্ঘন করে ফেলেন—সেই যে অ্যাকরয়েডের গল্প! একটা ঐতিহ্য ছিল যে উত্তম পুরুষে যে বলবে সে কি খুনী হতে পারে? ক্রিষ্টি একেবারে আন-ক্রিশ্চিয়ান হয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, পারে। শেষ মেষ দেখা গেল "আমি"ই খুনী, মানে আমি নামে কথকটি।

গোয়েন্দা গল্পে এরকম অনেক প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। যেমন চাকর চাকরানী, পাচক-পাচিকা প্রভৃতিকে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে তবে সচরাচর তারা কেউ হত্যাকারী হয় না। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, সবচেয়ে কম সম্ভবপর অপরাধী যে আসল হত্যাকারী হয়ত সেই। কোনো খোঁড়া কিংবা কানা। সন্দেহের ফোকাস যার মুখে সবচেয়ে কম, পিস্তল, ছুরি বা হাতুড়ি পাওয়া যায় তারই হাতে।

অপরাধ মূলক লেখায় এর সবই ঘটে গেছে। প্রতুল লাহিড়ী আর ব্যোমকেশ। এবং অবশেষে ফেলুদা। এরই মাঝখানে কিরিটীকে ভুললেই বা চলবে কেন? ঠিক লিখছি কিনা জানিনা, মনে হয় পরিমল গোস্বামী ভাঁওতাটা ধরতে পারেন, তাঁর ব্রজবিলাস-ই তাব সাক্ষী।

তবু ব্রজবিলাস বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে চিরায়ত হতে পারেননি, যেমন পারেননি দীনেন্দ্র কুমারের রবার্ট ব্লেক। কারণ, বেশির ভাগ লেখকেরা মারলে হাতি নইলে নবাব বা লাখোপতি মারতেন। লুঠতে হলে লুঠতেন ভাণ্ডার—বোম্বাগড়ের রাজার অন্দর মহলে ছুটতেন। খানিক আগে পাঁচকড়িবাবুর নাম লিখেছি না? তাঁর সমসাময়িক আর এক লেখকের নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। পুলিস কর্মচারী এই ভদ্রলোক কয়েকটা গোয়েন্দা গল্প লেখেন, এবং এই লেখকের যত দূর পড়াশোনা তাতে মনে হয় সেগুলো মৌলিক। তাঁর কাহিনী অভিজ্ঞতার, ধারণা আর গ্রাম্য পরিবেশের রচনা।

শ্রীমতী আগাথার মিস মারপ্‌লকে মনে পড়িয়ে দেয়। হারিয়ে দেয় তাঁর এরকুল পোয়ারোকে। পল্লীবাসিনী মিস্ মারপ্‌ল তাঁর নিজের দেখা সমান্তর অভিজ্ঞতা দিয়ে এক-একটা রহস্যের কূল কিনারায় ভিড়ে যেতেন। আঁকায় চালাকি তত ছিলনা। কিন্তু পল্লীচিত্র অঙ্কনে ওস্তাদ হয়েও দীনেন্দ্রকুমার গৌড়জনের চিত্ত থেকে এখন বুঝি নিঃশেষে মুছে গেছেন। তবু সার্থক তাঁর "পল্লীচিত্র" তো রইল! তুলনায় বাড়াবাড়ি হবে তবু বলি যেন "ছিন্ন পত্র"। যেমন রয়ে গেছে দীনেন্দ্র কুমারের লেখায় তাঁর রহস্য-লহরীতে আর "ষণ্ডামার্কের দফতরে"। বিলুপ্ত তবু এই মুহূর্তে এই লেখকের কাছে স্মৃত। শুধু এই জন্য যে তিনি পিকাডিলিকে কখনও চৌরঙ্গী বলে চোরাচালান দেননি। তবে বিলিতি প্রবাদে বলেনা যে বিড়ালের নটি প্রাণ? দুর্ধর্ষ ব্লেকের ছিল অন্তত নশোটি। গুলি বরাবর তাঁর কান ঘেঁষে ছিটকে গেছে। তাঁর রূপান্তরও অশেষ অলৌকিক—এই চীনেম্যান তো এই হাবসী, কুকুর বা ভালুক হয়ে যে কখনও আবির্ভূত হননি এই ভাগ্যি। হতে যে পারে না এমন নয়। লন চ্যানিকে নির্বাক যুগে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে ব্লেকের ছদ্মবেশ অবিশ্বাস্য ঠেকবে না।

ছয়

তবু গোয়েন্দা কাহিনী চিরায়ত হয়না। মারকিন ভ্যান ডাইক (কী জানি, কতকাল আগে পড়া ত, গল্পটল্প গুলে খেয়ে ভুলে আছি, লেখকের নামটাও নির্ভুল হলনা সম্ভবত) কিংবা জর্জেস সিমেনন এঁরা আপাতত দূরে থাকুন, হেমেন্দ্রকুমারের বিমলকুমার এবং পরে জয়ন্ত এদেরই বা কাকে কাকে আজ একাল যখের ধন করে আগলে রেখেছে। বরং এই শেষ পর্যায়ে গোয়েন্দা গল্পের কয়েকটি সামান্য লক্ষণ নিয়ে কিছু বলি। এক—অতি বুদ্ধিধর বা শক্তিধর কোনো নায়কের পাশে অবোধ একটি সহকর্মী। যেমন বলেছি তো হোমসের ওয়াটসন, ব্লেকের স্মিথ, পোয়ারোর ক্যাপটেন হেস্টিংস। আমাদের শরদিন্দুবাবুর ব্যোমকেশের অজিত কিংবা ফেলুদার তোপসেও কতকটা সেই ছাঁচে তৈরি নয় কি? এরা দেখেও দেখেনা, বুঝেও বোঝেনা, কেউ কেউ বড় জোর শুধু লিখে থাকে। তাদের কাউকে কাউকে বুঝ দেওয়া হয় যে তারা বিজলী নয়, তবে বিজলীর তার (হোমস এই ধরণের কি একটা কথা বলে না ওয়াটসনকে ভোলান?)—কাহিনীতে ঠাঁই পাওয়ার যোগ্যতা তাদের স্রেফ একটাই: নীরেট বোকা। হতেই হবে। পুত্তলিকাবৎ অথবা একটু বেশি। দেখিয়ে দিলে এরা দেখে। শোনালে শোনে, বুঝিয়ে দিলে বোঝে।

অথচ মহা তুখোড়, চতুর লেখকেরা জানেন না, তাঁদের বানানো গোয়েন্দাদের আগেই অনেক পাঠক আজকাল খুনীকে মনে মনে সনাক্ত করে ফেলে। ট্রিক বা কায়দাগুলো জানা হয়ে গেছে কিনা? ব্যবহারে ব্যবহারে পুরনো। লোকে আগে ভাগেই বুঝে নেয় যার ওপর সবচেয়ে কম সন্দেহের ছায়া খুনী নিশ্চয় সেই। রক্তের দাগ জল জল করে জ্বলতে থাকে।

আর একটা সনাতন স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে পুলিস মাত্রেই ভাঁড়, অথর্ব, অন্ধ, অক্ষম। এটা কিন্তু বাস্তবতাকে সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া। কারণ জীবনে (এক্ষেত্রে মরণে) পুলিসই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাটত্যার ফয়সালা করে। করতে না পারলে সে সব মামলা অনন্তকাল ফাইলের ফাঁসে আর এক বার মরে। মরেই থাকে। তবে পুলিস বাদ দিয়ে সাধারণত বাঁও মেলেনা, কিনারা হয়না। এই বোধটা পরবর্তীকালে কোনো কোনো সত্যকার সত্যান্বেষী লেখকের লেখায় ফুটে উঠতে দেখেছি। যেমন ডাঃ থর্নডাক, যেমন ইন্সপেক্টর মাইগ্রেন।

আর একটা কথা। গোয়েন্দা গল্পের হত্যা ইত্যাদি প্রায় কখনই রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় না। এসব বেশির ভাগই ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, নিহতের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভ কার? —এইটে প্রথম প্রশ্ন। তাই উইল টুইল এবং উত্তরাধিকারীর কথা এসে পড়ে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। তৃতীয়ঃ অকুস্থলে কে বা কারা ছিল বা ছিলনা। যারা ছিলনা বলে দাবি করছে তাদের সম্পর্কে নিঃস্বার্থ সাক্ষী আছে ত? এখানে বিলিতি বইয়ে একটা কথা কেবলই দেখা যায় অ্যালিবাই। যেন তেন প্রকারেণ ঐ অ্যালিবাইটাকে মজবুত পায়ে দাঁড করানো চাই। মজবুত বললাম কেন? এক—ডাক্তারের রাইগর মরটিসের রিপোরটে সময়ের খানিকটা ছাড় থেকেই থাকে। ঘড়ির ঘণ্টা ঘুরিয়ে দেওয়া বা ঘরের টেমপেরেচার ইত্যাদি ইত্যাদি কত কী। এই সবের উপরই ত মারার রহস্য কুয়াসার মতো ঘন হয়ে জমে থাকে। গল্পও জমে সেই জন্যই না? শেষ প্রশ্নঃ কে তাকে শেষ বারের মত জীবন্ত দেখছে?

এত ঘাঁটাঘাঁটি সব শেষ। সাধারণ গল্পে আজকাল যেমন গপ্পো মেলা ভার, তেমনি গোয়েন্দা কাহিনীও বেশ কিছুকাল অন্য খাতে প্রবাহিনী হয়েছে। দূরদর্শন থাকলে সৌরীন্দ্রমোহন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (যাঁদের নাম উল্লেখ করতে ভুলেছি—ক্ষমার অযোগ্য। অপরাধ নিয়ে লিখতে বসেও বিষম অপরাধ) হয়ত বা সতর্ক হতেন। দীনেন্দ্রকুমার নীহাররঞ্জন, শরদিন্দু, সত্যজিৎ প্রভৃতি ত বটেই—অধিকাংশ বাংলা গোয়েন্দা গল্প ভাষার নৈপুণ্যে বিশিষ্ট কার্য কারণের সম্পর্ক নিরূপণে বিজ্ঞান-অভিমানী, বুদ্ধি আর বিশ্লেষণ চাতুর্যে অনন্য। অনেকের মধ্যে সন্দেহ ছড়িয়ে দিতে দিতে হঠাৎ দেহ্মাঁর মুহূর্তে একটি সনাক্ত করণের পরিণাম। বিস্ময়ে উপনীত হওয়াও একটা উপনয়ন। গোয়েন্দা

কাহিনী ব্রাত্যই যদি হবে তবে কী করে মৃত শার্লক হোমস সগৌরবে তাঁর শত-বার্ষিকী উৎযাপন করলেন ?

কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয় এই নিয়ে অন্যান্য আখড়াতেও ত অনর্গল অবিরল সংশয়। কত লেখা এই আছে তো এই নেই। শর্ত কি জীবনের প্রতি সততা ? তবে ত গোয়েন্দা গল্পও সাহিত্য, কারণ মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু, হত্যা এসবই কি জীবনের অংশ নয় ? অংশ, তবে প্রতিলিপি হবে কেন ? হলে ত ঠাকুরমার ঝুলি থেকে অ্যালিস সবই বাদ যায়। বাদ যায় অরওয়েলের রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক প্রক্ষেপ ১৯৮৪।

বিশেষ কালে যা কলকে পায় তাই সাহিত্য, আর নির্বিশেষ কালে পেলে ? অনেক গোয়েন্দার অদৃষ্টে সেই অমরত্বও ত মিলেছে। হোমস্, মসিয়ে দুপাঁ, পোয়ারো ? ক্রিস্টি আস্তে আস্তে যেন ইটের উপরে থাকে থাকে ইট সাজিয়ে হঠাৎ চিলে কোঠায় সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়ে যাকে বলে ক্রাইম রি-কনসট্রাক্ট করা মানে হত্যার সম্ভাব্য দৃশ্যের পুনর্নিমাণ—সমস্ত সমূহ সমাধা করে শেষ সমাধানটা হুড়মুড় করে ভেঙে দিতেন। একটা বেদানা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে শেষ দানাটিকে বের করে চিনিয়ে দেওয়ার মতো। সাধে কি ডি-কুইনসি' মার্ডার কনসিডারড অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ফাইন আর্টস লিখেছিলেন ? তিনি অবশ্যই ছিলেন ত্রিকালদর্শী।

লিখতে লিখতে খেই হারিয়েছি। একালে শুধু খুনের রঙ পাঠকের মনের রঙ যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যায় না, তাই অনেকে এনেছেন সেক্স। অনেকে স্পাই স্টোরি। গুপ্তচরের ব্যাপারে সমারসেট মমের অ্যাশেনডেন স্মরণীয়। এই ধারা বয়েই পরে এসেছে তোপাজ ইত্যাদি। এসেছেন ইয়ান ফ্লেমিং। তিনি আনলেন চির-যুবা জেমস বণ্ডকে—একালের এক শ্রেণীর রাজনীতিনবীদেরা শুনে উৎফুল্ল হবেন—বণ্ড ছিলেন লাইসেন্সড টু কিল। মানুষ মারার খোলাখুলি ফরমান। ব্যবসায়ে একেই বোধ হয় ও জি এল বলে।

মানে, মনের সঙ্গে স্তম্ভন উচাটন সবই এল। লোকের মন উপছে গেল। নিক কার্টাররা যাঁরা পরে এলেন তাঁরা ঐ মাড়ানো রাস্তাই ধরলেন। অর্থাৎ, যে মরেছে সে তো বরাবরের মত শুয়েছেই, ব্যাপারটাব হিল্লে করতে বেশ বশ বড় সড বুক-শপ ওয়ালা যুবতীদেরও খানিকক্ষণের জন্য শোয়ানো চাই।

এই ধারাই চলছে। সেক্স আর ভায়োলেন্স্। খুনী হোন বা যাঁরা করেন গোয়েন্দাগিরি, কেউই কামিনী কাঞ্চনে বিতৃষ্ণ, শুকদেব আর নন। এর আভাস হয়ত আরল স্ট্যানলি গার্ডনার (ছদ্মনামে এ এ ফেয়ার) সাঁটে দিয়ে থাকবেন। তবু চূড়ান্ত আইনজ্ঞ তাঁর সব কোর্টসীন, আর পেরি মেসনের সওয়ালগুলো তো ছিল! কত

বাস্তবিক অপরাধী ঐ সব কাল্পনিক কাহিনীর কল্যাণেই ধরা পড়েছিল। পেয়েছিল শাস্তিও।

এখন সব কি নাস্তি? না। অন্ততঃ চোস্ত ইংরিজীটা আছে। প্রত্যেকেই দারুণ লেখেন। যেমন মহামহিমময় হ্যাডলি চেজ। তবে প্রায় প্রাচীন পেচকের বয়সী এই লেখকের মনের আহার কিছু কিছু হারিয়েছে বলে একটু একটু খালি খালি লাগে বই কি! খুনীকে যে আগে থেকেই জানা যায়। চেনা যায়। একালে শুধু পিছু পিছু ধাওয়া। কে হারে। কে জেতে, এই রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। তবু কবুল করি, পাতা মুড়ে বইটা তো সরিয়ে রাখতে পারিনা। ওর ভিতরে মিশে যায় আমার নিশ্বাস।

আর খুব শিবরামীয় না হলেও মিলিয়ে বলি, গোয়েন্দা গল্পের সম্পর্কে শেষ বিশ্বাস। সেটা খোয়া যায়নি। সেটা কী? না, নৈতিকতা, আর ন্যায়ের জয়। মানুষ মরে, মানবতা থাকে, জগতের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাই বলে। নয়? আজ প্রকরণ যেমনই হোক, যত যৌনতা আর জৈব বিকৃতি আসুক, এখনও বেশির ভাগ গল্পের বক্তব্য ওইটাই। যারা খারাপ তারা জেতেনা। এই শর্তটা এখনও পূর্ণ। তথাকথিত অন্তেবাসী অপরাধমূলক কাহিনী আগে এই কথাটাই হয়ত কোনো মিনার থেকে আজানের মত জানান দিত, আজ নিচের তলায় নেমে এসেও কিন্তু সেই একই কথা বলছে: খুন ঝরছে ঝরুক, একের পর এক খুন, কিন্তু খুনীর ক্ষমা নেই। এত রক্ত, এত রক্ত কেন?—রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনে এই ধরণের একটা জিজ্ঞাসা ছিল না? একালের, সেকালের সব কালের গোয়েন্দা গল্পেরও জিজ্ঞাসা এই।

পুনশ্চ: লেখক হিসাবে জায়গা পাওয়ার অধিকার এই লেখকের ছিল কি না সেই রায় দিন এই সংকলনের পাঠকেরা। তবে ভূমিকা লেখার ভার সে ঠেলতে পারে নি। এই অনুচ্ছেদটা তাই অধিকন্তু। যতদূর জানি, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের গঙ্গোত্রী থেকেই শুরু করা হবে—সম্পাদকের এই সংকল্প। তবে ভোজের সুবিধার্থে ভোজ্য বস্তুকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হল। এই শতকের সূত্রপাতটি বিভাজন রেখা। একটু অসুবিধা, তথাপি। বাংলায় রহস্য কাহিনীতে যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের অনেকেরই জন্ম উনিশ শতকে। যথা পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র কুমার থেকে শরদিন্দু ইত্যাদি অনেকেই। এই খণ্ডে যাঁরা হাজির তাঁরা স্বকীয় শক্তিতে। মনোজ বসু থেকে সমরেশ বসু প্রমুখ খ্যাতনামারা তো বটেই, অতিশয় কমবয়সী আগন্তুকেরাও। ভাগের রেখা সুতরাং কৃত্রিম। সম্পাদক অন্য একটি মুখবন্ধে সমস্তটারই নিপুণ বিদগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়ে আমার কাজ হালকা করেছেন—পাঠকরা জেনে রাখুন। তাঁরা এও জানুন যে, দ্বিতীয় খণ্ডটিও দেখা দেবে অচিরে। আর বিষয়বস্তু যদিও হত্যাদি, তবু এই প্রতিশ্রুতিটা খুন হবে না, আশা করি। রসজ্ঞ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, ইতি।

স. ক. ঘ.

প্রসঙ্গ ঃ দেশ বিদেশের গোয়েন্দা কাহিনী

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচারিত গ্রন্থ বাইবেল। তবে বাইবেলের পরই যদি কোন গ্রন্থ বিশ্ববাসীর নিকট, সৌর মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহের মানুষের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে থাকে তবে তা ডাঃ স্যার আর্থার কোনান ডয়লের শার্লক চরিতমালা। বাইবেল সর্বাধিক সম্মানিত ও আশ্রিত; শার্লক হোমস্ সর্বাধিক পঠিত। The Bible is less read and more revered but Sherlock Holmes is more read and less revered. বিশ্বসাহিত্যের অমর, অনন্য ও অবিস্মরণীয় পুরুষ শার্লক হোমস্। আর শার্লক হোমসের কাহিনী গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে বিশ্ববাসীকে এক অনাস্বাদিত পূর্ব রহস্য, রোমাঞ্চ ও অনুসন্ধিৎসার এক বিরল প্রদেশে অনুপ্রবেশের অর্গল উন্মোচিত করে দিয়েছে।

শার্লক—শার্লক—শার্লক হোমস তাঁর স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডয়েল হতেও অনেক নামী, অনেক দামী, অনেক অনেক পরিচিত নাম। রামায়ণের অমর কথায় রামের উজ্জ্বল উপস্থিতি ম্লান করে দেয় বাল্মিকীমুনিকে। ভিক্তোর হুগোর চেয়ে মানুষ বেশি চেনে রবিনশন ক্রুশোকে। তাই আশ্চর্য হই না যখন সুদূর ভারতবর্ষে ত দূর অস্ত, খোদ ইংলণ্ডের বহু বিজ্ঞ মানুষ শার্লক হোমসকে কেবল একজন প্রাণচঞ্চল অস্তিমজ্জাযুক্ত মানুষই ভাবে না, ভাবে এক ক্ষুরধার বুদ্ধি, অনুসন্ধেয় বিষয়ে মুসকিল আসানকারী লণ্ডন শহরের ২২১বি বেকার ষ্ট্রীটে বসবাসকারী এক বিরল প্রতিভা মানুষ।

স্যার কোনান ডয়েলের অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটে শার্লক হোমসের বিশ্ববিজয়ী জনপ্রিয় অবস্থিতির কাছে। কোনান ডয়েলের পরাজয় হয় শার্লক হোমসের খ্যাতির পরিম্লাণ উদ্ভাসে। স্রষ্টা হতে সৃষ্টি বড় হয়ে যায়। গুরু শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ। The creation is greater than the creator.

"চুরিবিদ্যা ...বিদ্যা যদি না...ধরা" এই চোর ধরার কাহিনীকে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা কাহিনীর অনুবর্তন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও গোয়েন্দা গল্পের বীজ নিহিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে চোর্য ও চাতুর্য অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে গেছে। এক কথায় চুরি বিদ্যাও চৌষট্টি কলার এক কলা, অর্থাৎ ফাইন আর্টসের অন্তর্গত হওয়ায় প্রাচীন সাহিত্যে চোরের শাস্ত্রকে চৌর্যশাস্ত্র বলা হত। চৌর্যশাস্ত্রের অধিদেবতা স্কন্দ অর্থাৎ কার্তিক। আর এই শাস্ত্র পারঙ্গমদেয অর্থাৎ চোরদের

বলা হত স্কন্দপুত্র। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে চোরের ও চুরির বর্ণনায় মৃচ্ছকটিক নাটক অনন্যতার দাবি রাখে।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই চোর ধরা বিদ্যাও এক বড় বিদ্যা। প্রাচীন কালেও দ্বারী, কোটাল সবই ছিল। চোর ধরে পুরস্কৃত হওয়ার রেওয়াজও ছিল। আর চোরের ধরা পরা তার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হিসাবেও গণ্য হত।

তবে আজকের দিনের গোয়েন্দা সাহিত্যে যে ডিটেকশন, পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি বিশ্লেষণ তার রেওয়াজ আমাদের উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান।

তবে মহাভারতের যুগেও পর্যবেক্ষণ, ডিটেকশন, বিশ্লেষণ সবই ছিল। মহাভারতের বনপর্বে বক-যুধিষ্ঠির সংবাদে যুধিষ্ঠিরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নানা নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। হ্রদের জল আনয়ন করতে গিয়ে পাণ্ডবরা চার ভাইই দ্রৌপদীসহ নিখোঁজ হল। ব্যাকুল প্রাণ যুধিষ্ঠির খুঁজতে গিয়ে হ্রদের তীরে তাঁদের জলে নামার পদ চিহ্ন দেখলেন। কিন্তু জল হতে প্রত্যাবর্তনের কোন চিহ্নই অনুসন্ধান করেও দেখতে পেলেন না। ফলে জলডুবি ও অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন। ফলে যুধিষ্ঠির বিপদ সঙ্কুল জলপথে অগ্রসরে বিরত হলেন।

পঞ্চতন্ত্রের গল্প মালায় আর হিতোপদেশের উপদেশ মালায় ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি কথায় গোয়েন্দা গল্পের আভাস পাওয়া যায়। দেড় দুই হাজার বছর পূর্বের "মূলদেব" কাহিনীকে আধুনিক শার্লক হোমসের প্রাচ্যদেশীয় পূর্বসূরী বলা যায়। দেবভাষার পর প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যেও সংস্কৃতের অনুরূপ সব চৌর্য ও চাতুরির নানা গল্প দেখা যায়। আজকের গোয়েন্দাগল্পেও যেমন ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় দেখা যায় সে দিনও তাই ছিল। অর্থাৎ পাপের বিনাস ও পূণ্যের বিজয় কেতন। আজকের গোয়েন্দা গল্প খুন, বলাৎকার চুরি, ডাকাতি ছাড়াও বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব সম্মত সব অত্যাধুনিক চাতুরি ও নব নব উদ্ভাবনী বুদ্ধি আকীর্ণ অপরাধ প্রবণতায় পঙ্কিল। তবে একটা বিষয়ে এখনও সেই সুপ্রাচীন কাল—কালিদাসের কাল হতে এই আজকের গ্রহান্তরে গামী মানুষের একই ধারা চলে আসছে তা হচ্ছে, যে কোন ধরনের গোয়েন্দা গল্পেই অপরাধীর বিরুদ্ধে পাঠকমন সজাগ ও সজীব। পাঠক পাঠিকা সর্বোতোভাবে গোয়েন্দার পক্ষে। অর্থাৎ সাদা মাটা কথায় বলতে বাধা নেয় অপরাধীর বিপক্ষে। আর এই এটা আছে বলেই এত সব অনাসৃষ্টির মধ্যেও মানুষ নামক দ্বিপদ জীবটি আজও বেঁচে আছে, সভ্যতা বেঁচে আছে। তবে জানি না আর কতদিন থাকবে।

আবার বলি চোরের চতুরতার গল্প বা কাহিনী সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে

বিচিত্র সাহিত্য—ডঃ সুকুমার সেন।

সুপ্রচুর। বিদ্যাসুন্দরের চৌর্য প্রেমের গল্প আর কোটাল দ্বারী প্রমুখ রাজপুরুষদের চোর ধরার কথায় আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। বিশেষ করে রাজার কোটালের ধোপা বাড়ীতে গিয়ে কাপড়ের দাগ দেখে চোর ধরার কাহিনীর মধ্যে আধুনিক Forensic (detection) science এর পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

তবে আধুনিক অর্থাৎ এ যুগের গোয়েন্দা গল্পের শুরুর সাথে জড়িয়ে আছে প্রায় গত দুই শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের কাহিনী। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড তথা ফ্রান্স ও ইউরোপের নামা দেশে যে পুলিশ ব্যবস্থা চালু হয় তার সাথে গোয়েন্দা বিভাগও ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে।

বিশেষ করে ভিক্টোরিও ইংলণ্ডেরস্থিতি শান্তিও সমৃদ্ধির সাথে সাথে ১৮২৯ সাল হতে লণ্ডনে যে পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তী কালে অপরাধ নিবারণে ও অপরাধী অন্বেষণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। তাই আজও পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের গোয়েন্দাদের তীর্থক্ষেত্র স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। লণ্ডন পুলিশ আজও জনসংযোগ, জনগণ মঙ্গল বিধায়কের ভূমিকায় অদ্বিতীয় অতুলনীয়: অপর পক্ষে ফরাসীদেশে নেপোলিয়ন বোনাপোর্টের শাসনকালে যে সুসংগঠিত পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে জনগণ মঙ্গল, জনসংযোগ যতখানি ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল বোনোপার্টের শাসন সুদৃঢ়করণ, রাজনৈতিক শত্রু নিধন, জনগণ দমন, পীড়ন ও নির্যাতন।

ফলে ইংলণ্ডে যত সহজে একসভ্য. সহনশীল ও প্রাণচঞ্চল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আর কোথাও তত সহজে গড়ে উঠেনি। আর অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন মহাদেশ আমেরিকায়, ইংলণ্ড তথা ইউরোপ হতে গিয়ে হাজার হাজার ভাগ্যান্বেষী মানুষ জীবন ও জীবিকার জন্য বসতি স্থাপন করে। কিন্তু যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দীতেও খুব সুসংগঠিত সরকারী প্রশাসন গড়ে উঠেনি ফলে নব গঠিত দুর্বল পুলিশ ব্যবস্থায় তখন ও কোন গোয়েন্দা বিভাগ গড়ে উঠেনি। তাই সঙ্গত কারণেই মার্কিন মানুষ অপরাধের অন্বেষণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও মূলত নির্ভর করছে Private Detective Organisation এর উপর। কারণ এখানের নতুন ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের কথা আক্ষরিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আরও অনেক পড়ে।

এরপর সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ। সচেতন অথবা অবচেতন ভাবেই হোক আর না হোক সামাজিক পরিবর্তনের ছাপ সাহিত্যে অপরিহার্যভাবে প্রতিফলিত হয়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নতুন মহাদেশ আমেরিকায় যে নতুন সমাজ, নতুন

---

1. Bloody Murder—Julian Symons 2. Development of Detective Novel—A. E. Murch

জনজীবন গড়ে উঠল তাতে সেই অজানা দেশের বিপুল বিস্তৃতি ও জনবিরল জনজীবনে যে রহস্য সাহিত্য সৃষ্টি হল তাতে ডিটেকটিভ আছে, ডিটেকশনও আছে ; তবে তার থেকেও বেশি যা আছে তা হল রহস্য, রোমাঞ্চ ও ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির দুর্মদ প্রচেষ্টা ও প্রবণতা।

তাই ইংলণ্ডে শার্লক হোমসের স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডয়েল সাহেব অপরাধীর অন্বেষণে ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও অনুসন্ধিৎসার এক বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। অথচ মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে এডগার অ্যালেন পো গোয়েন্দা গল্প যত লিখলেন, রহস্য রচনা সৃষ্টি করলেন তার থেকে অনেক বেশি। অজানা অচেনা নিঃসীম নিসর্গ প্রকৃতির ক্রোড়ে বিহারী মার্কিনমানুষ মানুষকে ভয় করল যত তার থেকেও বেশি ভয় করল প্রকৃতিকে আর অতিপ্রাকৃত গল্প কথায় ভরে উঠল মার্কিন রহস্য সাহিত্যের অঙ্গন।

এডগার অ্যালেন পোর অনুসরণে মার্কিন সাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চ ও বিভীষিকার পরিমণ্ডল সৃষ্টির এক দুর্নিবার প্রবণতা দেখা দিল। ফলে দীর্ঘকাল মার্কিন সাহিত্যকে যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক চিন্তাঋদ্ধ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান নির্ভর গোয়েন্দা গল্প সৃষ্টি করতে দেয় নি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কিন সাহিত্যে যে গোয়েন্দা কাহিনী রচনার প্রবণতা তা ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বললে অত্যুক্তি হবে না।

তবে ফরাসী সাহিত্যে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই বালজাকের লেখায় গোয়েন্দা গল্পের ও গোয়েন্দা উপন্যাসের প্রবণতা দেখা যায়। তবে তাকে গোয়েন্দা বিহীন গোয়েন্দা উপন্যাস বলাই ভাল। কারণ বালজাকের মৃত্যুর অন্ততঃ দশবৎসর পর ট্যাইপ গোয়েন্দা হিরো সৃষ্টি হয়।

তবে একথা ঠিকই যে অধিকাংশ ফরাসী লেখক বালজাকের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গোয়েন্দা গল্পে হাত পাকিয়েছেন। বালজাকই সম্ভবতঃ এমন একজন ক্লাসিক সাহিত্যিক যিনি সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্পের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অমর দুই গ্রন্থ Maitre cornilius (1831) এবং Une Tinibrense Affaire (1841)। প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী গোয়েন্দা উপন্যাস ইউ জিনস্থ (Eugine sue) এর দ্বারা, নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

এধারে আর একজন দিকপাল ক্লাসিক সাহিত্যিক আলেকজান্দার ডুমা তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীকে প্যারির সমকালীন জীবনের অতিবাস্তবতা হতে মুক্ত করে অভিজাত রাজসভার অত্যুজ্জ্বল অঙ্গনে উপস্থাপিত করেন। ফলে ডুমার অভিজাত গোয়েন্দা নায়ক সামান্য সূত্র হতে অসামান্য সিদ্ধান্তে পৌচেছেন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুঃসাহসী অভিযান ও বিশ্লেষণ লাঞ্ছিত অবধানের মাধ্যমে।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন

এড্‌গার অ্যালেন পো, ইংরাজ রুডিয়ার্ড কিপলিং ও কোনান ডয়েল গোয়েন্দা গল্পকে এক বিশিষ্টতা দান করেন।

তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালকেই ইংরাজী গোয়েন্দা গল্পের স্বুবর্ণযুগ বলতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক হতেই কোনান ডয়েল, আগাথাক্রিষ্টি, এইচ. সি. বেইলি, ডরোথি সোবার্স প্রমুখ লেখকদের লেখায় ইংরাজী গোয়েন্দা সাহিত্য পুষ্ট হয়। ইংলণ্ডে আর্থার কোনান ডয়েলের বিশ্লেষণ, অন্বেষা ও বিচার নিষ্ঠ আলোচনার অনুবর্তন দেখা যায় উল্লিখিত ইংরাজী গোয়েন্দা গল্পের লিখিয়েদের লেখায়। আর এডগার অ্যালেন পোর স্মৃতি বিজরিত Mystery writers of American Organisation কর্তৃক বৎসরান্তে খাঁটি রহস্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্য প্রদত্ত "এডগার অ্যালেন পো পুরস্কার" ঘোষিত হওয়ায় মার্কিন সাহিত্যে ইংরাজী ধাঁচের গোয়েন্দা লেখার প্রবণতার পরিবর্তে রহস্য কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা জনপ্রিয়তা (লিখন প্রিয়তা) লাভ করে।

তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে মার্কিন সাহিত্যেও ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় গোয়েন্দা, গুপ্তচর ও রোমাঞ্চকর যৌনতাপৃক্ত এক অভিনব অনাস্বাদিত পূর্ব ও উপাদেয় ভোজ্য পরিবেষণের রেওয়াজ দেখা যায়। আর এধারে ইংলণ্ড-আমেরিকা হতে হাজার হাজার মাইল দূরস্থ পরাধীন ভারতের পূর্ব উপকূল আশ্রয়ী এই প্রত্যন্ত প্রদেশের আমাদের আ মরি বাংলা ভাষাতে ইংরাজী রথী মহারথীদের লেখার অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রতি দশকে এবং দশক হতে দশকান্তরে। তাই পাঁচকড়ি দে হতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় আর দীনেন্দ্রকুমার রায় হতে হেমেন্দ্রকুমার রায় পর্যন্ত কেউই বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে বাংলা গোয়েন্দা গল্প লিখতে প্রয়াসী বা সমর্থ হন নি। আর বাংলা গোয়েন্দা গল্পের পটভূমিকায় যে কথা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত পরিতাপের তা হচ্ছে গোয়েন্দা গল্পের ন্যায় এক জনপ্রিয় সর্বাধিক পঠিত বিষয় সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের রথীমহারথীদের এক অনির্দেশ্য অনীহা।

তবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রথম লেখক যিনি সাহিত্যিক রসবিচারে সত্যিকারের উন্নত মানের গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে প্রয়াসী ও সক্ষম হয়েছেন। তাঁর হাতে বাংলা গোয়েন্দা গল্প উচ্চমানের শিল্প ও সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সমসাময়িককালে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় প্রমুখ লেখকগণও বেশ কিছু সার্থক গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ মশাইয়ের "আমার প্রিয় সখী", সমরেশ বোসের "হ্রেষাধ্বনি", মুস্তফা সিরাজের "ঘটনা যখন রহস্যজনক" ও নারায়ণ সান্যালের "উলের

কাঁটা" বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীতে এক সাহিত্যিক সংযোজন। তবে পরিতাপের বিষয় আমাদের সাহিত্যের অভিজাত পাঠক ও লেখকগণ আজও গোয়েন্দা বা রহস্য সাহিত্যের অঙ্গনে প্রকাশ্যে বিচরণে আগ্রহী নন। তবে অভিজাততর অনেকের হাতেই একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে নিঃসঙ্গতার সঙ্গী হিসাবে দেখা যায়, "মৃত্যু দূত" অথবা "নিঃসঙ্গ নায়িকার" ন্যায় রসাল রোমাঞ্চকর রোমান্সের বই। সর্বদেশে হয়ত সর্বকালেই গোয়েন্দা তথা রহস্য সাহিত্যের পাঠক পাঠিকা যে কোন তথাকথিত সৎসাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি। আর বিশ্বব্যাপী জনশিক্ষার প্রসারে ও গণশিক্ষার প্রশ্রয়ে যে বই মুক্ত দুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা হচ্ছে গোয়েন্দা, রহস্য ও রোমাঞ্চকর রোমান্সের দুঃসাহসী কাহিনী।

আব্রাহাম লিঙ্কন হতে জোসেফ ষ্টালিন কেউই এডগার অ্যালেন পোর কম অনুরাগী ছিলেন না আর আজকের দ্বিধা-দ্বন্দ্বদীর্ণ পৃথিবীতে সাধারণ ও অসাধারণ বিমানচারী ইরানী-মার্কিনী, আরব-ইস্রাইলি, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী সকলেরই হাতে হাতে ইয়ান ফ্লেমিং হেডলি চেস, নিকোলাস ব্লেক প্রমুখের পেপার ব্যাকের নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমা।

আর আমাদের মশা ক্লিষ্ট (নব পর্য্যায়ে) ম্যালেরিয়া পুনরাগত, বিদ্যুৎ বিদূরিত বাংলাদেশের ট্রেন, দূরগামী বাসচারী মানুষের হাতে অভিজাত লেখনী সঞ্জাত ব্যোমকেস, পরাশর, ফেলুদা, ছাড়াও হরিনারায়ণের পারিজাত বক্সী, অদ্রীশ বর্ধনের ইন্দ্রনাথ, মুস্তফা সিরাজের কর্ণেল এর এবং সত্যিকথা বলতে কি শ্রীস্বপনকুমার সিরিজেরও অপরিরোধ্য গতি।

তাই আজকের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমস্যা আকীর্ণ অস্থির ও উন্মত্ত পৃথ্বীর ব্যস্ত সমস্ত ত্রস্ত মানুষ তাঁদের নষ্টদুষ্ট জীবনের ক্ষণিক আনন্দের ভোজ্য হিসাবে গোয়েন্দাও রোমাঞ্চকর কাহিনীকে গ্রহণ করে। আর রহস্যও গোয়েন্দা সাহিত্যেও যখন সমাজ ও জীবনের বাস্তবতার বিম্বিত প্রতিফলন ও মানবিক উত্তরণ দেখান সম্ভব তখন সৎসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকদের তন্নিষ্ঠ পোষকতায় গোয়েন্দা সাহিত্য সমৃদ্ধ হলে নিশ্চয় সমাজের সকলেরই মঙ্গল কারণ পূর্বেই বলেছি সমস্ত সার্থক গোয়েন্দা গল্পের অন্তর্নিহিত মূল সুরই শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন ; সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্।

তুষার-কান্তি পাণ্ডে

ডিটেক্‌টিভ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি পুলিসের ডিটেক্‌টিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল। আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন। অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্ট লক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকবে না। পুলিশ বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম। অবশেষে ডিটেক্‌টিভ পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত। কারণ পুলিসের কর্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়। তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরও যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন—এখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব। আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেক্‌টিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটি নাম রাখিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যত কিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকী রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল। কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র গোয়েন্দা গল্প "ডিটেক্‌টিভ" প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা সাহিত্যে গোয়েন্দাগল্পের পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও তাঁর এই গোয়েন্দাগল্পে ডিটেক্‌টিভ গল্পের অনুসন্ধিৎসা ও অন্বেষণ ছাড়াও গোয়েন্দা নিয়ে এক সরস ব্যঙ্গ কৌতুক প্রবাহ পাঠককে রসসিক্ত করবে।

আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতি বিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধ বূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না এমন নির্জীব দেশে ডিটেক্‌টিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারে মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধী কুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ও ওস্তাদ-লোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেণ্টের সমুন্নত ফাঁসি কাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে কঠোর আত্মসংযম. তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস।'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম 'এই হর্ম্যরাজি এবং পথ উপ পথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত উৎসবস্রোত সৌন্দর্য স্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্র কুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ংকর অপরাধ প্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সমীপে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্যকৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাট, ভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্না বাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাস দাবার বৈঠক, দাম্পত্যকলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই কোনো একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনও এ কথা মনে হয় না যে হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনে একটা কোনে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার ছেলে ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছু মাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালো মানুষ এমন কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোন প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ডবলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে এইমাত্র যে কোনো একটি উৎকট দুষ্কার্য সাধন করিয়া আসিয়াছেন, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি—সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অন্যকোনো দেশে জন্ম গ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনী শক্তি এবং যথেষ্ট পরিমান পৌরুষের

অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল দ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া কাটাইল। দ্বিতীয় পাণ্ডিত্যটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোন অতি ক্ষুদ্র ঘটি বাটি চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্‌পোষ্টের নীচে একটি মানুষ দেখিলাম, বিনা বাক্যব্যয়ে সে উৎমুখ ভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে সে একটি গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারা খানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী. আমি যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের খাঞ্জ সর্বযত্নে পরিহার করে, সংসর্গ করিয়া তাহারা নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদুরি. সেই জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম, বলিলাম, ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়েছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার তবে তো বলি সাবাস্!"

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাত-পূর্বক বলিলাম, "এই যে. ভালো আছেন তো?" সে তৎক্ষণাৎ প্রবল মাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন, কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুন্ন হইলাম নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপনতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, গোলদিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিনী তীরে তৃনশয্যার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, আমি ভাবিলাম, উপায় চিন্তার এ স্থান বটে, গ্যাসপোস্টের তল দেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোক যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশ কালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃত সংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসায় এক অংশ গ্রহণ করিলাম, প্রথম দিন

যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজা ভাবে কস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয় বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলো না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদেয় লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশী হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকাল-ধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ হইবে না একদিন গদ্‌গদ কণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, "ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।"

প্রথমটা সে যেন চকিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এই প্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নর নারীর প্রভেদ করিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "তোমার পরামর্শও সাহায্য চাই।" সে সম্মত হইল, আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কহিল না। আমার ধারনা ছিল, ভালোবাসার বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মরিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবা মাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্‌ক্ খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয় স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা ন্যায় সংগত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার

কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে যে অসামাজিক মনুষ্য সম্প্রদায় পাতালে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মানুষ্য সমাজকে সর্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎ-বক্ষবিহারিনীর সর্বনাশিনীর একটি প্রলয় সহচর; আধুনিক কালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে, নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না। আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমনীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু-উদয়রে' কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিনাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলা সহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না। মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল। মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমার ও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী। ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যে দিন কোনো একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেইদিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকে ও মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে, এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি, সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সেই ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহার ও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমনীর অবতারনা করিয়া নূতন উপদ্রব স্বজন করিয়াছি : কিন্তু হই৷ সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার •একটি আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয৷ উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ কবিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সদুপায় ; এবং কোনে বিষযে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমনীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু একটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মৎলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয উঠিল মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, "আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সংকল্প করিয়াছি।" শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনও কোনও কারণে অনভি-রুচি দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিতভাবে কহিলাম, "হাঁ হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যে প্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সী

সমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হুঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজ ভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলক সঞ্চার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব. কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল, এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীত মুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি।" সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। এখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন না, কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন। তাহার পর কী হইল সকলে জানেন। এই আমার ডিটেক্‌টিভ পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।" মহিম কহিল, "না হইবার সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে। বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল, সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সুচরিতাসু

হতভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধকরি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ, বাল্যকালে যখন কাজি বাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার পাঁচ বৎসর তোমার আর তার কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার

পুলিসের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান্ করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোস্টের তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতালার দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটি মাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনো প্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, যদি

বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমানও দেখাইতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি, আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে, ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণতল স্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখ-স্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো, আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

আষাঢ়—১৩০৫ শ্রীমন্মথ মজুমদার



যদুনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ খুলনায় ॥

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খুলনা যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি থানা মাত্র। তখন খুলনায় স্থল-পুলিস ও জল-পুলিসের বড় আড্ডা ও কালেক্টরের অফিস ছিল। খুলনায় অনেক চোর ডাকাত ধরা পড়িত, খুলনা হইতে দুই-তিন দিনের পথে নিয়ত চুরি ডাকাতি হইত। এখন যেমন বিদ্যানুসারে পুলিস বিভাগে পদ-বিভাগ করা হয়, তখন তেমনি বুদ্ধি ও চুরি-ডাকাতি আসকরা করিবার ক্ষমতা অনুসারে লোক নিযুক্ত করা হইত।

পুলিসের বড় কর্ত্তা কাপ্তেন হগ স্টীমার সহযোগে বাদার অনেক স্থানে জল-পুলিসের অনেক আড্ডা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি খুলনার নিকটে নদীগর্ভে একটি সন্দেহজনক মৃতদেহ পাইয়াছেন। মৃতদেহটির গলা প্রায় বারো আনা কাটা ছিল। তাহার মাজায় একটা দড়ি দিয়া এক মেটে কলসী বাঁধা ছিল। কলসী জলে সম্পূর্ণ ডুবে নাই। স্টীমার চালানোর ঢেউতে কাপ্তেন হগ মৃতদেহের মাথা দেখিতে পান। তিনি মৃতদেহটা তুলিয়া লইলেন। মৃতদেহ হইতে পাইয়াছেন তিনি একটি মেটে কলসী, একগাছি দড়ি, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, একখানি গামছা ও একগাছি লম্বা পৈতা।

পুলিসের বড় কর্ত্তা কাপ্তেন হগ খুলনায় আসিয়াছেন। খুলনা থানার বড় প্রাঙ্গণে তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছে। দলে দলে লোক আসিয়া কার্য্যপ্রার্থী হইতেছে। কেহ কনেষ্টবলী, কেহ রাইটার কনেষ্টবলী, কেহ হেড্-কনেষ্টবলী ও কেহ দারোগাগিরী কার্য্যের উমেদারী করিতেছে। আমাদের নীলমণিও আজ দারোগাগিরী চাকুরীপ্রার্থী। কাপ্তেন হগের কথা এইরূপ যে, যিনি এই খুন আস্‌করা করিতে পারিবেন, তিনি দারোগা ও যাঁহারা এই খুন আস্‌করা সম্বন্ধে সাহায্য করিবেন, তাঁহারা গুণানুরূপে কনেষ্টবল ও হেড-কনেষ্টবল হইবেন।

নীল। আমি দারোগাগিরী কার্য্যের প্রার্থী।

হগ। টুমি কি লেখা পড়া জানে?

নীল। আমি বাংলা, উর্দ্দু, পার্শী ও অল্প অল্প ইংরাজী জানি।

হগ। টুমি খুন আস্‌করা করিতে জানে?

নীল। আজ্ঞে, তা পারি।

হগ। মনে কর, আমি জলে একটি খুন পাইয়াছে। খুনের সঙ্গে আর পাইয়াছে একটি কলসী, একখানি কাপড়, গামছা ও পৈটা। এটে টুমি খুন আস্‌কারা করিটে পাড়ে?

নীল। মৃত ব্যক্তির মাপ ও ছবি রাখেন নাই?

হগ। হাঁ, টাও পাবে।

নীল। তবে তো খুন আস্‌কারা করা অতি সহজ, সবই ত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ নিয়োগ ॥

অনন্তর কাপ্তেন হগ দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নীলমণিকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। কাপ্তেন হগ বলিলেন—"টুমি এই খুন আসকারা করিতে চাহিলে কি কি চাহে?"

নীলমণি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—"এই খুন আসকারা করিতে হইতে চাই, তাহার নক্সা, মাপ, ঐ কলসী, পৈতা, কাপড় ও গামছা, চারজন কনষ্টেবল, তাহার মধ্যে তিন জন গান ও খোলকরতালে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক আর একখানি নৌকা ও কিছু টাকা আরও চাই সকল থানার দারোগার উপর এই মর্মের এক পরোয়ানা যে, আমার যখন যত কনষ্টেবল, দারোগা ও চৌকিদারের প্রয়োজন হইবে, তখনই তা সব দিবে।

হগ। কাল এগারটার সময় টুমি এ সব পাবে। এ সব ফেলে টুমি খুন আসকরা করিতে পারিবে?

নীল। আজ্ঞে, নিশ্চয় পারিব।

পরদিন বেলা এগারটার সময় নীলমণি কাপ্তেন হগের সহিত দেখা করিলেন। চারজন গায়ক, কনষ্টেবল, একখানি দুই মাল্লা নৌকা, পঁচিশটি টাকা ও মৃত ব্যক্তির সহিত যে যে দ্রব্য ছিল, তাহা ও মৃতব্যক্তির একখানি ছবি ও মাপ প্রাপ্ত হইলেন। নৌকায় আরও তিনটি দাঁড় বসাইলেন। একটি খোল, দুই জোড়া করতাল, পাঁচটি বাউল বৈরাগীর পোষাক ও কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ প্রস্তুত করিলেন। মাঝিদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা বাউল বৈরাগী। তাঁহারা পূর্ব্বদেশে ভিক্ষা করিতে গমন করিবেন। সেদিন আয়োজনেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে নীলমণি পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে নৌকা চালাইয়া দিলেন। নীলমণির নাম হইল জগদানন্দ গোস্বামী ও অন্য চারজন লোকের নাম হইল যথাক্রমে অতুলানন্দ বাবাজী, প্রেমানন্দ বাবাজী, পুলকানন্দ বাবাজী ও নিত্যানন্দ বাবাজী। সকলেই গৈরিক কৌপীন পরিধান করিল ও গৈরিক আলখাল্লায় সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ কুম্ভকার গৃহে ॥

বৈরাগী বাবাজীরা স্থানে স্থানে কুম্ভকার বাটীতে খুব গান করিযাছেন ও বেশ চাউল ডাইল উপার্জ্জন করিয়াছেন। বাবাজীদের ভিক্ষাব পাত্র একটি কলসী।

জগদানন্দ প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া পাক করিতে বসিলেন। প্রভু তিনবার স্নান করেন। প্রচার আছে যে, প্রভু নানাপ্রকার আদি ভৌতিক ঔষধ ও কবচ জানেন। আজ গোপাল পালের বাটীতে তাঁহারা অতিথি। গোপালের মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। গোপালের কোন সন্তান-সন্তুতি হয় নাই। স্ত্রীমহলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, গোপালের স্ত্রী বন্ধ্যা। কিন্তু গোপালের মাতা এখন ঔষধ কবচ কুড়াইতে বিরত হন নাই। প্রভু জগদানন্দ রন্ধন করিতেছেন এবং গোপালের মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। গোপালের মাতা যুক্ত করে বলিলেন—"প্রভু শুনিলাম, আপনি অনেক ঔষধ ও কবচ জানেন। আপনি বেশ গোণা পড়া জানেন। আপনি গ'ণে বলুন, আমার গোপালের ছেলেপিলে হয় না কেন এবং একটি ভালো ঔষধ দিন।"

জগ। আজ হ'তে রাতে বিকালে তোমার বাড়ী হ'তে এক পক্ষের মধ্যে কে কলসী নিয়েছে?

গোপালের মাতা অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—"গত মঙ্গলবার দিন প্রায় দুই প্রহর রাত্রিতে রায়বাবুদের বাড়ীর বিধু চোপদার একটি কলসী লইয়াছিল।"

জগ। তবেই হয়েছে, তবেই হয়েছে। দুধ নাই, তা ছেলে হয়ে খাবে কি? উডোবানে আগে তোমার গোপালের স্ত্রীর দুধ নষ্ট করেছিল, সেদিন রাত্রে কলসী নিয়ে একেবারে আসল বানে সর্ব্বনাশ করেছে। যা হ'ক, কলসী আমার হাতে পড়েছে। আমি দোষদৃষ্টিব কলসীই শোধন ক'রে নিয়ে ভিক্ষা করি। দোষটা আমি আগেই কেটে দিয়েছি। আমি জলপড়া ও প্রস্তুত করে দিচ্ছি, আজ হ'তে এক বৎসরের মধ্যে তোমার গোপালের সুসন্তান হবে।

সে রজনী কুম্ভকার বাটীতে অতীত হইল। গোপালের মাতা জলপড়া ও কবচ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। শ্রোতৃগণ আবার প্রভুদের আহারান্তে সঙ্গীত আরম্ভ করিতে বলিলেন। প্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ রজক-গৃহে ॥

পরদিন প্রাতে বৈষ্ণব প্রভুগণ কুম্ভকার বাড়ী ছাড়িয়া পথ বাহিয়া চলিলেন। তাঁহারা যে সে বাড়ীতে গান করেন না—প্রকৃত হরিভক্তের বাড়ীতেই গান করেন। কিছু দূর যাইতেই অতুলানন্দ প্রভু বলিলেন—"প্রভো! এ মথুরানাথ রজকের বাড়ী, কি করা যাইবে?"

জগদানন্দ প্রভু বলিলেন—"মথুরের মা প্রকৃত হরিভক্ত। এ বাড়ীতে হরিনাম করতে হবে।"

এই বলিয়া জগদানন্দ প্রভু তাঁহার ভিক্ষার কলসীর গলায় একখানি কাপড়ে ধোপার চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন,—"বল দেখি মথুরের মা, এই কাপড়ের দাগটি কার? এই কি তোমার মথুরের দেওয়া।"

মথুরের মাতা হাসিয়া উত্তর করিল,—এ দাগ তো মথুরেরই দেওয়া। এ দাগ মথুর দেয়, আমি দেই ও আমার এক ছোট মেয়ে দেয়। এই দাগ রায় বাবুদের বাড়ীর গোমস্তা রমাকান্ত চক্রবর্ত্তীর কাপড়ে দেওয়া হয়। সেই সেই ঠাকুর আজ সাত আট দিন নিরুদ্দেশ। সেই সংগে রামটহল পাঁড়েকে পাওয়া যাইতেছে না।"

জগ। চুপ কর, চুপ কর মা, বাজে কথার কাজ নাই। কোন দুষ্ট লোক তোমার মেয়ের ছেলে, কি ছেলের চিহ্নমাত্র নষ্ট করেছিল। জলপড়া ও কবচ লও। আমরা আর দেরি করতে পারি না, এখনই উঠবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

থানায়

চৈত্র মাস, বেলা প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। খরকর সূর্য্যদেব প্রখরভাবে উদিত হইয়াছেন। বরিশাল জেলার পশ্চিম প্রান্তে এক থানার দারোগা বাবু এজলাসে বসিয়া আছেন। থানা লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এমন সময় আর এক নূতন দারোগা থানাগৃহে প্রবেশ করিলেন। নূতন দারোগার সহিত মাত্র চারিজন কনেষ্টবল। নূতন দারোগা অন্যান্য লোকদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তিনি থানার দারোগাকে এক পরোয়ানা দেখাইয়া বলিলেন—"আমি চাই, এমনি একখানি দ্রুতগামী নৌকা, বেলা একটার মধ্যে একশত চৌকীদার দশবারজন কনেষ্টবল, তিনজন সাব-ইনেস্‌পেক্টার ও হেডকনেষ্টবল।"

থানায় দারোগা বাবু সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—"আমি সব যোগাড় করছি। বেলা একটার মধ্যে সব পাবেন।"

থানার দারোগা বাবু এই কথা বলিয়া উচ্চরবে দেরবর সিং, পল্টীপত পাঁড়ে, রামটহল দোবে, লছমণ মিশ্র, বাহাদুর বিশ্বাস, আবদুল করিম, কাঁজী এইজদ্দি লস্কর প্রভৃতি কনেষ্টবলদিগকে ডাকিলেন। তিনি দোবেকে অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে একখানি দ্রুতগামী নৌকা আনিতে বলিলেন ও পাঁড়ে, মিশ্র এবং কাঁজীকে বেলা এগারটার মধ্যে দেড়শত চৌকীদার আনিতে আদেশ করিলেন, আর লস্করও বিশ্বাসকে কুড়িটি বন্দুক যোগাড় করিতে বলিলেন। থানায় ঘোর সমরায়োজন হইতে লাগিল।

অর্দ্ধ-ঘণ্টার মধ্যে দোবে এক দো মাল্লার নৌকায় ছয় দাঁড় বসাইয়া তাহাকে দ্রুতগামী করিয়া লইয়া আসিল। সে নৌকায় উঠিয়া নবাগত দারোগাবাবু তাঁহার সঙ্গের এক কনেষ্টবলের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি পত্র লিখলেন :—

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কাপ্তেন হগ সাহেব
বাহাদুর প্রবল প্রতাপেষু।

সেলাম বহুত বহুত আরোজ বিশেষ, আমি হুজুরের সকাস হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া দুইদিন পথে পথে ছিলাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে ঘটনায়

কতক অংশ জ্ঞাত হই। চতুর্থ দিন সকালে আরও কিছু অগ্রবর্ত্তী হই। পঞ্চম দিন রাত্রিতে সমস্ত অবগত হইয়াছি। ঘটনা বড় রহস্যজনক। ঘটনায় বড় ঘরে কলঙ্ক; বড় ঘরের বহু লোকের জীবন লইয়া টানাটানি। আমার হুজুরের কাছে নিবেদন আছে, আমার প্রথম আসকারার মোকদ্দমার কাহাকেও ফাঁসী দিতে পারিবেন না। আমি সমস্ত বিষয়েরই আসকারা করিয়াছি। সন্ধ্যার মধ্যে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করিব ও আর এক খুন আসকারা করিব। হুজুর কল্য যত সকালে আসিতে পারেন, ততই ভাল হইবে। আপনি আসিয়া দুই কুল বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন ১২১৫ সাল তাং ১৮ই চৈত্র।

আরোজ কারী

শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তিনটার সময় অমুক গ্রামের রায়বাড়ীতে দেড়শত চৌকীদার, বারো জন কনেষ্টবল, তিনজন হেড কনেষ্টবল ও দুইজন সাব-ইনেস্‌পেক্টর উপস্থিত হইলেন। চৌকীদারগন পদব্রজে ও পুলিশের লোকজন অশ্বপৃষ্ঠে। সূর্য্য করে তাল, অসি প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে ও গুলিহীন বন্দুকের দুড়ুম দুড়ুম শব্দ শ্রুত হইতেছে। চারিদিকে চৌকীদারী লাঠির ঠন্ ঠন্ শব্দ উত্থিত হইতেছে। সতের জন পুলিস-কর্মচারী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক বহির্বাটীতে প্রবেশ লাভ করিলেন। তাঁহারা কালীকিশোর রায় ও তাঁহার কর্মচারী ও পাইক—পেয়াদাগণকে বন্দী করিলেন। রায় বাড়ীর অন্তঃপুর ও বহির্বাটী তিনজন হেড-কনেষ্টবল, পাঁচ জন কনেষ্টবল ও পঁচিশ জন চৌকীদারের জিম্বায় রাখিয়া বন্দিগণকে ও খুন লইয়া দুই দারোগা, পুলিস কর্মচারী ও চৌকীদারগন বাখরগঞ্জ জেলার অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। বিশ হাজার টাকা ঘুসের প্রস্তাবেও দারোগাদ্বয় কর্ণপাত করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাপ্তেন হগের রিপোর্ট

সপ্তম দিন মধ্যাহ্নে কাপ্তেন হগ ষ্টীমারে বাখরগঞ্জ জেলার অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। অগ্রে নীলমণি, পরে সেই থানার দারোগাবাবু ও পরে

অন্যান্য পুলিশ-কর্মচারিগণ কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। নীলমণি খুনঘটিত আদ্যন্ত বিবরণ কাপ্তেনকে জানাইলেন এবং কাপ্তেন নীলমণির সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। জমীদার এ তাঁহার কর্মচারী গণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাদিগের সঙ্গে গোপনেও কিছু কিছু কথা হইল। রায়বাবু ও দেওয়ানজী জামীনে বাড়ী যাইবার অবসর পাইলেন। ক্রমে সকল জমীদারীর কর্মচারিগণ গৃহে যাইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। কাপ্তেনের নিকট অনেক ডালি উপায়ন আসিতে লাগিল। মাছ, মাংস, মুরগী, আণ্ডা, মাখন, ঘি, মিষ্টান্ন; ফল-ফুলাদি কতই আসিতে লাগিল। নীলমণি ও থানার দারোগা তফাৎ তফাৎ থাকিতে লাগিলেন। নবম দিনে জমীদার বাড়ী হইতে পুলিশ ও চৌকীদারগণকে উঠাইয়া আনা হইল, দশম দিনে কাপ্তেন হগের রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। রিপোর্ট শুনাইবার জন্য নীলমণি ও থানার দারোগা-বাবুকে ডাকা হইল। রিপোর্ট এইরূপ :-

"বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয সমীপেষু,

আমি বাঙ্গালা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে খুলনার নিকট নদীগর্ভে একটি মৃতদেহ প্রাপ্ত হই। নূতন দারোগা নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মৃত ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র, গামছা, তাঁহার উপবীত, সঙ্গের একটি কলসী, মাপ ও নক্সা দিয়া খুন তদন্ত করিবার আদেশ দেই। নীলমণি অতি বিচক্ষণতার সহিত খুন আসকারা করিয়া সাক্ষী প্রমাণ লইয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করত আসামী চালান দিবার জন্য আমাকে পত্র লিখেন আমি তদনুসারে তিন দিন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া এই রিপোর্ট প্রেরণ পূর্বক আসামীগণের দণ্ড প্রার্থনা করি।

কালীকিশোর রায় এক পুরাতন জমীদার বংশের লোক। এই বংশের বহু সংকার্য্য আছে। ইহাদের বাড়ীতে স্কুল, ডাক্তার খানা, কবিরাজী ঔষধ খানা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও পোষ্টাফিস দেখিলাম। কালীকিশোর যুবা পুরুষ। দুই এক বৎসর মাত্র জমীদারী দেখিতেছেন। সরকারী সারকুলার, রুল ও রেগুলেশনের কিছুই জানেন না। পুরাতন জমীদার বাড়িতে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কালীকিশোর রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে একটি দাসী আছে। এই দাসীর নাম অলক্ষমণি দাসী মন্দচরিত্রা। রমানাথ চক্রবর্ত্তী কালী-কিশোরের ছোট কমাকার। ইহারা উভয়ে গোপনে মন্দ অভিপ্রায়ে

আলোকের সম্মতিক্রমে তাহার ঘরে যাইত। রমানাথ অলকের ঘরে যাইয়া থাকিতে থাকিতে অলক কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে যায়। এই সময় রামটহল এক সু ধার তরবারি লইয়া অলকার ঘরে প্রবেশ করে। রমানাথ প্রাণভয়ে রামটহলের পেটে ছোরা মারে এবং রামটহল তরবারি দিয়া রমানাথের গলায় কোপ মারে। ঐ আঘাতে রাত্রি এগারটার সময় রমানাথের মৃত্যু হয় এবং রাত্রি চারিটার সময় রামটহলও ইহলোক পরিত্যাগ করে। জমীদার কালীকিশোর রায়ের অন্তঃপুরে এই খুন হওয়ায় তাহার কোন স্বজন মহিলার উপর অন্যায়রূপে কলঙ্ক আরোপিত হইবে, আশঙ্কায় তিনি কর্মচারিবর্গের সহিত যোগে প্রথম খুন জলে ফেলিয়া দেন ও দ্বিতীয় খুন মাটিতে পুঁতিয়া রাখেন। জমীদার কালীকিশোর রায়, তাঁহার দেওয়ান ভবদেব চক্রবর্ত্তী, পেস্কার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, জমানবীশ রাজমোহন ঘোষ, সুমারনবীশ, হরিমোহন দে, বিধু চোপদার, গজপতি সিং, কাজেল বিশ্বাস ও আবদুল করিম খাঁকে খুন গোপন করা অপরাধে চালান দিলাম। আমি অলকমণি দাসী, মোহন পাঁড়ে প্রভৃতি জমীদারের চাকর ও চাকরাণীগণের ও স্কুল মাষ্টার শ্রীনাথ রায়, দেবনাথ মুখুটী, সূর্য্যকুমার আচার্য্য, কবিরাজ গদাধর সেন, পণ্ডিত জগমোহন বিদ্যারত্ন, পোষ্টমাষ্টার হরকুমার ঘোষ ও গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও ভুবনমোহন রায়ের জবান বন্দী লইয়াছি ও তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট তারিখে কাছারীতে হাজির হইবার নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা করিয়া মুচলেকা লইয়াছি। এ মোকদ্দমার হত্যাকারী ও হত ব্যক্তি উভয়ই মরিয়াছে, কেবল খুন গোপনকারিগণ মূল আসামী। কালীকিশোরের সঙ্কট অবস্থা, তরুন বয়স ও অনভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আগামী ৮ই এপ্রেল এই মোকদ্দমার বিচারের দিন স্থির হইয়াছে।”

রিপোর্ট শুনিয়া নীলমণি বলিলেন,- “বেশ হয়েছে। পাপীদেরও অল্প অল্প দণ্ড হয় এবং কাহারও প্রাণদণ্ড না হয়, এই হ’লে বাঁচি।“

অপর দারোগা বলিলেন –“মোকদ্দমাটা আমি অন্যরূপ বুঝেছিলেম।”

হগ। মোকদ্দমা টো অন্যরূপ বটে, নীলমণির ইচ্ছা জমীদার বাঁচে ও টাড বাড়ীর মেয়েলোকের নিন্দা না হয়। এটা করিতে হইলে মোকদ্দমা একটু বদলাইতে হয়।

দ্বি-দা। হাঁ হুজুর! সকল দিক বজায় রাখতে হইলে এই বেশ রিপোর্ট হয়েছে।

এই সময় পর্য্যন্ত নূতন পেনাল কুড অর্থাৎ ভারতের দণ্ডবিধি আইন সঙ্কলন হয় নাই। এই সময়ে পুলিশের বড় সাহেবগণের মতানুসারেই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আসামীগণের দণ্ড করিতেন। ৮ই এপ্রিল দুই খুনী মোকদ্দমার বিচার হইল। বিচারে কালীকিশোর রায়ের হাজার টাকা, তাঁহার দেওয়ানজীর হাজার টাকা ও তাঁহার অন্যান্য শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের দুই শত টাকা ও পাইক-পেয়াদাগণের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইল। রায়ে নীলমণি দারোগার খুব প্রশংসা উঠিল।

সত্য গোপন থাকিবার জিনিস নহে। মোকদ্দমার বিচারান্তে ছয় মাস মধ্যে প্রচার হইল. এই মোকদ্দমায় কালীকিশোর রায়ের ত্রিশ হাজার টাকা উৎকোচ লাগিয়াছে। নীলমণি ও অমুক থানার দারোগা এক পয়সাও ঘুষ লন নাই। রমানাথ চক্রবর্ত্তীর আত্মীয়গণ কোন নূতন কথা তুলিলেন না। তাঁহার আত্মীয়গণ অঙ্গীকার করার তহবিল তছরূপী দেড় হাজার টাকার রেয়াত পাইয়াছেন ও নগদ হাজার টাকা পাইয়াছন। পাঁড়ের দেশ হইতে কেহ আসে ও নাই, কেহ কিছু পায় নাই। গজপতি পাঁড়েই সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং গজপতি দুই শত টাকা বকসিস্ পাইয়াছেন। যে আটজন পুলিশ কর্ম্মচারী রায় বাড়ীর প্রহরা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা চারি হাজার টাকা পাইয়াছে। এই খুন আসকারা করায় নীলমণি পাকা দারোগা হইলেন, দুই সহস্র টাকা পুরস্কার পাইলেন ও কাপ্তেন হগের সুদৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

যদুনাথ ভট্টাচার্য : ঊনবিংশ শতাব্দীর ঊষাকালে জন্ম গ্রহণ করে যে কয়জন সাহিত্য সেবী বাঙলা ভাষাকে গোয়েন্দা গল্পের সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন যদুনাথ ভট্টাচার্য মশাই তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখায় তৎকালীন বাঙলা দেশের অসংগঠিত পুলিশ প্রশাসনের সংগঠন প্রয়াসী ভূমিকার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এখানে "নীলমণি দারোগা" নামক গল্পেও শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টার সুন্দর এক লেখ চিত্র ফুটে উঠেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্নীতিদুষ্ট হাত হতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পরই সুদূর বাঙলা দেশের গ্রামে গঞ্জেও আইনের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছে। সে যুগের পুলিশ কর্মচারী যদুনাথ ভট্টাচার্যের বহু গোয়েন্দা কাহিনীতে সেদিনের দুর্ব্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যেও আইনের শাসনের—শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের কথা লক্ষ্যণীয়।



শেষ লীলা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিবা আন্দাজ নয়টার সময় সংবাদ পাইলাম যে, আজ কয়েক দিবস হইল, পাঁচু ধোপানির গলিতে রাজকুমারী নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে কে হত্যা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই তাহার কোনরূপ সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যে দিবস রাজকুমারীর হত্যা সংবাদ প্রথমে থানায় আসিয়া উপস্থিত হয়, সে দিবস আমি কলিকাতায় ছিলাম না; অপর একটি সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। কলিকাতায় যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলাম অমনি পাঁচু ধোপানির গলির যে বাড়ীতে রাজকুমারী হত্যা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই স্থানে বসিয়া চারি পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী অনুসন্ধান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া, তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার এক

পার্শ্বে আমাকে বসিবার স্থান প্রদান করিলেন। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলে, একজন কর্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিবস আপনি কোথায় ছিলেন? আজ কয়েক দিবস হইল, এই হত্যা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনি একবারের নিমিত্তও এদিকে আসেন নাই কেন?"

আমি। আমি কলিকাতায় ছিলাম না। অপর কার্য্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাদিগের সহিত এই অনুসন্ধানে যোগ দিতে পারি নাই। অদ্য কলিকাতায় আসিয়া এই ব্যাপার যেমন শুনিতে পাইলাম, অমনি আপনাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন?

কর্ম্মচারী। আপনাকে এখন আর বেশী কিছু করিতে হইবেনা, কেবল যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া তাহার যথা সর্বস্ব অপহরন করিয়া লইয়া গিয়াছে কেবল তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ধরিয়া দিলেই হইবে।

আমি। আপনারা দেখিতেছি সমস্ত কার্য্যই প্রায় শেষ করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত অতি অল্পই রাখিয়া দিয়াছেন।

সেই সময় আমি আমার বাসায় গমন করিলাম। স্নান-আহার বিশ্রামাদি করিয়া পুনরায় অপরাহ্ণ চারিটার সময় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম কর্মচারী মহাশয় আমার অপেক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া আছেন, আরও তিন চারিজন কর্মচারী সেই স্থানে উপবিষ্ট। বাড়ীর ভাড়াটিয়ামাত্রেই বাড়ীতে উপস্থিত, কর্ম্মচারী গণের নিকট ত্রৈলোক্য বন্ধনাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে।

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া, অপরাপর কর্মচারীগণ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম, এবং পূর্বকথিত কর্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম, "এই যে বন্ধনাবস্থায় বসিয়া আছে, এ ত্রৈলোক্য নহে?"

কর্মচারী। হাঁ।

আমি। ইহার এ দশা কেন?

কর্ম্মচারী। হত্যাপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি। এই কি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে?

কর্ম্মচারী। হাঁ মহাশয়। রাজকুমারীকে হত্যা করা অপরাধে এ ধৃত হইয়াছে।

আমি। এই হত্যা ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা কি বেশ প্রমাণিত হইয়াছে?

কর্ম্মচারী। এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলেও, এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমি। ইহার উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি?

কর্ম্মচারী। যাহার ব্যবসাই কেবল হত্যা করা, তাহার দ্বারা যে এই হত্যা হয় নাই, তাহা আমি কিরূপে বলিতে পারি?

আমি। হত্যাই যে ইহার ব্যবসা তাহা আপনাকে কে বলিল?

কর্ম্মচারী। তাহা আর কে বলিবে? কেন আপনি কি জানেন না যে হত্যা করাই ইহার ব্যবসা। আপনিই এ হত্যাপরাধে ইহাকে চালান দিয়াছিলেন।

আমি। পূর্ব্বে হত্যাপরাধে আমি ইহাকে চালান দিয়াছিলাম বলিয়াই যে, এই হত্যা ইহা দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলা যায়। পূর্ব্বে আমি ইহার বিরুদ্ধে অনেক লোকের নিকট হইতে অনেক অনেক কথা শুনিতে পাই, সেইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনের গতি খারাপ হইয়া যায়। সেই সময় যেমন ইহার উপর একটি নালিশ হয়, অমনি আমি তাহা বিশ্বাস করিয়া, সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধান আর কি করি? ইহার শত্রুপক্ষীয় লোকে যাহা বলে, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, হত্যাপরাধে ইহাকে দোষী স্থির করিয়া লই, এবং বিচারার্থ ইহাকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করি। মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহাকে দায়রায় পাঠাইয়া দেন। যখন দায়রায় বিচারে সাক্ষীগণের উপর জেরা থাকে, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, ত্রৈলোক্যকে আমি অনর্থক মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি, জজসাহেব ও সেই মোকদ্দমার ব্যাপার ঠিক বুঝিয়াছিলেন, এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপ নিরপরাধী জানিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন। সেই মোকদ্দমার পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের চরিত্রের উপর

আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, মোকদ্দমার পর হইতে সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যের ব্যবসাই হত্যা, এই বিশ্বাস ব্যতীত এই মোকদ্দমায় যদি ইহার উপর আর কোন প্রমান না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে নিরর্থক আরকষ্ট দিবেন না, এখনই ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

কর্মচারী। তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্যের দ্বারা হয় নাই ?

আমি। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য কখনও করে নাই।

কচর্মারী। তবে কে এই হত্যা করিয়া, রাজকুমারীর সমস্ত অলঙ্কার-পত্র চুরি করিয়া লইল' ?

আমি। কে যে এই হত্যা করিয়াছে, তাহা আমি ঠিক জানি না ; কিন্তু আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হত্যা ত্রৈালোক্য করে নাই। আরও একটু একটু শুনিতে পাইতেছি যে, এই হত্যা কোন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

কর্মচারী। তাহা হইলে বলুন না, আপনি কি শুনিয়াছেন, ও কে এই হত্যা করিয়াছে।

আমি। বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন সে সময় হইবে, তখন আপনি তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। এখন ইহাকে ছাডিয়া দিন, বিনা--অপরাধে এরূপ বন্ধনাবস্থায় ইহাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।

আমার কথা শুনিয়া কর্মচারী মহাশয় ত্রৈলোক্যের বন্ধন মোচন করিয়া দিতে কহিলেন। জনৈক প্রহরী আদেশমাত্র তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

সেই সময় অপরাপর কর্মচারীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "আজ কয়েকদিবস পর্যন্ত আপনারা এই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছেন, বা তাহাদিগের নিকট হইতে পারিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি জানিতে পারিয়াছি, ভীত হইয়া তাহারা কেহই প্রকৃত কথা কহে নাই। আমার বিবেচনা হয়, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলিবে। এই বাড়ীর সমস্ত

ভাড়াটিয়াগণকে ডাকাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। দেখুন, দেখি, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলে কি না ?

ইহার পর সেই বাড়ীর কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকল লোককেই আমি সেই স্থানে ডাকাইলাম।

বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ পুনরায় কিরূপ জবানবন্দী দেয়, তাহাই সকলে নিতান্ত ঔৎসুক্য সহকারে শুনিতে লাগিলেন ; ত্রৈলোক্যের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল ; তথাপি কে কি বলে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সে সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

পুনরায় সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের যেরূপভাবে জবানবন্দী দেখা হইতে লাগিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

একটি স্ত্রীলোক কহিল,—"আমি হরিকে উত্তমরূপে চিনি, সে ত্রৈলোক্যের পুত্র। তাহার মাতার সহিত সে এই বাড়ীতেই থাকে। কোনরূপ কার্য--কর্ম্ম করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, বা শুনি নাই, অথচ বেশ্যালয়ে গমন ও মদ্যাদি পান করিতে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাই। এই এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না।

যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্বদিবস সন্ধ্যার পূর্বে রাজকুমারীর সহিত সে নির্জ্জনে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই, এবং উহারা ও আমাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করে। ইহার পর রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমি কোন কার্য্য বশতঃ আমার গৃহ হইতে বাহির হই।

সেই সময় দেখিতে পাই, হরি ধীরে ধীরে তাহার মাতার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজকুমারীর গৃহের দিকে গমন করিতেছে। রাজকুমারীর গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, কেবল ভেজান ছিল মাত্র। হরি সেই দরজা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি সেই সময় অনুমান করিয়াছিলাম, রাজকুমারী তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়াছে, তাই হরি উহার গৃহে গোপনে গমন করিয়া থাকে। আমি পুলিসের ভয়ে একথা পূর্বে বলিতে সাহস করি নাই।"

অপর আর একটি স্ত্রীলোক কহিল,—"রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই। আমার গৃহে একটি লোক ছিল, সেই সময় সে আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সদর দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমি তাহার সহিত আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই এবং তাহার সহিত সদর দরজা পর্যন্ত গমন করিয়া দেখি যে, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। কে যে সেই দরজা খুলিয়া বাহিরে গমন করিয়াছে, সেই সময় তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, সেই দরজা ভিতর হইতে পুনরায় আমি বন্ধ করিয়া দিই, এবং আমার গৃহে গিয়া আমি শয়ন করি।"

তৃতীয় ভাড়াটিয়া কহিল "যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই দিবস অতি প্রত্যুষে আমি গাত্রোত্থান করিয়া আমার বাবুর সহিত আমি সদর দরজা পর্যন্ত গমন করি।

সেই সময় সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সেই দরজা আমি খুলিয়া দিলে, আমার বাবু এই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। সেই সময় দরজা আমি পুনরায় বন্ধ করিবার বাসনা করিয়া যেমন উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করি, সেই সময় হরি বাহির হইতে আসিয়া বাড়ীর ভীতরে প্রবেশ করে। সেই সময় তাহার অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সে যেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, আর উহার মনে যেন কি একটি ভয়ানক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমাদিগের সহিত যখন হরির সাক্ষাৎ হইত, সেই সময় দুই একটী কথা না বলিয়া, সে কখনও প্রস্থান করিত না। কিন্তু সে দিবস আমার সহিত কোন কথা না বলিয়া, যেন নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সে তাহার মাতার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।"

চতুর্থ ভাড়াটিয়া কহিল,—"যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহার পূর্ব রাত্রিতে আমিই সকলের শেষে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। আমি যখনসদর দরজা বন্ধ করি, তখন বোধ হয়, রাত্রি বারটা। সেই সময় হরিকে দেখিতে পাই, সে তাহার মাতার গৃহের সম্মুখে বারান্দার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। ওরূপ সময়

স্থানে আমি হরিকে ইতিপূর্বে আর কখনও বসিতে দেখি নাই ; সুতরাং আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। মনে করি, বোধ হয়, তাহার কোনরূপ অসুখ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি হরিকে জিজ্ঞাসা করি, "এমন সময় এরূপ ভাবে তুমি বাহিরে বসিয়া রহিয়াছ কেন? আমার কথায় হরি কোন রূপ উত্তর প্রদান করে নাই ; সুতরাং তাহার ব্যবহারে আমি একটু বিরক্ত হইয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনাই, আমার গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।"

পঞ্চম ভাড়াটিয়া বা কামিনী কহিল,—"রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার গৃহের সম্মুখের বারান্দার উপর আসিয়া উপবেশন করি। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে কেমন একরূপ গোঁ গোঁ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করে। আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমারীর গৃহের নিকট গমন করি, এবং তাহার গৃহের দরজা ঠেলিয়া দেখি, উহা ভিতর হইতে বন্ধ! বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাই। উহার গৃহে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, মেঝেয় পাটির উপর রাজকুমারী চিৎ হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, হরি তাহার বুকের উপর বসিয়া রহিয়াছে, রাজকুমারী অল্প অল্প গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে অন্য এক ভাবের উদয় হইল আমি মনে মনে সবিশেষ লজ্জিত হইয়া আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তৎপরে আমার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া আমি আমার বিছানায় শয়ন করিলাম।"

ষষ্ঠ স্ত্রীলোক বা বিধু কহিল,—"যে দিবস প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব রজনী আন্দাজ একটা কি দেড়টার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে অল্প গোঁ গোঁ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করে। কিসের শব্দ তাহা আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া,কিয়ৎক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি। তাহার পরই দেখিতে পাই, হরি রাজকুমারীর গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে, এবং দ্রুতপদে সদর দরজার নিকট গমন করিয়া, সেই দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যে সময় সে রাজকুমারীর

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় তাহার হস্তে সাদা রুমাল বা সাদা নেকড়ায় বাঁধা ছোটগোছের একটা পুঁটুলি ছিল। এখন আমার বেশ অনুমান হইতেছে যে, সেই পুঁটুলির মধ্যে রাজকুমারির গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কার গুলি ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা।" সেই বাড়ীতে যতগুলি ভাড়াটিয়া ছিল, সকলেই কিছু না কিছু হরির বিপক্ষে বলিল। কেবলমাত্র প্রিয় কহিল,—"আমি ইহার কিছুই অবগত নাই, বা হরির বিপক্ষে আমি এ পর্যন্ত কোন কথা শুনি নাই।" আমরা ত্রৈলোক্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সাক্ষীগণ যেরূপ জবানবন্দী দিতে লাগিল, ত্রৈলোক্য সেই স্থানে বসিয়া স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে একটা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেল। তখন কর্মচারী মাত্রেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এখন এই মোকদ্দমার উদ্ধার হইল, এখন উত্তমরূপে জানিতে পারা গেল যে, এই হত্যা কাহার দ্বারা হইয়াছে। রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি পাওয়া যাউক, বা না যাউক, এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যে যে হরির ফাঁসি হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এ পর্যন্ত হরিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। কর্মচারীগণের কথা শেষ হইবার পর, আমি কহিলাম, "এখন আর হরিকে এরূপভাবে রাখা উচিত নহে। হত্যাকারীকে যেরূপ ভাবে রাখা হইয়া থাকে। ইহাকে এখন সেইরূপ ভাবে বাখা কর্তব্য।"

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই একজন কর্মচারী উঠিয়া হরিকে ধরিলেন, ও তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইলেন; তৎপরে বস্ত্র দ্বারা পুনরায় উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দুইজন প্রহরীর হস্তে তাহাকে অর্পন করিলেন।

হরির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া বেগে জলধারা বহিতে লাগিল, এবং সজলনয়নে মধ্যে মধ্যে এক একবার কেবল ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "মা! আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজকুমারীকে আমি হত্যা করি নাই, বা তাহার অলঙ্কার পত্র

প্রভৃতি কোন দ্রব্যই আমি অপহরণ করি নাই। আমি সমস্ত রাত্রি বাড়ীতেই ছিলাম, একবারের নিমিত্ত আমি বাড়ীর বাহিরে গমন করি নাই।"

আমরা হরির কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অধিকন্তু তাহাকে কহিলাম "রাজকুমারীর গহনাগুলি তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা এখনও বলিয়া দেও। নতুবা আমাদিগের হস্তে তোমার যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না।"

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ঃ আজ হতে প্রায় দেড় শতক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেও যে কয় জন সাহিত্যসেবী বাঙলা ভাষায় সাহিত্য অনুশীলন করে আজকের দিনেও অনেক পাঠকের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পথিকৃত হিসাবে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয় এক উজ্জ্বল নাম। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর ইত্যাদি গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চের বহমান স্রোতধারার উৎসমুখ উন্মোচনকারী গ্রন্থ। সেই সে কালের নবগঠিত দুর্ব্বল পুলিশ ব্যবস্থায় গোয়েন্দা কাহিনীর মালমশলা সংগ্রহ যে কোন লেখকের পক্ষে এক অসাধারণ প্রয়াশ। প্রিয়নাথ বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের ন্যায় বিদ্যাসাগর মধুসূদনের সমসাময়িক হয়েও বাঙলা ভাষায় এক নতুন দিকের সন্ধান করেছেন। যে গোয়েন্দা ও রহস্য সাহিত্য আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ পাঠকের জনগণমন অধিনায়কের স্থান গ্রহণ করেছে তা। আমাদের এই নদীনালা অধ্যুষিত সেদিনের যকৃতাড়িত প্লীহা যকৃৎ স্ফীত বাঙালী জীবনের ব্যক্তিগত হত্যা, মৃত্যু ও প্রাত হিংসার অনুসন্ধানের এক নতুন আস্বাদন এনেছিল সাহিত্য রসগ্রাহীদের তৃষ্ণার্ত রসনায়। সেযুগে বাংলা ভাষায় কয়েকজন প্রিয়নাথ নামধেয় লেখক সাহিত্যচর্চা করেন। তবে তাঁদের মধ্যে "দারোগার দপ্তরের" লেখক প্রিয়নাথবাবুই আজও পরিচয়ে অম্লান।



হত্যাকারী কে ?

পাঁচকড়ি দে

হায়, পর দিন প্রভাতের সেই ঘটনার সেই লোমহর্ষক ঘটনার, সেই ভয়ঙ্করী স্মৃতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব ?

তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ, এবং দৃষ্টি উন্মাদের মত। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই সেটা একেবারেই ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, "যোগেশদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায় নাই। যোগেশদা, কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র ওঠো—এমন খুনে সে—"

আমি বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্ত্তে একটা অনিবার্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া বসিল যে, আমি নরেন্দ্রের কথা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে নরেন, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে যোগেশদা! লীলা নাই—শশিভূষণ কাল রাত্রে লীলাকে খুন করিয়াছে পুলিশের লোক শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

আর শুনিতে পাইলাম না, বজ্রাহতের ন্যায় সেইখানে নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় পড়িয়া গেলাম।

যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি, নরেন্দ্রনাথ পাশে বসিয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—যাক্, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিশের লোক গ্রেপ্তার করিয়াছে?"

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভূষণের উপরে বড় একটা জোর-জবরদস্তি করিতে হয় নাই; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিজেই ধরা দিয়াছে। হয় ত শশিভূষণের তখনও

নেশার ঝোঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশদা, এমন সময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার, যদি কোন একটা উপায় হয়।"

আমি কম্পিত-কণ্ঠে, কম্পিত-হৃদয়ে এবং কম্পিত-কলেবরে ভীতি-বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও—দাঁড়াও—নরেন, আমায় একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে!"

আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার মনের অবস্থা সম্যক্‌ বুঝিতে পারিয়াছিল। আমার কথায় সম্মত হইল; কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না—তখনই বাহির হইলাম।

২

যথাসময়ে আমরা শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা সম্বন্ধে শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাত্রে উদ্যানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে. সে নিজের জোবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল; সে ছুরিকাখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেখিয়াছে। সে রকম ধরনের প্রকাণ্ড ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাত্রে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছিল এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা

মুষ্ট্যাঘাতের চিহ্নও ছিল। ডাক্তারী পরীক্ষায় এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই-এক ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে সে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাদ্য প্রমাণ সত্ত্বেও সে যে স্ত্রীহন্তা, তাহা শশিভূষণ এখনও স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সে অবিচলিতভাবে এখনও বলিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে ফাঁসিই দাও—মার—কাট কর যা ইচ্ছা তাই কর--সেজন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে. তাহার পত্নীর প্রতি সে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, মদের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ, নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়া তাহার জীবন একান্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম, আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে যাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার যাইয়া তাহার সহিত দেখা করি।

শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু তাহার এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

৩

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, এবং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া—আরও আমার সহিত যে সমুদয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, বারংবার আমার নিকটে অশ্রুসংরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "ভাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কীটকে কখন ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, দিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল

নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি, বোধ করি কোন কঠোর রাক্ষসেও তাহা পারে না। আমি মনুষ্য নামের একান্ত অযোগ্য—আমার ন্যায় মহাপাপীর নাম এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া যাওয়াই ভাল। যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী। তুমিও যে এমন বিশ্বাস কর নাই, তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধারণা, এই বিশ্বাস চিরন্তর অটুট এবং অটল থাকিয়া যাক্—বরং তাহাতে আমি সুখী; কিন্তু তুমি—যোগেশ, তুমি যেন আর সকলের মত তাহা করিয়ো না, এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমার সত্য নাই, ধর্ম নাই, এমন কিছুই নাই, যাহা সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিলে তুমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পার। আমি ধর্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব-বিবর্জিত, শয়তানের মোহমন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? ভাই যোগেশ, তুমি ভাই অবিশ্বাস করিয়ো না, তাহা হইলে মরিয়াও আমার সুখ হইবে না—এ জগতে এমন একজন থাক্, সে যেন জানে, আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে, কিন্তু স্ত্রীহন্তা নই।"

বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কম্পিত এবং বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি, তাহার সেই সকরুণ অবস্থা তখন আমার মর্মভেদ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহার পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "শশিভূষণ, এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টামাত্রও করিয়ো না—যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারি।"

শশিভূষণ বলিল, "আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া তুলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেহে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বুকে রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ পিশাচকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ! প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝোঁকে আমিই তাকে রাত্রে

হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমারই ছুরিখানি লীলার বুকে তখনও আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিখানি আমার বৈঠকখানায় যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিখানি কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথায় পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেজন্যই মনে একটু সন্দেহ হইতেছে ; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী ; কিন্তু সেই ছুরিখানি—যোগেশ আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয় - ঠিক বলিতে পারি না—যদি— যদি—"

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সাম্‌লাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "কথা কহিতে এখন সঙ্কুচিত হইতেছ কেন ? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।"

শশিভূষণ বলিল, "লীলার বুকে ছুরি বসাইতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ভয়ানক শত্রু আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ "

আমি অত্যধিক ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে সে ? তাহার নাম প্রকাশ কর নাই কেন ?"

শশিভূষণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তুমি তাহাকে জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যেদিন আমার বিবাহ হইয়াছে, সেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছে। কি একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে, "ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাণে কেমন করিয়া দুটা পাখি মারিতে হয় আমা হইতেই তাহা একদিন তুমি দেখিতে পাইবে।"

শশিভূষণ আবার দুই হাতে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আমি অতিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, "অসম্ভব ! তাহা কি কখনও হয় ?"

অনুতাপদগ্ধ রোরুদ্যমান শশিভূষণ বলিল, "তাহা না হইলেও, আমি

তোমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিবে।” তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া. তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, “ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্য তোমাকে আমি এমন অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসি হউক বা না হউক সেজন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন ত সকলকেই মরিতে হইবে—তা দুইদিন আগে আর পরে ; কিন্তু যোগেশ, যখনই মনে হয় যে, লীলার হত্যাকারী তাহার এ নৃশংসতার কোন প্রতিফল পাইবে না—”

বলিতে বলিতে শশিভূষণের অশ্রুমগ্ন দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ রাত্রের তীব্র বিদ্যুদগ্নির ন্যায় ঝলসিয়া উঠিল এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কব্জিতে নখরগুলা বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

যদিও আমি শশিভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নিদারুণ অনুতপ্ত এবং মর্মাহত দেখিয়া আমার সে ভাব মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকার্ত শশিভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “শশিভূষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।”

এইরূপ প্রতিশ্রুতির পর আমি তাহার নিকট হইতে সেদিন বিদায় লইলাম।

৪

একজন পুরাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নামের ডাক যশ খুব। আমি এখন তাঁহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম সেইদিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়িতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহিরের ঘরে তাঁহার কিঞ্চিদধিক পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রটিকে জানুপরি বসাইয়া ঘোটকারোহণ শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে দ্বারসমীপাগত

দেখিয়া অক্ষয়বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা-কার্যটা স্থগিত রাখিলেন এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, রামা ভৃত্যকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্য হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সত্বর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশিভূষণ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম এবং স্বীকার করিলাম, শশিভূষণকে নির্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাঁহাকে একহাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন। শুনিয়া অনেকক্ষণ করতললগ্নশীর্ষ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তাঁহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের ন্যায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, "কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা নাই— হয় ত ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে কোন কথা বলিতে ভুল করিয়া থাকিব, সেইজন্য বোধ হয়, আপনি কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।"

"না, গোলযোগ কিছু ঘটে নাই।" হুঁকা রাখিয়া, অক্ষয়বাবু বলিলেন, "আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না; তবে কি জানেন, কাজটা বড় সহজ নয়; সহজ না হইলেও যাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।"

আমি বলিলাম, "দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব। তবে কোন্ বিষয়ে আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না। আমার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অন্যমত নাই জানিবেন।"

"সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করিলেন।

তাহার পর বলিলেন, আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন; আজ-কালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।"

আমি। আমি সম্মত আছি; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটি প্রশ্ন কি বলুন।

অক্ষয়। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দোষ, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি। নিশ্চয়ই। আমি তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা দূরে থাক্, তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে! তার পর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি কি কেবল শশিভূষণ যাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাই চাহেন, না যাহাতে স্ত্রীর হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি; কথাটা কি জানেন প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের স্বপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনায় অনেক সহজ।

তাঁহার কথায় আমার একটু হাসি আসিল। আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি, আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা আপনি শশিভূষণকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিশ্রমিকের যোগ্য বিবেচনা করেন; কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহার বেশি আর উঠিতে পারিব না। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি হত্যাকারীকেই ধরুন বা শশিভূষণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "তা বেশ, পরে এই সব লইয়া একটা গোল-যোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা আগে হইতে একটা ঠিকঠাক্ বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল। যাক্, আপনাকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই।"

৫

ইহার চারিদিন পরে একদিন অক্ষয়বাবু নিজেই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। সেদিন যেন তাঁহাকে কেমন একটু রুষ্টভাবযুক্ত দেখিলাম। আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, "যা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না—কে জানে মহাশয়, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা ঝঞ্ঝাটে কাজ এই বুড়োটারই ঘাড়ে চাপাইবেন।"

বলিতে বলিতে অক্ষয়বাবু উঠিলেন ক্ষিপ্রহস্তে পথের দিক্‌কার একটি জানালা সশব্দে খুলিয়া ফেলিলেন এবং জানালার সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন।

৬

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল এবং দৃষ্টির সম্মুখে সর্ষপ-কুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্ষণপরে দুইটি লোক সেই ঘরে প্রবেশ করিল। এক জনকে দেখিবামাত্র পুলিশ-কর্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম; আর তাহার পাশের লোকটি সেই-ই—গত রাত্রে যে বালিগঞ্জের পথ হইতে আমার বাড়ি পর্যন্ত আমার অনুসরণে আসিয়াছিল।

সেই লোকটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অক্ষয়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন, "না দেখিবারই কথা। আমারই আদেশে এই লোক আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, "তোমাদের ওআরেন্ট বাহির কর, ইহারই নাম যোগেশবাবু—ইনিই লীলার হত্যাকারী।"

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ হাত পশ্চাতে হটিয়া গেলাম এবং তেমন মধ্যাহ্নরৌদ্রোজ্জ্বল দিবালোকেও উন্মীলিত চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এই বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ কোলাহল আমার কর্ণমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গাঢ়তর—গাঢ়তর—গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলিল। কতক্ষণ পরে জানিনা—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়কঙ্কনে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, "যোগেশবাবু, আপনার জন্য আমি দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্তব্য আমাদিগের সর্বাগ্রে! আপনি জানিয়া শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্কন্ধে নিজের অপরাধটা চাপাইতেছিলেন? তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যাবৃত্তান্ত শুনিবার সময়েই আমি কোন সূত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার দেয়া পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তুরমত লেখাপড়া করিয়া কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখনও কাহারও মুখে ওঠে না। সে যাহাই হউক, ইহাতেই আপনার হৃদয়ে একটা মহৎ উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও সে যে নিরপরাধ, তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন। আপনার অপরাধে যে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আপনার যথেষ্ট

অনুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই-চারিটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অর্বাচীনের হাতে কেস্‌টা দেন নাই, সে সম্বন্ধে আপনার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেইদিন রাত দশটার সময়ে বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা রাগারাগি হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই-একজনের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানি আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই 'না-বলিয়া ছুরি-গ্রহণ' সম্বন্ধে আমি দুই-একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটূক্তিতে আপনার রক্ত নিরতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়িতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই সাম্‌লাইতে পারেন নাই; আপনি শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্ল্যান্ উদ্ভব হওয়ায়, আসিয়াই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানা 'না-বলিয়া-হস্তগত-করা' নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আসেন তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দেখিয়াছিল। আপনি ভদ্রলোক, সে ছোটলোক—সুতরাং তখন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গর্হিত সন্দেহ করিতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মদ খাইতেছিল। উদ্যানে আপনাদের সেই বাগ্বিতণ্ডার পরে আপনি যখন চলিয়া গেলেন কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে শশিভূষণের একটা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিয়া দেয়। মদেই লোকটার মাথা খাইয়া দিয়াছিল। যতটা পারিল, বসিয়া বসিয়া খাইল। তাহার পর বাকিটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আলমারিতে রাখিতে যায়—তখন দেখে আলমারি খোলা রহিয়াছে এবং ছুরিখানা সেখানে নাই। দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল। তাহার পর দুই-একবার এদিক-ওদিক খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ির ভিতর

চলিয়া গেল এবং লীলাকে ছুরির সহসা অদৃশ্য হওয়ার কথা বলিল। সেই সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্বস্থ গলিপথে মোক্ষদা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষদাকে আমি সেই লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে তাহাকে সে চেনে না, পূর্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কৌশল করিয়া আপনাকে তাহার সম্মুখে নিয়া যাই; আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা ভান মাত্র; আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মোক্ষদা আপনাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে। তখন রহস্যটা অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষদার কথায় আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেক্টিভদিগের স্বধর্মও নহে; আর যাহা হউক, সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সেই সঙ্গে ঠিক করিয়া লই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়িতে লইয়া যাই। বাগানবাড়িতে গিয়া হল্ ঘরে যাইতে সবে-মাত্র-বিলাতীমাটি-দওয়া সোপানে নগ্নপদে অতি সন্তর্পণে উঠিতে হয়; তাহাতে সেই সদ্যমার্জিত বিলাতীমাটিতে আপনার পায়ের যে দাগ পড়ে, আমি সেইগুলির সহিত ময়দান ছাপে তোলা সেই গলি পথের দাগগুলি মিলাইয়া বুঝিতে পারি—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই পা মহাশয়েরই।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তবিমর্ষণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মোক্ষদা বেটি ভারি চালাক—ভারি বুদ্ধিমতী—সাবাস মেয়ে যা হোক—যতদূর কিচেল হতে হয়। কি জানেন, যোগেশবাবু, তাহা হইলেও আমি মোক্ষদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎকালে সে যদি আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে যে, আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি; অথবা আপনি কৌশলে তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ি পর্যন্ত আপনার অনুসরণ করিয়া দেখিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বাড়িতে যান, কি আর কোথাও যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাব কি রকম, এই সব

লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ির সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহিরে আসিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ ওআরেণ্ট বাহির করিয়া আমার কর্তব্য নিষ্পন্ন করিলাম। বলিতে কি, অনেক খুনের কেশ আমার হাতে আসিয়াছে, তার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাহা হউক, এখন বুঝিলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং "হত্যাকারী কে?

২০

আর কি বলিব? আর কি বলিবার আছে? হে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্! এ দুর্ভাগার হৃদয়ের কথা তুমি সব জান, প্রভো যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিষের দাহন আরম্ভ হইয়াছিল, তুমি সব জান প্রভো! সেদিন যদি আমার সেই ভুল না হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, সুখে মরিতে পারিতাম। লীলাকে একজন নররাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করিতে পারিতাম, আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। হায়! মানুষ যাহা মনে করে, তাহার কিছুই হয় না। সেই সর্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ মানুষের কি বিচার করিবে? তাঁহার এমনই রচনা কৌশল—পাপী নিজের হাতেই সকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।

দুগ্ধপোষ্য অপরিস্ফুটবাক্ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইলে যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ্ বুঝিতে পারে না, বরং যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্তৃক কোনরূপে পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্লম্ফন, ভীষণোজ্জ্বল চক্ষু এবং দীর্ঘ লাঙ্গুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর বিরলদন্ত মুখে, নশ্বর অধরপুট দিয়া কল্লোলিত শুভ্রহাস্যস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে! হায়! স্বপ্নাবিষ্ট আমরাও তেমনি এই দুঃখ-দারিদ্র্য

ভীষণ শোক-তাপপূর্ণ, বিপদসঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষঃশায়িত হইয়া কোন্ মোহে অবিশ্রাম হাস্য-তরঙ্গে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতে থাকি! তাহার পর যখন কোন অপ্রতিহত দুর্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং মোহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা-ভরসা-শূন্য হইয়া, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

উপসংহার

আমার কথা

যোগেশের এই মর্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন চকিতে চাহিয়া দেখি, বহির্জগৎ প্রভাতের কোমল আলোকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার কাহিনীতে এমনি মগ্ন এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, এ সব কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি চুরুট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময়ে একজন প্রহরী সশব্দে কারাদ্বার উন্মোচন করিয়া ফাঁসির আসামী হতভাগ্য যোগেশচন্দ্রের শেষ আহার্য হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহার একঘণ্টা পরে সকলই ফুরাইল—যোগেশচন্দ্রের নাম এ জগতের জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। হতভাগ্য ফাঁসি-কাষ্ঠে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

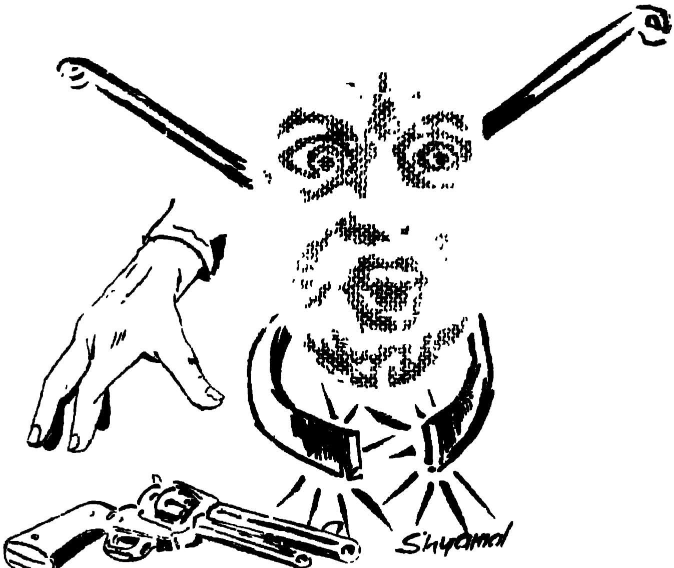
পাঠক! আমি আজ বত্রিশ বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি; কিন্তু এমন শোচনীয় ব্যাপার আমার আমলে আর কখনও ঘটে নাই। সেইদিন হইতে যেন নিজের ও নিজের কারাধ্যক্ষ পদটার উপরে আমার একটি বিজাতীয় ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। আশা করি, পতিত-পাবন ঈশ্বর, ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।

—জনৈক কারাধ্যক্ষ

পাঁচকড়ি দে: পাঁচকড়ি দে মশাই সেই সব হারিয়ে যাওয়া লেখকদের একজন যাঁরা সে দিনের (এই শতকের প্রথম দিকের) দুর্ব্বল বাঙলা সাহিত্যের দুর্ব্বলতম শাখা—গোয়েন্দাগল্পের অঙ্গনকে নানা ধরনের ফুলের ডালিতে সাজিয়েছিলেন।

বাঙলা গোয়েন্দা বা রহস্য সাহিত্য ইংরাজী, ফরাসী বা মার্কিন সাহিত্যের মত কোনান ডয়েল বা এডগার অ্যালেন পোর ন্যায় রথি মহারথিদের আবির্ভাবে ধন্য হয়নি আজও। তবে যে সকল সাহিত্যিক সে যুগেও নির্ভেজাল গোয়েন্দা গল্পের জালবুনে বুনে বাঙলাভাষী পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছেন পাঁচকড়ি দে তাঁদের অন্যতম।

সে দিন পাঁচকড়ি দের মনোরমা, হত্যাকারী কে, নীলবসনা সুন্দরী ইত্যাদি গ্রন্থ আজকের অনেক অতি বর্ষীয়ান ও বর্ষীয়সী গুরুগম্ভীর পাঠিকার কৈশোর ও যৌবনের জীবনের পাঠানুরাগের স্মৃতির সাথে জড়িয়ে আছে।



অদৃশ্য হস্ত

দীনেন্দ্র কুমার রা

মেজর ফরেষ্ট পর দিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার কুকুরটি সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল ঘুরিয়া আসিয়া তি তাঁহার অতিথিবর্গ সহ প্রাতর্ভোজনে বসিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহা স্ত্রীকে বলিলেন, "হত্যাকারী-সন্দেহে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হ নাই। ইন্‌স্পেক্টর রজার্স কাল অধিক রাত্রে ক্লে-বারোতে ফিরিয়া গিয়াছে আজ সকালেই তাহার এদিকে আসিবার কথা আছে।— কনষ্টেবল জিমি সঙ্গে আমার দুই একটা কথা হইয়াছে।"

হেনরী বলিল, "পুলিশ কি হত্যাকাণ্ডের কোনও কারণ স্থির করি পারিয়াছে?"

মেজর বলিলেন, "জিমির সঙ্গে আলাপ করিয়া সে-রকম ত কিছু বুঝি পারিলাম না। লোকটা ভারী বাচাল' তাহার মুখে কথার তুবড়ী ছো কিন্তু এই ব্যাপার সম্বন্ধে সে একদম চুপ! আমার মনে হয়, সে

প্রথমবার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার পাইয়াছে ; কিন্তু ইহার কোন হদিশ না পাওয়ায় তাহাতে ভয়ঙ্কর মাথা ঘামাইতেছে।"

সেই সময় সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথে মোটর-গাড়ীর ঘস্-ঘসানী শুনিয়া মেজর জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিলেন, এবং উৎসাহভরে বলিলেন, "আরে পামার্স আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি ! পল, উহার মতলব কি জান ? তোমাকে, আমাকে, আর হেনরীকে গল্ফ খেলিবার জন্য পাকড়াও করিতে আসিতেছে ; কিন্তু আজ সকালে কোনও রকম খেলাধূলায় যোগ দিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহার ঘরের দরজায় মানুষ খুন হইয়াছে, গল্ফ খেলিতে তাহার কি মন সরে ?"

মেজর-পত্নী লুসী খুব মিহি আওয়াজে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলিল, "কিন্তু তোমাকে যাইতেই হইবে প্রিয়তম ! আহা, বেচারা চার্লির জন্য তোমার মনে কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা কি আর আমি বুঝি না ? কিন্তু উপায় কি ? পুলিশ ত এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার লইয়াছে ; এ অবস্থায় তোমার আর কি-ই বা করিবার আছে ? তা যাও, এক বাজি গল্ফ খেলিয়া এসো ; মনটা বড়ই দমিয়া গিয়াছে, একটু চাঙ্গা হইবে, কি বল নিকোলাস্ !"

সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ রূপবান যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লুসী তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছিল। কিন্তু লুসীর সকল কথা সেই যুবকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, এই জন্য সে লুসীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কাহার চাঙ্গা হওয়ার কথা বলিতেছিলে ? তোমাদের কর্তাটির না কি ? হাঁ, হাঁ, এক বাজি গল্ফ খেলিলে আলবৎ উহার মন ওক গাছের গুঁড়ির মত চাঙ্গা হইবে।"

এই কথা শুনিয়া মেজর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, ওসব আজ আমার ভাল লাগিতেছে না ; আমি সত্য কথাই বলিতেছি।—নিকোলাস্ ! ইহার সঙ্গে তোমার বুঝি আলাপ নাই ? পলের সঙ্গে ত পূর্ব্বে কোনও দিন তোমার দেখা হয় নাই। পল, ইনি নিকোলাস্ পামার্স।"

পল নবাগত পামার্সের হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন। লুসী তাহাকে এক পেয়ালা কাফি দিলে, পামার্স তাহাতে চুমুক দিতে দিতে হত্যাকাণ্ডের কথার আলোচনা আরম্ভ করিল। সে এ সম্বন্ধে একটা নূতন কথা বলিবার

লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "যদি আপনারা আমার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব ডিককে যে খুন করিয়াছে, সে হয় কোনও ভবঘুরে পথিক, না হয় কোন জিপ্‌সী। গ্রামের কোন লোক যে এ কাজ করে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; কারণ গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে তাহার শত্রুতা ছিল না।"

মেজর বলিলেন, "হাঁ, একথা সত্য বটে। আর কাহারও সঙ্গে তাহার মনান্তর ছিল—এ অনুমান যদি সত্যও হয়, তাহা হইলেও, তাহার এরকম শত্রু কেহই ছিল না, যে তাহাকে হত্যা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই; এই হত্যারহস্য বড়ই জটিল বলিয়া মনে হইতেছে; পুলিশের একার চেষ্টায় কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় অবিলম্বে তাহাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত।"

যাহা হউক, মেজরের মানসিক অবস্থা শোচনীয় বুঝিয়া কেহই তাঁহাকে খেলিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত মনে করিল না; কিন্তু সকলকেই হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া মেজর স্বয়ং হাল ধরিলেন! তিনি চেয়ারখানি পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না ঘরে বসিয়া নিষ্কর্ম্মাভাবে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় মন আরও খারাপ হইবে। যদি ক্লাবে যাইতেই হয় ত তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল; নতুবা লাঞ্চের সময় আমরা ফিরিতে পারিব না। লুসী, প্রিয়তমে! তুমি মিসেস্ হপ্‌সনের বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না। কাল আমি হপ্‌সনকে বলিয়া রাখিয়াছি—আজ সকালে তুমি তাহাদের বাড়ী যাইবে। আমার সে কথার খেলাপ হইবে না ত?"

লুসী হাসিয়া বলিল, "বেশ তাহাই হইবে। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব। আশা করি তোমরা স্ফূর্ত্তি করিয়া খেলিবে। যদি তোমাদের ফিরিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে লাঞ্চের জন্য তোমাদের প্রতীক্ষা করিব।"

মেজর তাঁহার দুইজন অতিথি সহ পামার্সের কারে উঠিয়া প্রস্থান করিলে, স্থূলোদর সজীব মাংসপিণ্ড হর্নিম্যান মুখ-বিবর হইতে নিষ্ঠীবনবিন্দু বর্ষণ করিতে করিতে নেকড়ে বাঘের মত হুঙ্কার দিয়া বলিল, "মিসেস্ হপ্‌সনটা কে? আমি আশা করিতেছিলাম, তুমি আর আমি এই ফাঁকতালে পল্লীপথে বাহির হইয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত প্রমোদ-ভ্রমণ করিয়া আসিব।"

লুসী সুমধুর হাস্যে সেই জরদ্গবটার মুণ্ড ঘুরাইয়া বলিল, "হাঁ, সে ত আমরা যাইবই। উহাদের এত তাড়াতাড়ি বিদায় করিলাম, ইহার কারণ কি তুমি বুঝিতে পার নাই? যাইবার সময় হপ্‌সনের কুটীরের অদূরে গাড়ী রাখিয়া, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিব। সে জল-দারোগার স্ত্রী। বেচারা ভয়ঙ্কর ভুগিতেছে কি না, তাই তাহার রোগ-শয্যায় তাহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। এই অঞ্চলে যত লোক আছে, আমাদের বুড়োটা তাহাদের সকলেরই খোঁজ-খবর লইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে মিলা-মিশা করিতে ভালবাসে; সুতরাং আমাকেও তাহার মন যোগাইয়া চলিতে হয়, অগত্যা আমাকে যাইতেই হইবে।"

কয়েক মিনিট পরে লুসী সেই সচল মাংসপিণ্ডটাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং তাহার মোটর-কার পরিচালিত করিতে লাগিল। গাড়ী পথে আসিয়া, যে দিকে জল-দারোগার বাড়ী, সেই দিকে ছুটিল।

একটি পথ নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই পথের উভয় পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট গুল্মরাশি ও অরণ্য। লুসী সেই পথে আসিয়া গাড়ী থামাইল। সে তাহার সঙ্গী জালা-পেটা হার্নিম্যানকে বলিল, "এই পথের অদূরে হপ্‌সনের কুটীর। আমি এখানে নামিয়া সেই কুটীরে রোগিণীকে দেখিতে যাইব। তুমি কি করিবে? সেখানে যাইবে না গাড়ীতেই বসিয়া থাকিবে?"

হার্নিম্যান বলিল, "আমি এখানেই বসিয়া থাকিব। কোথাও রোগী-টোগী দেখিতে যাইব, সে রকম বিদ্‌ঘুটে সখ আমার নাই।"

লুসী তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া নামিয়া গেল। হার্নিম্যান মূলার মত স্থূল একটা চুরুট বাহির করিয়া, তোলো হাঁড়ির মত গোল মুখে পুরিল; তাহার পর তাহার ডগায় অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূমপান করিতে করিতে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় লুসীর সুললিত গতিভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। লুসীর প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল, লুসী ফরেষ্ট সুন্দরী বটে, হাঁ, পরমা সুন্দরী। তাহার স্ফূর্ত্তির প্রাণ। তাহাকে নগরে লইয়া গিয়া লাঞ্চের যোগাড় করিলে মন্দ হয় না। আর যদি ডিনারের আয়োজন করিতে পারা যায়—সে আরও ভাল।"

ক্রমশঃ সেই জরদ্গবের চিন্তার বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই সুন্দরী

যুবতীর নিরানন্দময়, ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ফরেষ্টের মত ভুঁড়িওয়ালা, বেঁটে কদাকার গাধাটাকে বিবাহ করিয়া, এই প্রকার পল্লীগ্রামে সেই বুনো বেরসিকের সহবাসে জীবনপাত করিয়া তাহার কি সুখ? তাহার জীবন এখানে নিশ্চিতই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এই নির্জ্জন নিঃসঙ্গ পল্লীপ্রান্তে প্রেম নাই, আনন্দ নাই, স্ফূর্ত্তিও নাই। সে এই কদাকার, অরসিক, আধবুড়ো লোকটার প্রেমে মজিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবন ব্যর্থ করিতেছে ইহা হর্নিম্যানের অদ্ভুত মনে হইল। লুসীর মত সুন্দরী যে-কোন ভাগ্যবান পুরুষকে লাভ করিতে পারিত। যদি এই সুন্দরীর সহিত আলাপ করিবার, তাহার সঙ্গে মিশিয়া স্ফূর্ত্তি করিবার আশা না থাকিত, তাহা হইলে সে মেজরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সপ্তাহ-শেষে ক্রফোর্ড-হলে অবসর যাপন করিতে আসিত না।

কোন্‌দিন প্রথমে কিরূপে লুসীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সেই কথা তাহার মনে পড়িল। লণ্ডনের একটি 'চ্যারিটী হলে' নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া সেই স্থানে তাহাদের প্রথম পরিচয়। লুসী ফরেষ্টের স্ত্রী, এই সংবাদ শুনিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না! সেই দিনই সে লুসীর নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইয়া—আর তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইল না। হঠাৎ কাহার দুইখানি হাত পশ্চাৎ হইতে তাহার ঘাড়ে পড়িল এবং লোহার সাঁড়াশীর মত দৃঢ়বলে তাহার গলাটি চাপিয়া ধরিল।

সেই সুদৃঢ় বন্ধনে হর্নিম্যানের মুখ-বিবর উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তাহার মুখের চুরুট খসিয়া পড়িল। হর্নিম্যান সেই সুদৃঢ় বন্ধন-পাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহার বিশাল বপু লইয়া আততায়ীর সহিত প্রবল বেগে ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল, কিন্তু বজ্রকঠিন অঙ্গুলীর প্রচণ্ড চাপে তাহার কানের ভিতর যেন ঝড় বহিতে লাগিল; তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার পর সে অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া ঢলিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

* * * *

…এধারে মিঃ পল যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন তাহার সহিত যেন ভীষণ যন্ত্রনা, মর্ম্মভেদী বেদনার সুতীব্র ঝঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। মিঃ হর্নি-ম্যানকে গুম্ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল। মিঃ পল তৎক্ষণাৎ

যেই অট্টালিকার ওক কাষ্ঠ নির্মিত সদর দরজার পাশে সরিয়া গিয়া অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিলেন। মিঃ পল দ্বিধাশূন্য চিত্তে সঙ্কল্প সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, তাহার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, তিনি সেই গভীর রাত্রেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া গুপ্ত রহস্য আবিষ্কার করিবেন।

অতঃপর মিঃ পল সেই দ্বার খুলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

চেতনা ফিরিলে হর্নিম্যান বিচলিত স্বরে বলিল. "সেই না কি?"

পল বলিলেন "সে ভিন্ন আর কে?"

হর্নিম্যান বলিল, "সে দ্বার খুলাইবার জন্য ঘণ্টা বাজায় কেন? দরজার চাবি কি তাহার কাছে নাই?"

পল বলিলেন, "এই বাড়ীর অর্গলরুদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপ করিবার প্রয়োজন ছিল। আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে ভিতরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি।"

হর্নিম্যান উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি এখানে অপেক্ষা করিব না; আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আমি সেই নরপশুকে সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িব না। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের অতিরিক্ত আরও কিছু তাহার ঘাড়ে চাপাইতে চাই।"

পল বলিলেন, "তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি ঠাণ্ডা হইয়া চলুন। আপনি অত গরম হইবেন না।"

পল এই কথা বলিয়া বাতিটা হাতে লইয়াই নীচের দিকে দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন। হর্নিম্যান মোটা মানুষ, তাহার উপর শৃঙ্খলিত দেহে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণারও অভাব ছিল না, সে কম্পিত পদে টলিতে টলিতে অন্ধকারে মিঃ পলের অনুসরণ করিল। সেই সময় বহির্দ্বারের ঘণ্টা পুনর্ব্বার বাজিতে আরম্ভ করায়, সেই শব্দে হর্নিম্যানের পদশব্দ ডুবিয়া গেল; ইহাতে পল অত্যন্ত খুসী হইলেন।

মিঃ পল বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া, বাতিটা বাঁ হাতে ধরিয়া ডান হাতে দ্বারের শিকল অপসারিত করিয়া তাহার অর্গল খুলিলেন; তাহার পর দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন, এবং দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আগন্তুক দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার দেহ ওভারকোটে আবৃত, মাথায় নরম ফেল্টনির্ম্মিত টুপি। সে দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়াই সক্রোধে হুঙ্কার দিল; উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওরে আহাম্মুক! এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি? ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আমি হয়রান হইলাম!"

মিঃ পল সংযত স্বরে বলিলেন, "সে জন্য আমি দুঃখিত, পামার্স!"

তাঁহার কথা শুনিয়া নিকোলস্ পামার্স ঘাড় বাঁকাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মুখ আরক্তিম।

"তুমি?"—বলিয়া হুঙ্কার দিয়া পামার্স বুক পকেটে হাত পুরিল।

কিন্তু মিঃ পল সেই মুহূর্ত্তে পামার্সের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। পামার্সের পিস্তলের গুলী সবেগে মেঝেতে প্রতিহত হইল। তাহার পর জড়াজড়ি ও হুড়াহুড়ি করিতে করিতে উভয়েব দেহ সশব্দে প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইল।

পামার্স পলের মুখে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতে লাগিল; পল তাহার ঘুসি-বৃষ্টিতে বিব্রত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পামার্স মুক্তিলাভ করিয়াই পলকে এরূপ বেগে ধাক্কা মারিল যে, পল সেই ধাক্কায় মুখ গুঁজিয়া পাশের দেওয়ালে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই সুযোগে পামার্স পিস্তলটা মেঝের উপর হইতে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে হাত বাড়াইয়া পিস্তলটি তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে হর্নিম্যান দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বিরাট দেহ পামার্সের দেহের উপর নিক্ষেপ করিল। পামার্স তাহার দেহের নীচে পড়িয়া চ্যাপ্টা হইবার উপক্রম! এবারও তাহার পিস্তলের গুলী যে-কায়দায় অন্য দিকে চলিয়া গেল। হর্নিম্যান পামার্সের দেহের উপর চাপিয়া থাকিলে পামার্স তাহার পদদ্বয় মুক্ত করিয়া এরূপ বেগে হর্নিম্যানের পাঁজরে পদাঘাত করিল যে, হর্নিম্যান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কুষ্মাণ্ডের মত গড়াইতে লাগিল। পামার্স মুক্তিলাভ করিয়া মিঃ পলের মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিতেই তিনি বসিয়া পড়িলেন। এবার গুলীটা পলের মাথায় উপর দিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই পল পামার্সকে আক্রমণ করিয়া, তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া তাহার মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, সে হর্নিম্যানের

পায়ের কাছে পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

*　　*　　*　　*

এইবার মেজর ফরেষ্টের কথা বলিব।

মধ্যরাত্রি অতীত-প্রায়। মেজর ফরেষ্ট তাঁহার ড্রয়িং-রুমে পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাইতেছিল।

লুসী বিবর্ণ মুখে এক পাশে বসিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল ; তাহার চোখে মুখে দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট।

সহসা সম্মুখের দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। লুসী সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, "চাকরেরা সকলেই ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; কে আসিল আমিই দেখিয়া আসি।"

মেজর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "না প্রিয়ে, তুমি কেন কষ্ট করিয়া যাইবে ? আমিই যাইতেছি। তুমি বসিয়া থাকো।"

লুসী বসিয়া রহিল। তাহার স্বামী দ্বার খুলিলেন, সে শব্দও সে শুনিতে পাইল। মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, "পল ? কি আশ্চর্য্য ! তুমি এই গভীর রাত্রিতে –"

পল মেজরের কথায় বাধা দিয়া কি বলিলেন ; তাহার পর উভয়ে হল-ঘরের দিকে চলিলেন। পল মেজরের সহিত ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিলে মেজর তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "পল ফিরিয়াছে দেখিতেছি।"—সেই সময় ও গাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে ; তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন : তিনি খোঁড়াইতেছেন ! অবস্থা দেখিয়া মেজর ফরেষ্ট গভীর বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন ; "এ কি সর্ব্বনাশ ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে পল ! তোমার এ রকম অবস্থার কারণ কি ? কাহারও সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে নাকি ?"

পল বলিলেন, "আমি অত্যন্ত অবসন্ন ; আপনার ঘরে ব্রাণ্ডি থাকিলে আমাকে এক গ্লাস আনিয়া দিন। শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়া আপনাকে সকল কথাই বলিতেছি।"

মেজর বলিলেন, "খাবার ঘরে প্রচুর ব্রাণ্ডি আছে ; আমি এক মিনিটের মধ্যে তাহা তোমাকে আনিয়া দিতেছি।"

মেজর প্রস্থান করিলে পল লুসীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর ; দৃষ্টি অচঞ্চল, অত্যন্ত কঠোর।

পল নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি হর্নিম্যানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। পামার্সকে আমি মুঠায় পুরিয়াছি ; তাহার যে সহযোগিনী ক্লোরোফর্ম্মের সাহায্যে হর্নিম্যানকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহাকেও হাতে পাইয়াছি। মার্স গ্রেঞ্জে তাহার যে ভৃত্য ছিল, তাহাকে আমার হাতে পড়িয়া শৃঙ্খলিত হইতে হইয়াছে ; আর মানুষের জীবন লইয়া নরপিশাচ মঙলোর খেলা শেষ হইয়াছে ; সে মরিয়াছে। আমার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছ ? তোমার কুহকের ফাঁদ আমি ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।"

লুসী বিবর্ণ মুখে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ ?"

পল বলিলেন, "আমি দরজায় আসিয়া সাড়া লইবার পূর্ব্বেই তোমাদের গ্যারেজে গিয়াছিলাম। তোমার গাড়ী গ্যারেজ হইতে বাহির করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার ভিতর তোমার ব্যাগ এবং লগেজ দেখিতে পাইলাম। বুঝিলাম, তুমি উড়িবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, এখন ডানা মেলিতে যে কিছু বিলম্ব !"

লুসী ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মুখে কথা সরিল না। সে অপরাধিনীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ পল মৃদুস্বরে কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বজ্রের কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, "আমার অধিক কথা বলিবার সুযোগ হইবে না ; বোধ হয় তাহার প্রয়োজনও নাই। আমি যাহাই জানিতে পারিয়া থাকি, পামার্স তোমার সম্বন্ধে এখনও কোন কথা প্রকাশ করে নাই ; ভবিষ্যতেও সে তোমাকে এই হীন ষড়যন্ত্রে জড়াইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ সে তোমাকে আড়ালে রাখিবে। এই সুযোগে তুমি ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়া দেশান্তরগামী কোনও এরোপ্লেনে আশ্রয় গ্রহণ কর। আর এদেশে কাহাকেও মুখ দেখাইও না। ঢলাঢলি করিয়া মেজর বেচারার মুখ পুড়াইও না। আর এক কথা—"

মিঃ পল লুসীর হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "যে স্ত্রীলোকটা হর্নিম্যানের নামে চিঠি লিখিয়াছিল, এবং যে চিঠির

জন্য ডাক-পিওনের প্রাণ গিয়াছে, তাহার রহস্যটা কি, সে কথা আমাকে বলিতে এখনো তোমার আপত্তি আছে কি ?"

লুসী বলিল, "সেই পত্রে হর্নিম্যানকে সতর্ক থাকিতে লেখা হইয়াছিল। টাকার বখরা লইয়া সেই স্ত্রীলোকটার সঙ্গে পামার্সের ঝগড়া হইয়াছিল। হর্নিম্যানের কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাহারা উভয়েই তাহাকে শোষণ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটা হর্নিম্যানকে যে দিন সেই চিঠি লিখিয়াছিল, সেই দিনই সে পামার্সের একখানি পত্র পাইয়াছিল। পামার্স সেই পত্রে স্ত্রীলোকটার প্রস্তাবিত বখরাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।"

মিঃ পল বলিলেন, "এই জন্যই কি সে হর্নিম্যানকে পত্র পাঠাইয়া অনুতপ্ত হইয়াছিল ? তাহার পর সে বোধ হয় টেলিফোনে পামার্সকে জানাইয়াছিল—সে হর্নিম্যানকে যে পত্র লিখিয়াছিল, ক্রফোর্ড-হাউসে হর্নিম্যানের নিকট তাহা ডাকে চলিয়া গিয়াছে।—এখন সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।"

"তুমি এখন যাইতে পার" বলিয়া মিঃ পল লুসীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। লুসী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সেই সময় মেজর ব্র্যাণ্ডির বোতল ও গ্ল্যাস লইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই তাঁহার স্ত্রীকে দ্বারপ্রান্তে যাইতে দেখিলেন। তিনি তাহাকে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও প্রিয়তমে, এই গভীর রাত্রে ? তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন ? মেজাজ সরিফ ?"

"হাঁ প্রিয়তম"—বলিয়া সেই মায়াবিনী উভয় হস্তে তাহার স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিল! তাহার পর করুণা-বিগলিত স্বরে বলিল, "বেচারা পলের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়াছি ; তবে আশা করি, কয়েক মিনিটের মধ্যে এই ধাক্কাটা আমি সাম্‌লাইতে পারিব। নারীর মন পরমেশ্বর কি উপাদান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তা পুরুষ তুমি কি বুঝিবে ?"

লুসী সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল। পল ব্রাণ্ডি ঢুকিয়া কিঞ্চিৎ চাঙ্গা হইলে মেজর তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার দুর্দ্দশার কারণ কি, এবং কোথায় বা তুমি ডুব মারিয়াছিলে, এখন তাহা খুলিয়া বলিবে ত ?"

পল সকল ঘটনার কথা সংক্ষেপে মেজরের গোচর করিলেন ; তাহা শুনিয়া মেজর বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, রোগ ও নিকোলস্ পামার্স উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি ? একবার সে ডাক্তার রোগের অভিনয় করিতেছিল, আবার খোলস বদ্‌লাইয়া নিকোলস্ পামার্সের মূর্ত্তিতে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া ফুর্ত্তি করিতেছিল ?"

মিঃ পল বলিলেন, "হাঁ, আমার এই ধারণা সত্য। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।"

মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, "রোগের ছদ্মবেশে সে আমাদের উভয়েরই সম্মুখে আসিয়াছিল। আমি এক দিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়াছিলাম ; তুমিও ডাক-পিয়ন ডিক চার্লির হত্যার রাত্রিতে তাহার মৃতদেহের অদূরে সেই ছদ্মবেশীকে দেখিতে পাইয়াছিলে ; কিন্তু আমরা উভয়েই তাহাকে চিনিতে পারি নাই—ইহার কারণ কি ?"

পল বলিলেন, "সেই দুর্য্যোগের রাত্রে আমি আমার মোটর-কারের মাথার আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—তখন সে খানিক দূরেই ছিল। বিশেষতঃ তাহার ছদ্মবেশ নিখুঁত হওয়ায় আমি তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাই নাই। ডাক্তার রোগের কুব্জদেহ ও আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া, বলবান ও চট্‌পটে নিকোলস্ পামার্সের সহিত তাহার তুলনা করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমার মনে হয় নাই।"

মেজর বলিলেন, "তোমার এ কথা সত্য।"

মিঃ পল এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া গ্লাসটা মেজরের হাতে দিয়া বলিলেন, "এটুকু আপনি পান করুন। আপনাকে এখন যাহা বলিব তাহা শুনিবার জন্য আপনার যথেষ্ট ধৈর্য্য ও মানসিক বলের প্রয়োজন।"

মেজর গ্লাসটি শূন্যগর্ভ করিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ পলের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ পল ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাঁহার গুণবতী পত্নীর গুপ্ত লীলা-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিলেন। সেই মায়াবিনী কুহকিনী প্রেমাভিনয়ের অন্তরালে এত দিন কি খেলা খেলিয়া আসিয়াছে, সেই যাদুকরী কোন্ মন্ত্রে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া কি ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—যাহার অস্তিত্ব মাত্র কোনও দিন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাহার বিস্ময়কর বিবরণ শুনিয়া মেজর

চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। আত্মসংযম তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

মিঃ পল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার শোচনীয় মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, দুঃশীলা তরুণীর প্রেমমুগ্ধ সেই প্রতারিত প্রৌঢ়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল না। তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমার কথা সত্য, অতি কঠোর সত্য। লুসী এই কুকর্মে পামার্সের বখরাদারী করিত। মঙ্‌লো হর্নিম্যানকে তাহার পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, তাহাকে বেহুস করিয়াছিল; তাহার পর লুসীই তাহাকে তাহার মোটর-কারে ফোর-গেবল্‌সএ রাখিয়া আসিয়াছিল। সেখানে তাহারা হর্নিম্যানকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল; সন্ধ্যার পর পামার্স তাহাকে মার্সগ্রেঞ্জে লইয়া গিয়াছিল। আমি মঙ্‌লোর অনুসরণ করিয়া জলার ভিতর দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মার্সগ্রেঞ্জের সম্মুখে আসিয়া যাহাকে গ্রেঞ্জে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সে পামার্স ভিন্ন অন্য কেহ নহে। আমার বিশ্বাস, সে আমারই সন্ধানে, আমি এখানে আছি কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছিল।"

মেজর অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না! যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্‌লো কি উদ্দেশ্যে লুসীকে এখানে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল?"

পল বলিলেন, "উহা একটা ছল মাত্র। সে আপনার স্ত্রীকে আঘাত বা তাহার উপর কোন অত্যাচার করে নাই, তাহা ত আপনি জানেন। পামার্স পুলিশকে ও আমাকে ভুল বুঝাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্যই এই খেলা খেলিয়াছিল!

মেজর বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, তুমি লুসীর সকল কীর্ত্তিই জানিতে পারায় সে আমাকে ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু তোমার একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। না, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।— আমার প্রতি তাহার প্রীতি মমতা অতুলনীয়।"

মিঃ পল বলিলেন, "প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে অতুলনীয় বলিতে পারেন। আমার কথায় অসন্তুষ্ট হইবেন না; আপনার মত গতযৌবন, অরসিক

প্রৌঢ়কে লইয়া লুসীর মত নবযুবতী, মায়াবিনী কুহকিনী প্রেমের অভিনয় করিতে পারে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে বাঁদর নাচাইতে পারে, কিন্তু আপনাকে ভালবাসিতে পারে না। সে আপনার প্রেমে বন্দিনী হইবার জন্য আপনার সংসারে আসে নাই।”

মেজর তখন একথা স্বীকার না করিলেও, পরে এক দিন ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ডাক-পিয়নের হত্যাপরাধে পামার্সের ফাঁসি হইবার কয়েক মাস পরে মেজর লুসীর একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। পত্রখানি সে সুদূর সমুদ্র-পারবর্ত্তী বুয়েনোআয়ার্স হইতে লিখিয়াছিল। মেজর সেই পত্রখানি পাইবার পর মিঃ পলকে সপ্তাহশেষে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পল যথাসময়ে ক্রফোর্ড-হাউসে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইলেন।

মিঃ পল সেই পত্রে পাঠ করিলেন, “প্রিয় চার্লস, আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমি তোমার স্ত্রী নহি—এই সংবাদ আমার নিকট হইতে পাইয়া তুমি কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিবে। যেদিন আমি রেঙ্গুনের গীর্জ্জায় গিয়া তোমার মত আধ্‌বুড়োকে বিবাহ করিবার সৌখীন অভিনয় করিয়াছিলাম, তাহার পূর্ব্বেই আমি আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি জানিতে না যে, আমি অন্যের পত্নী। রেঙ্গুনে যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, সেই সময় আমি পামার্সের সহযোগে ব্যবসায় চালাইতেছিলাম। ধনবানের গুপ্তকথা, কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশের ভয় দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জনই আমাদের সেই ব্যবসায়ের বিশেষত্ব। পামার্সই আমাকে পরামর্শ দিয়াছিল—যদি আমি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী সাজিয়া, আমার রূপের প্রভায় দুশ্চরিত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আমার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করি, তাহা হইলে তাহারা আমার নিমন্ত্রণে প্রফুল্ল চিত্তে আমার মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িবে। তাহার পর আমরা একযোগে তাহাদিগের শোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিব। তাহার এই উপদেশ মূল্যবান মনে করিয়া তোমাকে লোক-দেখানো বিবাহ করিয়াছিলাম; এবং প্রেমের অভিনয়ে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া, তোমার ঘাড়ে চাপিয়া সুকৌশলে ও-দেশে ব্যবসায় চালাইতে ছিলাম। প্রেমান্ধ তুমি মনে করিতে, আমি তোমার অনুরাগিণী, তোমা ছাড়া আমার

দেহতরীর আর কোনও কাণ্ডারী নাই। রূপমুগ্ধ নির্ব্বোধ পুরুষদের ভুলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করা আমাদের পক্ষে এতই সহজ! আমি ও পামার্স—আমরা উভয়েই হর্নিম্যানের এবং যে পরস্ত্রী তাহার প্রণয়িনী, তাহার অবৈধ গুপ্তপ্রেম-সংক্রান্ত অনেক কথাই জানিতাম। হর্নিম্যানকে তোমার ক্রফোর্ড-হাউসে কৌশলে লইয়া যাইতে পারিলে তাহাকে শোষণ করিবার সুযোগ পাইব বুঝিয়া, লণ্ডনে গিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহার মন চুরি করিয়াছিলাম। সে আমার রূপের লোভে আমারই নিমন্ত্রণে তোমার পল্লী-ভবনে আমাদের অতিথি হইয়াছিল। তাহার পূর্বেও ঐরূপ কৌশলে আমি বহু লোকের সর্বনাশ করিয়াছিলাম। হর্নিম্যানের প্রণয়িনীকেও আমাদের দলে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম।

"আমি সংবাদ পাইয়াছি, সে ধরা পড়িয়া ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, পামার্সই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল; কারণ, তাহারই নির্বুদ্ধিতায় ডাক-পিয়ন নিহত হইয়াছিল। পিয়নটা নিহত হওয়াতেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল আশা নষ্ট হইয়াছে; নতুবা আরও কত কাল তোমার ঘাড়ে চাপিয়া কত কাণ্ড করিতাম, কে বলিতে পারে?

"আমার ক্ষোভের অনেক কারণ আছে; কিন্তু যখন আমার মনে হয়, তোমার মত সরলপ্রকৃতি নির্বোধ বুড়োকে প্রতারিত করিয়া কি ভাবে বাঁদর নাচাইয়াছি, এবং তোমাকে কিরূপ অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি, তখন সেই ক্ষোভ মর্মান্তিক দুঃসহ বলিয়াই আমার মনে হয়।—চিরবিদায়-প্রার্থিনী লুসী।"

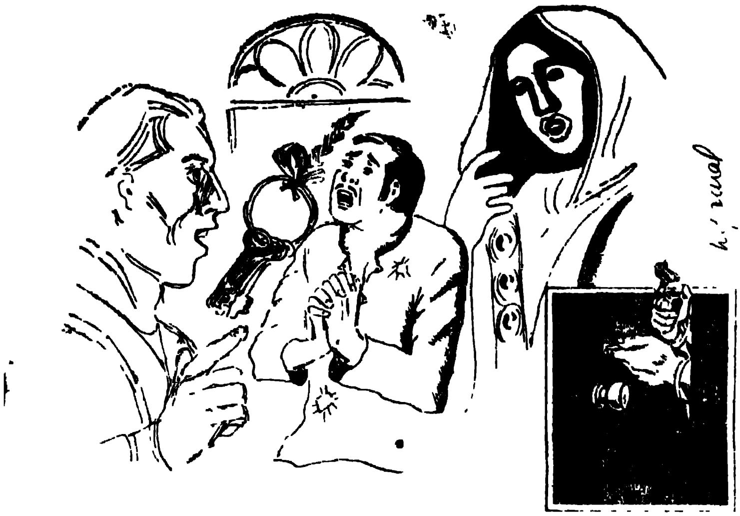
মিঃ পল পত্রখানি ফেলিয়া-রাখিয়া পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "হতভাগা পামার্সটা অপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।"

মেজর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু লুসীর পত্রে তাহার নিন্দাসূচক একটা কথাও নাই! সে কি এই নরপিশাচেরই স্ত্রী? বেচারার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ হয়; আহা অভাগী!"

মেজর রুমাল নাকে দিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন; তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ঃ বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনীর অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও ছায়া অবলম্বনে গল্প লেখার যে রেওয়াজ আজকের দিনে বহুল প্রচলিত আছে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে তার প্রবর্ত্তনা ঘটে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে। আজহতে বেশ কিছু দশক পূর্বে ব্লেক সিরিজের গোয়েন্দা গল্পমালা রচনায় লেখকের সার্থক প্রয়াস তাঁকে রহস্য সাহিত্যের পাঠকদের নিকট এক অতিপরিচিত মানুষ করে তুলেছে। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা গল্পে বিদেশী প্লট, পটভূমি প্রভৃতি রহস্য গল্পের পাঠকদের নিকট পরিচিত হলেও তাঁদের হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয় নি। তবে দীনেন্দ্রকুমারের পল্লী বর্ণনা তাঁকে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল করেছে। পল্লীচিত্র অঙ্কনে তাঁর সার্থক প্রয়াস ও গোয়েন্দা গল্প রচনায় ভাষার প্রাঞ্জল্য ও প্রসাদ গুণ তাঁকে তাঁর যুগে বহুল পঠিত লেখকদের অন্যতম করেছে।

লেখকের রহস্যলহড়ী, যণ্ডামার্কের দপ্তর, লণ্ডনেরড্রাগন, নিশাচর বাজ, প্রচ্ছন্ন আততায়ী, কুহকিনীর ফাঁদ ইত্যাদি গ্রন্থ আজকের পরিণত বর্ষীয়ান পাঠকদের অনেকেরই অতি পরিচিত ও বাল্যপরিচিত গ্রন্থ।



চাবি এবং খিল

হেমেন্দ্র কুমার রায়

॥ এক ॥

মধু ঘরে ঢুকে বললে, "বাবু একটি ভদ্দর লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" জয়ন্ত বললে, "কে তিনি?"

—"নাম বললেন রাখোহরিবাবু।"

—"রাখোহরিবাবু? এমন সেকেলে নামধারী আধুনিক কোন ভদ্রলোককে আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে না তো।"

মধু বললে, "তিনি বললেন, গেল বছরে দেওঘরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে নাকি তাঁর আলাপ হয়েছিল।"

মাণিক বললে, 'ওহো, হয়েছে। জয়ন্ত, তোমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল দেখছি। দেওঘরের রাখোহরিবাবুকে এর মধ্যেই তুমি ভুলে গেলে?

জয়ন্ত বললে, "ভায়া, বিংশ শতাব্দীতে অমন পৌরাণিক নাম স্মরণ ক'রে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তা যা হোক, এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে।"

—"আমাদের তোয়াজ করবার জন্যে রাখোহরিবাবু কি চেষ্টাই না করেছিলেন।"

—"যাক মাণিক, আর বলতে হবে না। হে শ্রীমধুসূদন, তুমি ঝটিতি নীচে নেমে গিয়ে রাখোহরিবাবুকে বলে এস—স্বাগত!"

মধুর প্রস্থান। ঘরের ভিতরে রাখোহরিবাবুর প্রবেশ অনতিবিলম্বে।

রাখোহরি নামটি জন্ম মান্ধাতার আমলে বটে; কিন্তু রাখোহরি নামধারী এই ব্যক্তিটি যে পৃথিবীর আলো দেখছেন অতি আধুনিক যুগেই, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সে কথা আর বুঝতে বাকি থাকে না। বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ। একহারা সৌখীন চেহারা, গৌরবর্ণ। চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা ঠোঁটের উপরে 'চার্লি-চ্যাপলিন' গোঁফ। গায়ে গিলে করা চুড়ীদার পাঞ্জাবী পরনে ফিন্‌ফিনে তাঁতের কাপড়। পায়ে 'সেলিম-সু'। হাতে রূপো বাঁধানো একগাছা সরু ছড়ী। তার উপরে মুক্তার বোতাম, সোনার 'রিষ্ট-ওয়াচ' এসেন্সের ভুরভুরে গন্ধ প্রভৃতি আদিক্ষেতার কথা আর নাই বা বললুম।

নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণের আদান-প্রদান হবার পর একখানা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে মাণিক বললে, "বসুন রাখোহরিবাবু। কি আপনাকে দেখলেই আমার কি মনে হয় জানেন?"

—"কি মনে হয়?"

—"পিতার অবাধ্য ছেলে ব'লে।"

—"কেন?"

—"পিতৃদেব আপনাকে একটি অত্যন্ত সেকেলে নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি নিজের চেহারা মানিকে দস্তুরমত আপ-টু-ডেট ক'রে তুলে একেবারে হালফ্যাসনের বাবু ব'লে পরিচিত হ'তে চান। এটা আপনার পিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ নয়?" রাখোহরি মৃদুহেসে বললে, "মোটেই নয়। পিতার অবাধ্য পুত্র হচ্ছে একালের সেই সব ছেলে, যা পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করে হালফ্যাসনের নতুন নতুন রং চঙে নাম আমি তো তা করিনি। স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাকে যে নাম দিয়েছিলেন আ তা মাথায় ক'রে রেখেছি! নিজের সাজসজ্জাকে আমি আপ-টু-ডেট ক' রাখব না, আমার বাবা তো এমন কোন ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে যাননি! কি যাক সে কথা, আমি এখানে ছুটে এসেছি রীতিমত দায়ে ঠেকেই!"

জয়ন্ত শুধোলে, "ব্যাপার কি রাখোহরিবাবু?"

—"আমার ভগ্নীর অত্যন্ত বিপদ!"

জয়ন্ত একটু বিস্মিত হয়ে বললে, "আপনার ভগ্নীর বিপদের জন্যে আপনি আমাদের কাছে ছুটে এসেছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ছাড়া আর কেউ তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।"

—"আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না আপনার ভগ্নির কি হয়েছে?"

—"শুনুন তবে বলি।"

॥ দুই ॥

রাধাহরি বললে, "স্বামীর বিপদকে প্রত্যেক স্ত্রীই নিজের বিপদ ব'লেই মনে করে। পুলিশ আমার ভগ্নীপতিকে গ্রেপ্তার করেছে।"

—"কেন?"

—"চুরির অপরাধে।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, "আপনার ভগ্নীপতি যদি চুরি ক'রে ধরা প'ড়ে থাকেন, তাহলে আমি হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে পুলিসের হাত থেকে তো ছাড়িয়ে আনতে পারব না!"

—"জয়ন্তবাবু, আমার ভগ্নীপতি চোর হ'লে আমি আপনার কাছে ধরণা দিতে আসতুম না। সুব্রত আর যাই হোক, চোর নয়।"

—"আপনার ভগ্নীপতির নাম সুব্রত?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ। সুব্রত সেন।"

—"আমরা এক ভাই, এক বোন। তার নাম রাধারাণী, আমার চেয়ে সে দুই বছরের ছোট। বাবা খুব ভালো ঘরেই তার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুব্রতও ছিল দেখতে-শুনতে রীতিমত সুপাত্র। তার পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল মাসিক তিন-চার হাজার টাকা। কিন্তু জয়ন্তবাবু, সর্ব্বনেশে ঘোড়া রোগে সর্ব্বস্ব তার উড়ে গিয়েছে।"

—"ঘোড়া রোগ?"

—"হ্যাঁ, ঘোড়াদৌড়। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার রোগ আরো বেড়ে যায়, সে টাকা ধার ক'রে 'রেস খেলতে থাকে আর কতগুলো হতছাড়া জুয়াড়ীর

সঙ্গে মিশে মদ পর্যন্ত ধরে। যত বাজী হারে, তত মদ খায়। জুয়া আর নেশা, এখন এই হয়েছে তার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ।"

জয়ন্ত বললে, "রাখোহরিবাবু, আপনার ভগ্নীপতির যে ছবি আঁকলেন, তা মোটেই উজ্জ্বল ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"ইদানীং মাতাল হয়ে অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরে রাধারাণীকে সে যা-তা গালিগালাজ দিতে সুরু করেছিল। তার অপরাধ, স্বামীকে সে মদ খেতে আর জুয়া খেলতে মানা করত। শেষটা আর সইতে না পেরে রাধারাণী আমার কাছে পালিয়ে এসেছে—যদিও এখনো স্বামীকে সে প্রাণের মত ভালোবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে।"

—"তারপর এই চুরির ব্যাপারটা কি ?"

—"দেনার দায়ে সুব্রতের পৈতৃক বাড়ী বিকিয়ে গিয়েছে, সে এখন ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে। এক অংশে সে থাকে আর এক অংশে থাকে তার বাড়ীওয়ালা জগন্নাথ। শুনছি আজ পাঁচদিন আগে জগন্নাথের পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে আর পুলিস চোর ব'লে গ্রেপ্তার করেছে সুব্রতকে।"

—"সুব্রতের বিরুদ্ধে কি কি প্রমান পাওয়া গিয়েছে ?"

—"আমি এখনো তা ভালো ক'রে জানতে পারিনি। তবে আমার আর রাধারাণীর দৃঢ়বিশ্বাস, সুব্রত যত নীচেই নামুক, কিছুতেই চুরি করতে পারে না।"

—"রাখোহরিবাবু, আপনাদের এ বিশ্বাস যুক্তিহীন, আদালতে গ্রাহ্য হবে না। পুলিশ বিনা প্রমাণে কারুকেই গ্রেপ্তার করতে পারে না। এ মামলাটার ভার পেয়েছেন কোন্ পুলিস-কর্ম্মচারী ?"

—"আপনাদের বন্ধু সুন্দরবাবু।"

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইল ; তারপর বললে, "সুন্দরবাবু রোজসকালে আমাদের প্রভাতী চায়ের আসরে যোগ দেন। কাল তিনি যখন আসবেন, তাঁর কাছ থেকে মামলার সব কথা জেনে নেব।"

—"হয় তো কাল তিনি আসবেন না।"

মাণিক বললে, "অসম্ভব! আপনি সুন্দরবাবুকে জানেন না। তাঁর নিজের ফরমাস মত কাল এখানে 'চিকেন পাই' নামে একটি বিলাতী খাবার

তৈরি হবে। সেটিকে উদরস্থ করবার জন্যে সুন্দরবাবু নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে এখানে ছুটে না এসে থাকতে পারবেন না।" রাখোহরি কাতরকণ্ঠে বললে, "না জয়ন্তবাবু, আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি আজকেই সুন্দরবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা শুনে আসুন। আপনি রাধারাণীর অবস্থা জানেন না। আজ ক'দিন থেকেই তার চোখে সেই কান্না, দিন-রাত সে খালি কাঁদছে আর কাঁদছে কাল থেকে আহার পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে, বলে সুব্রত খালাস না পেলে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করবে। তাকে বাঁচাবার জন্যই আমি আজ নাচার হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

জয়ন্ত গভীর স্বরে বললে, "রাখোহরিবাবু, আমি যাদুকর নই, আমার উপরে এতটা নির্ভর করবেন না। সুব্রত যদি সত্যসত্যই চুরি ক'রে থাকে, আমি কিছুতেই তাকে বাঁচাতে পারব না।"

—"তবু আপনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন, আজই দয়া ক'রে থানায় গিয়ে একবার সুন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।"

—"বেশ, তাই করব।"

॥ তিন ॥

গদিয়ান হয়ে টেবিলের সামনে ব'সেছিলেন সুন্দরবাবু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর এক সহকারী এবং আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

জয়ন্তও মাণিককে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "হুম, একেবারে মাণিকজোড়। ব্যাপার কি জয়ন্ত? অসময়ে কেন হে প্রকাশ?"

জয়ন্ত বললে, "সুব্রতের মামলাটার তদবির করবার ভার পড়েছে আমার উপরে।"

—"বটে, বটে! তোমার উপরে কে এ ভার দিলে ভায়া? সুব্রতের স্ত্রী রাধারাণী দেবী বুঝি?"

—"আপনার এমন সন্দেহের কারণ?"

—"কারণ? কারণ রাধারাণী দেবীর দ্বারা আমি যে নিজেই আক্রান্ত হয়েছি।"

—"আক্রান্ত ?"

—"তাছাড়া আর আর কি বলি বল ? বড়ই মুস্কিলে পড়েছিলুম হে ! পরশু দিন রাধারাণী দেবী হঠাৎ আমার কাছে এসে ধরণা দিয়েছিলেন। উস্কোখুস্কো রুক্ষ চুল, ফোলা-ফোলা চোখের পাতা, উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি, ময়লা কাপড়—একেবারে বিষাদ-প্রতিমা ! ক্রমাগত কাঁদেন, থেকে থেকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে আসেন আর করুণ স্বরে বলতে থাকেন—"আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন—তিনি নির্দ্দোষ !" জানোই তো ভাই, পুলিসের লোক হয়েও আমার একটা দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রীলোকের অশ্রুবর্ষা আমি সহ্য করতে পারি না। তার উপরে মহিলাটির স্বামীভক্তি দেখেও আমার মনটা আরো ভিজে গেল। অমন দুরাচার স্বামীর অমন পতিব্রতা স্ত্রী ! কি ক'রে যে রাধারাণী দেবীর কাছ থেকে ছাড়ান পেয়েছি, তা আর বলবার নয়। যাবার সময়ে আবার ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন, তিন দিনের মধ্যে সুব্রত ছাড়া না পেলে তিনি আমার বাড়ির দরজায় 'হত্যা' দিয়ে প'ড়ে থাকবেন। কিন্তু আমি কি করব বল জয়ন্ত ? আমি পুলিস কর্মচারী, আইনের বাঁধনে আমার হাত-পা বাঁধা, সুব্রতকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই !

জয়ন্ত শুধোলে, "সুব্রতকে কি সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, না তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ আছে ?"

—"প্রমাণ আছে বৈ কি, যথেষ্ট প্রমাণ আছে।"

– "মামলাটার বিবরণ গোড়া থেকে শুনতে পেলে খুসি হব !'

সামনের অপরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "গোড়ার কথা শোনো ওর মুখ থেকে, কারণ ওঁর বাড়ীই হচ্ছে ঘটনাস্থল। ওঁর নাম হচ্ছে বাবু জগন্নাথ পাল।"

জয়ন্ত ফিরে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে দেখলে। হৃষ্টপুষ্ট, বেঁটেসেটে, কালো-কালো মানুষটি, গলায় তুলসী মালা দেখলেই মনে হয়, কোন গদির মালিক।

জয়ন্ত শুধোলে, "আপনিই জগন্নাথবাবু, সুব্রতের বাড়ীওয়ালা ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"মশাইয়ের কি করা হয় ?"

—"দর্মাহাটায় আমার চিনির কারখানা আছে।"

—"আচ্ছা, এইবারে অনুগ্রহ ক'রে সব কথা খুলে বলুন দেখি। ছোট আর বড় সব কথা সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর ভেবে কোন কথা বলতে ভুলবেন না।"

॥ চার ॥

জগন্নাথ বলতে লাগলেন : "আমার বসতবাড়ী হচ্ছে দরজী পাড়ায়। সংসারে আমরা ছয়জন লোক—আমি, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার চিনির কারবার থেকে মন্দ আয় হয় না, সুতরাং নিজেকে আমি সম্পন্ন গৃহস্থ ব'লেই বর্ণনা করতে পারি।

শ্রীনাথ ব'লে আমার এক ছোট ভাই ছিল, পাটের দালালিতে সে বেশ দু'পয়সা রোজগার করত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাসা বেঁধেছিল আহিরিটোলায়। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বছর চারেক আগে তার স্ত্রী মারা পড়ে আর মাস কয়েক আগে হঠাৎ কলেরা রোগে তারও মৃত্যু হয়। তখন শ্রীনাথ আমাকেই তার সম্পত্তির অছি ক'রে যায়।

আমার বসতবাড়ীর দুই অংশ। আমার সংসার ছোট্ট একটা অংশেই সকলের স্থান সংকুলান হয়। তাই বাকি অংশটা ভাড়া দিয়েছি। আজ আট মাস আগে সেই অংশটা ভাড়া নিয়েছেন সুব্রতবাবু। বাড়ির এই দুই অংশের মধ্যে আনাগোনা করবার উপায় নেই। দোতলার ছাদটা পাঁচিল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা। দুই অংশেই দোতলার ছাদের উপরে আছে একখানা ক'রে তিনতলার ঘর।

কিছুদিন যাবৎ সুব্রতবাবুর সঙ্গে নানা কারণে আমার আর বনিবনতি নেই। আমি তাঁকে বিশিষ্ট ভদ্রলোক ভেবেই বাড়ীভাড়া দিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন একের নম্বরের জুয়াড়ী আর বেহেড মাতাল। তাঁর বাড়ীতে যে-সব লোক আসা-যাওয়া করে তাদের চেহারা ভদ্রলোকের মত হ'লেও ব্যবহার ভদ্রলোকের মত নয়। কোন কোন রাতে মাতলামি আর হুল্লোড়ের চোটে পাড়ার লোক ঘুমোতে পারে না।

তার উপরে সুব্রতবাবুর কাছ থেকে আজ তিন মাসের বাড়ি ভাড়ার টাকা আমি পাইনি। কাজেই তাঁকে আমি বাড়ী ছাড়বার জন্যে 'নোটিস' দিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেইজন্যে ক্ষেপে গিয়ে একদিন তিনি মদের ঘোরে ছাদে উঠে যা-তা অকথা কুকথা বলতেও কসুর করেন নি। আমি তো দূরের কথা, সুব্রতবাবুর গালাগালি আর সইতে না পেরে তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত বাপের বাড়ীতে পালিয়ে গিয়েছেন।

এইবারে আসল ঘটনার কথা শুনুন।

আমার ভাই শ্রীনাথ তার জীবনবীমা ক'রে গিয়েছিলে। তার ফলে তার মৃত্যুর পরে শ্রীনাথের বীমাপত্রে পাওনা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমি শ্রীনাথের সম্পত্তির অছি। তার নাবালক পুত্রের হয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি উদ্ধার করি। এ হচ্ছে ছয় দিন—অর্থাৎ ঘটনার আগের দিনের কথা। সমস্ত টাকা আমি বাড়িতে এনে আমার তিনতলার শয়নগৃহে লোহার আলমারির ভিতরে তুলে রাখি।

জয়ন্তবাবু, আপনার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন! ভাবছেন, এই ডামাডোলের দিনে এত টাকা কেউ ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে বাড়ীতে এনে রাখে না। বিস্মিত হবার কথাই বটে।

কিন্তু টাকাটা যখন হাতে পাই, তখন সেদিন ব্যাঙ্কে জমা দেবার সময় উৎরে গিয়েছিল। পরদিনও জমা দেওয়া হয়নি কেন, তারও কারণ শুনুন। আমার এক বাল্যবন্ধু আছেন, কুমুদকান্ত চৌধুরী, তিনি মনসাপুরের দারোগা। পরদিনেই—অর্থাৎ গেল চব্বিশ তারিখে ছিল তাঁর মেয়ের বিয়ে, আমি নিমন্ত্রিত হয়ে সকালের ট্রেনেই সপরিবারে মনসাপুরে চ'লে যেতে বাধ্য হই।

এজন্যে আমার মনে ছিল না কোনই দুশ্চিন্তা। কারণ প্রথমতঃ বাড়ীতে রইল যে দুজন ভৃত্য ও একজন পাচক, তারা প্রত্যেকেই পুরাতন, পরীক্ষিত ও বিশ্বাসী লোক। তাদের জিম্মায় বাড়ী রেখে এর আগেও দুই-এক মাসের জন্যে আমরা পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ আমার শোবার ঘরে যে অত টাকা আছে, তখন পর্যন্ত এ কথা আমি ছাড়া জনপ্রাণী জানত না।

এখন বুঝতে পারছি, আমার কাজটা হয়েছিল অত্যন্ত কাঁচা। কারণ, পরদিনেই মনসাপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আবিষ্কার করলুম, আমার

আলমারির ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট, আর কিছু কিছু অলঙ্কার। বেশীর ভাগ গহনাই ছিল আমার স্ত্রী আর মেয়ের গায়ে তাই রক্ষা, নইলে সেগুলোকেও আর দেখতে পেতুম না।

আলমারিটা ভাঙা হয়নি, চাবি দিয়েই খুলে ফেলা হয়েছে। চোর যে বাড়ির বাহির থেকে এসেছে, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। আমার বাড়ীর ভিতর থেকে শোবার ঘরে ঢুকবার দরজাটা ছিল তালা বন্ধ, কিন্তু খোলা ছিল দ্বিতলের ছাদে যাবার একটিমাত্র দরজা। ঘরে মেঝেয় কুড়িয়ে পেলুম তার খিলটা, দরজার উপরে বাহির থেকে ধাক্কাধাক্কির ফলেই যে সেটা খ'সে পড়েছে, একথা বুঝতেও আর বাকি রইল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সজোরে ধাক্কাধাক্কির ফলে দরজার খিল খ'সে পড়ল, তবু বাড়ীর লোকজন তা শুনতে পেলে না কেন? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, চোর নিশ্চয়ই এসেছিল ঘটনার দিন রাত্রে এবং সেটা ছিল বিষম দুর্যোগের রাত্রি—ঝড়, বাজ আর বৃষ্টির শব্দে ডুবে গিয়েছিল পৃথিবীর অন্য সব শব্দ। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।"

॥ পাঁচ ॥

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শুধোলে, "সুন্দরবাবু, এই চুরির মামলায় আপনারা সুব্রতকে আসামী ব'লে সন্দেহ করছেন কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, সন্দেহ কি হে? তার বিরুদ্ধে অকাট্য সব প্রমাণ পেয়েছি।"

—"কি রকম প্রমাণ শুনি?"

—জগন্নাথবাবুর তিন তলার শোবার ঘরে বাহির থেকে যদি চোর আসে, তবে তাকে সুব্রত যে অংশে থাকে সেইদিক দিয়েই আসতে হবে। দুই অংশের মাঝখানে আছে কেবল একটা ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল, যে-কোন বালক সেটা ডিঙিয়ে এ ছাদে ও-ছাদে আনাগোনা করতে পারে। কাজেই তদন্ত করবার জন্যে আমি প্রথমেই গেলুম সুব্রতর বাসায়। কিন্তু গিয়ে দেখলুম অবস্থা তার অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব কি, মদ খেয়ে সে একেবারে বেহুঁস হয়ে প'ড়ে আছে। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে পাগলের মত বলতে লাগল যত সব অসংলগ্ন কথা। বাড়ীতে আর কারুর সাড়া পেলুম না,

পাড়ার লোকের মুখে শুনলুম, একটা চাকর ছিল, মাহিনা না পেয়ে সেই চম্পট দিয়েছে। আরো শুনলুম, ঘটনার দিনে 'রেসে' গিয়ে সুব্রত হেরে ভূত হয়ে বাসায় ফিরে এসেছে, আর সেই দুঃখে কাল থেকে ক্রমাগত মদ খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তারপর তার বাড়ী খানাতল্লাস ক'রে কি পাওয়া গেল জানো? এই চাবিটা।" তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে টেবিলের উপরে একটা বড় চাবির দিকে জয়ন্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জয়ন্ত চাবিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "এটা কিসের চাবি?"

—"জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির।"

—"কিন্তু এ চাবি সুব্রতর বাড়ীতে গেল কেমন ক'রে? জগন্নাথবাবু, আপনার আলমারির কোন চাবি কি খোয়া গিয়েছে?"

জগন্নাথ বললেন, "আজ্ঞে না। আমার আলমারির চাবি আমার পকেটেই আছে।"

—"দেখি সেটা।"

জয়ন্ত দুটো চাবিই টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে কিছুক্ষণ মনযোগ দিয়ে দেখে তারপর বললে, "তাহলে বলতে হয়, এর মধ্যে একটা চাবি আসল, আর একটা নকল?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তা ছাড়া আর কি? সুব্রত অন্য কোনদিন কোন্ ফাঁকে জগন্নাথবাবুর তিন তলার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে আলমারির কলের ছাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছিল।"

—"চাবিটা সুব্রতর বাড়ীর কোথায় পাওয়া যায়?"

—"তিন তলার ঘরের মেঝেয়।"

—"সেটাও কি শোবার ঘর?"

—"না, বোধহয় সেটা বাড়তি ঘর। কোন আসবাব নেই। মেঝে ভিজে স্যাঁৎসেতে, নিশ্চয় দরজা-জানলা খোলা থাকে, কারণ ঘটনার রাত্রে বৃষ্টির জল এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।"

—"সব বুঝলুম। আপনার টেবিলের উপরে একটা খিল প'ড়ে আছে দেখছি। ওটাও কি ঘটনাস্থল থেকে এসেছে?"

—"হ্যাঁ, জয়ন্ত। ঐ খিল ভেঙেই চোর জগন্নাথবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।"

খিলটা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, "দেখছি খিলটা ভাঙেনি, ইস্ক্রুপের প্যাঁচ খুলে সরাসরি উপড়ে এসেছে। তা'হলে ঐ চাবি আর এই খিলই হচ্ছে এ মামলার প্রধান প্রমাণ?"

—হ্যাঁ। ঐ খিল প্রমাণিত করছে চোর এসেছে বাহির থেকে। আর ঐ চাবি প্রমাণিত করছে সুব্রতই হচ্ছে চোর। তার উপরে সুব্রতর নষ্ট স্বভাব আর দারুণ অর্থাভাবও তার বিরুদ্ধে যাবে, কেন না মানুষকে অপরাধী করে ঐ তুটো কারণই। সেইজন্যেই আমি তাকে গ্রেপ্তার করেছি।"

—"সুব্রতর মদের নেশা তো কেটে গিয়েছে, এখন সে কি বলে?"

—"বলে, চব্বিশ তারিখের সন্ধ্যা থেকে পরদিন তুপুর পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কেটে গিয়েছে, মদে চুর হয়ে কিছুই সে জানতে পারেনি। বলে, ঐ চাবি সে কখনো চোখেও দেখেনি, অর্থাভাবে সে আত্মহত্যাও করতে পারে, কিন্তু চুরি করা তার পক্ষে অসম্ভব, প্রভৃতি।"

জয়ন্ত বললে, "জগন্নাথবাবু, লোহার আলমারিটা আপনি কতদিন আগে কিনেছিলেন?

—"তা প্রায় দশ বৎসর হবে।"

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, আজ সন্ধ্যার আগে সুব্রত আর জগন্নাথবাবুকে নিয়ে আমার বাড়ীতে দয়া ক'রে একবার যেতে পারবেন?"

সুন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, "কেন হে?"

—"আমার আরো কিছু জিজ্ঞাসা আছে। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপাততঃ এই খিলগাছা আমি নিয়ে চললুম। বৈকালে ফেরৎ পাবেন। চল হে মাণিক।"

বাইরে রাস্তায় এসে মাণিক দেখলে, জয়ন্ত প্রশান্ত বদনে নিজের রূপোর নস্যদানী বার ক'রে তুই টিপ নস্য গ্রহণ করলে।

মাণিক বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়ন্ত, বেশী খুশি না হ'লে তুমি তো নস্য

নাও না। এর মধ্যে মামলাটার কোন সুরাহা করতে পেরেছ নাকি?"

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, "এই খিলগাছা নিয়ে তুমি আমার বাড়ীতে যাও। আমার অন্য জরুরি কাজ আছে, ফিরতে দেরি হ'তে পারে।"

॥ ছয় ॥

বৈকাল উৎরে গেল। বৈঠকখানায় ব'সে আছে জয়ন্ত ও মাণিক। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "কৈ হে মাণিক, সুন্দরবাবুরা তো এখনো আত্মপ্রকাশ করলেন না!"

মাণিক কান পেতে শুনে বললে, "কিন্তু বাড়ীর দরজায় কার গাড়ী এসে থামল! বোধহয় সুন্দরবাবুরাই এলেন!"

কিন্তু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল রাখোহরির পিছনে পিছনে একটি তরুণী মহিলা। তরুণী এবং রূপসী বটে, কিন্তু তার যাতনাবিকৃত মুখের দিকে তাকালে সে দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য দৃষ্টিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করে না। পরণে ময়লা কাপড়, মাথার চুল তৈলাভাবে অচিক্কণ, চোখের চাহনি উদ্‌ভ্রান্তের মত।

জিজ্ঞাসু নেত্রে রাখোহরির মুখের পানে তাকাল জয়ন্ত।

রাখোহরি বললে, "আমার বোন রাধারাণী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।"

ব্যস্তসমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "বসুন রাধারাণী দেবী!"

রাধারাণী ব'সে পড়ল বটে, তবে চেয়ারের উপরে নয়, হাঁটুগেড়ে মেঝের উপরে। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে দুই বাহু বদ্ধ বাড়িয়ে জয়ন্তের পা জড়িয়ে ধরতে গেল।

—"করেন কি, করেন কি" বলতে বলতে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

রাধারাণী করুণস্বরে বললে, "রক্ষা করুন, আমার স্বামীকে রক্ষা করুন!"

ঠিক সেই সময়ে সদরের কাছে আর একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ানোর শব্দ হ'ল।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, "রাধারাণী দেবী, নিশ্চয় সুন্দরবাবু আসছেন সদলবলে। শীগগির আপনি পাশের ঘরে গিয়ে দাড়ান। আপনার স্বামীকে আমি রক্ষা করতে পারব কি না জানি না, তবে অঙ্গীকার করছি, তাঁর সঙ্গে এখনি আপনার দেখা করিয়ে দেব। যান, যান—আর দেরি করবেন না।"

রাধারাণী পাশের ঘরে প্রবেশ করলে অত্যন্ত নাচারের মত। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব, তারপর এল জগন্নাথ ও আর এক বিষণ্ণ মূর্ত্তি;—বয়সে সে যুবক, উস্কখুস্ক মাথার চুল, সুন্দর মুখশ্রী কিন্তু কালিমায় পরিম্লান।

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, এই আসামী।"

জয়ন্ত শুধোলে, "আপনারই নাম সুব্রতবাবু?"

ভীরু মুখ তুলে একবার জয়ন্তের দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে সুব্রত অতি মৃদুস্বরে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"ভদ্রলোকের ছেলে, শেষটা চোর-দায়ে ধরা পড়লেন?"

নতনেত্রেই সুব্রত বললে, "ভগবান জানেন, আমি চোর নই!"

—"আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে বিচারে নিশ্চয়ই আপনি খালাস পাবেন। কিন্তু খালাস পাবার পরেও তো আবার আপনি রেস খেলবেন, মদ খাবেন, কুসঙ্গে মিশবেন, সাধ্বী স্ত্রীর সঙ্গে অমানুষের মত ব্যবহার করবেন।"

ভগ্নকণ্ঠে সুব্রত ব'লে উঠল, "আবার? কখনো নয়, কখনো নয়!"

জয়ন্ত বললে, "শুনে সুখী হলুম। আপাততঃ একবার পাশের ঐ ঘরে যান দেখি, এখানে রাধারাণী দেবী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

সুব্রত চমকে ব'লে উঠল, "রাধারাণী দেবী?"

—"হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী।"

সুব্রত পাশের ঘরের ভিতরে গেল দ্রুতপদে।

সুন্দরবাবুও হন্ হন্ ক'রে সুব্রতর পিছনে পিছনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "মাভৈঃ! আপনার আসামী চম্পট দিতে পারবে না। পাশের ঘরে ঐ একটিমাত্র দরজা, কাউকে বেরুতে হ'লে এই ঘরের ভিতর দিয়েই বাইরে যেতে হবে। আসুন সুন্দরবাবু, এইবারে আমাদের কাজের কথা হোক।"

॥ সাত ॥

সুন্দরবাবু বিরক্তস্বরে বললেন, "কাজের কথা? কি কাজের কথা? বিরহী আর বিরহিনীর মিলন দেখবার জন্যে আমরা এখানে আসিনি।"

মাণিক বললে, "হ্যাঁ, সুন্দরবাবু। জয়ন্তও সেকথা জানে ব'লেই আপনাকে পাশের ঘরে যেতে দিলে না।"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "তুমি থামো মাণিক, বাজে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। জয়ন্ত, আসামীকে আজই আমি চালান দিতে চাই। তার আগে তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে তো বল।"

জয়ন্ত বললে, "জগন্নাথবাবু, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, আপনার শোবার ঘরে দুটো দরজা—একটা ছাদের দিকে, আর একটা ভিতর বাড়ীর দালানের দিকে। চুরির পরদিনে দেখা যায়, ছাদের দরজাটা খোলা রয়েছে, কিন্তু ভিতর দিকের দরজাটা তো তালাবদ্ধ ছিল?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

—"তালার চাবি ছিল কোথায়?"

—"আমার পকেটে।"

—"উত্তম! এখন শুনুন সুন্দরবাবু। জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির আসল আর নকল চাবি দুটো আমার টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে দিন।"

কথামত কাজ করলেন সুন্দরবাবু।

জয়ন্ত শুধোলে, "কি দেখছেন?"

সুন্দরবাবু নীরসকণ্ঠে বললেন, "দেখব আবার কি ছাই? দুটো চাবি।"

—"চাবি দুটো? মাপজোক, গড়ন-পিটন একরকম।

—"হ্যাঁ, অবিকল।"

—"এটা কি সন্দেহজনক নয়?"

—"কেন, কেন?"

—"ধরুন, আপনি এক-একদিনে এক-একজন কারিকর ডাকলেন। তাদের প্রত্যেককে দিয়ে একই কলের জন্য দুটো চাবি গড়ালেন। সেই দুটো চাবি দিয়ে কল খোলা যাবে বটে, কিন্তু তাদের গড়ন-পিটন কিছুতেই একরকম হবে না, আর আকারেও কোনটা হবে কিছু ছোট, কোনটা হবে কিছু বড়।"

—"হ্যাঁ, এ কথা ঠিক।"

—"কিন্তু এই দুটো চাবি দেখলেই বোঝা যায়, একই মাপজোকের সঙ্গে মিলিয়ে একই কারিগরের হাতে দুটো চাবিই গড়া হয়েছে।"

—"হুম্।"

—"আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করুন। আপনারা যেটাকে আসল চাবি বলছেন, তার বয়স নাকি দশ বৎসর। চাবিটা যে পুরাতন, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তবে নিয়মিত ব্যবহারের দরুণ তার উপরে একটা পালিশ পড়েছে বটে। আর যেটাকে নকল চাবি বলা হচ্ছে, সেটাও দেখতে পুরাতন হ'লেও তার উপরে কিন্তু পালিশ টালিশ কিছুই নেই, বরং বহুদিন ব্যবহৃত হয়নি ব'লে তার উপরে মরচে ধ'রে গিয়েছে।"

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত ?"

—"আমি বলতে চাই যে, সুব্রতবাবু এ পাড়ার নতুন বাসিন্দা। তিনি যদি আলমারির কলের ছাচ তুলে দ্বিতীয় একটা গড়াতেন, তাহ'লে দেখলে তাকে মরচে-ধরা পুরাতন ব'লে ভ্রম করবার উপায় থাকত না, আর দেখতেও সেটা হ'ত না আকারে আর গড়ন পিটনে অবিকল প্রথম চাবিটার মত।"

সুন্দরবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন, কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

জয়ন্ত গাত্রোত্থান ক'রে দরজায় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "এখানে আসুন সুন্দরবাবু, এইবারে আর একটা ব্যাপার প্রতিপাদন করতে হবে।"

জয়ন্তের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সুন্দরবাবু। দরজার পাল্লা দু'খানা ভেজিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখুন, জগন্নাথবাবুর ছাদের দরজার খিলটা আমি নতুন ইস্ক্রুপ দিয়ে আমার দরজায় লাগিয়ে দিয়েছি ?"

সুন্দরবাবু বললেন,, "হুম, এ আবার কি বাবা ?"

জয়ন্ত বললে, "মাণিক, তুমি ঘরের বাইরে যাও। আচ্ছা, এইবারে আমি দরজাটা ভিতরে থেকে বন্ধ ক'রে নতুন খিলটা লাগিয়ে দিলুম। মাণিক, তুমি বাহির থেকে জোরে ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলে ফেলবার চেষ্টা কর।"

মাণিক সজোরে বার চারেক ধাক্কা মারবার পরেই সশব্দে খিলটা ভেঙে

দরজায় পাল্লা দুখানা খুলে গেল এবং খিলের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল গিয়ে মাটির উপরে।

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই। সাধারণতঃ বাঙালীদের বাড়ীর খিলগুলো হয় পল্‌কা অর্গলবদ্ধ দরজা জোর ক'রে কেউ বাহির থেকে খুলতে গেলে ধাক্কা মারে দরজার মাঝ-বরাবর, আর খিলটাও ভেঙে যায়, মাঝখান থেকেই—এখানে ও ঠিক তাই হয়েছে।"

সুন্দরবাবু একেবারে স্তব্ধ।

খিলের যে অংশ তখনও দরজার সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন ছিল সেটা দুই হাতে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, "কিন্তু কেউ যদি ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে খিলের মাঝখানে ধরে এমনি ক'রে জোরে টান মারে তা'হলে কি হয় দেখুন"—তার একটানেই খিলের অপর অংশটা ইস্ক্রুপের প্যাঁচ ছাড়িয়ে উপড়ে এল!

সুন্দরবাবু মাথার টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "তবে তো দেখছি চোর হচ্ছে বাড়ীর লোক!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "হ্যাঁ, আর সেই লোক হচ্ছেন জগন্নাথবাবু নিজেই! জগন্নাথ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "বুদ্ধির গলায় দড়ি! নিজের টাকা আমি চুরি করব নিজেই!"

জয়ন্ত বললে, "এ আপনার নিজের টাকা নয় জগন্নাথবাবু, এ হচ্ছে আপনার পিতৃমাতৃহীন নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের টাকা। সুব্রতবাবুর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ক'রে সেই টাকা আপনি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। আলমারি কেনবার সময়েই আপনি পেয়েছিলেন একরকম দেখতে দুটো চাবি—একটা ছিল তোলা, আর একটা নিজে ব্যবহার করতেন। সেই তোলা চাবিটাই আপনি পাঁচিল টপকে গিয়ে বেচারা সুব্রতবাবুর ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করেছিলেন। আরো শুনুন। আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে আপনার সম্বন্ধে আমি আরো কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। আপনার চিনির কারবার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে, শুনে আপনার মাথা বিকিয়ে যাবার মত হয়েছে। লয়েডস ব্যাঙ্কে আপনার নামে জমা আছে মাত্র একশো টাকা। গেল তেইশ তারিখে বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। পরদিন সকালেই আপনি সপরিবারে মনসাপুরে যাত্রা

করেন বটে, কিন্তু সরাসরি ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হননি, আগে সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কে নিজের শ্রীঅবলাবালা দেবীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে তবে ষ্টেশনে যান। তারপর—"

জয়ন্তর কথা ফুরোবার আগেই জগন্নাথ দরজার দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পাগলের প্রলাপ শুনতে রাজী নই!"

একলাফে তার সামনে গিয়ে প'ড়ে সুন্দরবাবু বললেন, হুম মাইরি নাকি —যাবে কোথায় চাঁদ? তোমার চক্রান্তে ভুলে সুব্রতকে আদালতে নিয়ে গিয়ে আসামী ব'লে খাড়া করলে শেষটা হয়তো আমাকে গর্দভ নাম কিনতে হ'ত, আর কি তোমাকে ছেড়ে দি?"

আচম্বিতে পাশের ঘর থেকে দুই মূর্তি বেরিয়ে জয়ন্তের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, সুব্রত এবং রাধারাণী। তার দুই পা ভিজে গেল তাদের আনন্দের অশ্রুজলে।

তাদের হাত ধ'রে তুলে জয়ন্ত অভিভূত কণ্ঠে বললে, "আপনাদের ঐ অশ্রুজলই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!"

হেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ আলোয় যখন বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত তখন অপরাপর কয়েকজন লেখকও স্বকীয় বৈশিষ্টে উজ্জ্বল ছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার তাদের অন্যতম। মূলতঃ রোমাঞ্চকর বিষয় বস্তুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় বেশী। তাছাড়া ভ্রমনকাহিনী, অলৌকিক রচনা এবং কিশোরদের উপযোগী অজস্র কাহিনীর জন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লেখকের "চাবি ও খিল" গল্পটি বাংলা গোয়েন্দা গল্পে এক বিশিষ্ট সংযুজন। আজকের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের অনেকেই তাঁর রচনা পড়ে কৈশোরের স্মৃতিকে খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই, হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বৈশিষ্ট তাঁর গদ্যের সাবলীলতা এবং পরিবেশ বর্ণনার নিখুঁত পারিপাট্যে। অত্যন্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে তিনি গল্পকে উপস্থাপিত করেন এবং তা সহজেই পাঠকের চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। তিনি একজন আশ্চর্য রকমের জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।



চোরাবালি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমার ত্রিদিবের বারম্বার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পৌষের শীতে—সুতীক্ষ্ণ প্রভাতে ব্যোমকেশ ও আমি তাঁহার জমিদারীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত আট সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া ফাঁকা জায়গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা করিয়া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্যর দিগিন্দ্রই বেশী স্থান জুড়িয়া রহিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়নঘরের দরজা পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

ব্যোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?' ত্রিদিব বলিলেন, 'যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ পাওয়া যায়, ময়ুর, বনমুরগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; তাই সকালে আমি চিঠি লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। কোনো আপত্তি নেই তো?'

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, আপত্তি।'

ব্যোমকেশ যোগ দিয়া দিল, 'তবে বাঘ যে নেই এই যে দুঃখের কথা।'

ত্রিদিব বলিলেন, 'একেবারে যে নেই তা বলতে পারব না; প্রতি বছরই এইসময় দু'একটা বাঘ ছটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভরসা করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না, নিজেই ব্যাগ করবে।' কুমার হাসিতে লাগিলেন—'জমিদারী দেখবার ফুরসৎ পায়না, তার এমনি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্দুকের ঘরে, নয়তো জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার-পাগল। টিপও অসাধারণ—মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে। ব্যোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বলিলেন, জমিদারীর চোরাবালি? অদ্ভুত নাম তো।'

হ্যাঁ,, শুনছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।' হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আর দেরী নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠতে কষ্ট হবে।' বলিয়া একটা হাই তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল শরীর বেশ একটি আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম!

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশী দেরী হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—চোরাবালিতে ডুবিয়া যাইতেছি; ব্যোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গেল; যতই বাহির হইবার জন্য হাকপাক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া যাইতেছি। শেষে নাক পর্যন্ত বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্য ভয়াবহ মৃত্যু যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে! অনেকক্ষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল!

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোনোমতে হাফ্-প্যাণ্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শর্ট গান, অজস্র কার্তুজ ও এক বেতের বাক্স-ভরা আহার্য্য দ্রব্য আগে হইতেই রাখা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন পিছনের সীটে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল উষালোকের ভিতর দিয়া হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ওভারকোটের কলারের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, স্বর্যোদয়ের আগে না পৌঁছুলে ময়ূর বনমোরগ পাওয়া শক্ত হবে। এইসময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে - চমৎকার টার্গেট।'

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পথের দু ধারে সমতল ধানের ক্ষেত; কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও সোনালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটমূলে পুরু কালির দাগের মত বনানী দেখা গেল, আমাদের রাস্তা তাহার একটা কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট কুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আসিয়া থামিল। আমরা পকেটে কার্তুজ ভরিয়া লইয়া বন্দুক ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর ব্যোমকেশ একসঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্দুক চালনায় আমার এই প্রথম হাতে খড়ি, তাই একলা যাইতে সাহস হইল না। ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে স্থির হইল যে বেলা ন'টার সময় বনের পূর্ব সীমান্তে ফাঁকা জায়গায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেইখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকাণ্ড বনের মধ্যে বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর যেন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নীচে হরিণ, খরগোশ—উপরে হরিয়াল, বনমোরগ,

ময়ূর। প্রথম বন্দুক ধরিবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষচূড়া হইতে মৃত পাখীর পতন-শব্দ, ছররার আঘাতে উড্ডীয়মান কুক্কুটের আকাশে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—একটা এপিক শিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, বিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে—সঞ্চরমান লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা—এরূপ, বিনোদ আর কোথায়? কিন্তু যাক্—পাখী শিকারে বহুল বর্ণনা করিয়া প্রধান বাঘ শিকারীদের কাছে আর হাস্যাস্পদ হইব না।

আমাদের থলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অলক্ষিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কার্তুজে—দশ নম্বর—সাতটা হরিয়াল মারিয়া আত্মশ্লাঘার সপ্তম স্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম্—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আমার মত অব্যর্থ সন্ধান সেকালে অর্জুনেরও ছিল না। ব্যোমকেশ দুই-বার মাত্র বন্দুক চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বৃহত্তর শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে; তা ছাড়া, বাঘ না হোক, ভাল্লুকের আশা সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার ভাল্লুক-লুব্ধ মন সেইদিকেই সতর্ক হইয়াছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা তখন জঙ্গলের পূর্ব-সীমা লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুমার ত্রিদিবের বন্দুকের আওয়াজ দূর হইতে বরাবরই শুনিতে পাইতেছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল খোলা জায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়-প্রায় সিকি মাইল চওড়া; দৈর্ঘ্যে কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কোনো সুদূর অতীতে হয়তো ইহা একটি স্রোতস্বিনী ছিল। তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হয়তো ভূমিকম্পে ঘাট উঁচু হইয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুষ্ক বালুপ্রান্তরে পরিণত হয়েছে। আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে—না? ঐ যে দুর্যোধন পৌঁছে গেছে চলুন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুর্চি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর সাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমরা এই কার্তুজে সাতটা হরিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকণ্ঠ আহার ও অনুপান হিসাবে থার্মোফ্লাস্ক হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অর্ধনিমীলিত চক্ষে কহিলেন, 'এই যে বালুবন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারীর নাম হয়েছে চোরা-বালি। এদিকটা সব হিমাংশুর। বলিয়া পূর্বদিক নির্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?'

কুমার বলিলেন, 'না। মাইল তিনেক লম্বা হবে তারপরে আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোন্‌খানটায় আছে কেউ জানে না; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বালিতে কোথাও জল নেই বোধহয়?

কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, 'বলিতে পারি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।' বলিয়া দক্ষিণদিকে যেখানে বালুর রেখা বাঁকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে রহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি এমন সময় একজন বন্দুকধারী লোক একটা মৃত খরগোশ কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেস্, মাথায় বয়-স্কাউটের মত খাকি টুপি, চামড়ার কোমরবন্ধে সারি সারি কার্তুজ আঁটা রহিয়াছে।

কুমার ত্রিদিব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'আরে হিমাংশু, এস এস।'

খরগোশ মাটিতে ফেলিয়া হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'অভ্যর্থনা আমাদেরই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষতঃ এঁদের।' কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন 'তুমি বুঝি আর লোভ সামলাতে পারলে না? কিম্বা ভয় হল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা ব্যাগ করে ফেলি?'

হিমাংশু বলিলেন, 'আরে বল কেন? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হল না, দেওয়ানজী আটকে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না। তাই রাগ করে আজ সকালবেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর! কিছু না হোক দুটো বনপায়রাও তো মারা যাবে।'

কুমার বলিলেন, 'হায় হায়—কোথায় বাঘ ভাল্লুক আর কোথায় বন-পায়রা। দুঃখ হবার কথা বটে, কিন্তু যাওয়া হল না কেন?'

হিমাংশুবাবু ইতিমধ্যে খাবার বাক্সটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রফুল্লমুখে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে; বেশ

মজবুত ও পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একজোড়া উগ্র জার্মান গোঁফ মুখখানাকে অনাবশ্যক রকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাঘ-শিকারীর নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে।

এক নজর দেখিলে মনে হয় লোকটা ভীষণ দুর্দান্ত। কিন্তু তবু বর্তমানে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত অর্ধমুদ্রিত নেত্রে কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে; বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর মনের মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ নাই। সাংসারিক বিষয়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক; নিদ্রায় জাগরণে নিরন্তর বাঘ ভাল্লুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধ করি বুদ্ধিটাও সাংসারিক ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম্ব সমাপনান্তে চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন; 'কি বললে? যাওয়া হল না কেন? নেহাত বাজে কারণ: কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'হয়েছে কি?'

হয়েছে আমার মাথা। জান তো, বাবা মারা যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তসিলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগে আছে: উকিল মোক্তার পরামর্শ, সে সব তো তুমি জানোই। যাহোক আমমোক্তারনামা দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গিছল, এমন সময় আবার এক নূতন ফ্যাচাং— । মাস-কয়েক আগে বেবির জন্যে একটা মাষ্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশুদিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; যাবার সময় খানকয়েক পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। থানা পুলিস হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, এটা আমার মামলাবাজ প্রজাদের একটা মারাত্মক প্যাঁচ।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'লোকটা এখনো ধরা পড়েনি?' বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'না। এবং যতদিন না ধরা পড়ছে—'

হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে। এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। আপনি তো একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, চোর ডাকাতের সাক্ষাৎ যম। (ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল সত্যান্বেষী) তাহলে মশায়, দয়া করে যদি দু' একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তাহলে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল-পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—'

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চোরের মন পুঁই আদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিসই খুঁজে বার করবে তখন। এসব জায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।'

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পুলিশের কর্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে ষ্টেশন আছে সব জায়গায় পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু এখনো তো কিছু করতে পারলে না! দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আপনি কেসটা হাতে নিন; সামান্য ব্যাপার, আপনার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না।'

ব্যোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন তো শুনি।'

হিমাংশুবাবু সাক্ষাতে হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'আমি কি সব জানি ছাই। তার সঙ্গে বোধহয় সাকুল্যে পাঁচ দিনও দেখা হয় নি। যা হোক, যতটুকু জানি বলছি শুনুন। কিছুদিন আগে বোধহয় মাস দুই হবে—একদিন সকালবেলা একজন ন্যালা খ্যাপা গোছের ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হল। তাকে আগে কখনো দেখিনি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হল না। তার গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, পায়ে ছেঁড়া চটিজুতা—রোগা বেঁটে দুর্ভিক্ষ পীড়িত চেহারা; কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে, চাকরীর অভাবে খেতে পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকুরী দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? পকেট থেকে বি-এস্‌ সি'র ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা

দেখে আমার একটু দয়া হল, কিন্তু কি কাজ দেব? সেরেস্তায় তো একটা জায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির জন্যে একজন মাষ্টার রাখবার কথা গিন্নি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন। বেবি এই সাতে পড়েছে, সুতরাং তার পড়াশুনোর দিকে এবার একটু বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

'তাকে মাষ্টার বহাল করলুম, কারণ, অবস্থা যাই হোক, ছোকরা শিক্ষিত ভদ্র সন্তান। বাড়িতেই বাইরের একটা ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ছোকরা কৃতজ্ঞতায় একেবারে কেঁদে ফেললে। তখন কে ভেবেছিল যে— ; নাম? নাম যতদূর মনে পড়ছে, হরিনাথ চৌধুরী—কায়স্থ।

'যা হোক, সে বাড়িতেই রইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা—সাক্ষাৎ হত না। বেবিকে দু'বেলা পড়াচ্ছে, এই পর্যন্ত জানতুম। হঠাৎ সেদিন শুনলুম, ছোকরা কাউকে না বলে কবে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে, হয়েছে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝ থেকে কতকগুলো বাজে পুরানো হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়েই আমার সর্বনাশ করে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়িতেই যেত। আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না, বেবির মাষ্টার বলে গিন্নি তাকে নিজে—'

এই সময় পিছনে একটা গাছের মাথায় ফট্ ফট্ শব্দ শুনিয়া আমার মাথা তুলিয়া দেখিলাম, একটা প্রশান্ত বন-মোরগ নানা বর্ণের পুচ্ছ এলাইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে। গাছ দু'টার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু নিমিষের মধ্যে বন্দুকের ব্রীচ্ খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিমাংশুবাবু ফায়ার করিলেন। পাখীটা অন্য গাছ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না, মধ্য পথেই ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি অদ্ভুত টিপ্।'

ব্যোমকেশ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, 'সত্যিই অসাধারণ।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন? ওর চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য বিদ্যে ওর পেটে আছে!—হিমাংশু, তোমার সেই শব্দভেদী প্যাঁচটা একবার দেখাও না।'

'আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জঙ্গলে ঢোকা যাক—'

'সে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে রুমাল বাধো।'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে টিক্, আপনারা কতবার দেখেছেন—'

আমরাও কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, 'তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।'

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করা।' বন্দুকে একটা বুলেট ভরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনিই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিন্তু দেখবেন কান দুটো যেন খোলা থাকে।'

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সূতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—যাহাতে হিমাংশুবাবু বুঝিতে না পারেন তিনি কোনদিকে গিয়াছেন—প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হিমাংশুবাবু এবার শুনুন।'

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটায় আঘাত করিলেন, ঠুং করিয়া শব্দ হইল। হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। বন্দুকটা একবার তুলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আর একবার বাজাও।'

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সরিয়া আসিলেন। শব্দের রেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল: দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের সাজানো নাট্য মঞ্চে এরকম খেলা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক রকম জুয়াচুরি আছে। এ একেবারে নির্জলা খাঁটি জিনিস।

হিমাংশুবাবু চোখের রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'হয়েছে ?'

আমাদের মুক্ত কণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ও কথা থাক, আপনাদের সুখ্যাতি আর বেশিক্ষন শুনলে আমার গণ্ডদেশ ক্রমে বিলিতি বেগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো যাক।'

বেলা দেড়টার সময় শিকার—শ্রান্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাথ মাষ্টারের খাতা চুরির কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছিল হিমাংশুবাবুরও কি জানি কেন, ব্যোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে সদ্য পরিচিত একজন লোককে খাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন, হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিসই শীঘ্র এই ব্যাপারের একটা সমাধান করিয়া ফেলিবে। সে যাহাই হোক, ব্যোমকেশই প্রসঙ্গটার পুনরুত্থাপন করিল, বলিল, 'আপনার হরিনাথ মাষ্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হল না।'

হিমাংশুবাবু মোটরের ফুট বোডে পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি সবই প্রায় বলেছি, আর বিশেষ কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই। তুমি বোধ হয় হেঁটেই এসেছ।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে ঘুর পড়ে গেল ওদিক দিয়ে মাঠে মাঠে এসেছি। ওদিক দিয়ে মাইলখানেক পড়ে।' বলিয়া দক্ষিন দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল দুই। চল তোমাকে পৌঁছে দিই।' তারপর হাসিয়া বলিলেন 'আর যদি নেমন্তন্ন কর তাহলে না হয় দুপুরের স্নানাহারটা তোমার বাড়িতেই সারা যাবে। কি বলেন আপনারা ?'

আমাদের কোনো আপত্তিই ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি.

গৃহস্বামী যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতেই রাজী ছিলাম। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা তো আজ আমারই অতিথি—এতক্ষন এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়িতে আর দেরী নয়; খাওয়া দাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পারেন। আর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ি ফিরলেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল 'এবং পারি যদি ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাষ্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয়তো তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন। বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্তী হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবই সমাদর সহকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার একটু ক্ষীন সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুশী হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ি তাহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ির শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর হিমাংশুবাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা হিমাংশু যা ভেবেছিলাম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুরি করে নি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে দু'হাজার টাকাও গেছে।

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ণ ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

'এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।' বলিয়া ব্যোমকেশ মোটা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া বসিল। গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিস্তৃত ফরাসের শয্যার এক একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতেছিলাম। হিমাংশুবাবুর কন্যা বেবি ব্যোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটা পুতুলকে কাপড়

পরাইতেছিল; এই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য মহাশয় একটু তফাতে ফরাসের উপর মেরুদণ্ড সিধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাইলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন. বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে জপতপ ধ্যান-ধারনার কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। আমি তো প্রথম দর্শনে তাঁহাকে জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিন্দুরের টিকা। মুখে তপঃকৃশ শান্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকারপাগল—সংসারউদাসী—জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা যে এই লোকটির তীক্ষ্ণ সতর্কতার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্য অতিথির সংবর্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত ইহারি কটাক্ষ ইঙ্গিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ব্যোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষনকাল মুদ্রিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হরিনাথ লোকটা আপাত দৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। ন্যালা—ক্যাব্‌লা গোছের একটা ছোড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শয়তানী লুকানো ছিল তা কেউ কল্পনা ও করতে পারেনি। আমি মানুষ চিনতে ভুল করি না, এক নজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে ছোড়া আমার চোখেতে ধূলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করিনি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো কু-অভিপ্রায় আছে। প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামা কাপড়ের দুরবস্থা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু'জোড়া কাপড় দুটো গেঞ্জি দুটো জামা আর দু'খানা কম্বল বার করে দিলুম। একখানা ঘর হিমাংশু বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না; সেই ঘরে তক্তপোষ ঢুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ঠিক হল, বেবি দু'বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলুম, অনাদি সরকারের কিম্বা কোনো আমলার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমলারা সবাই কাছে পিঠেই থাকে। কিন্তু

আমাদের মা—লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্দর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাস্টার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য হল। 'তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল' আমি দু'দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলুম—দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম সম্বন্ধে দু'চারকথা শুনতে চাইত। এমনিভাবে দু'মাস কেটে গেল। 'গত শনিবার আমি সন্ধ্যার পরই বাড়ি চলে যাই। আমি যে—বাড়িতে থাকি দেখেছেন বোধ হয় ফটোকে ঢুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়িখানা পড়ে সেইটে। কয়েক মাস হল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।—একলাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাত্রে আমার পুরশ্চরন করবার কথা ছিল। তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্যোগ আয়োজন করে পূজোয় বসলুম। উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল। 'পরদিন সকালে এসে শুনলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল তখনো মাস্টারের দেখা নাই। আমার সন্দেহ হল, তার ঘরে গিয়ে দেখলুম রাত্রে সে বিছানায় শোয় নি। তখন যে আলমারিতে জমিদারীব পুরনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই। 'গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে ; সন্দেহ হল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক সুবিধা হয় ; বুঝলুম হরিনাথ তাদেরই গুপ্তচর, মাষ্টার সেজে জমিদারীর জরুরী দলিল চুরি করবার জন্য এসে ঢুকেছিল। 'পুলিসে খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে সিন্দুক থেকে ছ'হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।' এ পর্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী থামিলেন, তারপর ইষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমার খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ'হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। টাকাটা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় সিন্দুকের এক কোনে রাখা ছিল। ইতি মধ্যে অনেকবার সিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটলি খুলে দেখবার কথা একবার ও মনে

হয় নি। আজ সদর থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম ; দেখি, নোটের তাড়ার বদলে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে। দেওয়ান নীরব হইলেন। শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ আবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কড়ি কাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তাহলে সিন্দুকের তালা ঠিকই আছে ? চাবি কার কাছে থাকে ?' দেওয়ান বলিল, 'সিন্দুকের দুটো চাবি ; একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশুবাবু শুষ্ক মুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনো কালে ঠিক থাকে না, কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনি—ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছেই—' 'হুঁ—ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেবিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, মা—লক্ষ্মীর মাস্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো ?' দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, 'যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিস—তো আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি কিন্তু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।' বেবি পুতুল রাখিয়া ব্যোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাস্টার-মশাই কবে ফিরে আসবেন ?' ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল 'জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।' বেবির চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল ; তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাসো—না ?' বেবি ঘাড় নাড়িল—হ্যাঁ—খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা বল তো, সাত—নাম্ কত হয় ?' ব্যোমকেশ বলিল, 'কত ? চৌষট্টি ?

বেবি বলিল, 'দুৎ ! তুমি কিচ্ছু জান না। সাত-নাম্ তেষট্টির। আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো ?'

ব্যোমকেশ হতাশ ভাবে বলিল, 'না। মা কালীর স্তবও কি তোমার মাষ্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি ?'

হ্যাঁ—শুনবে?' বলিয়া বেবি সুর করিয়া আরম্ভ করিল—'নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—' কালীগতি ঈষদ্‌হাস্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।'

বেবি একটু ক্ষুণ্ণভাবে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না। বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—' ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'চলুন, মাষ্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।' বাড়ির সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ; দ্বারে তালা লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কষি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালা খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি আয়তনে ছোট। গোটা-দুই কাঠের কবাটযুক্ত আলমারি, টেবিল চেয়ার তক্তপোষেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। দ্বারের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খুলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তক্তপোষের উপর বিছানাটা অবিন্যস্তভাবে পাট করা রহিয়াছে; টেবিলের উপর সূক্ষ্ম একপুরু ধূলার প্রলেপ পড়িয়াছে; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দাঁড় টাঙাইয়া কাপড়-চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত। দেওয়ালে লম্বিত একখানি কালীঘাটের পটের কালীমূর্তি হরিনাথ মাষ্টারের কালীপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের নীচে উঁকি মারিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, 'তাই তো, জুতোজোড়া যে একেবারে নূতন দেখছি। ও—আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' জুতা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ দড়ির আলনাটার দিকে গেল। আলনায় কয়েকটা কাচা-আকাচা কাপড়-জামা ঝুলিতেছিল, সেগুলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার বলিল, 'ভারি আশ্চর্য!'

হিমাংশুবাবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল, তাহার দৃষ্টি

ঘরের বিপরীত কোণে একটা কুলুঙ্গির উপর গিয়া পড়িল। সে দ্রুতপদে গিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, 'মাষ্টার কি চশমা পরত?'

কালীগতি বলিলেন, 'ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে—পরত বটে। চশমা কি ফেলে গেছে নাকি?'

চশমার কাচের ভিতর দিয়া একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সহাস্যে সেটা আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ আশ্চর্য নয়?'

কালীগতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য বটে। কারণ যার চোখ খারাপ তার পক্ষে চশমা ফেলে যাওয়া অস্বাভাবিক; এর কি কারণ হতে পারে আপনার মনে হয়?

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয়তো তার সত্যি চোখ খারাপ ছিল না, আপনাদের ঠকাবার জন্য চশমা পরত।'

ইত্যবসরে আমি আর কুমার ত্রিদিব চশমাটা পরীক্ষা করিতেছিলাম। স্টিল ফ্রেমের নড়বড়ে বাহুযুক্ত চশমা, কাচ পুরু। কাচের ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার অনুমান বোধহয় ঠিক নয়। চশমাটা অনেকদিনের ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে, আর কাচের শক্তিও খুব বেশী।

ব্যোমকেশ বলিল, আমার ভুলও হতে পারে। তবে, মাষ্টার আর কারুর পুরনো চশমা নিয়ে এসেছিল এটাও তো সম্ভব। যা হোক, এবার আলমারিটা দেখা যাক।'

খোলা আলমারিটার কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল, তার মধ্যে থাকে থাকে খেরো বাঁধানো স্থূলকায় হিসাবের খাতা সাজানো রহিয়াছে—বোধহয় সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট খানা। ব্যোমকেশ উপরের একটা খাতা নামাইয়া দু'-হাতে ওজন করিয়া বলিল, 'বেশ ভারী আছে, সের চারেকের কম হবে না। প্রত্যেক খাতায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে। কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ খাতার গোড়ার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, পাঁচ বছর আগেকার খাতা, ইহার পর হইতে শেষ চার বছরের খাতা চুরি গিয়াছে।

আরো কয়েকখানা খাতা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ হিসাব রাখিবার প্রণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল। প্রত্যেকটি খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ একাধারে জাব্‌দা ও পাকা খাতা। এক অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয় ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইয়াছে—অন্য অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিখিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্‌দা ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়। গোড়া হইতে ব্যোমকেশ ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধহয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথাও সে একটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত পাইয়াছে ; হয়তো যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। ঘরের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করি আপনি চান ?'

মুহূর্তকালের জন্যে হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'হ্যাঁ—চাই বই কি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আমাদের দু'জনকে এখানে থাকতে হয়।' হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। সে আর বেশী কথা কি' ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা ওঁর অতিথি।' কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। ব্যোমকেশ হিমাংশু-বাবুর কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে চায় এরূপ সন্দেহও হয়তো তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'বেশ তো আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকে তো বলুন—চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, বিষয়চিন্তাও কলকাতায় ফেলে এসেছি। তাই আপনি যদি আমার সাহায্য দরকার না মনে করেন, তাহলে আমি বরঞ্চ খুশীই হব।'

কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি। কিন্তু আমার তো অতটা মনে হল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—' টাকা যাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

'তবে?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাষ্টার বেঁচে নেই।'

আমরা দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, 'সে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই মনে হচ্ছে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবেন।'

কুমার উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, 'না না, ক্ষমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবি থাক। আপনি কাল আসবেন তো? তাহলে আমাদের সুটকেসগুলোও সঙ্গে করে আনবেন। আচ্ছা আজ বেড়িয়ে পড়ুন—পোঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

কুমারের মোটর বাহির হইয়া যাইবার পর আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম ফটক হইতে বাড়ির সদর প্রায় একশত গজ দূরে, মধ্যের বিস্তৃত ব্যবধান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালার পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঞ্চি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ালের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বাগানে প্রবেশ করিলাম। শীতকালের দীর্ঘ গোধূলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসন্ন

দিবার শেষ রক্তিম আভা পশ্চিমে জঙ্গলের মাথায় অলক্ষ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ চিন্তিত নত মুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছিল চিন্তার ধারা তাহার কোন সর্পিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হরিনাথ মাষ্টারের ঘরে সে এমন কি পাইয়াছে যাহা হইতে তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিঃঝুম পাড়া গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে অন্তর হইতে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না— গূঢ়নক্র হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রসন্নই দেখায়। ব্যোমকেশের সঙ্গে অনেক রহস্যময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বহিরবয়ব দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য। একটা ইউক্যালিপটাস্ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর উর্ধ্বমুখে চাহিয়া কতকটা আত্মগত, ভাবেই বলিল, 'জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে হাঁটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন? চশমাটা ফেলে যাবে কেন?'

আমি বললাম, 'চশমা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরেনি একথা জানলে কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুনে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হল যে জামা পরে যায়নি।

আমি বলিলাম, 'তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, ভাণ্ডার থেকে মাষ্টারকে দুটো গেঞ্জি আর দুটো জামা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আলনায় টাঙানো রয়েছে।' আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তাহলে তুমি অনুমান কর যে—'

ব্যোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে, দেখেছ? সবে মাত্র শুক্লপক্ষ পড়েছে। সে রাত্রে কি তিথি ছিল বলতে পারো?'

তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'বোধহয়—অমাবস্যা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনার আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিয়া কবি এবং নবপ্রণয়ীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে জানিতাম; কিন্তু ব্যোমকেশের মধ্যে কবিত্ব বা প্রেমের বাষ্পটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও যে চাঁদ দেখিয়া এমন উতলা হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না। যা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সময়েই বুঝিতে পারি না - ওটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই সে যখন ফিরিয়া বাড়ির অভিমুখে চলিল তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অংশটায় আসিয়া পৌছিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাড়ির ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশী হইবে না। সিধা যাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউয়ের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলা বাগানের কিয়দংশ ঘিরিয়া যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঘাসের উপর দিয়া নিঃশব্দপদে আমরা প্রায় ঝাউ ঝোপের কাছে পৌছিয়াছি, এমন সময় ভিতর হইতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পাইয়া আমাদের গতি আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রাখিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সঙ্কেত জানাইতেছে। কান্নার ভিতর হইতে একটা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—'বাবু, এই অনাদি সরকার আপনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—পুরনো চাকর বলে আমাকে দয়া করুন। মা-ঠাকরুণ ভুল বুঝেছেন। আমার মেয়ে অপরাধী—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, ও মহাপাপ আমরা করিনি।' কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবুর কড়া কঠিন স্বর শুনা গেল—'ঠিক বলছ? তোমরা মারোনি?'

'ধর্ম জানেন হুজুর। আপনি মালিক—দেবতা, আপনার কাছে যদি

মিথ্যে কথা বলি তবে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।' আবার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কিন্তু রাধাকে আর এখানে রাখা চলবে না।' কালই তাকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কর। একথা যদি জানাজানি হয় তখন আমি আর দয়া করতে পারবো না—এমনিতেই বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই।'

অনাদি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হুজুর, কালই তাকে আমি কাশী পাঠিয়ে দেব ; সেখানে তার এক মাসী থাকে—'

'বেশ যদি খরচা চালাতে না পারো—'

ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা সরিয়া গেলাম। মিনিট পনেরো পরে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম : বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কালীগতিবাবু একজন নিম্নতন কর্মচারীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, বেবি তাঁহার হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে কি একটা উপরোধ করিতেছিল—তাহার কথার খানিকটা শুনিতে পাইলাম, 'একবারটি ডাকো না—'

কালীগতি একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'আঃ পাগলি—এখন নয়।' বেবি অনুনয় করিয়া বলিল, 'না দেওয়ানদাদু, একবারটি ডাকো, ঐ ওঁরা শুনবেন।' বলিয়া আমাদের নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কালীগতি আমাদের দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, যে আমলাটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া প্রশান্ত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।—বেবি কি বলছে ? কাকে ডাকতে হবে ?' কালীগতি ঘুমের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ওর যত পাগলামি। এখন শেয়াল ডাক ডাকতে হবে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'সে কি রকম ?'

কালীগতি বেবির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এখন কাজের সময়, এখন বিরক্ত করতে নেই। যাও—মা'র কাছে গিয়ে একটু পড়তে বসো গে।' বেবি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে তাঁহার আঙুল মুঠি করিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'না দাদু, একবারটি' অগত্যা কালীগতি চুপি চুপি তাহার কানের

কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি যখন ঘুমুতে যাবে তখন শোনাব কেমন ? এখন যাও লক্ষ্মী দিদি আমার।'

বেবি খুশী হইয়া বলিল, 'নিশ্চয় কিন্তু। তা না হ'লে আমি ঘুমুব না।'

'আচ্ছা বেশ।'

বেবি প্রস্থান করিলে কালীগতি বলিলেন, 'এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাষ্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'ও!' ব্যোমকেশ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি বলে কোনো কর্মচারী আছে কি ?'

'আছে। অনাদি জমিদার বাড়ির সরকার।' বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আমলাদের পাড়াতেই থাকে ?'

কালীগতি বলিলেন 'না,। সে বহুকালের পুরনো চাকর। বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলের লাগাও কতকগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।'

'না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক'দিন থেকে অসুখে ভুগছে; অনাদিকে বললুম ডাকো, তা সে রাজী নয়। বললে, আপনি সেরে যাবে।—কেন বলুন দেখি ?'

'না—কিছু নয়। কাছে পিঠে কারা থাকে তাই জানতে চাই। অন্যান্য আমলারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে ?'

'হ্যাঁ, তাদের জন্যে একটু দূরে বাসা তৈরী করিয়ে দেওয়া হয়েছে—সব সুদ্ধ সাত-আট ঘর আমলা আছে। শহর থেকে যাতায়াত করলে সুবিধা হয় না, তাই কর্তার আমলেই তাদের জন্যে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।'

'শহর এখান থেকে কতদূর ?'

'মাইল পাচেক হবে। সামনের রাস্তাটা সিধা পূব দিকে শহরে গিয়েছে।' এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, আসুন ব্যোমকেশবাবু, আমার অস্ত্রাগার আপনাকে দেখাই।'

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান আহ্নিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খড়ম পায়ে অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলাম, মেঝেয় বাঘ ভল্লুক ও হরিণের চামড়া বিছানো রহিয়াছে; দেওয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি আলমারি সাজানো। হিমাংশুবাবু একে একে আলমারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিস্তল ও রাইফেলে আলমারিগুলি ঠাসা। এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। প্রত্যেকটির গুনাগুন—কোনটির দ্বারা কবে কোন্ জন্তু বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতখানি, কোন্ রাইফেলের গুলি বামদিকে ঈষৎপ্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পনে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রানান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা, তেল মাখানো সবই নিজে করেন। অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্বচিৎ স্বভাবছদ্মবেশী মানুষের মন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়-সহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিত্তটিও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরল চিত্ত—মনটি ও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিধা পথে চলে, এ বিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। আমাদের সঞ্চরমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। হিমাংশুবাবু এই সূত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়ত সঙ্ঘর্ষে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর আয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমায় খরচের অন্ত নাই; ফলে, এই কবছরে ঋণের মাত্রা প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয়ে

সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, জমিদারী সংক্রান্ত অশান্তি তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বিপদের গুরুত্ব অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট আতঙ্কে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয় ব্যসন শিকারের প্রতি আরো আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্তমানে এইরূপ, কথাবার্তায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অতঃপর অন্দর হইতে আহারের ডাক আসিল। এই সময় আনাদি সরকারকে দেখিলাম; সে আমাদের ডাকিতে আসিয়াছিল। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে; অত্যন্ত শীর্ণ কোলকুঁজা চেহারা। গালের মাংস চুপসিয়া অভ্যন্তরের কোন অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ঝাকড়া গোঁফ ওষ্ঠাধর লঙ্ঘন করিয়া চিবুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি—যেন কোনো দারুন দুষ্কৃতি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক হইয়া আছে, ব্যোমকেশ তাহাকে একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম। আহারাদির পর একজন ভৃত্য আমাদের পথ দেখাইয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ভৃত্যটির নাম ভুবন —সেই হিমাংশুবাবুর খাস বেয়ারা। শয়নকক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া আমরা সিগারেট ধরাইলাম; ভুবন মশারি ফেলিয়া, জলের কুঁজা হাতের কাছে রাখিয়া, ঘরের এটাওটা ঝাড়িয়া ঝাড়ন স্কন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি তো হরিনাথ মাষ্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চশমা পরে থাকত?

আমরা যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়াছি তাহা ভুবন বোধকার জানিত, তাই কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া সে উৎসুক ভাবে বলিল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই তো চশমা পরে থাকতেন, একদিন চশমা না পরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বিনা চশমায় তিনি এক-পা চলতে পারতেন না বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার? ভুবন হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু,

এক জোড়া। তাও সরকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-জোড়া পরে তিনি এসেছিলেন সে তো এমন ছেড়া যে কুকুরে ও খায় না। আমরা সেইদিনই সে জুতো টান মেরে আঁস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'

বটে! আচ্ছা, মাষ্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা—কালীর ছবি টাঙ্গানো রয়েছে সেটা কি মাষ্টার সঙ্গে করে এসেছিল?'

'আজ্ঞে না হুজুর, মাষ্টারবাবু একটি খড়্কে কাঠিও সঙ্গে করে আনেননি ও ছবি দেওয়ানজীর কাছ থেকে মাষ্টারবাব একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙ্গিয়ে ছিলেন।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।' ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু চাই না হুজুর?'

'না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার? বাড়িতে পাঁজি আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার? ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু সে জমিদার বাড়ির লেফাফাদুরস্ত চাকর, সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'এখনি কি চাই হুজুর?'

'এখনি হলে ভাল হয়।'

'যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।'

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর, হঠাৎ অতি সন্নিকটে একটানা বিকট একটা আর্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড় মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম।

কিন্তু তখনি বুঝিলাম, অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ ছয়টা শৃগাল একত্র হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সম্মিলিত উর্ধ্বস্বরে যাম ঘোষনা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। এই সময় ভুবন পাঁজি হাতে ফিরিয়া আসিল আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ওকি হে! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকছে?'

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, 'আসল শেয়াল নয় হুজুর। বৌবিদিদি আজ সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শুনবেন। তাই তিনিই ডাকছেন।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ· আজ সন্ধ্যেবেলা বেবি বলছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা তো দেওয়ানজীর! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝবার জো নেই।'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারেন।' বলিয়া পাঁজি ব্যোমকেশের পাশে টেবিলের উপর রাখিল। ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্তিতে পরিনত হইয়া গিযাছে; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্বাঙ্গের পেশী টান হইয়া শক্ত হইয়া আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি হে?'

ব্যোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখে দিয়া হাতটা একবার চালাইয়া বলিল, 'কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভুবন প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিকপরে একটা পাতায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পড়িয়া সে পাঁজি আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'এই ত্থাখ।'

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

পাঁজির নির্দিষ্ট পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে-রাত্রে মাষ্টার নিরুদ্দেশ হইয়া যায় সে-রাত্রিটা ছিল অমাবস্যা।

পরদিন সকাল সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—তখনো সমস্ত বাড়িটা সুপ্ত। একজন ভৃত্য বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে শীতকালে বেলা আটটার পূর্বে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইহাই এ বাড়ির রেওয়াজ। এই দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায়? আকাশে একটু কুয়াশার আভাস ছিল; সূর্যের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। আমার মন উসখুস করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'চল ব্যোমকেশ, এখন তো তোমার কোনো কাজ হবে না; জঙ্গলে গিয়ে দু'চারটে পাখী মারা যাক। তারপর এদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ফিরে আসা যাবে।'

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যাহা পাই তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দিই। বিশেষতঃ কাল বন্দুক ছুটা কুমার বাহাদুর এখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'চল।'

বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম। যে চাকরটা ঝাট দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করায় সে জঙ্গলে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল, বলিল, এই পথে সিধা যাইলে বালির পাশ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব। আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চাবণভূমির উপর দিয়া চলিলাম। কুয়াশার জন্য ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজিল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরের বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা রহিয়াছে, তাহার কোলের কাছে শিশু বেলা অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে—দূর হইতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা লম্বা খাল জঙ্গলের পাদমূল বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যেদিকে চলিয়াছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণ প্রান্তটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া একটা অনুচ্চ পাড়ের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্দাজ পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। আমরা নিকটতর ঢিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নীচের দিকে চাহিয়া।

দেখিলাম গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহাব পরেই অনিশ্চিত ভয় সঙ্কুল বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোন খানটায় সেই ভয়ানক চোরাবালি কে বলিতে পারে? বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। সেটি একটি অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙ্গনের দক্ষিন মুখটি আগুলিয়। এইকুটীর পড়ি পড়ি হইয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মটকা দেখা যায় না। ছিটা বেড়ায় দেওয়াল, মাটি লেপিয়া জলবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল; এখন প্রায় সর্বত্র মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উই-ধরা

হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের দু'চালা খড়ের চালাটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পচিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কোথায়ও বা গলিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কেহ বাস করে নাই। বনের ধারে লোকালয় হইতে বহুদূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ একটি কুটীর দেখিয়া আমাদের ভারি বিস্ময় বোধ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই তো। চল, ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশে শাঁই শাঁই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বন পায়রা মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকে টোটা ভরিয়া ফায়ার করিল। আমার একটু দেরী হইয়া গেল, যখন বন্দুক তুলিলাম তখন পায়রার ঝাঁক পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশের আওয়াজে একটা পায়রা নিম্নে বালুর উপর পড়িয়াছিল। সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—পথ এত বেশী ঢালু যে পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভবনা। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের হে! মরা পাখী তো আর উড়ে পালাবে না। চল, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে। তখন যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙ্গনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয়া প্রবেশ করিলাম তাহার কবাট নেই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাখারির আগড় লাগিয়া আছে। ঘরের মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্বে গোময় লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িয়া স্থানটাকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটি চওড়ায় ছয় হাতের বেশী হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্য দুই বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; অন্য পথ নাই। ব্যোমকেশ ঘরে অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, সম্প্রতি এ ঘরে কোনো মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখেছ? ঐ

কোনে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের যাতায়াত আছে।' মানুষের যাতায়াত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। রাখাল বালকেরা এদিকে গরু চরাইতে আসে, হয়তো এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা দ্বিপ্রহর যাপন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অন্য দ্বারের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখীর দিকেই পড়িয়া ছিল। কিন্তু পাখী কোথায় ? পাখীটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ করিয়াছিলাম : অথচ কোথাও তাহার চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া ব্যোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, ওহে, তোমার পাখি কৈ ? সত্যিই কি মরা পাখি উড়ে গেল নাকি ?' ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখীর একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল 'তাই তো '।

'একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয়তো আশে পাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বালুর উপর পদার্পণ করিতে যাইব, ব্যোমকেশের একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে আসিযা আমাব কোটের কলাব চাপিয়া ধবিল।

'থামো—',

'কি হল ?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। 'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সদ্য—ছোঁড়া কার্তুজের শূন্য খোলটা ব্যোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশ হাত দূরে বালুর উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর।' চাপা উত্তেজনায় তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। লাল রঙের খোলটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। কি সবনাশ। কার্তুজ খোলের ভারী দিকটা নামিয়া গিয়া সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই চোরাবালি ! এবং ইহাতেই আমি গবেটের মত এখনি পদার্পণ করিতে যাইতেছিলাম। ব্যোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত ভাবিয়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ব্যোমকেশ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত

হইয়া দাঁতগুলা ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। সে বলিল, দেখলে। উঃ, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।' আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে সে কেবল অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর ব্যোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরো বাখারি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাবালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ যতদূর পর্যন্ত বাখারি ফেলা হইল সব বাখারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাহুবেষ্টন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় জমিদার হয়তো প্রজাদের জীবন রক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যই লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। —চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, একথা যেন ঘুনাক্ষরে কেউ না জানতে পারে। বুঝলে?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাঃ! ঘরটি কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? পিছনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত গভীর বন —দুধারে বাঁধ। কে এটি তৈরী করেছিল জানতে ইচ্ছে করে।'

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ার নীচে দিয়া একজন হাফ্-প্যান্ট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ার বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু। হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।' তারপর গলা চড়াইয়া বলিল,—'অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখীরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্মস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগগির পুলিশের হাতে পড়বে।'

আমি বললাম, 'এবারে কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।'

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, 'তারপর কিছু পেলেন?'

'কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!' বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। চাকরটা বললে আপনারা এদিকে এসেছেন—একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনাদের পাখীমারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছর্‌রা কোনো কাজেই লাগবে না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'জানি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

তিনজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, 'বছর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক'বছর হল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা, মাথায় জটার মত চুল, অজস্র গোঁফদাড়ি' পাঁচ হাত লম্বা এক জোয়ান। পরণে স্রেফ একটি নেংটি, চোখ দুটো লাল টক্‌টক্‌ করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে 'তুইতোকারি' করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে অতিথি থেকে সাধনা করতে চান।

'সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—এ সব বুজরুকি আমার সহ্য হয় না; বিশেষতঃ ভেকধারীদের ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা আমি বরদাস্ত করতে

পারি না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর করে দিচ্ছিলুম ; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তার বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যবায় অভিসম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখালেন। কিন্তু আমি ঐ উলঙ্গ লোকটাকে বাড়িতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী হলুম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকবেন—আর ভাণ্ডার থেকে তাঁর নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অগত্যা রাজী হলুম।

'বাবাজী তখন এই জায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন. অবশ্য উনি আগেও শাক্তই ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

'যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে। গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বারান্দায় টেবিল পাতিয়া তাহার উপরের চা, কচুরি, পাখীর মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহার্য ভুবন খানসামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যব্যায়ে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহার্য বস্তুর সৎকারে প্রবৃত্ত হইলাম। সৎকার কার্য অল্প দূরে অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। কুমার ত্রিদিব অবতরণ করিলেন। মোটরের পশ্চাতে আমাদের স্যুটকেস কয়টা বাঁধা ছিল, সেগুলো নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কদ্দুর ?'

ব্যোমকেশ অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বেশী দূর নয়। তবে দু'একদিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার শহরে যাওয়া দরকার। পুলিশের কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন আমার গাড়িতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার একদিন সময় লাগবে ; সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বেরুলে বোধহয় ভালো হয়।'

কুমার বলিলেন, 'সে কথা মন্দ নয়। হিমাংশু তুমি চল না হে, খুব খানিক হৈ-হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন শহরে যাওয়া হয়নি।'

হিমাংশুবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক আমরা দু'জনে গেলেই যথেষ্ট।' বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইশারা ছিল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় কি একটা বলতে গিয়ে থামিয়া গেলেন।

বেলা এগারটার সময় ব্যোমকেশ কুমারের গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, 'চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।'

তাহাদের গাড়ি ফটক পার হইয়া যাইবার পর হিমাংশুবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আবার আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ; আমাদের মুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমাংশুবাবুও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। ব্যোমকেশ সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইল। ব্যোমকেশের কীর্তিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেক্‌টিভ তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না।

শেষে বলিলাম, 'হরিনাথ মাষ্টার যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শীগগির বার করতে পারত না।'

দুজনেই চমকিয়া উঠিলেন—'বেঁচে নেই!'

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যোমকেশ অবশ্য বারণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলে বোধহয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, যথা সময় সব কথা জানতে পারবেন।'

অতঃপর বারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমাংশুবাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যে তাঁহাদের দুজনকেই বিশেষ-ভাবে নাড়া দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। দুপুরবেলাটা বোধ করি ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইত; কারণ হিমাংশুবাবু আহারের পর একটা জরুরী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু বেবি আসিয়া আমাকে সঙ্গদান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই ব্যোমকেশের খোঁজ খবর লইল এবং সকালবেলা মেনির সন্তান প্রসবের জন্য আসিতে পারে নাই বলিয়া যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজেদের পারিবারিক বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল। হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, 'মা আজ তিনদিন ভাত খাননি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর অসুখ করেছে বুঝি?'

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরমুখে বেবি বলিল, 'না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভদ্রোচিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, একটা সবুজ রঙের সিডান বডির মোটর গ্যারেজের দিক হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, গাড়িখানি সাবধানে ফটক পার হইয়া শহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম চালক স্বয়ং হিমাংশুবাবু। গাড়ির অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, আমাদের নতুন গাড়ি। ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংশুবাবু ঠিক যেন চোরের মত মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? সঙ্গে কেহ ছিল কি? তিনি গোড়া হইতে আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে; তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করিতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য কিছু জানেন? তিনি কি জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন? ভীত দৃষ্টি রুগ্নকায় অনাদি সরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল কি জন্য? 'ও মহাপাপ করিনি'—কোন্ মহাপাপ হইতে নিজেকে স্খালণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। বেবি আজ আবার একটা নূতন খবর দিল—হিমাংশুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া? হরিনাথ মাষ্টার কি এই কলহ রহস্যের অন্তরালে লুকাইয়া আছে।

'তুমি ছবি আঁকতে জানো?' বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'জানি।'

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খুব—ভাল ছবি।'

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরানী দেবী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি তোমার মাষ্টারমহাশয়ের হাতের লেখা?'

বেবি বলিল, 'মাষ্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।' দেখিলাম মিথ্যা নয়। খাতার অধিকাংশ পাতাই মাষ্টারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি

ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতব্য উচ্চ গণিতের অবতারণার সার্থকতা কি?

খাতার পাতাগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে এক স্থানে দৃষ্টি পড়িল—একটা পাতার আধময়লা কাগজ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ খাতার পরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া নখচিহ্নের মত দাগগুলি পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীরভাবে বলিল, 'ওকি করছ। ছবি একে দাও না।' ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন এই ধরণের বর্ণহীন চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা ম্যাজিক দেখবে?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ দেখব।'

তখন খাতা হইতে একটুকরো কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিষ ঘষিতে লাগিলাম; কাগজটা যখন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সন্তর্পণে সেই অদৃশ্য লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্ যেমন রাসায়নিক জলে ধৌত করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার মৃদু ঘর্ষণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ওঁ হ্রীং....ক্লীং...

রাত্রি ১১...৫....অম....পড়িবে।

অসম্পূর্ণ দুর্বোধ অক্ষরগুলোর অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ও হ্রীং ক্লীং—বোধহয় কোনো মন্ত্র হইবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাষ্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল

না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই, সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার খাতায় কুকুর বাঘ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশী করিলাম। মন্ত্র-লেখা কাগজটা আমি ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়ির পশ্চাতে গ্যারেজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম; তিনি ভুবন বেয়ারাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতেছেন।

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুমার গাড়ি হইতে নামিলেন না; ব্যোমকেশকে নামাইয়া দিয়া শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল?'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'বিশেষ কিছু হল না। পুলিশের ধারণা হরিনাথ মাষ্টারের প্রজারা কেউ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার তা মনে হয় না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। আমার ধারণা অন্যরকম।'

'আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই?'

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি কি করে বুঝলেন? ও অজিত বলেছে। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চটিয়াছে, কিন্তু মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে হয়তো কথাটা ইহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া

অন্যায় করিয়াছি, ব্যোমকেশ নির্জনে পাইলেই আমার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, 'আমার বোধহয় আপনি ভুলই করেছেন ব্যোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবতঃ মরেনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল. আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?'

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না—তাকে ঠিক জানা বলে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

ব্যোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে? এই দারুণ শীতে?'

হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে রাত্রে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়ে সম্ভবতঃ সেই ঘরটায় লুকিয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে ঐখানেই আছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না।

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিয়েছো তো?'

'না না – আমি শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি তো ওকথা বলতে বারণ করনি।'

তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বারণ কর তবে গাহিব না। এবং বারণ না করিলেই তারস্বরে গাহিব। যা হোক্ আজ দুপুরবেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম ব্যোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই; বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্তত তাহার কাজের যে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন দ্বিপ্রহরে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি সব বলিলাম; মন্ত্র-লেখা কাগজটাও দেখাইলাম। কাগজটা ব্যোমকেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নূতন কিছুই নয়—এসব

আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—'রাত্রি ১১টা ৪৫ মিঃ গতে অমাবস্যা পড়িবে। অর্থাৎ হরিনাথও পাঁজি দেখেছিল।'

হিমাংশুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, কোনো মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'ছাখ ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে খুশী হন নি।

ব্যোমকেশ মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংশুবাবু যে কত উঁচু মেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে ধারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওর মতন সহৃদয় প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। যেমন করে হোক এ ব্যাপারে একটা রফা করতেই হবে।'

আমাকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি সরকারের রাধা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে শুনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে বলিয়া চলিল, 'সতের-আঠার বছরের মেয়েটি—দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।—দেখ অজিত, যৌবনের উন্মাদনায় অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই বিশেষতঃ অপরাধী যদি স্ত্রীলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিসাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বাভাবিক অপরিণামদর্শিতাকেও হিসাব থেকে বাদ দিই। ফলে যে বিচার করি সুবিচার নয়। আইনেও **grave and Sudden provocation** বলে একটা সাফাই আছে। কিন্তু সমাজ কোনো সাফাই মানে না; আগুনের মত সে নির্মম, যে হাত দেবে তার হাত পুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে লোক এই কঠিনতার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।'

ব্যোমকেশকে কখনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই;

অনাদি সরকারের কন্যাকে দেখিয়া তাহার ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল কেন তাহাতে বোধগম্য হইল না। আমি ফ্যালফ্যাল করিয়া কেবল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, 'আর একটা আশ্চর্য দেখছি, এসব ব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; শেষে ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়ের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, 'রাত হল, শোয়া যাক। এ ব্যাপারটা যে কিভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নাই।' তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।'

আমি বলিলাম, 'যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তাহলে একটু স্পষ্ট করে বল। জ্ঞাতব্য কোনো কথাই আমি এখনো বুঝতে পারিনি।'

'কিছু বোঝোনি?'

'কিছু না।'

'আশ্চর্য! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ শহরে গিয়ে ঘুচে গেছে। সমস্ত ঘটনাটি বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শহরে সারাদিন কি করলে?'

ব্যোমকেশ জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'মাত্র দুটি কাজ। ইস্টিশনে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকিয়ে বসেছিলুম। তারপর রেজিষ্ট্রি অফিসে কয়েকটি দলিলের সন্ধান করলুম।'

'এইতেই এত দেরী হল?'

হ্যাঁ। রেজিষ্টি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তদ্বির করতে হল।'

'তারপর?'

'তারপর ফিরে এলুম।' বলিয়া ব্যোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম আর কোনো কথা কহিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিদ্রাদেবীর ছায়া-ময়ীর মাথার মধ্যে ঝুমঝুম করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুট্‌খুট্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ব্যোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ?'

বাহির হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন!' ব্যোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কালো রঙের কম্বল গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিষ দেখাতে চাই। —অজিতবাবু জেগে আছেন নাকি ? আপনিও আসুন।

ব্যোমকেশ ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলিল, 'এত রাত্রে। ব্যাপার কি ? কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেপ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতির অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।

বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার রাত্রি বহুপূর্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ মন্থর একটা বাতাস যেন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ এহেন রাত্রে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল ! কতদূর যাইতে হইবে। ব্যোমকেশই বা এমন নির্বিচারে প্রশ্নমাত্র না করিয়া চলিয়াছে কেন।

কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান বেশী-দূর নয়। কালীগতির বাড়ির সদর দরজায় একটি হারিকেন লণ্ঠন ক্ষীণ-ভাবে জ্বলিতেছিল, সেটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাতি উস্কাইয়া দিয়া কালী-গতি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

কালীগতির বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকেনা, কারণ বাড়িতে

প্রবেশ করিয়া জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলাম না। লণ্ঠনের শিখা বাড়ির অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্যান্য দু'একটা আসবাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। একপ্রস্থ সিড়ি শেষ ধাপে উঠিয়া কালীগতি লণ্ঠন কমাইয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম, আলিসা-ঘেরা খোলা ছাদে উপস্থিত হইয়াছি।

এদিকে আসুন।' বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিসার ধারে লইয়া গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

উচ্চস্থান হইতে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি গ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। তাই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগতির অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্রালশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তিম ভাবে জ্বলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে। কিম্বা আগুনও হতে পারে।'

'কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।' 'ও-যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন। তা তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি? ব্যোমকেশের ব্যঙ্গহাসি শুনা গেল।

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাষ্টার।'

'ওঃ!' ব্যোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু আলো জ্বেলে সে কি করছে?'

'বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জ্বেলেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, শেষে মৃদুস্বরে বলিল, 'হতেও পারে। যদি সে বেঁচে থাকে – অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ।' মনুষ্য সমাজ থেকে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, সে ছাড়া এই রাত্রে ওখানে আর কে আগুন জ্বালবে?'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর

বলিল, 'হরিনাথ মাষ্টার হোক বা না হোক, লোকটা জানা দরকার অজিত, এখন ওখানে যেতে রাজী আছে ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন ? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সব দিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো রকম শব্দ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি ? আলো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারন আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শব্দ হবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষে স্থির হইল যে আজ রাত্রে যাওয়া নিরাপদ হইবে না ; কারণ আসামী যদি একবার টের পায় তাহা হইলে আর ওঘরে আসিবে না। ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আসামী যদি ভড়্‌কে না যায় তাহলে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব—বুঝেছেন ? তারপর সে যেম্‌নি আসবে—

কালীগতি বলিলেন, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মতলব যদি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক।'

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। যাইবার সময় ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন. 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তান্ত্রিকধর্মে বিশ্বাস করেন না ?'

ব্যোমকেশ বলিল, না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।'

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল, তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব

কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভয়ঙ্কর চটেছেন।'

আমি বলিলাম, 'যাবার সময় তোমার দিকে যে রকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হল। তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ওসব কথা বলবার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তান্ত্রিক—কাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে।' ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও কায়মনোবাক্যে তাই আশা করছি।'

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা কওয়া তাহার অভ্যাস নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে জানিয়া বুঝিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, তার মানে? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চটিয়ে কোন লাভ হল নাকি?'

'সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন ঘুমিয়ে পড়।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ব্যোমকেশ অলস-ভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশুবাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম নানা কথাবার্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্পে আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্ত করিয়া ব্যোমকেশ কালীগতিকে একান্তে লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে তো?'

কালীগতি চিন্তান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি কি বিবেচনা করেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিবেচনায় যাওয়াই ঠিক, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আজ রাত্রি দশটা নাগাদ চন্দ্রাস্ত হবে, তার আগেই আমি

আর অজিত গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরব।'

কালীগতি বলিলেন। 'যদি না আসে?'

'তাহলে বুঝব আমার আগেকার অনুমানই ঠিক, হরিনাথ মাষ্টার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বলিলেন, 'বেশ, কিন্তু ঘরটা এখন একবার দেখে এলে ভাল হত। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন। ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আবার রাত্রে সেখানে যাবার অসুবিধা হবে।

ঘরটা যে আমরা আগে দেখিয়াছি তাহা ব্যোমকেশ ভাঙিল না। যথাসময় তিনজনে বনের ধারে কুটীরে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেঝের উপর একস্তূপ ছাই পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরের আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবাট খুলিয়া বালুর দিকে লইয়া গেলেন। বালুর উপর তখন সন্ধ্যার মলিনতা নামিয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ! এদিকটা তো বেশ, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

আমিও দেখাদেখি বলিলাম 'চমৎকার।'

কালীগতি বলিলেন, আপনারা আজ রাত্রে এই ঘরে থাকবেন বটে কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।'

আমি বললাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না। যা হোক, আশা করি বাঘের গুজবটা মিথ্যে—বন্দুক আনিবার দরকার হবে না; তবে সাবধানের মার নাই, আপনাদের সতর্ক করে দিই। যদি রাত্রে বাঘের ডাক শুনিতে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেরিয়ে এসে আগুন লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢোকে বালির ওপর যেতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল, 'সেই ভাল বন্দুকের হাঙ্গামায় দরকার নেই। অজিত আবার নূতন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয়তো বিনা কারণেই আওয়াজ করে বসবে ; ফলে শিকার আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসিয়া গল্পগুজব হইল। একসময় ব্যোমকেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ নির্ভরশীল লোককে জেনেশুনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়, তাঁর শাস্তি কি?' হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মৃত্যু। A tooth for a tooth, an eye for eye!'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিল—'অজিত তুমি কি বল?'

'আমিও তাই বলি।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, 'হিমাংশুবাবু, আজ রাত্রে আমরা দু'জনে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়েয় লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি। কেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে সাহস করে না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ, নিশ্চয় যাব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকার ইঙ্গিতে কেউ না জানতে পারে। তা হলেই সব ভেস্তে যাবে। শুন, আমরা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুব ; আপনি তার আধঘণ্টা পরে বেরুবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি, আমাদের যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

'আর আপনার সবচেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।' রাত্রি ন'টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের

ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

পাশে তাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কালীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন। বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ—মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন!'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত যাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িবে। কালীগতির মৃদু কথিত 'দুর্গা' 'দুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে টর্চ বাহির করিল, নিমেষের জন্য একবার জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল. 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরাতে পারি?

পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো।

দু'জনে উক্তরূপে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম। আধঘণ্টা পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। ব্যোমকেশ ডাকিল, 'হিমাংশুবাবু আসুন।' হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু' একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম দ্যুতি সময়ের নিঃশব্দ সত্যের জ্ঞাপন করিতে লাগিল। বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় একটা বিকট গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্য বাঘের ক্ষুধার্ত্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, 'বাঘ।' তাহার রাইফেলে খুট্ করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন। বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়া-

ছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গুঢ়তর দেহরেখা অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হিমাংশুবাবু ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, 'কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'শব্দভেদী'—ব্যোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনিতে পাইলেন কি না জানি না, তিনি কুটীরের বাহিরে দুইপদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বাহির হইল। শব্দ হইল—কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুরুভার পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'পড়েছে। ব্যোমকেশবাবু, টর্চ বার করুন।'

টর্চ ব্যোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে যাইতে যাইতে বলিল, 'আসুন।'

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'বেশী কাছে যাবেন না; যদি শুধু জখম হয়ে থাকে—'

কিন্তু বাঘ কোথায়? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কম্বল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার পর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'একি! এ যে দেওয়ানজী।'

দেওয়ান কালীগতি কাৎ হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার রক্তাক্ত নগ্ন বক্ষ হইতে কম্বলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাঁহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া তাহার বুকের উপর হাত রাখিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গতাসু। যদি প্রেতলোক বলে কোনো রাজ্য থাকে তাহলে এতক্ষণে হরিনাথ মাস্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর মুলাকাত হয়েছে।' তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে মর্মপীড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

হিসাবের খাতা কয়টা হিমাংশুবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, এক লক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।' আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়াছিলাম। কালীগতির মৃত্যুর পর আরও অনেক দলিল ব্যোমকেশ বাহির করিয়াছিল। হিমাংশুবাবুর চক্ষু হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিলেন, ব্যোমকেশের কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনো যেন আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। ভাবতেগেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আমি টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেয়েছি তা আপনাকে বলছি, শুনুন কিছু। তার আগে ওই রেজিস্ট্রি দলিল গুলো নিন।'

'কি এগুলো?' বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যে-মহাজনের কাছে তমসুক লিখে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমসুক রেজিস্ট্রি করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেইসব তমসুক আর তার বিক্রি কবালা।'

'কালীগতি এইসব তমসুক কিনেছিলেন?'

'হাঁ, আপনারই টাকায় কিনেছিলেন; যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।' হিমাংশুবাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। নাম
ব্যোমকেশ বলিল, 'ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, কার ছোরা
কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন ন
তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলাম কর সেই
ভেবেছিলেন-আরো বছর দুই এইভাবে চালালে, করতেনও তাই বি কাপালিকের
থেকে ঐ হ্যালাখ্যাপা অঙ্ক-পাগলা মাস্টারদা এসে সব ভণ্ডুল করে। ম্যাশিতভাবে

আমি বলিলাম, 'না না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।'

ব্যোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, গোড়া থেকেই ন।
বলছি, হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিষয় পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারী সুবিধা পেলেন,

হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তাঁর মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই —সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু টাকা তছরূপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু গল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশী গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক মস্ত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর বাঁধা-বাঁধির মধ্যে রইল না; আদালতে ন্যায্য এবং ন্যায়—বহির্ভূত দুই রকমই খরচ আছে, সুতরাং গোঁজামিল দেওয়া চলে। কালীগতির চুরির খুব সুবিধা হল।

'প্রথমটা বোধহয় কালীগতি কেবল চুরি করবার মতলবেই ছিলেন, তার বেশী উচ্চাশা করেন নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তান্ত্রিক এসে হাজির হল —এবং আপনি প্রথমেই তার বিষ নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রনা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিকে দেয়; কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

'স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরুর প্ররোচনায় অন্নদাতার সর্বনাশ করতে উদ্যত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেমনি কার্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল খালিকরে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই ওই অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ালেন, তারপর মহাজনের কাছ থেকে আপনারই-টাকায় সেই তমসুক কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ণহয়ে দাঁড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

এইভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল। আপনি তাকে বেবির মাষ্টার রাখলেন। বড় ভাল মানুষ বেচারা, দু'চার দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল; কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম—মাহাত্ম্য শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্তির এক পট

হরিনাথ তাঁর কাছ থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখলে। 'কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না—সে অঙ্ক-পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়, আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কল্পিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

'একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেয়ে অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতাগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে দেখা করতে সে সাহস করে না। এ অবস্থায় যা সব চেয়ে স্বাভাবিক সে তাই করলে—কালীগতিকে গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

'কালীগতি দেখলেন—সর্বনাশ। তাঁর এতদিনের ধারাবাহিক চুরি ধরা পড়ে যায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং এই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তাঁর দুষ্কৃতির প্রমান থেকে যাবে। একদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেননি এই অনুতাপ তাঁকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুললে

এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোরা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায়?

'যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালীর সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন; পাখী মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

* * *

'কালীগতি' মাষ্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাষ্টার মরবে। অথচ কেউ বুঝতে পারবে না

যে সে মরেছে। তাঁর উপর সন্দেহের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

'গত অমাবস্যার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, 'তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও তো আজ রাত্রে ঐ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর!' হরিনাথ রাজী হল, সে বেঁবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

'রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরবার দরকার নেই, এমন কি সে চশমাটাও, সঙ্গে নিলে না—কারণ অমাবস্যার রাত্রে চশমা থাক' না থাকা সমান।

'কালীগতি তাকে কুটীর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন—'যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।' হরিনাথ জপে বসল। তারপর যথাসময় বাঘেয় ডাক শুনতে পেল। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক। কালীগতি জন্তু জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথমদিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম। 'বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির উপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয়তো সে করেছিল কিন্তু তাও অর্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলেও গা শিউরে উঠে। একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, 'কালীগতি কার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে এসে সেই রাত্রেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতা চুরি করে পালিয়েছে।

'হরিনাথের অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে। তখন তিনি সিন্দুক থেকে দু'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সহজেই কালীগতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হল, টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

'তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্রাজেডি বিধবার পদস্খলন, নূতন কিছুই নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে, এসব অনাচার এ বাড়িতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও।— কেমন, ঠিক কি না?

শেষের দিকে হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আপনার মনে দয়া হল; আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা ভ্রূন হত্যার অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যেও জানাজানি হয়, এই জন্যে নিজে গাড়ি চাপিয়ে তাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। 'অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে সে আপনার মত মনিব পেয়েছে; অন্য কোনো মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

'সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম; রাধাকে দেখবার জন্যে ষ্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলুম। তার চেহারাটা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্রাজেডি অন্য রকম। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছেন। লোকটি কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেলুম রেজেষ্ট্রি অফিসে। কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই; যে খাতাগুলো থেকে তাঁর চুরি—অপরাধ প্রমাণ হতে পারত

সেগুলো তিনি আগেই সরিয়েছেন। হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছেন, নয়তো হরিনাথের সঙ্গে ঐ চোরাবালিতেই ফেলে দিয়েছেন। কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলে যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরেনি, প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বেলে রেখে এসে দুপুর রাত্রে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাত্রে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাজী হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বারণ করে দিলেন। 'আমাদের মারবার ফন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের জন্যে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই, তখন তাঁর ভয় হল যে, এইবার তাঁর সব কলাকৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। আমি ও এই সুযোগই খুঁজছিলুম, আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-ধর্মকে গালাগালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

'পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বললেন, রাত্রে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনতে পাই তাহলে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই। এই হল সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।' ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমাকে সে রাত্রে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ব?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, 'সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন

হিমাংশুবাবু, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। তিনি যে ফাঁসি কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর উদ্দেশ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন রাত্রে আপনিই বলেছিলেন—a tooth for a tooth, an eye for an eye?' এই সময় বাইরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্ত সমস্তভাবে কুমার ত্রিদিব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, 'হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড। দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?' বলিয়া কাগজখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কিছুই জানতাম না: ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম তাই ক'দিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি।' ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—'চোরাবালি নামে উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন বন্ধুর সহিত রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়েছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশুবাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছেন। 'বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না। 'জমিদার হিমাংশুবাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন, পুলিস-তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি যথোচিত অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।'

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্য ভাঙ্গিয়া কুমার ত্রিদিবকে বলিল' 'চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাব।'

॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বাংলা ডিটেক্‌টিভ গল্প ও রহস্য গল্পের ক্ষেত্রে শরদিন্দুবাবুর ভূমিকা অসাধারণ। এই সংকলনের অন্তর্গত "চোরাবালি" গল্পটি তার বিশিষ্ট উদাহরণ। এই লেখকের 'জাতিস্মর' 'চুয়াচন্দন', ব্যুমেরাং প্রভৃতি গল্প সংগ্রহ এবং 'বন্ধু' 'ডিটেকটিভ' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। অতিপ্রাকৃত এবং গোয়েন্দা গল্প রচনায় শরদিন্দু বাবু এক অনন্য স্বাদ-বৈচিত্র্য এনেছেন। তাঁর অতিপ্রাকৃত রস-প্রধান গল্প সংকলন 'কল্পকুহেলী' বাংলা অতিপ্রাকৃত গল্পের ক্ষেত্রে স্বকীয় মর্যাদায় ভাস্বর। তার 'ব্যোমকেশ' এবং বরদা অপূর্ব সৃষ্টি। শরদিন্দুবাবু ১৯২৯ সালে ওকালতী ছেড়ে সম্পূর্ণত সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও ১৯৩৮ সালে বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে 'সিনারিও' লেখার কাজে সেখানে যান। ১৯৫২ সালে চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনরায় পুণায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ও সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রথম লেখক যিনি সাহিত্যিক রসবিচারে উন্নতমানের গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে প্রয়াসী ও সক্ষম হন। এই শক্তিধর লেখক ৩০শে মার্চ ১৮৯৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন ও ২২শে সেপ্টেম্বরের ১৯৭০ সালে পরলোক গমন করেন।



হরবিলাসের মৃত্যুরহস্য

(বনফুল) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে। এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। একদল নীতিবিদ বলিবেন, যে পাষণ্ড পর-স্ত্রী হরণ করিয়া কেবল টাকার জোরে সমাজের বুকে এতদিন বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছিল, তাহার মৃত্যুতে ভূ-ভার লাঘবীকৃত হইয়াছে। আর একদল বলিবেন (ইহারাও নীতিবিদ) যে, আইনতঃ ললিতা হয়তো পর-স্ত্রী ছিল, কিন্তু ধর্মতঃ হরবিলাসই তাঁহার স্বামী, কারণ ললিতা যতদিন জীবিত ছিল, হরবিলাস নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছে। আইনতঃ যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব। ললিতার পিঠের উপর তাঁহার কত জোড়া জুতো যে ছিঁড়িয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই; রাখিলে তাহা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকমাত্রেরই চিত্তে বিস্ময়, আতঙ্ক ও সহানুভূতির উদ্রেক করিত। মোট কথা ললিতার স্বামী বকেশ্বর বক্‌সী অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রুর ও নীচমনা ব্যক্তি ছিলেন। উহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এই সৎকর্মের জন্য কেহই তাঁহাকে বাহবা দেন নাই, আজীবন তাঁহাকে ভয়ে

ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে. কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ রকম সৎকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ-সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মতো সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি! লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কতরকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হইল। অসুখের কোনও লক্ষণ তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছেন: "ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি, তার কিছুদিন পরে বক্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কি লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন,—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি। কিন্তু ও কুলটার মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত ম্লান হাসি সহসা। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যিই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বক্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়তো প্রসাদের সহিত বিষ ছিল ······

বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই

রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল: "তুই যা আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?"

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারদের অভিমত হইল। হরবিলাসের হৃদযন্ত্র যে দুর্বল ছিল, তাহা আর একজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না। সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক ধড়ফড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই সে বেশ বাঁচিয়াছিল। সহসা এমন কি হইল...। থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"তুই প্রথমে কি করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন?"

"বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখ'ন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম..."

"ও—"

ফোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল।

ভদ্রলোক ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন, সেই সময় তিনি নাকি লক্ষ্য

করেন যে ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনও মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিযাছিলেন ঃ সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এখানে । ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিশ করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে যে রকম কর, ভয় হয়,—"

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ঃ আপনার হার্ট খারাপ তাই শ্বাস কষ্ট হয়।

হরবিলাস বলিল ঃ "আমি তো তেমন টের পাই না।"

"আর কিছুদিন পরে পাবেন।"

"কি করব তাহলে ?"

"মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার—।"

"ও বাবা, আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।"

"জানলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।"

হরবিলাস চুপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন ঃ "আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।"

হরবিলাসের মাথার শিয়রের জানলায় গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রী ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাঁহার পর বেশীদিন তিনি ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো ! কিন্তু কিরূপে ?

"আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর আর কেউ কি এসেছিল ?"

"আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।"

"পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?"

"দিন পনের আগে।"

"কি বলল সে।"

"তাতো জানিনে বাবু। তবে অনেকক্ষণ ছিল।"

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিল। উইলে ছিল যে, মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। 'ললিতা বৃত্তি' নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষা-প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতি বিক্রয়ের ভার লইবেন। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকেন, গবর্ণমেণ্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে!

বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাঁহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিত, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছে।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটক গেল। একস্থানে লেখা ছিল : আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসি ছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল— "আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো?"

বলিলাম, "না রাগ করিব কেন, কি জানিতে চান বলুন।"

সে বলিল, "আপনি কি কখনও পর-স্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?"

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, ধরুন যদি করিয়াই থাকি··· ।"

জ্যোতিষী বলিল, "তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।"

এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বাণীটি তুচ্ছ করিবার মতো নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক এসিড আনাইব। শুনিয়াছি, ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।···

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কন, জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল. কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ওই ছিদ্রপথে ত্যিই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা ল শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডাইরি জান করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাঁহার কাছে চলিয়া গেল।

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?"

"তা পারতাম বই কি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?"

"না, এমনি—"

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

"হার্ট ফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই।

আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি?”

“তা বটে।”

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

মাস খানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময় একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়াছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা ছিল। রোদে জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পড়া যাইতেছিল। কি মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কি ছিল এ বাক্সে? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাক্সটা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল, ঠিক তেমনি একটি জিনিস ভি পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কি হয়? হয়তো কিছুই হইবে না। কিংবা হয়তো একটা গেঞ্জি বা কয়েক জোড়া মোজা বা ওই ধরনের কিছু একটা আসিয়া ও পড়িতে পারে। দেখাই যাক না কি হয়।...

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল, তাহা নয়, কেমন যেন নিগূঢ় ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এ বাক্সটির সহিত হয়তো হরবিলাসের মৃত্যুর কোন ও সংস্রব আছে।

দিন দশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিস পত্রের একটা ফর্দ করিতেছিলো। সম্মুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"আপনার নামে একটা ভি· পি· আছে বাবু।"

"ভি পি? ক' টাকার?"

"দশ টাকা পনের আনা।"

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল সেই দোকান হইতেই ভি, পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহর্ষে স্বগতোক্তি করিল: "দেখা যাক কি এসেছে।" অবিকল সেই রকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোনে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠীটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং—এর একটা কারসাজি, তাহা বুঝতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর!

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যুর রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্কেশ্বর বক্‌সীর লোক। সহসা একটা শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে

বনফুল (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়): বনফুলের জন্ম বিহারের মনিহারী গ্রামে, ১৮৯৯ সালে। সাহিত্যের হাতে খড়ি তিনি কবিতা লিখেই শুরু করেছিলেন। প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁর কালী-প্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকাতে।

পরবর্তীকালে তিনি অসংখ্য উপন্যাস, পাঁচ-ছশো গল্প, শ দেড়েক প্রবন্ধ ও পনের কুড়িটার মত নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হলেও, পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার।

বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব, ভাষার প্রাঞ্জল্য ও গল্প কথনের অসাধারণ দক্ষতা রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা ছোট গল্পে তাঁকে এক অনন্যতা দান করেছে। বাংলা ছোট গল্প তাঁর হাতের যাদুস্পর্শে ছোট ব্যথা ও ছোট কথায় সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে।

বাঘা

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

তোমরা ও দিকে কেউ কখনও গেছ, যেখানে রূপসা, ভৈরব আর পশর নদী এসে মিলেছে?

সেখানে এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। জল, শুধু জল,—কলকল, ছলছল অবিরাম বয়ে চলেছে। এধারে যতদূর দেখা যায় কেবল ধানের ক্ষেত। বর্ষা-শরতে সবুজ ধানের পাতা ঢেউ খেলে চলেছে। কিছুক্ষন সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তোমার মনে হবে, সেটাও যেন একটা দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, মেঘের কোলে গিয়ে মিশেছে। শীতে ধুধু করে। শূন্য মাঠ।

মাঝে মাঝে দু—একটা ছোট গ্রাম তারই মধ্যে যেন দ্বীপের মতো ভাসছে।

ওপারে কি আছে কে বলবে? সাদা চোখে কিছুই দেখা যায় না। খুব সূক্ষ্ম ফিকে বন রেখার মতো কী যেন একটা দেখা যায়, কিংবা হয়তো যায় না,—চোখের ভুল হয় তো।

জন—মানবের দেখা এ দিকে তুমি বেশী পাবেনা। চাষের সময় কিছু কিছু চাষীকে দেখতে পাবে। সেই সময় দু—চারজন রাখাল বালককেও দেখতে পাবে গাছের ছায়ায় বাঁশী বাজাতে। কিন্তু সে সব সময় নয়।

বেশীর ভাগ সময়েই দেখবে, একদিকে জনহীন দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আর একদিকে অসীম জলরাশি কুটিল তরঙ্গ—ভঙ্গে খলখল হাসছে।

আর দেখবে, দু—একটি পালতোলা নৌকা নিঃশব্দে ভেসে চলেছে। তালে তালে দাঁড়ের শব্দ হচ্ছে- ছপাত্ ছপ্।

নির্জনতা তোমরা অনেক রকম দেখেছ।

কলকাতা শহর রাত্রি একটারপর নির্জন হয়ে যায়। অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের জন্য শহরের আর সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সে হল ক্লান্ত নির্জনতা। যেন সারা শহর সমস্ত দিন কুলির মতো খেটে ক্লান্ত হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

হাজারিবাগে ক্যানারি পাহাড়ের নীচে যদি শেষ অপরাহ্নে এসে বসো, সেখানে নির্জনতার আর এক রূপ দেখবে। মনেহবে, সেই বিরাট পাহাড়ের

গাছের তলায় সমস্ত পৃথিবী যেন প্রশান্ত নীরবতায় তপস্যা করছে। তোমারও মন শান্ত হয়ে আসবে।

কিন্তু এ নির্জনতা অন্য রকমের।

একে ভয়ংকর বলতে পার। চারিদিকে চাইলে একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে মন ছম-ছম করতে থাকে। দেখছনা, নৌকাগুলো কেমন ভয়ে ভয়ে চলেছে। যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদৃশ্য কোন ভয়ংকরকে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।



আসলে এই জায়গাটা সত্যিই ভয়ংকর।

কয়েক বৎসর আগে এখানে একটা ভীষণ ঘটনা ঘটেছিল। সে গল্পই তোমাদের শোনাব।

আমাদের পাড়ায় রমেশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন দীর্ঘকাল।

তাঁর ছেলে পুলে ছিল না। শুধু স্বামী আর স্ত্রী আর একটি কুকুর। গবর্ণমেণ্ট আপিসে ভাল মাইনেয় তিনি চাকরি করতেন। পেনশন নেবার পরেও কিছুদিন তিনি এইখানেই ছিলেন।

কিন্তু বয়স হলে কলকাতায় কোলাহল ভালো লাগেনা। রমেশবাবু স্থির করলেন, জীবনের শেষ কয়টা দিন তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতেই কাটাবেন।

চাকরি কালেও গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর একেবারে ছিঁড়ে যায়

নি। দুর্গম দেশ হলেও সময় পেলে মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন—দুইচার বৎসর অন্তর।

যতদিন রক্তের জোর থাকে, কর্মব্যস্ত কলকাতা বেশ লাগে। রক্তের জোর কমে এলে মন যখন শান্ত হয়ে আসে, তখন মনে পড়ে, ছেলেবেলার লীলাভূমি পল্লীজননীকে, ছায়ায় ঘেরা পাখি—ডাকা গ্রামকে।

রমেশবাবুর গ্রাম ওই দিকে, ওই রূপসা, ভৈরব আর পশরের সঙ্গম স্থান পেরিয়ে।

একদিন তিনি সস্ত্রীক রওনা হলেন সেই দেশের দিকে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে। আসবাব পত্রের অধিকাংশই বিক্রি করে দিলেন। গ্রামে কি হবে শহুরে আসবাব পত্রে—টেবিল—চেয়ার—খাটে? তাছাড়া সেই দুর্গম দেশে ওগুলো নিয়ে যাওয়ার ঝামেলাও কম নয়! বুড়ো বয়সে সে ঝামেলাও পোষায় না।

সঙ্গে রইল একটি ট্রাঙ্কে কিছু কাপর-চোপর; একটি কাঠের বাক্সে কিছু বাসনপত্র আর একটি ক্যাশবাক্সে গহনা ও টাকাকরি।

আর বাঘা কুকুর।

তাদের বয়সের আর পথের দুর্গমতার তুলনায় এ মালও কম নয়। কিন্তু এগুলো নিতান্ত না নিয়ে গেলেই নয়। সেখানেও ত একটি সংসার পাততে হবে।

কলকাতা থেকে ওরা ট্রেনে গেলেন খুলনা।

তখন ভোর হচ্ছে।

সমস্ত দিন খুলনা থেকে ওরা রাত্রি দশটার সময় একখানি পানসি ভাড়া করে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রওনা হলেন।

গ্রীষ্মকালের রাত্রি। নদীতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। কেবিনের ভিতরে ওরা বিছানা পেতে শুয়ে পরলেন।

বাইরে সজাগ প্রহরি রইল বাঘা।

আর মাঝি—মাল্লা।

রাত তখন বোধহয় দুটো হবে।

হঠাৎ স্ত্রীর অতি—সতর্ক ঠেলায় রমেশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

কামরার মধ্যে মিটমিট করে আলো জ্বলছিলো। সেই আলোয় চোখ মেলতেই রমেশবাবুর চোখে পড়লো, স্ত্রীর হাতে ছোট একটা চিরকূট।

নিদ্রাজড়িত চোখে রমেশবাবু পড়লেন :

"নৌকোর খোলে লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সাবধান।"

মুহূর্তে রমেশবাবুর চোখের ঘুম ছুটে গেল।

কী সর্বনাস!

রমেশবাবু কান পেতে শুনলেন। সত্যিই তো! নীচে, খোলের মধ্যে লোকের যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে নড়া—চড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এদিকটা ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত। সুতরাং এরা যে ডাকাত, তাতে আর রমেশ বাবুর সন্দেহ রইল না; এবং যখন ওরা অমন আরামে রয়েছে, তখন মাঝিরাও নিশ্চয় এর মধ্যে আছে।

কিন্তু এদের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যায় কি করে?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল, বুক দুরদুর করতে লাগলো

কারও মুখে সাড়া নেই।

কিছুক্ষণ পরে রমেশবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বাইরে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলেন, নদীর জলে গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট পাতায়, আবছা লোকালয়ে তখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নি। কুয়াশার মতো পাতলা অন্ধকারে সবই যেন ঝিমুচ্ছে!

এ দিকটায় নদীর ধারেই লোকালয়। নদীও খুব বড় নয়। সেই জন্যেই ডাকাতেরা বোধ হয় তেমোহানায় নৌকো পৌছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করছে।

সেখানটায় লোক নেই, জন নেই,—চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললেও লোকের সাড়া পাওয়া যাবেনা। খুন ও ডাকাতির পক্ষে সেইটেই প্রশস্ত স্থান।

এ অঞ্চল রমেশবাবুর পরিচিত। চারি দিক ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখলেন, বুঝলেন, সেখানটায় পৌছুতে আর দেরি নেই। বরং তারপরে তাঁদের অদৃষ্টে কি ঘটতে পারে ভেবে তাঁর হৃৎপিণ্ড কেঁপে যাবার মতো হল।

এইখানটায় যদি কোন রকমে নামা যায়।

কাছে গ্রাম আছে রাঙামাটি। সেইখানে রমেশবাবুর চেনা লোক কেউ নেই। কিন্তু মাইল চার-পাঁচ দূরে থানা সেখানে খবর দেওয়া যায়।

কিন্তু কারও সন্দেহ উদ্রেক না করে এখানে নামবার উপায় কি?

রমেশবাবু সেই ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়াতেও ঘেমে উঠলেন। গলা শুকিয়ে উঠলো। তাঁর স্ত্রী কাঠের মতো শক্ত হয়ে নি:শব্দে শুয়ে।

রমেশবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

গলায় তাঁর স্বর আসছিলো না। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করে বললেন, -একটা সিগারেট খাবে নাকি মাঝি?

ভোরের হাওয়ায় মাঝিরও কেমন ঝিমুনি?

বলে, দ্যান।

সিগারেট দেবার জন্য রমেশবাবু কেবিনের বাইরে এলেন। বললেন, -রাঙামাটি গ্রামটা কাছাকাছিই হবে বোধ হয়—না মাঝি?

মাঝি যেন চমকে উঠলো।

বললে, আপনি কি এদিককার গ্রাম চেনেন না কি বাবু?

—কিছু কিছু চিনি। রাঙামাটির ঘাটে তোমাকে একবার নৌকা লাগাতে হবে মাঝি। এখানে এক জনের কাছে কিছু টাকা পাব। আগেই এই সুযোগে টাকাটা নিয়ে আসতে হবে। আবার কবে এদিকে আসব ঠিক তো নেই।

—দিনের বেলা এখানেই থাকবেন নাকি বাবু?

—খেপেছ। আসার কি থাকবার উপায় আছে? ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে যতটা যাওয়া যায়। বরং তেমোহনীর ঘাটে গিয়ে রান্না—বাড়া করে আবার বিকেল বেলায় বেরুনো যাবে। কি বল?

মাঝি বললে, সেই ভালো বাবু। নইলে আবার জোয়ার আসবে।

মাঝি বোধ করি ভাবলে, বাবু যদি আরও টাকা আনেন, মন্দ কি? লুঠের ভাগ বাড়বে।

মাঝি লোভে লোভে নৌকো ঘাটে লাগালো।

রাঙামাটিতে সবে তখন লোক জন একটি-দুটি করে উঠতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তাদের কিছু জানাতে রমেশবাবুর সাহস হল না। কে জানে, তারাই বা লোক কেমন?

এদিকের লোকের বিশেষ খ্যাতি নেই।

তিনি ছুটলেন থানার দিকে।

চার-পাঁচ মাইল নিতান্ত কম রাস্তা নয়। এতখানি পথ গিয়ে দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে যখন রমেশবাবু নদীর ঘাটে ফিরলেন, তখন দশটা বেজে গেছে।

তাঁরা সদলবলে ঘাটে এসে দেখলেন, ঘাট শূন্য। সেখানে নৌকোর চিহ্ন-মাত্র নেই!

রমেশবাবু হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

সর্বনাশ হয়ে গেল।

তাঁর আসতে দেরি দেখে মাঝিরা বোধ হয় সন্দেহ করে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বাঁচানো গেল না।

দারোগা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিক পরে দেখা গেল, বাঘা তীর বেগে এইদিকে ছুটে আসছে। বাঘা ছুটে এসে রমেশবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

রমেশবাবু চিৎকার করে উঠলেন, বাঘা, তুই কোথা থেকে?

বাঘার মুখের দুই কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। তার সর্বাঙ্গ জলে ভিজে। বাঘা একবার প্রভুর গা শুঁকেই, যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে আবার ছুটলো।

একবার ছুটে আর পিছনে চেয়ে কাউকে আসতে না দেখে ফিরে আসে। আবার ছোটে।

দারোগার সন্দেহ হল।

তিনি সঙ্গের একজন সিপাহীকে বললেন, তুমি এঁকে নিয়ে এই খানে অপেক্ষা কর। আমি দেখি, কুকুর কি বলে।

বলে তিনি কয়েকজন সিপাহী সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে কুকুরের পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

অনেক দূরে গিয়ে তে মোহনার কাছে এসে পৌঁছুলেন। সেখানটায় একটা চর জেগেছে।

বাঘা কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে বিদ্যুৎ বেগে জলে দিলে ঝাঁপ। সাঁতরে উঠলো সেই চরে এবং নখ দিয়ে একটা জায়গা আঁচড়াতে লাগলো।

দারোগার কৌতূহল হল।

কিন্তু তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, নৌকো দূরে থাক, কোথাও একটা ডিঙ্গির চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তিনি সঙ্গের একজন কনস্টেবলকে পোশাক খুলে চরে যেতে হুকুম দিলেন। চরে পৌঁছে সেই জায়গাটা খানিকটা খুঁড়তেই লালপাড় শাড়ির খানিকটা দেখা গেল।

লোকটা চিৎকার করে উঠলো, লাশ!

বাঘা আবার সাঁতরে এপারে এল এবং দক্ষিন দিকে ছুটতে আরম্ভ

করলো। কোমরের রিভলভারটায় একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে, দারোগাও তার পিছু পিছু তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে একটা বাঁকের আড়ালে নৌকো সমেত সেই ডাকাত দলকে পাওয়া গেল। তারা বাক্স খুলে লুঠের মাল ভাগ করছিলো। বাঘা বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে এক জনের ঘাড় কামড়ে ধরলো।

দারোগা বহু কষ্টে সেই লোকটিকে বাঘার হাত থেকে ছাড়ালেন। পরে জানাগেল, সেই লোকটিই রমেশবাবুর স্ত্রীকে খুন করেছিল। তাই তার উপর বাঘার অত রাগ। দারোগা রিভলভার দেখিয়ে তখন সেই লোকটিকে বেঁধে ফেললেন। ইতিমধ্যে কনস্টেবলরাও এসে গেল। তখন সকলকে সেই নৌকায় চড়িয়ে তারা থানায় ফিরে এলো।

শুনে আশ্চর্য হবে, বিচারের সময় বহু লোকেরভিড়ের মধ্যে সেই লোকটিকে দাঁড়করিয়ে বাঘাকে যখন আসামী সনাক্ত করতে বলাহল, বাঘা আসল লোকগুলিকে জজের সামনে ঠিক সনাক্ত করেদিলে,—একবার নয়, তিনবার।

বিচারে সব ক' জনের শাস্তি হয়ে গেল।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী হাজারিবাগ অঞ্চলের বন প্রকৃতির অঞ্চলের আচ্ছাদনে জন্মগ্রহন করেন। আবাল্য প্রকৃতির সাথে নিবিড় সঙ্গম, লেখককে এক স্বাভাবিক শিল্পিমানস দান করে। তবে সরোজ বাবুর আদি নিবাস-মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঢ় মাটির দেশ—মালিহাটি। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে সরোজ কুমার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল একনাম। তাঁর লেখায় কাহিনীকারের কুশলতা ও শিল্পীর কারুকার্য-অনিবার্য ভাবে বর্ত্তমান। ভাষার প্রাঞ্জল্য ও সুখদায়িকা লেখকের নিপুন চরিত্র চিত্রনকে নিপুনতর করেছে। সরোজ রায়চৌধুরী মশাই গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ গুলোকে অসামান্য সুষমায় মণ্ডিত করে তার গল্পে ও উপন্যাসে-উপস্থাপিত করেছেন। লেখকের শতাব্দির অভিশাপ, পাগলাঘোড়া, কৃশানু ইত্যাদি গ্রন্থ সমাধিক পঠিত।

বিচিত্র রসের সন্ধান পিয়াসী লেখক কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্পও লিখেছেন। গ্রাম্য প্রকৃতি ও নদী মাতৃক গ্রাম দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রেক্ষাপটে লেখক উল্লিখিত 'বাঘা' গল্পে হত্যা মৃত্যু ও মানবিক নিষ্ঠুরতার ও পাশবিক বিশ্বস্ততার এক নিপুন লেখ চিত্র অঙ্কিত করেছেন।

পরাশর বর্মা ও ভাঙা রেডিও

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেন যে এমন ভুল করে ছিলাম।

এসে অবধি এই ক' দিন ধরেই আফসোস করছি।

এসেছি সেই শুক্রবার। আজ পরের শনিবার। এই আট দিনেই মন মেজাজ বিগরে গেছে। এখন যেন পালাতে পারলেও বাঁচি।

কিন্তু তার কি জো আছে?

পরাশরের খপ্পরে একবার পড়লে অনুনয় বিনয় চোখ রাঙানি—কিছুতেই কিছু ফল হবার নয়।

সেকি! এইতো সবে এল—এই তার বুলি। এমন মজার দিন কাটানো ছেড়ে কেউ যে চলে যেতে চাইতে পারে, এ যেন তার বিশ্বাসই হয় না। বলে বোম্বাই শহর কি ছু—দিনে দেখে সারা যায়।

বোম্বাই আমি ঢের দেখেছি। —একটু বিরক্তির সঙ্গেই আমি বলি হয়তো: তোমার সঙ্গেই তো এই সে—বছর বোম্বাই চষে বেড়াতে হয়েছে সেই সাংঘাতিক শিশির ব্যাপারে। বোম্বাই—এ আর আমার দেখবার আছে কি!

আছে, আছে। —পরাশর হেসে আশ্বাস দেয়, বোম্বাই নিত্যিনতুন। হররোজ এখানে নতুন খেল হচ্ছে। তা না হলে তোমায় ট্রাঙ্ককল করে আনাই! আর ক'টা দিন একটু মজা করো না, দুজনে একসঙ্গেই ফিরে যাব।

না—এবার শক্ত হয়ে বলি, তোমার সঙ্গে ফেরবার সৌভাগ্যে আর আমার দরকার নেই। তুমি নতুন যে সব ইয়ার বন্ধু জুটিয়েছ, তাদের নিয়ে আর তোমার ভাঙা রেডিওর গান শুনেই যতদিন পারো কাটাও, আমি আজই রওনা হচ্ছি।

মুখে শাসালেও সেদিনই রওনা হওয়া সম্ভব হয়নি। পরাশরের পেড়াপেড়িতে রবিবারটা থেকে যেতে হয়েছে। সে আশ্বাস দিয়েছে, সোমবারের পর আর আমায় কিছুতেই ধরে রাখবে না।

সোমবার পর্যন্ত কি সুখে যে সে থাকতে চাচ্ছে তা আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। ওর ভাঙা রেডিওটা অবশ্য সেদিন ফেরৎ আনবার কথা

মেরামতের দোকান থেকে। দিয়েছে আজ—মাত্র শনিবার দুপুরে। রবিবার ছুটির দিন বাদদিয়ে সোমবার সারানো অবস্থায় তা যে ফেরত পাওয়া অসম্ভব, তা তাকে বৃথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছি। রেডিও কি ক্যামেরার মতো যন্ত্রপাতি যে একবার মেরামতের জন্য গেলে তার তেরো মাসে বছর হয়ে দাঁড়ায়, সে অভিজ্ঞতা বোধ হয় পরাশরের নেই।

আর ওই অখদ্দে ভাঙা রেডিও কি একদিনে সারাবার।

এসে অবধি সবচেয়ে জ্বালাতন করে মেরেছে ওইটেই। মেরামতের জন্য না দিয়ে ওটাকে কোলাবা-র 'কজওয়ে' থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম।

বোম্বে পৌঁছোবার পর প্রথম হোটেলে ঢুকে পরাশরের আঠারো নম্বর ঘরের সামনের করিডরে গিয়ে দাঁড়ানোর পর থেকেই ওই রেডিওতে কান ঝালাপালা।

ওইটাই যে পরাশরের কামরা বিশ্বাস করতেই পারিনি।

সঙ্গে হোটেলের খানসামা এসেছিল, সে ঘরটা দেখিয়েই চলে গেছে।

ভুল করেছি কিনা বুঝতে না পেরে দোমনা হয়ে দরজায় মৃদু করাঘাত করেছি প্রথমে। তাতে কোন ফল হয় নি। না হবারই কথা। দরজা ভেদ করেও যে কর্কশ নিনাদ আসছে তা ছাপিয়ে কিছু শোনা যায়।

একটু জোরেই তাই বার কয়েক ঘা দিতে হয়েছে দরজায়।

দরজা খুলে স্বয়ং পরাশরই এসে দাঁড়িয়েছে সহাস্য বদনে।

এসোএসো। তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। ট্রেন তোমার লেট ছিল বোধ হয়?

তা—ছিল।—আমি ঠিক প্রসন্ন মুখে বলতে পারিনি। কিন্তু ট্রেনে থেকে নেমে রিটার্ন টিকিট কেটে ফিরে যাওয়াই বোধ হয় উচিৎ ছিল। ওটা কি যন্ত্রনার ব্যবস্থা করেছ?

পরাশরের পিছুপিছু তখন তার হোটেলের কামরার ভেতর গিয়ে ঢুকেছি। নেহাৎ অপ্রশস্ত নয়। দুজনের জন্য বরাদ্দ ঘর। আসবাব পত্রও চলনসই।

ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে পরাশর প্রথম যেন আমার অভিযোগের হেতুটা বুঝতেই পারেনি।

অবাক হয়ে বলছে, যন্ত্রনা কিসের?

কিসের যন্ত্রনা বুঝতে পারছ না।—সুটকেশ আর ফোলিও ব্যাগটা

একটা সোফার ওপর রেখে ঘরের কোণের রেডিওটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছি,—ওটা কি?

ওঃ ওই রেডিওটা?—পরাশর ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই বলেছে,—আওয়াজটা একটু কেমন বেসুরো।

একটু বেসুরো!—শুধু বিরক্তির দরুন নয়, বেয়াড়া রেডিওর থেকে থেকে সপ্তমে ওঠা বিদঘুটে আওয়াজটাও ছাপিয়ে যাবার জন্যে গলা চড়িয়ে বলেছি,—স্বয়ং বৃত্রাসুরও ও-আওয়াজ শুনলে লজ্জা পাবে। রেডিওটা দয়া করে থামাবে। চল্লিশ ঘণ্টা ট্রেনে কাটিয়ে এসে আর এ শাস্তিভোগ করতে পারব না।

বলছ যখন তখন বন্ধ করে দিচ্ছি।—পরাশর যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রেডিওটা তখনকার মত বন্ধ করে দিয়েছিল।

একটু শান্তি পেয়ে বলেছি,—এ রেডিওটি যোগার করলে কোথায়?

যোগাড় করব কোথায়? পরশু তো কিনলাম।—পরাশর একটু যেন ক্ষুন্ন হয়ে বলছে।

তুমি বোম্বাই—এ এসে রেডিও কিনলে?—আমি তাজ্জব,—আর এই রেডিও। আহা, রেডিওটা এমন কি খারাপ।—পরাশর নিজের সওদার হয়ে ওকালতি করেছে,—একটু মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। কিন্তু গানগুলো বুঝতে তো কষ্ট হয় না। বোম্বাই ফিল্মের গান শোনাবার জন্যেই তো ওটা কিনলাম।

বোম্বাই ফিল্মের গান শোনাবার জন্যে রেডিও কিনলে।—আমি তার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে বলেছি।—তুমি কি এখানকার ফিল্মের গান লিখবে নাকি?

না না, সে বড় শক্ত।—পরাশর যেন নিজের অক্ষমতায় দুঃখিত হয়েছে,—কিন্তু মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত সব আইডিয়া পাওয়া যায়।

এরপর আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরে নি।

শুধু রেডিও হলেও হয়তো রক্ষে ছিল।

পরাশর সুযোগ পেলেই যেমন সেটা চালিয়ে দেয়, আমিও ধারে কাছে থাকলে তেমনি বন্ধ করে দিই তৎক্ষণাৎ।

আমার অনুপস্থিতে একলা থাকলে পরাশর যে বেপরোয়া হয়ে প্রাণ ভরে সে-রেডিও চালায়, আসার দু-দিন বাদেই তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের ঠিক পাশের কামরায় সেদিন সকালে নতুন একটি প্রৌঢ়

দম্পতি ঢুকেছিলেন। দুপুরে আমি একটু নিজের কাজে বেরিয়েছিলাম। বিকেলে ফিরে এসে দেখি তাঁরা এ কামরা ছেড়ে দূরের একটি কামরায় চলে যাচ্ছেন।

ব্যাপারটায় তখন তেমন কিছু গুরুত্ব দিইনি।

কামরা বদলের রহস্যটার ইঙ্গিত পেলাম সন্ধ্যের পর। তখন পরাশরের ঘরে এ ক'দিন ধরে যা দেখেছি, সেই একই নিয়মিত তাসের আড্ডা বসেছে।

স্বয়ং ম্যানেজারই অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকে পরাশরকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি বললেন।

ম্যানেজার চলে যাবার পর পরাশর যে রকম মুখ করে তাসের আসরে ফিরে এল, তা কারুর দৃষ্টি এড়াবার নয়।

এ আসরে মধ্যমণি মনুভাই তাঁর সুবিশাল পা দুলিয়ে হেসে উঠে আধা হিন্দী আধা ইংরেজিতে বললেন, কি, ব্যাপার কি ভার্মাসাব। খেদি ম্যানেজার এসে কানে কানে কথা বলে যাচ্ছে। খুব বড় গোছের শিকার বোধ হয়।

উঁহু, শিকার হয়তো বড় গোছেরই ছিল। কিন্তু ফসকেছে।—পাকানো দড়ির মত চেহারা জাসুমল বললে কাঁসির মত ঘ্যান ঘেনে গলায়, ভার্মা-সাহেবের মুখের চেহারা দেখছ না।

পরাশরই এবার বিরক্তির সঙ্গে ঝাঁঝালো গলায় বললে, না, এ হোটেলে আর থাকব না।

সে কি। —আসরের সবচেয়ে গম্ভীর মানুষ ভাবনানী এবার তাসের টেবিল থেকে চোখ তুললেন সবিস্ময়ে, এ হোটেল ছাড়বেন কেন?

ছাড়ব না! —পরাশর গরম, —আমার এই রেডিও নিয়ে না কি নালিশ উঠছে। কারা না কি পাশের কামরা বদল করে চলে গেছে আমার রেডিওর জ্বালায়। নিজের ঘরে আমি রেডিও বাজাতে পারব না।

এবার সবাই হেসে উঠল।

মনুভাই বললেন, কিছু যদি মনে না করো তো বলি ভার্মাসাব। আপনার পাশের কামরায় আমিও পারত পক্ষে থাকতে রাজি নই। এ করিডরে আসতে যেতে দু' একবার যা কানে গেছে তাতেই অ্যাসপিরিন দরকার হয়েছে মাথা ধরা সারাতে।

আর একবার হাসির রোল ওঠবার পর ভাবনানি বললে, তা আপনার রেডিওটার কি গলদ হয়েছে দেখিয়ে নিলেই তো পারেন।

আচ্ছা তাই, দেখাবো। —পরাশর নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রস্তাবটা মেনে নিলেও কিন্তু শান্ত হল না। জোর দিয়ে বললে, তবু এ হোটেল ছাড়তেই হবে।

কেন? কেন? —এবার হাসির বদলে সকলের বিস্মিত প্রশ্ন।

কেন। —পরাশর পকেট থেকে একটা কাগজ টেবিলের ওপর বললে, দেখুন দিকি এটা কি?

জাস্‌মলই সেটা প্রথম তুলে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে বললে, আরে, এটা তো বিলেতের এক পাউণ্ডের নোট।

হ্যাঁ। —পরাশর স্বীকার করে আবার খাপ্পা হয়ে উঠল, ম্যানেজার বলে কিনা আমি এ—হপ্তার চার্জ চুকিয়ে দেবার সময় এই নোটটা দিয়েছি। পাঁচ টাকার বদলে এক পাউণ্ডের নোট দেব, আমি কি এমন আহাম্মক। এর ভিতর কোথাও একটা কারসাজি আছে।

পরস্পরের দিকে একটু চিন্তিত ভাবে চেয়ে জাভেরীই প্রথম জিজ্ঞাসা করলে, কি কারসাজি থাকতে পারে মনে করেন?

সেইটে ঠিক বুঝতে পারছি না। —পরাশর একটু বিব্রত ভাবে জানালে কিন্তু তা না থাকলে আমার ঘাড়েই এটা চাপাবার চেষ্টা কেন? ম্যানেজার বলছে যে ক্যাসিয়ার তখন ছিল না বলে হোটেল-ক্লার্ক আমার দেওয়া টাকাটা নিয়ে একটা খামে আলাদা করে রেখেছিল। সেইখানেই ওটা পাওয়া গেছে।

আশ্চর্য। —মনুভাই নোটটা জাস্‌মলের হাত থেকে নিয়ে একটু উল্টে-পাল্টে বললেন, আচ্ছা, আপনার কোন ভুল হয় নি তো? আপনার কাছে এ ধরনের নোট আছে?

আমার কাছে। —পরাশর যেন একটু থতমত খেয়ে বললে, আমার কাছে এ ধরনের নোট থাকবে কোথা থেকে? আর থাকলে এ নোট বেশি দামে বিক্রি না করে আমি পাঁচ টাকার নোটের বদলে দিই?

ঠিক। ঠিক। —মনুভাই হাসলেন, কিন্তু এ নিয়ে এত ঘাবড়াবার কি আছে। আপনি কিছু বিদেশী টাকার চোরাই কারবারও করেন না, আর ম্যানেজারও এই একটা নোটের জন্যে আপনার নামে পুলিশে খবর দিচ্ছে না। আসুন, আসুন, খেলতে বসুন। এ হোটেল ছেড়ে যাবেন কোথায়?

যাওয়াটা মনুভাই জাস্‌মল বা জাভেরীর পক্ষে অবশ্য বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত।

তাসখেলা আমি বুঝি না। পরাশরের কামরায় যে খেলা হয়, তা তো আরো জটিল। পরাশর যে এসব খেলায় অত পাকা, তা আমার জানা ছিল না। একটু-আধটু এক-আধ দিন হারলেও বেশির ভাগ সবাইকে সে বেশ দোহনই করে নেয় রোজ।

তার সঙ্গীদের তাতে অবশ্য ভ্রুক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। তিন জনেই বেশ শাসালো। হারের শোধ নেবার জন্যে জেদটাই তাদের কাছে বড়

পরাশরকে হোটেল ছাড়তে দিতে না চাওয়াতে এটাও একটা কারন।

পরাশরের ভাঙা রেডিওটা তো বটেই, এবার বোম্বে অসহ্য লাগার আর একটা কারণ নিত্য সকাল-বিকেল এই তাসের আড্ডা।

মানুষ হিসাবে পরাশরের সঙ্গীরা যে খারাপ তা বলব না। সবাই বেশ মিশুক অমায়িক ভদ্র। কিন্তু যত সজ্জনই হোক, দিনের পর দিন তাদের তাসের আড্ডায় সাক্ষী গোপাল হয়ে বসে থাকতে কারুর ভালো লাগে।

তা-ও তাস যদি আমার দু-চক্ষের বিষ না হত তো কোন রকমে সইতে পারতাম।

সব জেনে-শুনে আমায় এ শাস্তি দিতে বারো শ' মাইল ছুটিয়ে আনা কেন? তাও আবার ট্রাঙ্ককলে।

ট্রাঙ্ককলের কথাটা তুলতেই পরাশরকে কেমন একটু অবশ্য অপ্রস্তুত মনে হয়েছে। তাসের আড্ডায় এক বেলা বেশ কিছু জিতেই হঠাৎ খেয়ালের মাথায় সে যে এটা করে ফেলেছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

দু-চারবার এ খোঁচাটা দেবার পর তার ঈষৎ লজ্জিত অসহায় অবস্থা দেখে মায়া করেই আর এ-প্রশ্ন তুলি নি। সোমবারে যাওয়ার সঙ্কল্পটা কিন্তু জোরের সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছি।

সোমবারের আগে রবিবারটাও অবশ্য এক দিক দিয়ে একটু আরামেই কাটল।

পরাশরের সে-রেডিওটার উৎপাতে অতিষ্ঠ হতে হয়নি। শনিবার দুপুরে বেরিয়ে পরাশর নিজেই সেটা সারাবার জন্যে কোথায় দিয়ে এসেছে।

তার ধারণা সোমবারই সে সারানো অবস্থায় রেডিওটা ফেরৎ পাবে। দু-চারবার তার এ হাস্যকর বিশ্বাস ভাঙতে গিয়ে বিফল হয়ে চুপ করে গেছি। সে তার দিবাস্বপ্ন নিয়েই থাক, আমাদের ফিরে যাওয়াটা বন্ধ না হলেই হল।

তাসের আড্ডায় এ-নেশা ছেড়ে সোমবার আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সে যেতে পারবে কিনা, এ বিষয়ে একটু সন্দেহ যে মনে ছিল না এমন নয়।

সোমবার সকালে ভাবগতিক দেখে কিন্তু আশা হল তার কথা সে রাখবে। সকালেই তার জানা একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করে আমাদের দুজনের বার্থের ব্যবস্থা করে ফেলতে শুনলাম। তারপর আমায় নিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু কেনা কাটা করতে ও বেরুল।

কেনা কাটা সামান্যই। কিন্তু তা সেরে যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা।

আর দু-ঘণ্টা বাদেই ট্রেন। ধীরে-সুস্থে এবার তৈরি হওয়া যেতে পারে। হোটেল-বয় ট্রেতে করে চা দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে সেই কথাই ভাবছি এমন সময় পরাশর একেবারে যেন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এইযাঃ।

হল কি ? পরাশরের মুখের চেহারা দেখে আমি রীতিমত উদ্বিগ্ন।

আমার রেডিও।—পরাশরের প্রায় আর্তনাদ, সেটা দোকান থেকে ফেরৎ আনতেই ভুলে গিয়েছি।

ভুলে আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটা এমন বুক চাপড়ে আর্তনাদ করবার মত ব্যাপার বলে ভাবতে পারলাম না। বললাম, ভুলে যখন গেছো, তখন তো আর উপায় নেই।

উপায় নেই মানে ? —পরাশর অধৈর্যের সঙ্গে বললে, দোকান তো এমন বন্ধ হয় নি ?

দোকান বন্ধ হয়নি। কিন্তু সেটা এখন আনতে গেলে ট্রেন আর ধরা যাবে। —বিরক্তির সঙ্গে বললাম।

খুব যাবে। —পরাশর অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা ফেলে উঠে দাঁড়াল, ট্যাক্সিতে যাব আসব। এসোনা।

যাচ্ছি। —রাগ বিরক্তির হতাশা সব আমার গলায় তখন মেশানো, কিন্তু দোকানে যদি দেরি হয় তা হলে ওই ট্যাক্সিতেই আমি একলা চলে যাব বলে রাখছি। আমার সুটকেশ আমি নিজেই নিচ্ছি।

আহা, শুধু তোমারটা কেন। আমার লাগেজও নিয়ে যাওনা। তাতে তো আপত্তি করছি না। কিন্তু ও রেডিও তো আর ফেলে যাওয়া যায় না। —পরাশর যেন নিরুপায়।

ফেলে যাওয়া যায় না। —এবার ঝঙ্কার দিয়ে, কিন্তু রেডিও যদি মেরামত

না হয়ে থাকে, তাই ফেরৎ নেবে তো। দোকানে তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করবে না।

সময় নষ্ট আর কি! —পরাশর আশ্বাস দিলে।

সেই রেডিও নিয়ে অমন ঝামেলা তারপর হবে ভাবতেও পারি নি।

ট্যাক্সিতে বিকেলের ভিড়ের রাস্তায় পদে পদে বাধা পেয়ে যেতে যেতে তো মনে মনে সারাক্ষণ ভাঙা রেডিও আর তার মালিকেরও মুণ্ডপাত করেছি

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বোম্বাই-এর অত্যন্ত ঘিঞ্জি সাবেকী ব্যবসার কেন্দ্রে একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে যথাস্থানে পৌঁছবার পর পরাশরের প্রস্তাব শুনে একেবারে জ্বলে উঠলাম।

রেগে উঠে বললাম, আনবে তো একটা রেডিও ফেরৎ! তাতে আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকারটা কি? না, মালপত্র ট্যাক্সিতে ফেলে আমি যেতে পারব না। আমি ট্যাক্সিতেই থাকব আর তোমার অকারণে দেরি হলে এই ট্যাক্সি নিয়েই সোজা স্টেশনে চলে যাব বলে রাখছি।

আহা, তাতে কি আমি আপত্তি করছি?—পরাশর নাছোড়বান্দা, কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে, কারণে না অকারণে দেরি সেটাতো ঠিকমত বুঝতে পারবে। ওমাল পত্রের জন্যে ভাবনা নেই। ও ট্যাক্সিওয়ালা আমার চেনা।

তোমার চেনা। অবাক হয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাতে সে হেসে বললে, হাঁ সাব। ঘাবড়ানেকা কুছনেই। ম্যায় হিঁয়ে খাড়াই রহেঙ্গে।

অগত্যা পরাশরের সঙ্গে দোকানের ভেতরেই গেলাম।

দোকান দেখতে এমন কিছু সাজানো গোছানো চমকদার নয়। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে সেটা যে একটা বড় আড়তের অফিস তা বোঝা যায়।

ভেতরে তখন একটি কর্মচারী ছাড়া আর কেউ নেই।

পরাশর গিয়ে তার রসিদটা দেখাতে সে একটু অবাক হয়ে বললে, এ রেডিও তো আজ ফেরৎ পাবেন না।

কেন? মেরামত হয়নি এখনো। —পরাশর বেশ ক্ষুন্ন।

আপনি ভুল করছেন। —কর্মচারী রসিদটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, পরের সোমবার এ রেডিও আপনাকে ফেরত দেবার কথা। তারিখটাই পড়ে দেখুন না ভালো করে। ও তারিখে মেরামত হওয়া অবস্থায় না পেলে বলবেন।

রসিদটা ভালো করে এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলাম। কর্মচারীর কথাই ঠিক।

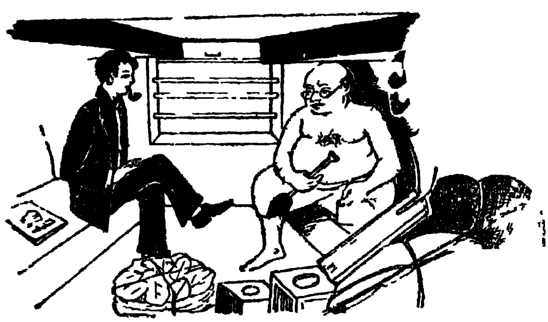
পরাশর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, মিছে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা কোরো না। রেডিওটা যেমন আছে তাই ফেরত নাও।

পরাশর যেন একটু দুঃখিতভাবে সেই কথা জানাবার পর কর্মচারী দূরের একটি শেলফ থেকে রেডিওটা এনে কাউন্টারের ওপর রাখতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল,—এ কে মিস্টার ভার্মা না?

অবাক হয়ে চেয়ে দেখি পেছন দিকের এক পাশের একটি দরজা থেকে স্বয়ং মনুভাই-ই বেরিয়ে আসছেন।

আরে, এটা আপনার দোকান নাকি। —পরাশরকেও রীতিমত বিস্মিত মনে হল।

হাসি মুখে সামনে এসে মনুভাই বললেন, হ্যাঁ আর আপনি বেছে আমার দোকানেই ও-রেডিও মেরামত করতে দিয়ে গেছেন। কি আশ্চর্য বলুন তো।



তাই তো দেখছি। —পরাশর হাসি মুখে বললে, কিন্তু মেরামত করানো আর হল না মনু ভাই জী। এখুনি গিয়ে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। রেডিওটা নিয়ে যাচ্ছি।

তা কি হয় ভার্মা সাহেব! মুখের হাসি সত্ত্বেও মনুভাই কেমন একটু অন্য রকম গলায় বললে, আমার দোকানে সারাতে দিয়েছেন, ও রেডিও এমনি আপনাকে ফেরত দিতে পারি? আসুন, আসুন আমার ঘরে। এত কষ্ট করে খুঁজে-পেতে এসেছেন, একটু বসে যান।

কিন্তু ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী। —এবার আমি উদ্বিগ্নভাবে না বলে পারলাম না।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী কি বলছেন। ও ট্রেন এখন ছাড়ে কিনা তাই দেখুন। আসুন আমার ঘরে।

এ সময়ে মনুভাই-এর এ রকম ঠাট্টার সুরটা আমার ভালো লাগল না। বললাম, তাহলে তুমি যাও পরাশর। আমি স্টেশনে চললাম।

পরাশর কিন্তু তখন বজ্রমুষ্টিতে আমার একটা হাত চেপে ধরেছে। মুখে কিন্তু হেসে বললে, আরে, ট্রেনের জন্য তোমার ভাবনা নেই। এ ট্রেন ফেল করলে নাইট প্লেনে তোমায় পাঠিয়ে দেব কথা দিচ্ছি। মনুভাইজী এত করে ডাকছেন, ওঁর ঘরে একটু না বসে পারি।

যে ভাবে পরাশর হাতটা চেপে ধরে আছে, প্রতিবাদ করতে হলে তখন এই দোকানের মধ্যেই তার সঙ্গে ধস্তাধ্বস্তি করতে হয়। রাগে মুখখানা কালো করেই তার সঙ্গে মনুভাই-এর ঘরে গিয়ে এবার বসলাম।

দোকানের পাশে ছোট একটা কুঠুরি। কিন্তু সামনের দোকানের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ছোট ঘরটির সাজসজ্জা আসবাবে সৌখীনতার চূড়ান্ত পরিচয়।

মেহগনী কাঠের দামী টেবিলের একপাশে মখমল-মোড়া চেয়ারে আমাদের বসিয়ে মনুভাই অন্য দিকের উচুদরের কাঠের কাজ করা আসনে নিজে গিয়ে বসে প্রথমেই যা বললেন তাতে আমি অবাক।

দরজাটা বন্ধ করে দাও রাজন।

রাজন নামে কর্মচারিটির হুকুম তামিল করতে দেরি হলনা। বিমূঢ় ভাবে পরাশরের দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখে কৌতুকের হাসি।

সেই রকম হাসি মুখেই পরাশর বললে, ভালোই করেছেন মনুভাইজী। আমাদের মত বন্ধুদের আলাপ একটু নিভৃতে হওয়াই দরকার। কিন্তু আলাপটা কি নিয়ে শুরু করা যায় বলুনতো।

ধরুন, আপনার সেই এক পাউণ্ডের নোটটা নিয়ে,—মনুভাইয়ের মুখের চেহারা আর গলা দুই-ই এখন যেন আলাদা—যেটা ভুলে হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে ছিলেন।

ওঃ সেই নোটটা।—পরাশর হেসে বললে, আপনি তাহলে ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন।—জানতাম আপনি নেবেন।

জানতেন।—মনুভাইয়ের মুখ এবার কঠিন,—জেনেশুনেই মিথ্যে কথাটা আমাদের বলেছিলেন।

তাইতো বলেছিলাম।—পরাশর অম্লান বদনে জানাল, সত্যি সত্যি

ও নোট তো ম্যানেজারকে আমি দিই নি।

এ রকম মিথ্যে বলার উদ্দেশ্য ?—মনুভাই-এরগলা তীক্ষ্ণ।

উদ্দেশ্য তো জলের মত পরিস্কার। প্রথমে ভাবী মক্কেল হিসেবে আপনার একটু কৌতূহল হবে, তারপর খোঁজ নিয়ে মিথ্যেটা জেনে সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। তারপব আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু খোঁজখবর যখন পাবেন, তার আগেই আমি কাজ হাসিল করে ফেলেছি। সবেতো আজ সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে আপনার টনক নড়েছে আর আমি তো দু-মাস আগে থেকে পাঁয়তাড়া কষছি। আজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা না বললে অন্য ভাবেও আপনাকে উদ্বিগ্ন করবার ব্যবস্থা করতাম। এমন কি শেষ মুহূর্তে আপনার এই টনক নড়াবার ব্যবস্থাও না করে ছাড়তাম না।

বটে।—মনুভাই-এর-গলাটা বজ্রগম্ভীর, কি পাঁয়তাড়া শুনতে পাই?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। একতাসের আড্ডার বন্ধুদের মধ্যে গোপনতা থাকা উচিত নয়।—পরাশর যেন বন্ধু বৎসলতায় উচ্ছ্বসিত: প্রথম এখানে এসে আপনার গতিবিধি স্বভাব—চরিত্র সব কিছুর তালিকা করে ফেলেছি। তা থেকে জেনেছি, নানা সৎ-অসৎ উপায়ে টাকার কুমীর হয়ে উঠলেও প্রথম জীবনের জুয়ার নেশা আপনার কাটেনি। সেই নেশা এখন শুধু অবশ্য তাস খেলা দিয়েই মেটান। আপনি যাদের সঙ্গে সাধারণতঃ মোটা টাকার খেলা খেলেন, তাদের সঙ্গে ভাব করেছি। এ বিষয়ে ভাবনানির সাহায্য অবশ্য সবচেয়ে দামী। আজ এক বছর ধরে আপনাদের মতই সুড়ঙ্গ ব্যবসায় ওস্তাদ বলে নিজের পরিচয় কায়েমী করে সে কেন্দ্রীয় পুলিশের হয়ে আপনার ওপর নজর রাখছে। শুধু হাতে হাতে প্রমাণের অভাবেই আপনার হাতে হাত কড়াটা পরাতে পারেনি। সেই প্রমাণ অকাট্যভাবে পাবার জন্যে ভাবনানির সাহায্যে আমার হোটেলের ঘরে জমাট তাসের আড্ডা বসিয়েছি। বন্ধু বান্ধবের কথায় আর ভাবনানির অনুমোদনে আপনি সেখানে এসে জমে গেছেন। জমে গেছেন প্রায় নিত্য হেরে যাওয়ার দরুন। আপনার জেদ বাড়াতে আর আমার ভূমিকাটা বিশ্বাসযোগ্য করাবার জন্যে আমি নিজে বেশীর ভাগ খেলায় জেতবার ব্যবস্থা করেছি। আমি জেতার বদলে বেশি হারলে হয়তো আপনার সন্দেহ হতে পারত, জেদও এত বাড়ত না।

কিন্তু এত পাঁয়তাড়া যার জন্যে কষা আমায় হাতকড়া পরাবার মত সেই

অকাট্য প্রমাণ ওই তাস খেলাতেই পেলেন নাকি ? —মনুভাইএর হাসিটা ভোজালির মত বাঁকা আর তেমনি ধারালো তার গলার বিদ্রূপ।

না, না, তা কেন ? —পরাশর যেন সরলভাবে বোঝাতে ব্যাকুল হয়ে উঠল,—ও তাসের আসর তো শুধু ওই ভাঙা রেডিওটা আপনাকে বার বার দেখিয়ে শুনিয়ে বিশ্বাস করাবার জন্যে। আসল প্রমাণ ওই ভাঙা রেডিওর মধ্যে।

ভাঙা রেডিওর মধ্যে। —মনুভাই-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়েও বেরিয়ে গেল। মনুভাই-এর গলার সুরটা অবশ্য আলাদা।

হ্যাঁ, ওই রেডিওটা সত্যিই বিকল বলে আপনাকে বুঝিয়ে ওটা মেরামতের জন্যে শনিবার আপনার এ দোকানে দিয়ে গেছি। শনিবারের পর গেছে ছুটির দিন রবিবার, আর আজ সোমবার। ওই রবিবারেই যা প্রমাণ দরকার সব সংগ্রহ হয়ে গেছে ওই রেডিওর মারফৎ।

কি রকম ? —মনুভাই-এর গলাটা এবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

আপনাদের এ ঘরে রবিবারে যে যে এসেছে, আর যে যা বলেছে সব ওই জাল রেডিওতে তোলা হয়ে গেছে বলে। আমার ভাঙা রেডিওটা তো নয়, তারই বাঁ-ধারের খোলসের ভেতরে একটা ইনফ্রা রেড আলোর ক্যামেরা আর অত্যন্ত শক্তিমান টেপ রেকর্ডার বসিয়ে সারাবার নামে এখানে রেখে গেছি। রবিবার তো নয়ই, দুচার দিনের মধ্যে তাতে কেউ হাত দেবেনা আমি জানতাম। আজ আপনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বিকেলে তাই ওটাও নিতে এসেছি।

আমায় সন্দিগ্ধ করতেই চেয়েছিলেন এ-কথা তো দু-বার বললেন। তাতে আপনার সুবিধে ? —মনুভাই—এর গলায় অবজ্ঞা না আক্রোশ কোনটা প্রধান বলা কঠিন।

সুবিধে এই যে রেডিওটা ফেরৎ নিতে আসার সময় আপনি এই রকম উপস্থিত থেকে বাধা দিতে পারেন। তাতে অনেক হ্যাঙ্গামা বেঁচে যায়।

আপনার হ্যাঙ্গামা বাঁচাতে পেরে আমি বাধিত। —মনুভাই এবার কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—কিন্তু ও রেডিওর ভেতরকার ক্যামেরা আর টেপ-রেকর্ডার কি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে মনে করেন ?

সেটাও আমার মুখ দিয়ে শুনতে চান ? —পরাশর হেসে উঠল, দেখুন, আজ বহুদিন ধরে এই বম্বে শহর থেকে লক্ষ লক্ষেরও বেশী বিদেশী মুদ্রার গোপন লেন—দেন অনবরত চলেছে। পুলিশ দু-একজনকে ধর-পাকর

করলেও আসল চাঁইদের ধরবারমত সাক্ষাৎ প্রমাণ না পেয়ে ঠুঁটো হয়ে আছে। সত্যিকার লেন-দেন কোন নির্দিষ্ট জায়গায় হয়না, কিন্তু কোথায় তাহার তা ঠিক করবার একটা গোপন আড্ডা এই আপনার দোকানটি। রবিবার কোন একটা সময়ে যখন যে মক্কেল আসে, তার সঙ্গে আপনি দেখা করেন। পুলিশ সে সময়ে হানা দিয়েও কিছু করতে পারবেনা। কারণ তারা এসে দেখবে দুজন ভদ্রলোক নিতান্ত সাধারণ ঘরোয়া আলাপ করছেন। সেইজন্যে আপনারা যখন নিশ্চিত মনে গোপন আলাপ করেন, তখনকার কথাবার্তা আর ছবি তোলার দরকার ছিল। ওই ভাঙা রেডিও তাই করেছে।

ভালো। ভালো! —নিজের দিকের ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বার করে আমাদের দিকে উঁচিয়ে এতোক্ষণে মনুভাই যেন নেবড়ের হাসি হাসলেন। —কিন্তু আমার এ গোপন কারবারের প্রমাণ ও রেডিও এখন গলবস্ত্র হয়ে আপনার হাতে তুলে দেব বলে আপনি আশা করেন?

তুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? অনর্থক ঝামেলা আর তাহলে হয়না। —পরাশরের মুখে যেন মাখন মাখানো,—আর ওটা যদি ভেঙে নষ্ট করে ফেলেন, তাহলেও এমন কিছু ক্ষতি নেই। ও সম্ভাবনার কথা ভেবেই আমার এই বন্ধুটিকে সাক্ষী হিসেবে ধরে রেখেছি।

কাল কি পরশু কিংবা তারও পরে আপনার আর আপনার এই সাক্ষীর লাশ হয়তো বান্দ্রা কি আরো সুদূর সমুদ্রের পাথুরে চড়ায় এসে লাগতে পারে, সে কথা কি ভেবেছেন? —মনুভাই—এর গলাও এবার মিছরী।

না, তা ভাবি নি। —পরাশর যেন লজ্জিত ভাবে স্বীকার করলে, কারণ আমাদের মারলেও আপনার এখন পরিত্রান নেই। দরজাটা বন্ধ না থাকলে দেখতে পেতেন পুলিশ এসে সমস্ত দোকান আর তার চারধার পাহারা দিচ্ছে।

এতকথা শোনার পরও সত্যিই সেই মুহূর্তে সজোরে দরজা ঠেলে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকবে ভাবতে পারিনি।

মনুভাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিনা বঞ্ঝাটেই ধরা দিলেন।

খানিকক্ষণের জন্যে কেমন মুহ্যমান হয়েছিলেন। মনুভাইকে পু ভ্যানে নিয়ে যাবার পর ট্যাক্সিতে উঠে হঠাৎ চমকে গিয়ে হাত ঘড়ির-দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম, একি, এখন যে আটটা বাজে।

তাতো বাজবেই। —নির্বিকার ভাবে বললে পরাশর, ট্রেন অনেকক্ষন ছেড়ে গেছে। তবে তোমার ভাবনা নেই। ট্রেনের রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে নাইট—প্লেনের তুটো সীটের ব্যবস্থা করে রেখেছি। এখনতো রেডিও টাকে কাকে দান করে যাব তাই ভাবছি।

ভাঙা রেডিওটা সে যে ইতিমধ্যে দোকান থেকে এনে মোটরে তুলেছে তা খেয়াল করিনি।

অবাক হয়ে বললাম, সেকি। দান করবে কি। ওর মধ্যে অত বড় প্রমাণ। পুলিশে জমা দিতে হবেনা?

জমা দেব। —পরাশর হাসল, এই ভাঙা রেডিও।

ভাঙা রেডিও মানে? ওর ভেতর কার ইনফ্রারেড আলোর ক্যামেরা, টেপ—রেকর্ডার।

একটা রেডিওর ভেতর অতকাণ্ড সম্ভব বলে তো জানিনা—পরাশর হাসল, অন্তত এদেশে ও-রকম যন্ত্র এখনো কেউ দেখেনি। মনুভাইকে ভয় পাইয়ে নিজমুর্তি ধরাবার জন্যেই ওই ভাঁওতা দিয়ে ছিলাম। ওই ভাঁওতার আসল যা কাজ তা হয়ে গেছে। অকাট্য প্রমাণ আছে বিশ্বাস করে মনুভাই নিজেই এখন সব কবুল করবে।

আচ্ছা,—একটু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যিই মনুভাই—এর কথার সাক্ষী হবার জন্যেই কি আমাকে কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল করে আনিয়েছিলে?

না,না, তা কেন,– পরাশর হেসে বললে, তোমায় আনিয়েছি শুধু ভাঙা রেডিওতে জ্বালাতন হবার জন্যে। নিজের লোকও তিতিবিরক্ত নাহলে ওরা বিশ্বাস করবে কেন?

শুধু তিতিবিরক্ত হবার জন্যে? —মুখ চোখ লাল করে আমি পরাশরের দিকে তাকালাম।

পরাশরের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। তাচ্ছিল্যভাবে বললে, ভালো মানুষ গোছের কাকেও-যন্ত্রনা দেওয়া যায় ভাবতে গিয়ে তোমার নামটাই মনে পড়ল।

আমি গুম হয়ে গেলাম।

———

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি, প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পকার ও ঔপন্যাসিক তবে এক ধরনের পাঠকের নিকট প্রেমেন্দ্র মিত্রের সব থেকে বড় পরিচয় তিনি রহস্য ও গোয়েন্দা গল্পের লেখক। বিদেশী ধাঁচে গোয়েন্দাধর্মী গল্প ও উপন্যাস লেখার যে ধারা দীনেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে আরম্ভ হয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে পুষ্ট হয়েছে ; প্রেমেন্দ্র মিত্র তাকে সযত্নে লালিত ও পালিত করেছেন। তাঁর ঘনাদা ও পরাশর গোয়েন্দা গল্প হিসাবে অনবদ্য। লেখকের নূপুর ও পরাশর বর্মা ও ভাঙা রেডিও রহস্য ও রোমাঞ্চ স্থষ্টিতে অনন্যতার দাবী রাখে। কল্লোলকালের সাহিত্যিকদের পুরোধা হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্র আজ হতে পাঁচ দশক পূর্ব হতেই বাঙ্গালী পাঠকদের এক অতি প্রিয় নাম, আপনজন।

অস্থির পৃথিবীর দুরন্ত তিরিশের দশকের লেখক হওয়া সত্বেও কল্লোল আশ্রয়ী প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম জীবনে সাহিত্য করেন সাহিত্যের জন্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের জটিল আবর্ত্ত হতেও কল্লোল কালের সাহিত্যিকগণ দূরে থাকেন। তবে পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের অসাধারণ সব সমস্যা আর সঙ্কট তাঁকে স্পর্শ করে। তাই কুলি, মজুর আর অন্ত্যজদের ব্যথা বেদনা ভরা তাঁর লেখাগুলি আমাদের সাহিত্যে এক নব চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত করে।

কল্কে কাশির কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রফুল্ল গোড়া থেকেই বিষণ্ণ মেরে আছে। হ্যাঁ, ভারিতো কাজ! তার জন্যে আবার কল্কে-কাশিকে তার ল্যাজে বেঁধে দেওয়া। হোন না গে তিনি একজন নামজাদা ডিটেকটিভ (প্রফুল্ল শুনেছিল কোরিয়া অঞ্চলে কল্কে-কাশির মতো অতবড় গোয়েন্দা আর নেই নাকি!)-তবু এই সামান্য একটা মশা-মারার ব্যাপারে অত ভারী কামান কাঁধে বয়ে আনতে প্রফুল্লর আত্মসম্মানে ঘা লাগে বইকি। সত্যি, বলতে কামাস্কাটকা থেকে টাটকা উনি না এলেও কামটা কিছু আটকাতো না।

বোম্বের একটা বিখ্যাত রেস্তোরাঁর এক কোনের টেবিলে কল্কে-কাশির মুখোমুখি বসে গুম হয়ে এই সব কথাই সে ভাবছিল। সামনে সাজানো চপ-কাটলেট ডেভিল-ডিম-কেক-পুডিং এর সমারোহ সত্ত্বেও তার জিভ সরছিল না। বাস্তবিক, এত বড়ো অপমান হজম করবার পর খেতে কারু রুচি থাকে?

কিন্তু মিঃ কল্কে-কাশি বেপরোয়া। ডিশের পর ডিশ তিনি সাবড়ে চলেছেন—কাটা-চামচের তাঁর কামাই নেই। এক ফাঁকে সামনের ভদ্রলোকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। একী! কল্কে-কাশি একটু অবাকই হন। একজন খুনে একটার পর একটা দশটা খুন করেছে; নিজের চোখেই এরকম দৃশ্য তাঁর জীবনে একাধিকবার তিনি দেখেছেন কিন্তু বিস্মিত হতে পারেন নি। তাঁর এক আসামী তাঁর ট্রেন থেকে আরেক ট্রেনে—ছুটোই বেশ চালু—লাফিয়ে পালিয়েছে চোখের ওপর দেখেও তিনি চমকান নি। কিন্তু এক ভদ্রলোক দশ-দশটা প্লেটের সামনে একেবারে নির্বিকার! একদম জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন, একটাকেও কাবু করতে পারছেন না! তাঁর সুদীর্ঘ জীবনস্মৃতির মধ্যে এবম্বিধ কাণ্ড তাঁর স্মরণে পড়ে না।

বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। কল্কে-কাশির বিরাট বপু-পরিধির তুমুল আন্দোলন (অবশ্য খাবার সময়েই সবচেয়ে সেটা লক্ষণীয় হয়) অকস্মাৎ থেমে যায়; মাছের চোখের মত ড্যাবডেবে চোখ ঈষৎ প্রসারিত হয়।

"প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্লতর হবার পক্ষে কী বাধা হচ্ছে, জানতে পারি কি?" তিনি প্রশ্ন করেন।

প্রশ্নটা করেন বাংলাতেই। সোজা পরিষ্কার বাংলায়। কামাস্কাটকার লোক হলে কী হবে, বাংলা, হিন্দি, (এবং কোন কোন জানোয়ারের ভাষাও) ভালোভাবেই তাঁর আয়ত্ত. তবে কামাস্কাটকার ভাষায় তাঁর দখল আছে কি না বলা যায় না। এ বিষয়ে প্রফুল্লর সন্দেহ থাকলেও পরীক্ষক হবার সাহস তার হয় না। কেন না সে নিজেও কামাস্কাশিয়ানে অজ্ঞ, দারুণ নিরক্ষর। কোরীয়ার লোকরা কিং করিয়া যে এত পারদর্শী হয় কে জানে!

প্রফুল্ল আরো বেশি গম্ভীর হয়ে যায়; মাথা চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয়, "ভাবনায় মশাই, ভাবনায়। কী রকম গুরুদায়িত্ব মাথার ওপরে, বুঝতেই তো পারছেন।"

"বুঝতে পারছি বৈকি", কল্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, "মিঃ ব্যানার্জির কবে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছবার কথা, অথচ তিনি কি এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিলেতে আটকে গেছেন। তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর সই করা নমিনেশন পেপার এয়ার মেল এ কাল বিকেলে বোম্বে পৌঁচেছে; তাঁর এ্যাটর্নি গলস্টোন কোম্পানীর আপিসের জিম্মায় রয়েছে। সেই নমিনেশন পেপার আজই সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ছুটতে হবে আমাদের। তবেই আঠারো তারিখের আগে সেই নমিনেশন পেপার ফাইল হতে পারবে। আঠারোই হচ্ছে ফাইলিং-এর শেষ দিন। তা না হলে মিঃ ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হবে না এযাত্রা!"

"বিলেতে মিঃ ব্যানার্জির আকস্মিক দুর্ঘটনার মূলে কি কোনো রহস্যজনক কারণ আছে আপনি মনে করেন?" প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করে।

কল্কে-কাশি এর জবাব দেন না। "এই নমিনেশন পেপার ডাকে পাঠানো নিরাপদ নয়। কোন কারণে একদিন কিম্বা কয়েক ঘণ্টা লেট হলেই সমস্ত পণ্ড—তার চেয়েও বড় আশঙ্কা হচ্ছে নমিনেশন পেপার মারা যাবার।"

"মারা যাবার?" প্রফুল্লের চোখ ছানাবড়া হয়, "কেন, নমিনেশন পেপার মেরে কার কী লাভ? ওটা কি কোনো মার্তব্য বস্তু?"

"হ্যাঁ, ডাকে পাঠালে, এমন কি রেজিষ্টি করে ইনসিওর করে পাঠালেও যথাস্থানে যথাসময়ে যথাযথ জিনিসটা পৌঁছবে কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কার কী লাভ আপনি জিজ্ঞাসা করছেন? বাংলা দেশে দুটি বড়ো দল আছে তা আপনি জানেন?"

"উঁহু," প্রফুল্ল বলে, "জানি না তো! না, দলাদলির কোনো খবর আমি রাখি না।"

"এই দুটি দলই কাউন্সিলে ঢুকতে চায়। দু-দলে ভীষণ রেষারেষি। কাউন্সিলে যে-দল ভারী হতে পারবে তাদেরই সারা বাংলায় আধিপত্য হবে কিনা। একটি দলের নাম হচ্ছে ক্লু-ক্লুকস-ফ্যান, যারা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খেলে আর ফ্যানের তলায় হাওয়া খায়, তারা মিলেই এই দল গড়েছে, আমেরিকার বিখ্যাত ক্লু-ক্লুকস-ক্ল্যানের সঙ্গে এদের কোনো সম্বন্ধ নেই, এক মাত্র দুই নামের এই ধ্বনি মাহাত্ম্যের গোঁজামিল ছাড়া।"

"বটে!" প্রফুল্লয় নিশ্বাস পড়ে কি পড়ে না! "আরেকটা দল কারা?"

"মিঃ ব্যানার্জী হচ্ছেন এই ক্লু ক্লুকস-ফ্যানএর পাণ্ডা। অন্য দলের নাম হচ্ছে বাই হুক অর ক্রুক। এই বাই হুক অর ক্রক পার্টির নেতা হচ্ছেন মিঃ সরকার। যেমন করেই হোক নিজেদের মতলব হাসিল করতে এঁরা সিদ্ধ হস্ত।"

"আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সরকারী চালে মিঃ ব্যানার্জি বিলেতে আটকা পড়েছেন?"

"আপাতত আমি কোনের ঐ লোকটার দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি।" বলে কঙ্কে কাশি চোখ টিপে ইসারা করেন।

এতক্ষণে কঙ্কে-কাশির ওপরে প্রফুল্লর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিল। সত্যি, অনেক খবর রাখেন ভদ্রলোক। এইজন্যে অপর দিক থেকে সহসা 'তুমি' সম্বোধনেও সে অপ্রসন্ন হতে পারে না, কঙ্কে-কাশির ইঙ্গিতের অনুসরণ করে সে।

"ঐ যে কাঠখোট্টা-গোছের চেহারা, চুল ক্রপ করা, চোখে কুটিল চাহনি ঐ কোনের ছোট্ট টেবিলে বসে অমলেটের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে—ওকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝতে পারবে। এ রকম ফ্যাশনেবল রেস্তরাঁর গতিবিধি ওর স্বভাবসিদ্ধ নয়। কাঁটা-চামচের কসরতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। খাদ্যের সঙ্গে কাটাকাটি নয়, হাতাহাতিতেই ও পরিপাক। উনি এখানে এসেছেন তোমার অনুসরণ করে।" কঙ্কেকাশি জানান।

"আমার?" প্রফুল্লর বিশ্বাস হয় না, "তার মানে?"

"একটু কায়দা করে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে, চোখ ওমলেটের ওপর থাকলেও মনোযোগ ওর আমাদের দিকেই। কলকাতার একটি বিখ্যাত চীজ—ওর মতো কৌশলী এবং ভয়-লেশহীন ভদ্র-গুণ্ডা আর দুটি আছে কি না

সন্দেহ। ঐ শ্রেণীর ক্রিমিনাল ব্রেনের আমেরিকায় জোড়া মিলতে পারে, কিন্তু এদেশে দুর্লভ। মিঃ ব্যানার্জির পার্টি আমাকে যে তোমার সঙ্গে দিয়েছেন, উনিই হচ্ছেন তার একমাত্র কারণ।”

প্রফুল্লর সহজে বাকস্ফূর্তি হয় না, সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করে বলে,—“ওর নাম ?”

“ওর নাম হচ্ছে সমাদ্দার ওরফে সমরেশ ঠাকুর ওরফে গোপাল হাজরা ওরফে নটবর রায় ওরফে পোড়া গণেশ ওরফে আরো এক ডজন। প্রেসিডেন্সি জেল আর হরিণবাড়ির ফেরত। আমার সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়—অনেকটা হৃদ্যতার সম্বর্দ্ধই বলতে পারো। এই কারণে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে ও একটু সঙ্কোচ বোধ করছে, নইলে এতক্ষণে সে তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে একটুও দ্বিধা করত না।”

প্রফুল্ল চমকে ওঠে।—“বলেন কী মশাই ?”

“এই রকমই।” কল্কে-কাশি যৎসামান্যই হাসেন। “সরকারের দল ওকে লাগিয়েছে তোমার পেছনে, ব্যানার্জির নমিনেশন পেপার নিয়ে তুমি যথা সময়ের আগে যথাস্থানে যাতে না পৌঁছতে পার সেইজন্যেই। এজন্যে তোমাকে খুন করতেও ও পেছপা হবে না; তবে, কৌশলে কাজ উদ্ধার করতেই ও ভালবাসে—খুনোখুনি করার তেমন পক্ষপাতী নয়। এ বিষয়ে একটু যেন সঙ্কোচই আছে লোকটার।”

প্রফুল্ল আশ্বস্ত হতে পারে না, “আপনি কেন ওকে অ্যারেষ্ট করছেন না তাহলে ? গ্রেপ্তার করে ফেলুন! এই দণ্ডে—এক্ষুনি !”

এখন পর্যন্ত ও কোনো অপরাধ করে নিতো, কেবল মনের মধ্যে এঁচেছে মাত্র এবং মনে আঁচার জন্যেই যদি গ্রেপ্তার করা শুরু করতে হয় তাহলে এত লোককে ধরতে হয় যে জেলে তার জায়গা কুলোবে কি না সন্দেহ। কেবল মনের মধ্যেকার প্ল্যানের জন্যে কাউকে তো জেলে পোরা যায় না।”

“তাহলে—তাহলে তো ভারি মুস্কিল।” প্রফুল্ল ভীতই হয়, “বেশ, আমাকে খুন করে ফেলবে তবে ?”

“যদি করেই ফেলে, তখন—হ্যাঁ, তখন ওকে হাতে নাতে ধরে ফেলতে আমার দেরি হবে না, নিতান্তই যদি পালিয়ে না যায়। তবে, সমাদ্দারের সাজে আমার হৃদ্যতারই সম্পর্ক; আমাকে দেখে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও

তোমাকে একেবারে খতম করবে এমন আমার মনে হয় না। ভয় কী তোমার ?"

বিশেষ ভরসাও পায় না প্রফুল্ল।

"এ জন্যেই বলছিলাম, ভয়ানক গুরু দায়িত্ব তোমার মাথায়। যদি নমিনেশন পেপার নিয়ে আঠারোই এগারোটার মধ্যে কলকাতায় না পৌঁছতে পার তাহলে ব্যানার্জির আর কাউন্সিলে যাওয়া হল না—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের দফাও রফা। মিঃ সরকারের দলেরই একছত্র আধিপত্য হবে কাউন্সিলে ; মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও দখল করে বসবেন তাঁরাই। সামান্য একটা সই করা কাগজের ওপরে একটা পার্টির কতখানি নির্ভর করছে ভেবে দেখ। সে ফের যে-সে পার্টি নয়, আদি ও অকৃত্রিম, ফ্লু ফ্লুকস ফ্যান।"

অর্থাৎ আপনার ভাষায়, যাঁরা ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগে, রেস খেলে—রেসে ফ্লুকসের ঘোড়া ধরে—ইত্যাদি। কিন্তু আমি তো এদের দলের কেউ নই। বিন্দু-বিসর্গও জানি না : আমাকে এই মারাত্মক কাজে পাঠাবার মানে ?" প্রফুল্ল বিরক্তিই প্রকাশ করে।

"তার মানে, তুমি যে-আপিসের কেরানি তার বড়বর্তা ঐ দলের একজন হোমরা চোমরা। তিনি তো ফ্যানের হাওয়া খান, তাহলেই হল। এসব কাজে অজ্ঞ এবং আনাড়িকে পাঠানোই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, নাড়িজ্ঞানওয়ালা লোক অনায়াসেই অন্য দলের ঘুস খেয়ে—বুঝতেই পারছ ! তাছাড়া, তোমার ওপর ওনাদের বিশ্বাস আছে। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ তোমার ওপর দেওয়ায় সেটা প্রমাণ হয় না কি ?"

"আমার গায়ে জোরও যথেষ্ট !" প্রফুল্ল কোটের হাতা তুলে মাসল কণ্ট্রোল করে কঙ্কে-কাশিকে দেখায়। "সহজে যে কেউ আমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে তা আমার প্রাণ থাকতে নয়।

"এস, সমাদ্দারের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—কঙ্কে-কাশি প্রফুল্লকে আহ্বান করেন, "কী ছুতোয় যে গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে উঠছে বেচারা।"

"ওর সঙ্গে আলাপ" ! দারুণ বিস্মিত হয় প্রফুল্ল, বলেন কী আপনি" ! "ক্ষতি কী তাতে ? গিলে ফেলবে না তোমায়।" কঙ্কে-কাশি প্রফুল্লকে টেনে নিয়েই চলেন, "এই যে সমাদ্দার ! অনেক দিন পরে দেখা—ভাল আছ তো ?

সমাদ্দার চমকে ওঠে, "মিঃ কঙ্কে-কাশি যে ! এখানে এখন এইভাবে আপনাকে দেখতে পাব আশা করিনি।"

"আমি কিন্তু আশা করেছিলাম। পরশু সন্ধ্যায় আমাদের বোম্বে মেলএ তোমাকে যখন উঠতে দেখলাম—

"বটে?" সমাদ্দার যেন একটু অপ্রস্তুত হয়, "আপনারা তাহলে আজ সকালেই বোম্বে পেঁৗছেছেন? উনি আপনার বন্ধু বুঝি?"

"হ্যাঁ, এই একটু আগেই পেঁৗছলাম তো। নেমেই এই রেস্তোরাঁতেই প্রাতরাশের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময়ে—হ্যাঁ, কী জিজ্ঞেসা করছিলে? ইনি? ইনি হচ্ছেন বাবু প্রফুল্লকুমার রায়,—কেন যে এঁর বোম্বে আগমন তা তো তোমার ভালমতই জানা আছে ভাই।"

"আমার?" সমাদ্দার থতমত খায়, "না তো! তবে, ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে বিশেষ আপ্যায়িত হব।"

"তা তো হবেই! হবার কথাই। বেশ, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু প্রফুল্লবাবু, আর ইনি হচ্ছেন মিঃ সমাদ্দার, আমার বন্ধুই। অন্তত আমার শত্রু নন। এঁর পরিচয় তো টেবিলে বসেই তোমাকে দিয়েছি। প্রফুল্ল, তুমি সমাদ্দারকে নমস্কার করলে না? প্রথম পরিচয়ে নমস্কার করাই তো ভদ্র রীতি।"

প্রফুল্ল আর সমাদ্দার বোকার মতো পরস্পরকে প্রতি-নমস্কার করে। "আপ্যায়িত হলাম প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আলাপিত হয়ে।" সমাদ্দার জানায়।

"হবেই তো।" কল্কে-কাশি যোগ করেন, 'নিশ্চয়! এইজন্যেই কি কলকাতা থেকে এতটা পথ তোমাকে আসতে হয়নি? বল? ভাগ্যিস আমি ছিলাম এখানে! বন্ধু-বান্ধবের উপকার করতে কখনই আমি পেছপা নই বলেই গায় পড়ে তোমাদের এই আলাপ করিয়ে দিলাম।"

"সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ কল্কে-কাশি!" সমাদ্দার বিস্ময়ের ভান করে, "কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সত্যি বলছ?" কল্কে-কাশি আকাশ থেকে পড়েন। "আমার সঙ্গে তুমি জোচ্চুরি করবে বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

"সত্যি, আপনার কথার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এখানকার একটা ফিল্ম ষ্টুডিয়োয় চাকরির চেষ্টাতেই আমার বোম্বে আসা।"

"তাই নাকি? তবু তোমাকে বলে রাখছি, যদি তোমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কথাগুলো কাজে লাগবে। এখান থেকে প্রফুল্ল বাবু যাবেন গলস্টোন কোম্পানির আপিসে। সেখানে তাঁর কী কাজ আছে।

আমি অবশ্য ওর সঙ্গে যাচ্ছি না। আরেকটা জরুরী খবর, আমরা উঠেছি তাজমহল হোটেলে। তারপর আজ রাত্রের গাড়িতেই ফিরছি আমরা কলকাতা। আচ্ছা, এখন আসা যাক, হোটেলেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছে আশা করি?"

হতভম্ব সমাদ্দারের কাছ থেকে দুজনে বেরিয়ে আসে। প্রফুল্ল অসন্তোষ প্রকাশ করে—"মিঃ কল্কে-কাশি! আপনি একজন খুব বড় গোয়েন্দা হতে পারেন—"

"উঁহু, উঁহু, আদৌ না! এই বরাতের জোরেই যা করে খাচ্ছি ভাই!"

"কিন্তু আপনি কি অনেক গুপ্ত খবর ওকে দিয়ে দিলেন না?"

"কাকে? সমাদ্দারকে?" কল্কে-কাশি অবাক হন, "কী রকম গুপ্ত?"

"এই, আমার গলষ্টোন আপিসে যাবার খবর, এবং তাজমহল হোটেলে আমাদের ওঠার কথা। তারপর আজ রাত্রেই কলকাতা-মেলে ফেরা—"

"কেন কী হয়েছে তাতে? ওর কত কষ্ট লাঘব হয়ে গেল। কতো সুবিধা করে দিলাম ওর! বেচারাকে এসব খুঁজে বের করতে আর হাঙ্গাম পোহাতে হবে না।"

"সেটা কি ভাল হল?" প্রফুল্ল বিরক্তি চাপতে পারে না।

"আহা! বুঝতে পারছ না? যতই ওকে কম হাঙ্গাম পোহাতে হবে ততই বেশি ও ভাববার সময় পাবে। আর যতই ও ভাবতে পাবে, ভাবিত হবে ততই নিজের কাজ মাটি করবে—তা জানো?"

অতঃপর প্রফুল্ল কল্কে-কাশির কাছে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। একটু পরেই আরেকখানা ট্যাক্সি প্রফুল্লর গাড়ির পিছু নেয়—এই ট্যাক্সিটা সমাদ্দারের। পরমুহূর্তেই আরো একখানা গাড়ি দূর থেকে দুজনের অনুসরণ করে চলে—এ গাড়িতে আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীযুক্ত কল্কে-কাশি মহাশয়।

তিনখানি গাড়িই অনেক ঘুরে-ফিরে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয় —চারধারে বাগান ঘেরা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ফটকে। গলষ্টোন কোম্পানির বড়সাহেবের রেসিডেন্স। প্রফুল্লর গাড়ি ফটকের ভেতর ঢোকে। একটু দূরে সমাদ্দারের গাড়ি থামে—কল্কে-কাশির গাড়ি দ্বিতীয় গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যেতে যেতে অকস্মাৎ যেন থেমে যায়।

"সমাদ্দার মশাইকে এখানে এ অবস্থায় দেখব আশা করতে পারিনি।" কল্কে-কাশি বলেন। তাঁর মুচকি হাসিটি লক্ষ্য করবার।

"এই, একটু শহর দেখতে বেরিয়েছি!" সমাদ্দার থতমত খায়, "হাওয়া খেতেও বটে!"

"শহর দেখতে শহরের বাইরে? মন্দ নয়! ফিল্ম আর্টিষ্টের কাজটা তোমার পাকা তাহলে!" কঙ্কে-কাশি গলা পরিষ্কার করেন, "আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম, যাচাই করে নিতেই এতদূর আসা। যাক, আমার কাজ আছে। শহরেই আমি ফিরলাম।" তারপর একটু হাসেন, "হ্যাঁ, হয়ত তোমার জানাই আছে, তবু খবরটা তোমাকে দিয়ে রাখাই ভালো। ঐ বাড়িটাই মিঃ গলস্টোনের—ব্যানার্জির নমিনেশনের কাগজপত্র আনতে প্রফুল্লবাবু ওখানেই গেছেন। দ্যাখো চেষ্টা করে যদি তোমার বরাত খুলে যায়! বন্ধু-বান্ধবের শুভাকাঙ্ক্ষা করাই আমার দস্তুর, জানোই তো ভায়া!"

কঙ্কে-কাশির গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যে পথে এসেছিল সেই দিকেই ফিরে চলে। সমাদ্দার কোন জবাব দিতে পারে না।

তারপরে আরো খানিকক্ষণ সমাদ্দারকে অপেক্ষা করতে হয়। অবশেষে প্রফুল্লর গাড়ি বাইরে বেরোয়। সমাদ্দারের আবার অনুসরণ। প্রফুল্লর ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায় তাজমহল হোটেলের সামনে। সমাদ্দারেরও। প্রফুল্ল নেমেই, ট্যাক্সি-ওয়ালার পাওনা চুকিয়ে সটান তেরো নম্বর ঘরে ঢুকেই খিল আঁটে। সমাদ্দার গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কঙ্কে কাশির অভ্যুদয় হতেই প্রফুল্ল রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটে যায়—"সর্বনাশ হয়েছে, মিঃ কঙ্কে-কাশি।"

কঙ্কে-কাশি কিছুমাত্র বিচলিত হন না—"কী সর্বনাশ?"

"সমাদ্দার এসে উঠেছে এখানে। আমাদের পাশের বারো নম্বর ঘরেই।"

"তাই নাকি? তাহলে তো ওকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আমন্ত্রণ করতে হচ্ছে। আমিও ওঁর শুভাগমন আশা করেছিলাম।

কঙ্কে-কাশি রসিকতা করছেন, প্রথমটা প্রফুল্ল তাই ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই ডিনারের টেবিলে সমাদ্দারের পাশে বসে নিজের চক্ষু-কর্ণকে ওর বিশ্বাস করতে হেলো। ওর চিরকালের ধারণা, গোয়েন্দায় আর বদমাইসে মুখোমুখি হলেই ঝটাপটি বেধে যায়। শেষোক্তরা স্বভাবতই পলায়নপর এবং প্রথমোক্তরা সর্বদাই ওদের পশ্চাদ্ধাবনে ব্যতিব্যস্ত। মাসিক পত্রের পাতায় আর গোয়েন্দা-গ্রন্থমালার কাহিনী পড়ে পড়ে এইরকমের একটা বিশ্বাস ওর বদ্ধমূল হয়েছিল কিন্তু যখন ওদের পরস্পরকে অন্তরঙ্গের মতো কথাবার্তা কইতে দেখে তার সে ধারণা দস্তুরমত টলে গেল।

মধ্যাহ্নভোজ প্রফুল্লের মাথায় উঠে গেল, মাঝে মাঝেই তার কোটের বুক পকেটে হাত পুরে গুরুতর বস্তুটির অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগল। যে কাগজের টুকরোটির ওপর একটা পার্টির জীবনমরণ নির্ভর করছে তাকে সে যত্নের সহিত কোটের লাইনিঙের সঙ্গে সেলাই করে রেখেছে। জিনিসটার সেখান থেকে অকস্মাৎ উবে যাবার কথা নয় কিছুতেই, তবু সে বারম্বার যাচাই করে আপনাকে যেন ভরসা দিতে চাচ্ছিল।

ওর হাতের কসরৎ কল্কে-কাশির নজরে পড়ে একবার। তিনি হাসতে থাকেন—"ভয় নেই প্রফুল্লবাবু! ও নিরাপদেই আছে, এবং থাকবেও, যদি না তোমার কোট তুমি খোয়াও।"

কল্কে-কাশির কথায় প্রফুল্লর ভারি রাগ হয়, তার মুখ লাল হয়ে উঠে। কল্কে-কাশি তা বুঝতে পারেন। "আমি কি কোন গুপ্তকথা ফাঁস করে দিলাম নাকি? মোটেই না, প্রফুল্লবাবু! সমাদ্দার জানত যে কোথায় তুমি নমিনেশন পেপারটা রেখেছ।—কিহে সমদ্দাদার, জানতে না?"

সমাদ্দার সহাস্য মুখে ঘাড় নাড়ে—"নিশ্চয়ই! কোটের লাইনিং, ঐখানেই তো দামী জিনিস রাখবার জায়গা! সকলেই রাখে এবং সব্বাই জানে।"

গোয়েন্দা এবং বদমাইস দুজনে মিলে অকপটে হাসতে থাকে। প্রফুল্ল ভারি মুসড়ে পড়ে। হতে পারে কোটের লাইনিংই মূল্যবান কাগজ-পত্র রাখার একমাত্র জায়গা এবং সকলেই তা জানে, তবু কী দরকার ছিল মিঃ কল্কে-কাশির সমাদ্দারকে এই খবরটা দেবার? বরং যাতে সমাদ্দারের মনে এরকম সন্দেহ না জাগে বা জেগে থাকলেও তা দূর হয় সেই চেষ্টা করাই কি তার উচিত ছিল না? কল্কে-কাশির গোয়েন্দাপনায় সে ঘাবড়ে যায় সত্যিই।

যাক, প্রফুল্লর আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। যতক্ষণ সে জেগে আছে ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু—কোটের কোটরের বা তার বাইরের কিছু ছিনিয়ে নেওয়া কারো ক্ষমতার বাইরে—এবং রাত্রে, রেলগাড়িতে, হয় সে গা থেকে কোট খুলবেই না, আর খোলেও যদি বা, তাহলে বালিসের মতই সেটাকে ব্যবহার করবে, সে ঠিক করে রাখল। তার ভারি সজাগ ঘুম, তার মাথার তলা থেকে কোট নেয় কার সাধ্য?

খাওয়া শেষ হলে কল্কে-কাশি বলেন—"এসো সমাদ্দার, একটু দাবায় বসা যাক। প্রফুল্ল, জানো নাকি দাবা খেলা?"

"জানি সামান্যই।" প্রফুল্ল মুখ গোঁজ করে বলে।

"আমার আপত্তি নেই।" সমাদ্দার জবাব দেয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা বেশ জমে ওঠে। কল্কে-কাশি ও সমাদ্দারের তো ভালোই জানা আছে, প্রফুল্লও নেহাৎ কম যায় না। ক্রমশই ওর উৎসাহ বাড়তে থাকে, সমাদ্দারের চাল কেড়ে নিয়ে নিজে চাল দেয়। প্রফুল্ল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তার গরম বোধ হয়, সে কোট খুলে ফ্যালে—সমাদ্দারের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওর হুঁশই নেই তখন। সমাদ্দারও নিজের কোট খোলে এবং প্রফুল্লর কোটের পাশেই রাখে। খেলা চলতে থাকে।

খানিক বাদে সমাদ্দার উঠে পড়ে—"প্রফুল্লবাবু, আপনি ততক্ষণ মিঃ কল্কে-কাশির সঙ্গে খেলুন। আমি আসছি এক্ষুনি।"

একটু পরেই সমাদ্দার ফিরে আসে—"প্রফুল্লবাবু, ভুল করে নিজের কোট ফেলে আপনার কোট নিয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না!' কোট খুলতে খুলতে সে বলে।

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের কোট কেড়ে নেয়। যেখানে নমিনেশন পেপার ছিল সেখানটা অনুভব করে। পরমুহূর্তেই সে সমাদ্দারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। কল্কে-কাশি মাঝে পড়ে বাধা না দিলে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বদমাইসটাকে হয়তো সেই দণ্ডেই টুঁটি টিপে খুন করে বসত!

"প্রফুল্লবাবু, করছ কী? কী ব্যাপার?"

"ঐ চোর—"

"আহা, গালাগালি কেন? কী হয়েছে?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না! এই লোকটা এইমাত্র আমার কোট থেকে নমিনেশন পেপার চুরি করেছে।"

কল্কে-কাশি তেমনই অবিচলিত থাকেন—"তাই নাকি হে সমাদ্দার? তাই নাকি?"

"প্রফুল্লবাবু তো সেই রকমই ভাবছেন!" সমাদ্দার বলে, "কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা কখন করলুম।

সমাদ্দার উচ্চহাস্য করে, কল্কে-কাশিও হাসতে থাকেন। প্রফুল রেগে আগুন হয়ে ওঠে, কিন্তু একা সে কী করবে? আপন মনেই সে ফুলতে থাকে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন-কেমন ঠেকে। সমাদ্দার

ও কল্কে-কাশির মধ্যে যে রকম অন্তরঙ্গতা তাতে তার ওর নিদারুণ সন্দেহ হতে থাকে···ওরা দুজনে নিতান্তই মাসতুতো ভাই নয় তো ?

"তুমি যদি এখুনি আমার কাগজ না ফিরিয়ে দাও তোমার হাড় ভেঙে আমি ছাতু করব !" প্রফুল্ল ঘুসি বাগিয়ে প্রস্তুত।

"আহা, হচ্ছে কী সব ! মারামারি কি ভদ্রলোকের কাজ ?" কল্কে-কাশি ওকে সামলাতে যান।

"আপনি থামুন মশায়। আপনারা এক গোত্র। আমি বেশ বুঝেছি। গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম, কিন্তু—সে যাক। আপনার কোনো কথা আমি শুনছি না আর !" প্রফুল্ল মরিয়া হয়ে ওঠে।

এবার সমাদ্দার কথা বলে—"আপনি যদি আমার গায়ে হাত দেন প্রফুল্লবাবু, তাহলে আমি এক্ষুনি হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে আপনাকে পুলিশে দেব। আপনার কাগজ যে আমি নিয়েছি তার প্রমাণ কী ?"

"বেশ, আমি তোমাকে সার্চ করব ! তোমার কামরাও !"

"স্বচ্ছন্দে। এক্ষুনি।' সমাদ্দার কল্কে-কাশির দিকে ফেরে, "আপনিও কি সার্চ করতে চান মশাই ? আসুন আমার সঙ্গে, আমার আপত্তি নেই !"

"বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না আমি"—কল্কে-কাশি একটা সিগারেট ধরান। "তুমি যদি সত্যিই ও-কাগজ নিয়ে থাকো সমাদ্দার, তাহলে এখন তোমাকে সার্চ করে কোন লাভ নেই। কোথায় তুমি তা রেখেছ তাই যদি ভেবে বার করতে পারি, তাহলে তা পেতে আমার বিলম্ব হবে না।"

"আপনি কি তাহলে সার্চ করতে প্রস্তুত নন ?" প্রফুল্ল এবার ক্ষেপে ওঠে।

"উহুঁ !" কল্কে-কাশির সংক্ষিপ্ত জবাব। "আপাতত না।"

"বেশ, আমি নিজেই করব তাহলে।"

প্রফুল্ল সমাদ্দারের ঘরে যায়, ওর আপাদমস্তক অনুসন্ধান করে, সবগুলো জামার ভেতরের বাইরের সমস্ত পকেট হাতড়ায়, কোটের যাবতীয় লাইনিং পরীক্ষা করে ; অবশেষে মুহ্যমানের মতো যখন নিজের কামরায় ফেরে তখনো কল্কে-কাশি জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছেন। মুখ না ফিরিয়ে তিনি বলেন—"তখনই বললাম, প্রফুল্লবাবু ! এখন ওকে সার্চ করে কোনই ফল নেই। কোথায় ও জিনিসটা সরিয়েছে যতক্ষণ তাই না আন্দাজ করতে পারছি—"

সমাদ্দার ফিরতেই কঙ্কে-কাশির কথায় বাধা পড়ে। প্রফুল্ল কোনো জবাব দেয় না। নিজের মধ্যে নিজেই সে নেই তখন, এতই সে দমে গেছে।

"তবে সত্যি বলতে কী, দোষ তোমার নিজেরই প্রফুল্লবাবু! তুমিই বলো, তোমার আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল কি না?" কঙ্কে-কাশি তাঁর কথাটা শেষ করেন।

কিন্তু এ-কথায় প্রফুল্লর এখন আর সান্ত্বনা কোথায়? সে গুম হয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারকে বলেন—"ভারি দমিয়ে দিয়েছ তুমি বেচারাকে। ওর মুখ দেখলে মায়া হয়।"

সমাদ্দার ঘাড় নাড়ে। স্বভাবতই সে কোমল-হৃদয়, সত্যিসত্যিই দুঃখ হয় তার। "বিজনেস, মিস্টার কঙ্কে-কাশি!" সে বলে। "ভারি কড়া জিনিস।"

"সেকথা হাজার বার। কিন্তু ভেবে দেখ দিকি কী সর্বনাশ হোলো ওর। হয়ত চাকরিই থাকবে না আর। ও তো ভেঙে পড়েছেই, আমিও খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।" কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের চোখের ওপর চোখ রাখেন—"কাগজখানা রাখলে কোথায় হে সমাদ্দার?"

সমাদ্দার হাসে—"আমি যে রেখেছি আমি তো তা স্বীকার করিনি।"

"না। এবং তোমাকে স্বীকার করতে বলছিও না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, ও-কাগজ নিয়ে সটকাতে পারছ না তুমি। হাওড়ায় নেমেই আমি তোমাকে আটকাবো এবং খানাতল্লাসি করাবো—যাকে বলে পুলিশের খানাতল্লাসি।"

সমাদ্দার আতঙ্কিত হয়। "সেটা কি সঙ্গত হবে মিঃ কঙ্কে-কাশি? কাগজখানা যে আমার কাছে আছে তার বিন্দুমাত্র প্রমাণও আপনি পাননি।"

"না পাই। কিন্তু কাগজখানা আমি পেতে চাই"

কঙ্কে-কাশির সঙ্কল্প শুনে সমাদ্দারের শঙ্কা হয়। সে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে যায়, গিয়ে মাথা ঘামাতে থাকে। অনেক ভেবে সে একটা উপায় আবিষ্কার করে। দরজায় খিল আঁটে। তারপর নিজের সুটকেস বার করে এক কোনের একটা গুপ্ত বোতাম টেপে, তার ফলে ডালার দিকে একটা লুকানো খুপরি খুলে যায়। তার ভেতর থেকে সদ্য-অপহৃত নমিনেশন পেপার বেরিয়ে পড়ে।

সমাদ্দার কাগজটা পরীক্ষা করে। সেই সঙ্গে আরেকখানা অনুরূপ নমিনেশন পেপারও। দ্বিতীয় কাগজখানা ফাঁকা, এখানা তাকে দেওয়া হয়েছিল আসল কাগজ চেনার সুবিধার জন্য। সমাদ্দার দ্বিতীয় কাগজের যথাস্থানে

প্রথম কাগজের দেখাদেখি ব্যানার্জি'র সই নকল করে বসিয়ে দেয়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে একই কাগজ, হুবহু একই সই, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেই এ সইটা যে জাল-করা তা স্পষ্টই ধরা পড়ে যাবে।

অবশেষে জাল কাগজখানা গুপ্ত ডালার মধ্যে এঁটে রেখে, আসল কাগজটা একখানা লেফাফায় ভরে। খামের ওপরে লেখে মিঃ সরকারের নাম আর ঠিকানা। কাগজটা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয় দেখে, রেজিস্ট্রি করে পাঠানোই সে সমীচীন মনে করে। ডাকে গেলেও তার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় পৌঁছবে এবং একেবারে তার নিয়োগকর্তার স্বহস্তেই, সুতরাং তার অসুবিধের কিছু নেই। তারপর দরজায় তালা লাগিয়ে, কাছাকাছি পোস্ট-আপিসের উদ্দেশে সে রওনা হয়।

প্রফুল্ল ঘরে ঢোকে। আপন মনেই যেন কয়, "দরজায় তালা লাগিয়ে সমাদ্দারকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।"

"তাই নাকি?" কঙ্কে-কাশি সিগারেটের ভুক্তাবশেষটা ছুঁড়ে ফেলে দেন, "তাহলে তো ওর ঘরটা একবার তল্লাস করতে হয়। এই তো সেরা সুযোগ।"

সব-খোল চাবির সাহায্যে সহজেই তালা খুলে যায়। প্রফুল্লকে নিয়ে তিনি ঢোকেন।

"কোথায় কোথায় তুমি খুঁজেছিলে?"

তদুত্তরে প্রফুল্ল তার অনুসন্ধান-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করে।

"এই সুটকেসটা দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ। ওর ভেতরেও দেখেছি। ওখানে নেই।"

"দেখেছ ঠিকই, তবু আরেকবার দেখা যাক।"

কঙ্কে-কাশি সুটকেসটাকে উন্মুক্ত করেন, ভেতরের যা কিছু জিনিস-পত্র সব তাঁর পায়ের গোড়ায় উজাড় হয়।

"দেখলেন তো! বললাম ওতে নেই!" প্রফুল্ল বলে।

কঙ্কে-কাশি ওর কথায় কান দেন না। খুঁজতে খুঁজতে সেই গুপ্ত বোতাম বেরিয়ে পড়ে। "পেয়েছি প্রফুল্লবাবু, এতক্ষনে পেয়েছি।"

"কী?"

"এই দেখ।" চাবি টিপতেই সেই লুকানো ডালা প্রকাশ পায়। তার মধ্যে একটা লম্বা লেফাফা। লেফাফাটা না খুলেই তিনি প্রফুল্লর হাতে দেন। "এই নাও। কিন্তু সাবধান, আবার যেন না খোয়া যায়।"

প্রফুল্ল কম্পিত হাতে লেফাফা খোলে। কাগজখানা দেখেই সে লাফিয়ে

ওঠে। তারপর ছ'হাতে কঙ্কে-কাশির একখানা হাত চেপে ধরে —"আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে মাপ করুন—"

উত্তরে কঙ্কে-কাশির শুধু একটু মৃদু হাসি দেখা যায়। সমস্ত জিনিস যথাযথ রেখে তেমনি তালা এঁটে তাঁরা বেরিয়ে আসেন।

সমাদ্দার হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকেই, তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে কঙ্কে-কাশির কাছে। "এটা কি ভাল কাজ আপনার মশাই? আমার অবর্তমানে আমার ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে—"

কঙ্কে-কাশি বাধা দেন —"আমরাই যে তোমার সুটকেস খুলেছি তার কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ? প্রমাণ ছাড়া তুমি তো চলোনা সমাদ্দার!"

প্রফুল্ল এতক্ষনে মন খুলে হাসতে পারে।

সমাদ্দার গজরাতে থাকে, ভয়ানক রাগের ভান করে, কিন্তু সেও মনে মনে হেসে নেয়।

আর মিঃ কঙ্কে-কাশি? তাঁর মুখে হাসির কোনো চিহ্ন দেখা যায় না।

সমাদ্দার চলে গেলে প্রফুল্ল মুখ খোলে—"একবার বাগাতে পেরেছে,আর পারবে না। এ-কোট আমি আর গা থেকে খুলছি না। রাত্রেও নয়।"

"ঠেকে শেখা- ভয়ানক শেখা প্রফুল্লবাবু!" কঙ্কে-কাশি ঘাড় নাড়েন, "এবং সেটা একবারই একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।"

আচ্ছা মিঃ কঙ্কে-কাশি, সুটকেশটায় যে একটা গোপন খুপরি আছে কী করে আপনি বুঝলেন?"

"তোমার কোটের লাইনিং আছে যেমন করে সমাদ্দার বুঝেছিল।" কঙ্কে-কাশি ব্যাখ্যা করে দেন—"ও থাকতেই হবে। তোমার কি ডিটেকটিভ উপন্যাস একেবারেই পড়া নেই প্রফুল্লবাবু?"

প্রফুল্ল নিজের বিদ্যাবত্তা জাহির করতে লজ্জা পায়। একেবারেই যে এক্আধখানা ওর পড়া নেই তা নয়, তবু সে সসঙ্কোচেই বলে—"এবার থেকে পড়ব কিন্তু।"

কলকাতা ফেরার পরদিনই, কঙ্কে-কাশি সমাদ্দারের আড্ডায় গিয়ে আবির্ভূত হয়। "আসতে পারি ভেতরে?"

"আসুন,আসুন। আমার কী সৌভাগ্য, আপনি এসেছেন!" সমাদ্দার শশব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"সরকারদের কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে গেছ তো?" কঙ্কে-কাশি জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ, কালই দিয়েছে। নগদ পাঁচটি হাজার।" সমাদ্দার উত্তর দেয়, "কেন, কী হয়েছে তার?"

"না, এমন কিছু না।" কঙ্কে-কাশি তাঁর হাত-ঘড়ির দিকে তাকান। "এখন দশটা, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রেসিডেন্সি কোর্টে নমিনেশন পেপার সব দাখিল হবে কিনা তার আগেই তোমাকে আমি কেটে পড়তে বলি। নেহাত বন্ধু-হিসেবেই বলতে এসেছি অবশ্যি।"

"কেটে পড়ব? আমি? কেন?" সমাদ্দার সচকিত হয়। "—কাটব কেন?"

সরকারদের পার্টির কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছ এইজন্যে। ওদের হাতে খুনে গুণ্ডার তো কমতি নেই, যাদের তুলনায় তুমি আস্ত দেবশিশু!"

"ফাঁকি দিয়ে নিয়েছি কী রকম?" সমাদ্দার হাসে এবার, "আপনি কি এখনো বুঝতে পারেন নি, মিস্টার কঙ্কে-কাশি, আমার সুটকেস থেকে যে কাগজ আপনি বের করে নিয়েছিলেন তা আসলে জাল-সই করা?"

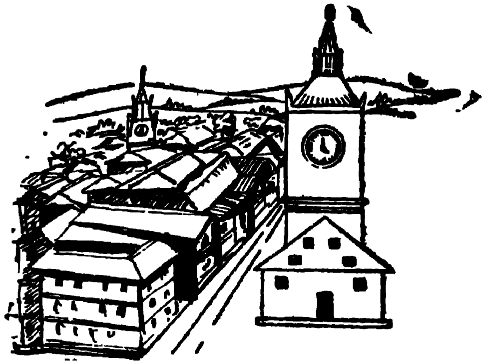
"আগাগোড়াই তা আমি জানতাম।" কঙ্কে-কাশির গলার স্বর গম্ভীর।

"তবে—?"

"আসলে একটা কথা তুমি নিজেই এখনো বুঝতে পারোনি, সমাদ্দার। প্রফুল্লর পকেট থেকে যে কাগজ তুমি বাগিয়েছিলে সেটাও জাল ছাড়া কিছু না।"

"য্যা?" এবার সত্যিই চমকে ওঠে সমাদ্দার। "তাই নাকি?"

"নিশ্চয়! যে সময়ে তুমি সেই বাগানবাড়ির গেটে প্রফুল্লর জন্যে অপেক্ষা করছিলে সেই সময়ে আমি শহরে ফিরে গলস্টোন কোম্পানির আপিস থেকে



আসল কাগজখানা হস্তগত করি। স্টেশনে নেমেই গলস্টোন সাহেবকে ফোন

করে রেখেছিলাম যাতে সাহেবের বাড়ি থেকে প্রফুল্লকে একখানা নকল নমিনেশন পেপার দেওয়া হয়—এখন সব বুঝতে পারছ তো ? যাতে তোমার নজর একেবারেই আমার উপর না পড়ে সেইজন্যই আমার এত কাণ্ড করা। প্রফুল্লকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এবং সব কিছু। অমন মূল্যবান কাগজ আমি নিতান্ত অবহেলা ভরে আমার এই কোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছি, ইচ্ছে-মত জামা খুলেছি, রেখেছি, তুমি তা ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে পারোনি। প্রফুল্লও তা জানে না। কোনদিন জানবেও না। যাক্, বেচারা আনন্দেই রয়েছে, ওর বেতন বেড়ে গেছে খবর পেলাম”—

শিবরাম চক্রবর্ত্তী মশায় বাংলা সাহিত্যে সরস রচনার ক্ষেত্রে প্রবাদ পুরুষ। হাসির উচ্ছলতায় ভরা তাঁর গল্প ও কৌতুক প্রবাহ গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও পাঠিকাদের মনোরঞ্জন করেছে ও করছে। ঝড় ঝঞ্ঝা, মহামারি অথবা যুদ্ধ, স্বাধীনতা-আন্দোলন কোন কিছু তাঁর হাসির সঞ্জীবনী সুধা থেকে বাংলা ভাষার পাঠকদের বঞ্চিত করেনি। ‘চুম্বন’ ও “মানুষ” নামক দুই কাব্য রচনার মধ্যদিয়ে শিবরামবাবুর যে সাহিত্য সাধনা একদা আরম্ভ হয়েছিল ‘ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা’ নামক আত্ম জীবনী মূলক এক সফল সাহিত্য কর্মের সৃষ্টিতে তা পরিণতি লাভ করে। লেখকের রক্তের টান, প্রেমের পথ ঘোরাল, মনের মত বৌ, মস্কো বনাম পণ্ডীচেরী প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক পরিচিত। হাসির গল্পের কারবারী শিবরাম বাবু মাঝে মাঝে প্রবন্ধ নাটক ও উপন্যাস লিখেছেন। তবে অনেকেই হয়ত জানেন না যে লেখকের সরস ও কৌতুকাবিষ্ট রচনাশৈলী গোয়েন্দা গল্পের সফল বিন্যাসেও পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল। শিবরামবাবুর শৈশব কাটে মালদহ-জেলার চাঁচলে। তবে আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলায়। যৌবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ ও উচ্ছাস তাঁকে চাঁচলের বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষুদ্র পরিধি হতে মুক্ত করে বিপুল-বিশ্বের বিস্তৃত শিক্ষাসত্রে আনয়ন করে। আজীবন কলকাতাবাসী লেখক আলাপচারী, অকৃতদার ও সজ্জন ব্যক্তি। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত শিবরামবাবু অনুযোগ হীন আশুতোষ ও সত্তর অতিক্রান্ত যৌবনেও (বার্দ্ধক্যে) বন্ধুবৎসল ও পরিহাস-প্রাণ ছিলেন। খ্যাতির প্রতি নির্মোহ, যশের প্রতি নিরাকাঙ্খ এমন মানুষ যে বিংশ শতাব্দীতেও দেখাযায় তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ শিবরামবাবু। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর জীবন তাঁর রচনা ও রচিত চরিত্রগুলির মতই বিচিত্র ও বৈচিত্রময়। ইংরাজী বাইশ সালে তিনি ১৩৪, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের মেশ বাড়ীতে ঢোকেন আর গত ২৮শে আগষ্ট চলে যান স্বর্গের কাছাকাছি।



ভূতের বাতাস

সুকুমার সেন

জরুরি তলব এসেছে মহামন্ত্রীর উপকারিকা থেকে। লোক এসেছে চিঠি নিয়ে পালকি সঙ্গে করে। চিঠিতে যা লেখা আছে তার মর্ম হল বিশেষ প্রয়োজন কালিদাসকে অবিলম্বে মহামন্ত্রীর ভবনে যেতে হবে। যদি মহাকবি যেতে না পারেন তবে মহামন্ত্রীই তাঁর কাছে আসবেন।

আষাঢ়ান্ত দিনের পড়ন্ত বেলায় রোদের ঝাঁজ কমেছে তবে হাওয়া এখন ও উত্তপ্ত আছে। দ্বিরুক্তি না করে কালিদাস নরযানে সোয়ারি হলেন। মহামন্ত্রীর ভবনে গিয়ে দেখলেন সব চুপচাপ। ভিতরের একটি কক্ষে মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ মিলল। তাঁর কাছে বসে আছেন তাঁরই বয়সী এক সৌম্যকান্ত প্রবীণ পুরুষ। কালিদাসকে দেখে দুজনেই আসন ছেড়ে উঠে সৌজন্য দেখালেন। কালিদাস অঞ্জলি-প্রণাম করলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলেন। সবাই নীরবে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মহামন্ত্রী শারদানন্দ।

'কবি, তোমার সঙ্গে এঁর পরিচয় নেই। ইনি দক্ষিণপূর্ব অপরান্ত প্রান্তের মহাসামন্তধিপতি ভাগভদ্রেরও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কন্যা রাণী বজ্রভদ্রার মহামন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিত। ইনি আমার সতীর্থ, বাল্যসুহৃৎ। অনেকদিন পরে

দেখা হল। তবে এসেছেন ইনি আমার সঙ্গে নয় তোমার সঙ্গেই দেখা করার উদ্দেশ্যে।

ক্ষেমরক্ষিতের মুখে চোখ রেখে হাত জোড় করে কালিদাস বললেন, 'বলুন আপনার অভিপ্রায়।'

ক্ষেমরক্ষিত বললেন, 'বড় দারুন এবং গোপনীয় কথা। আপনাকে মন দিয়ে শুনতে হবে।'

কালিদাস একটু হেসে বললেন, 'মন দিতে সদাই প্রস্তুত, প্রাণ দিতে নই, বলুন 'কি বলবেন।'

শারদানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ক্ষেমরক্ষিত তাঁকে নিষেধ করে বললেন, তোমারও শোনা দরকার। মহাকবির কল্পনার সঙ্গে মহামন্ত্রীর যন্ত্রনার সংযোগ ঘটলে আমার সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হতে পারে।'

'ব্যাপার কী', কালিদাস বললেন।

ব্যাপার গুরুতর এবং কঠিন। ভাগভদ্রদেবের মৃত্যুর—কয়েকবছর আগে একটি অজ্ঞাত কুলশীল কিশোরকে নিজের পার্শ্বচর করেছিলেন। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভালো, বিনয়ী, সুশীল, লিখতে পড়তে ভালোই জানে। সর্বোপরি বিচক্ষণ। তিরোধানের কিছু আগে রাজা ছেলেটিকে জামাই করেন। ছেলেটির আগে কী নাম ছিল জানিনা, ভাগভদ্রদেব তাঁকে গুহগুপ্ত ব'লে ডাকতেন। এই নামেই সে এখন রাজকন্যার হয়ে রাজকর্ম চালাচ্ছে।'

'রাজকর্মে তার কিছু গাফিলতি দেখছেন?

কিছুমাত্র না। আমার সাধারণ তত্ত্বধানে সব কাজ আগেকার বুড়ো রাজার দিনের মতোই স্বচ্ছন্দে চলছে।'

'তবে?'

'বিবাহসূত্রে রাজ-অধিকার পাবার কিছুকালপরের থেকে গুহগুপ্তর আচরণে মাঝে মাঝে অদ্ভুত বৈলক্ষণ্য ঘটছে।'

'সে কী রকম?'

'কোন ঠিক ঠিকানা নেই, মাঝে মাঝে ঘুমুতে ঘুমুতে জামাতা বাবাজী হঠাৎ জেগে উঠে রাজকন্যা—পত্নীর পিঠে দুহাত মুঠো করে কিল মারতে থাকেন আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করেন। রাজকন্যার চীৎকারে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তখন লজ্জিত হয়ে পত্নীর পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে অনিয়নিত হলেও বারবার ঘটছে। বাধ্য হয়ে রাজকন্যাকে

স্বতন্ত্র শয়নকক্ষ আশ্রয় করতে হয়েছে। তাতে লোক জানাজানি হবার আশঙ্কা বেড়ে গেছে।'

'প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন নি?'

রাজকন্যা চিকিৎসার অথবা ঝারফুঁকের কথা উত্থাপন করলে গুহগুপ্ত বলে, "তুমি যদি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কাউকে বল তবে আমি জলে ঝাঁপ দেব।" আসল কথা কি, মেয়ে জামাইকে অত্যন্ত ভালোবাসে। জামাইও মেয়েকে ছেড়ে থাকতে চায় না।

'রাজ্যের ভার নিয়ে বসে আছি। এ ভার আমাকে দিন দিন পিষে ফেলছে। কিছু করবার হদিস পাচ্ছি না। সেদিন হঠাৎ কেন জানিনা আপনার কথা মনে হল। সরস্বতী আপনার হৃদয়ে ও কণ্ঠে। আপনি হয়ত উপায় বলে দিতে পারবেন। এই রকম ভেবে চিন্তে আপনাদের কাছে এসেছি। যা হয় একটা উপায় করে দিতে হবে।' 'ছেলেটিকে যিনি দিয়েছিলেন তাঁর খোঁজ খবর করেছিলেন?'

'দিয়েছিলেন এক বড় সাধু। বিদর্ভের এক বিখ্যাত শৈবমঠের আচার্য। তিনি কোন কোন বছর আমাদের দেবকুল সংলগ্ন অতিথি শালায় চাতুর্মাস্য করতেন। সেই রকম এক চাতুর্মাস্যে ছেলেটিকে সঙ্গে এনেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা জানি না। খোঁজ অবশ্য নিতে পারতুম। কিন্তু জানাজানির ভয়ে আমাদের হাত পা মুখ বন্ধ। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি। একটা বিহিত করে দিতেই হবে।'

কালিদাস চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, আপনাদের কন্যারাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা হতে পারলে তবেই আমি বুঝতে পারতুম আমি এ বিষয়ে কিছু করতে পারব কিনা। সেটা কি সম্ভব হবে?'

'সম্ভব করতেই হবে। কন্যারাণীকে তো আনা যাবেনা। আপনি কবে যেতে পারবেন বলুন। আমি আজ ভোরেই রওনা হচ্ছি। ষোল সাঙ্গের নরযান হলে পাঁচ দিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। পথের সব ব্যবস্থা আমরা দুজনে করে দেব।'

'বেশ আমি তাহলে দশদিন বাদে যাত্রা করব। কাউকে কিছু বলবেন না। আমি আপনার বাড়ীতে গিয়ে উঠব অতিথি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে। তারপর যা করতে হবে আমি সেখানে গিয়ে বাতলে দেব।'

কিছুক্ষন গল্পগুজব করে কালিদাস বিদায় নিলেন।

সেদিনের কথাবার্তার ঠিক পক্ষকাল পরে সন্ধ্যার ঝোঁকে কালিদাস এসে

পৌঁছলেন ভাগভদ্রের রাজধাণী ভদ্রাবতীতে। সোজা উঠলেন গিয়ে মন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিতের আবাসে। মনুষ্যবাহ্য যান কালিদাস পছন্দ করতেন না দুটি কারণে। প্রথমত পশুবৎ বাহনগিরিতে মানুষের নিয়োগ তিনি পাপতুল্য অপরাধ বলে মনে করতেন। দ্বিতীয়ত এ যানে গমনাগমন মেয়েদেরই শোভা পায়। তাঁরা তো একরকম নারবহনই। অন্য কোন উপায়ে এত তাড়াতাড়ি আসা যেত না বলেই কালিদাস পালকি আশ্রয় করেছিলেন। পথে কোন অসুবিধা হয় নি। বেশ শুয়ে শুয়ে বসে বসে দেখতে দেখতে এসেছেন। এসে ভালোই লাগছে। ছোট নদীর তীরে ঘেরা বাগানের মধ্যে মন্ত্রী মহাশয়ের আবাস। কয়েকবছর পরে উজ্জয়িনী থেকে দূরে এসে কালিদাসের মন যেন নবীন হয়ে উঠল। সকালে ক্ষেমরক্ষিত একঘটি জিরান কাঠের খেজুর রস এনে দিলে। তা পান করে মহাকবির মনে হল তিনি যেন ছেলেবেলার দিনে জেগে উঠেছেন। মধ্যাহ্নভোজের পর কালিদাস বললেন, 'কন্যারাণীর সঙ্গে এবার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিন।'

ক্ষেমরক্ষিত বললেন, 'আপনার তো রাজবাড়ীতে যাওয়া চলবে না। কোন অছিলায় তাঁকে আমার এখানে আনতে হবে। আপনার পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না। তাইত, কি করা যায়।'

'আপনি বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করে আসুন। ওঁরা ঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।'

'তাই বাড়ীর মধ্যেই যাই।'

দণ্ডখানেক পরে মন্ত্রী মহাশয় বাড়ির ভিতর থেকে ফিরে এসে বসে বললেন, 'ওঁরা বলছেন, কাল বাদ পরশু উত্থান-একাদশী। আপনার আগমন উপলক্ষ্য করে ও-দিন একটু ভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কন্যারাণীকে আমন্ত্রন করলে ওঁর এখানে আসা সহজ হবে। রাজবাড়ীতে এখন এ সব অনুষ্ঠান আর হয় না। তবে বন্ধুভদ্রা এ সব ভালোবাসেন।'

'সে কথা মন্দ নয়। তবে আমার পরিচয় যেন বাইরে ফাঁস না হয়। এমন কি আমি যে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী থেকে আসছি এ সন্দেহ ও কারো মনে যেন প্রশ্রয় না পায়।'

'না-না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

উত্থান-একাদশী পর্বের ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষ্যে কন্যারাণী বন্ধুভদ্রা এসেছেন মন্ত্রী মহাশয়ের ভবনে একটি বিশ্বস্ত চেড়ীকে সঙ্গে নিয়ে।

রন্ধন মহলে তখন মেয়েরা ভিড় করেছে আর চেড়ী তখন আনাজ কুটছে

নিযুক্ত। এমন সময়, ক্ষেমরক্ষিত অঙ্গের অলক্ষিতে, কালিদাস যে ঘরে বসে-ছিলেন কন্যারাণীকে সেই ঘরে নিয়ে এলেন। পরিচয় করে দিলে কন্যারাণী আনন্দ বিস্ময়ে উদ্ভাসিত হয়ে কালিদাসকে প্রণাম করতে গেলে কালিদাস তাঁকে থামিয়ে বললেন, 'ওই হয়েছে। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার মনের কালি মুছেযাক। বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

শুনেই ক্ষেমরক্ষিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতে কালিদাস তাঁকে নিষেধ করলেন, 'যাবেন না। থাকুন।'

তারপর কন্যারাণীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার কষ্টের কথা শুনে প্রতিকার-চেষ্টায় এসেছি। কোন আশঙ্কা না করে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। তোমার উত্তরের উপর প্রতিকার ব্যবস্থা নির্ভর করছে।'

'বলুন। আপনাদের দুজনের কাছে আমার গোপন করবার কিছু নেই।'

'কতদিন জামাই বাবাজীর স্বপ্নাভিযান শুরু হয়েছে?'

'প্রায় মাস আষ্টেক হল।'

'কদিন অন্তর অন্তর হয়'।

'ঠিক নেই। তবে মাসে তিন চার বার তো বটেই।'

'প্রথম যে রাত্রে আরম্ভ হয় সে দিনে বাবাজী কোন বিশেষ কিছু খাদ্য খেয়েছিলেন? বা কোথাও গিয়েছিলেন কি?'

'বিশেষ কিছু খাদ্য পানীয় বা ওষুধ খান নি বলেই মনে হয়। তবে বিকাল বেলায় পল্লী অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন. ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল।

'হুঁ', বলে কালিদাস চুপ করে রইলেন।

'আচ্ছা, বলতো প্রথম দিনের আঘাত কি রকমের বা কি ভাবের ছিল —অর্থাৎ চড়চাপড় না কিলঘুঁসি না আঁচড়কামড়?'

'দুহাতের জোড়া-কিলের আছাড় চলেছে তো চলেইছে। হঠাৎ ঘুমভেঙে আমি হতচকিত ও জর্জরিত! আমার চীৎকারে ওঁর হুঁস হল। অমনি বালিসে ঘুম গুঁজড়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুতেই আর সাড়া দিলেন না। যতবার ঘটেছে ঠিক এই রকমই। প্রতিকারের কথা তুলতে গেলে আত্মঘাতী হতে চান। কিন্তু প্রতিকার না হলে আমি বাঁচি কি করে।'

'প্রহারের সময়ে কোন রকম শব্দ করেন কি?'

'হুঁ। আর কিছু নয় শুধু ফোঁস ফোঁস বা হুঁস হুঁস শব্দ। যতক্ষণ কিল-আছাড় চলতে থাকে।'

শুনেই কালিদাস দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন, 'অনেক দুঃখ পেয়েছ। আর বোধহয় পেতে হবে না। এস তুমি। মনকে চাঙ্গা কর। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

বন্ধুভদ্রা বিনত হয়ে কালিদাসের পদস্পর্শ করলে। কালিদাস তাঁর মাথায় হাত রাখলেন। বললেন ,'এস।'

ক্ষেমরক্ষিতের সঙ্গে কন্যারাণী ভিতর মহলে চলে গেলেন।

ক্ষেমরক্ষিত ফিরে এলে কালিদাস বললেন' 'কতদিন আগে আপনার কর্তা ভাবী জামাই বাবাজীকে পেয়েছিলেন?'

'দশ বারো বছর হবে। ঠিক তারিখ চাই কি?'

'না। কার কাছে পেয়েছিলেন?'

'মহারুদ্র মঠের আচার্য বটেশ্বর স্বামীর কাছ থেকে। সেবার উনি ভদ্রাবতীতে বর্ষাযাপন করছিলেন। ছেলেটি সঙ্গে ছিল।'

'আমাকে কালই মহারুদ্র মঠের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়তে হবে! আপনি সব ঠিকঠিক করে দিন।'

'বেশ।'

কয়েকদিন পরে মহারুদ্র মঠের অতিথিশালায় কালিদাস গিয়ে হাজির হলেন। আহারের পর কালিদাস মঠস্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

সেবক বললে, তিনি তো খুব বৃদ্ধ হয়েছেন এখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না।'

কালিদাস বললেন, 'আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁকে জানাও গিয়ে যে উজ্জয়িনী থেকে কুমার সম্ভবকার এসেছেন তাঁর দর্শনার্থী হয়ে।'

সেবক গিয়ে নিবেদন করলে, 'প্রভু উজ্জয়িনী থেকে এক ব্যক্তি এসেছেন 'আপনার দর্শন পেতে। তাঁর নাম কুমার সম্ভবকার।'

বৃদ্ধ বটেশ্বর স্বামী শয্যায় কাত হয়ে ঝিমুচ্ছিলেন। শুনে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। বললেন, 'কুমার সম্ভবকার নয়, কুমার-সম্ভবকার-কালিদাস। ডাক, ডাক তাঁকে এখনি'।

কালিদাস এসে ঝুঁকে প্রণাম করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর পদধূলি নিয়ে মাটিতে বসে পড়তে যাচ্ছিলেন,। বটেশ্বর স্বামীর ব্যগ্র ইঙ্গিতে তাঁর বিছানার প্রান্তে বসলেন। স্বামী তাঁর দুটি হাত ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় ধীরে ধীরে বললেন,

'অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে ॥

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর এই কথা শুনে কালিদাসের বুক ঠেলে চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় বললেন, 'আমার লেখনী ধারণ সার্থক হয়েছে,—আজ তা বুঝলুম।'

উজ্জয়িণীর কথা, মহাকালের কথা, মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের কথা ইত্যাদি নানা কথার পর বটেশ্বর স্বামী বললেন, বিশেষ কি হেতু আগমন সে কথা বলুন।'

'তুচ্ছ সামান্য জ্ঞাতব্য কিছু উপলক্ষ্য করে আপনার দর্শনে নিজেকে ধন্য করতে এসেছি। আজ যখন অনায়াসে আপনার দর্শন পেয়েছি তখন তুচ্ছ জ্ঞাতব্যের কথা ভাবি না। ও এমনিই পাব।'

'না না বলুন। লজ্জা বা বিনয় করবেন না। জ্ঞান হল জিজ্ঞাসা বৃক্ষের ফল। ভালো সে ফল কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। গাছ থেকে পেড়ে নিতে হয়। জানেন তো মনু মহারাজের সাবধানবাণী—"না পৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়াৎ।"

'আমি ও অন্যায় প্রশ্ন করব না। আচ্ছা, কখনো আপনার কোন রজক জাতীয় বালক অনুচর ছিল?

'একবার একটি অব্রাহ্মণ ছেলেকে কাছে রেখে কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে ছিলুম। কিন্তু তার জাত কি ছিল তা তো কখনো জিজ্ঞাসা করিনি। তার নাম ছিল গজানন, আমি পালটে রেখেছিলুম ষড়ানন। চেহারা ভালো ছিল, রাজপুত্রের মতো। বুদ্ধিশুদ্ধিও খুব ধারালো ছিল। তবে সে ব্রাহ্মণ নয়, তাকে সন্ন্যাস দেওয়া যেত না। তাই তাকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়াই নি। কাব্য ও নীতি শাস্ত্রে বেশ পড়াশোনা করছিল সে আমার কাছে।'

'কোথায় ওকে পেয়েছিলেন?'

'গোদাবরীর ধারে বাকাটক গ্রামে আজীবিকদের জন্যে নির্মিত প্রাচীন গুহায় একবার আমি চাতুর্মাস্য যাপন করেছিলুম। ছেলেটি রোজ দুপুর বেলায় আমার কাছে এসে চুপ করে বসে কথা শুনত। সূর্যাস্ত হবার আগেই সে উঠে যেত। দুপুর বেলায় আর কেউ না থাকলে আমি তাকে বর্ণমালা শেখাতে প্রবৃত্ত হতুম। চার মাস শেষ হবার আগেই সে অক্ষর সব চিনে গেল। বানান করে সব পড়তে পারত, বানান করে সব লিখতেও পারত। তাই, আমার চলবার সময় হলে সে যখন ম্লান মুখ করে আমাকে বললে, আমার সঙ্গে সে যাবে তখন আমি মন কঠিন করে তাকে না বলতে পারিনি।

আমি জানতুম তার বাপ মা কেউ ছিল না। হয়ত তাকে সঙ্গে এনে ভুল করিনি। সে মানুষ হয়েছে, রাজসহচর। হঠাৎ তার কথা কেন? 'না না, তার কিছু হয়নি, সে ভালোই আছে। রাজা তাকে জামাতা করেছিলেন। রাজার মৃত্যু হয়েছে। আপনার ষড়ানন এখন রাজকন্যার স্বামী ও প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসন করছেন। ওঁদের মন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিত জামাতা-রাজার অজ্ঞাত কুলশীলত্ব ঘুচাতে চাইছেন ওর পূর্বপুরুষদের সন্ধান করে।'

'এমন বংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কী হবে? যা ঘটবার তাতো ঘটেই গেছে। এখন আপনার হাত। যদি আর একটি 'বংশ' বা 'সম্ভব' কাব্য লিখে দেন তবে জামাতা বাবাজীর কুলগৌরব সাত তাল ছাড়িয়ে যাবে।'

এই বলে বটেশ্বর স্বামী হাসতে লাগলেন। সে হাসিতে কালিদাসের কণ্ঠও খুলে গেল। পাশের ঘর থেকে সেবক উঁকি মারলে ব্যাপার কী দেখতে।

তারপর সাত পাঁচ কথা হল। কালিদাস প্রণাম করে বিদায় নিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর মাথায় হাত দিয়ে বেদমন্ত্র পড়ে আশীর্বাদ করলেন,

"সুগা তে সুপথা কৃণু
পূষন্নৃ ইহ ক্রতুং বিদঃ।"

অতিথিশালায় রাত কাটিয়ে ভোর হতেই কালিদাস বেরিয়ে পড়লেন। উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করে কালিদাস তক্ষনি ডাক দিলেন বেতাল ভট্টকে। বেতাল আসতেই তাকে বললেন, 'আজই তোমাকে এক ব্যাপারে খোঁজে বেরতে হবে।'

'বলুন।'

বিদর্ভে প্রতিষ্ঠানপুরের অনতিদূরে এক বিখ্যাত শৈব মঠ আছে মহারুদ্র নামে। সেখানকার বৃদ্ধ-আচার্য বছর দশেক আগে বাকাটক গ্রামে আজীবিকদের প্রাচীন গুহাগৃহে বর্ষা-চাতুর্মাস্য করেছিলেন। গ্রামটি গোদাবরীর সন্নিকটে, আজীবিকদের গুহা নদীতীরে। তুমি ওই গ্রামে গিয়ে খোঁজ নেবে কোন একটি সুদর্শন বালক,—জাতি ব্রাহ্মণ নয়, পেশা সম্ভবত রজকের—সেই বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে বিবাগী হয়ে গ্রাম ত্যাগ করেছিল কি না। যদি সেখানে অথবা অন্য কোনখানে ওই রকম কোন গ্রামে, ওইভাবে বিবাগী হওয়া কোন ছেলের সন্ধান পাও তবে তার খুঁটিনাটি সব বিবরণ অবিলম্বে আমাকে এনে দেবে। এ ব্যবহার কৌশলের কাজ অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তুমি না পারলে আমাকেই বেরুতে হবে।'

'না না। কিছু ভাববেন না। আমি পারব।'

'তবে সাবধান। কোনরকমে কারো মনে সন্দেহ যেন না হয় যে তুমি চরবৃত্তি করছ। অতি গোপনীয় ব্যাপার। মরণ-বাঁচনের সূক্ষ্ম সমস্যা।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন। পক্ষ কালও লাগবে না। খবর এনে দিচ্ছি।'

'শিবাস্ তে পন্থানঃ সন্তু।'

বেলা দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গেছে। গোদাবরী—তটস্থ গুহাবাসের দ্বারে বসে এক দীর্ঘকায় বলবান পরিব্রাজক, চেয়ে দেখছেন অনতিদূরে এক রজকের বস্ত্রধাবন কাণ্ড। কাপড় কাচা শেষ করে শুকুবার জন্তে তা মেলে দিয়ে রজক ধীরে ধীরে গুহা-গৃহের ধাপ বয়ে উঠে এল রৌদ্র তাপ থেকে বিশ্রাম নিতে। কাপড় শুকুলেই সে তা গুটিয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে।

উঠেই পরিব্রাজককে দেখে সে বিস্মিত হল। প্রণাম করে বললে, এখানে কেউ রয়েছেন আমি তা বুঝতে পারিনি।'

'অনেকক্ষণ। তোমার কাপড় কাচার কৌশল দেখছিলুম।'

একটু লজ্জা পেয়ে লোকটি বললে, 'আপনার ভিক্ষা হয়েছে তো?

'না ভিক্ষা এখনও হয়নি। তার কোন প্রয়োজন ও বোধ করছি না কাল যেখানে ছিলুম সেখানে ভিক্ষা একটু গুরুতর রকমই হয়েছিল।'

'তা কি হয়। আমাদের গ্রামে এসে সাধুবাবাজী উপবাসী থাকবেন? আপনি গ্রামের দিকে যান। এখন ও সব গৃহস্থের হেঁসেলের পাট উঠে নি। উঠুন, দেরি করবেন না।'

পরিব্রাজক হেসে বললেন, 'শরীর বড় ভার ঠেকছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না তোমার সঙ্গে কথা কইলে বোধ হয় শরীরটা ঝরঝরে হবে। আমার একটু বকমবাই আছে। কথাবার্তার মানুষ পেলে আর কিছু চাই না। আচ্ছা তোমাদের এখানে কত কালের বাস?

'আজ্ঞে আমি শ্বশুর বাড়ীতে থাকি। এসেছি দশ বিশ বছর হল। আমার শ্বশুর গোষ্ঠীর বাস এখানে অনেক পুরুষের।'

'আমি আট দশ বছর আগে এখানে একবার এসে দু এক দিন কাটিয়ে ছিলুম। তখন দেখেছিলুম একটি সুশ্রী ছেলেকে কাপড় কাচতে। তাকে চেন? সে আছে?

'আজ্ঞে খুব চিনতুম। গজানন আমার শ্বশুরদের জ্ঞাতি ছিল যে।'

'কী হল তার?

সে এক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে ঘর দুয়ার ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেছে, অনেকদিন হল।'

'কী রকম ?'

'শুনবেন ? তবে বলি। তার বাপ মা ছিল না। বাপ ভালো রজক ছিল। দুটি ভালো গাধা ছিল, নাম দিয়েছিল তাদের মন্দী আর ভন্দী। বাপ মারা যেতে সে গাধা দুটিকে পালন করত, অল্পস্বল্প কাপড় কাচার কাজ করত। কী জানি কী হল। ঘরে চাবি তালা মেরে মন্দী-ভন্দী তার এক জ্ঞাতি খুড়োকে দিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীর চেলা বনে দেশ ছেড়ে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে। তাকে আমি দেখেছি। সকলেই তাকে পছন্দ করত। তার ভিটেতে কাঁথ এখনও খাড়া আছে তবে চালে খড় নেই। যদি কখনো ফিরে আসে এই ভেবে সে ভিটে আমরা কাউকে দখল করতে দিই নি।'

বেতাল ভট্ট অন্য কথা পাড়লেন। বেলা পড়ে এল। লোকটি বললে, 'এই বার উঠি। কাপড় চোপড়গুলো জড় করে বাড়ী যাই। আপনার জন্যে কিছু ভিক্ষা এনে দিতে হবে তো।'

পরিব্রাজক বললে, 'ব্যস্ত হয়ো না। একদিন কিছু না খেলে আমার শরীর ভালোই থাকবে। মনে রেখো আমি ভিক্ষুক। দরকার হলে চাইতে আমার লজ্জা নেই।'

'না না তা হবে না।' বলে সে উঠে গেল।

দণ্ড চার পাঁচ পরে সে ফিরে এল। তার এক হাতে এক ছড়া পুষ্ট পাকা কলা, আর হাতে একটি ছোট ভাঁড়, তাতে কিঞ্চিৎ গুড়।

কলাছড়া ও গুড়ের ভাড় নামিয়ে রেখে লোকটি বললে, দিন আপনার 'কমণ্ডলু। নদী থেকে জল এনে দিই। আপনি হাত পা ধুয়ে এসে কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন। এখনো সূর্য ডোবে নি।'

লোকটির বোধ হয় জৈন সাধুদের আচরণ জানা ছিল।

আহারের পরে সে পরিব্রাজককে বললে, 'একটু বাইরে এসে দাঁড়ান।' এই বলে একটা গাছের ডাল ভেঙে এনে গুহাকক্ষটির মেঝে খানিকটা সাফ করে দিলে। বললে, 'এইবার এখানে আঁচল পেতে গড়িয়ে নিতে পারেন। তারপর সে বিদায় নিলে প্রণাম করে। পরিব্রাজক আশীর্বাদ করলে, 'তোমার ভালো হোক।'

কাজ সফল হয়েছে। বেতালের মন এখন উজ্জয়িনীতে ফিরতে উদ্‌গ্রীব। অথচ এখানে রাত কাটিয়ে ফেরবার উপায় নেই। লোকটি যেমন ব্যস্তবাগীশ, হয়তো মাঝরাত্রিতে খেয়ালবশে.বাবাজী কেমন আছে জানতে এসে পড়তে পারে। তখন আমাকে না দেখতে পেলে সন্দেহ করবে আমি হয়ত চোর-

হেঁচড়। রাতটা কাটানো যাক।

'খবর মিলেছে?' বেতাল ভট্টকে দেখেই কালিদাস বলে উঠলেন।

সহাস্য বদনে বেতাল ঘাড় নেড়ে জানালে খবর মিলেছে।

তার সব কথা কালিদাস মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'বেশ। তোমার ছুটি হল। বিকেলের দিকে অগ্নি শর্মাকে একবার পাঠিয়ে দিয়ো।'

পাঠশালার দ্বারে অর্গল দিয়ে কালিদাস চিঠি লিখতে বসলেন।

"অপরান্তপ্রান্তসিংহাসনাসনা স্বাধিকারাৎ পট্টমহাদেবী শ্রীশ্রীমতী বন্ধুভদ্রা রাজশ্রী মাতার করকমলে নিবেদন -

বৎসে, রুষ্ট হইয়ো না এই সম্বোধনে। আমার ভাগ্যে সন্তানলাভ যদি ঘটিত তবে দুহিতা হইলে তোমার বয়সীই হইত। তোমাকে আমার না-হওয়া কন্যা বলিয়া ভাবিতে ভালো লাগিতেছে। বৃদ্ধকে ক্ষমা করিয়ো।

তোমার রাজশ্রী চিরকাল অম্লান থাকুক, সে পদ্মের একটি পাপড়িতেও যেন হিমস্পর্শ না ঘটে।

জামাতা বাবাজীর রোগ-বিনিশ্চয় করিয়াছি। তাঁহার গায়ে প্রেতের বাতাস লাগিয়াছে। কোনো রজক-যোগিনীর ক্ষেত্রে অথবা তাহার অধিষ্ঠিত গাছের তলায় উনি কিছু অনাচার করিয়া থাকিবেন। সেই অপরাধে অপদেবতা আশ্রয় লইবার সুযোগ পাইয়াছে।

রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা দিতেছি। অব্যর্থ প্রতিকার। মনে মনে এই মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়া রাখিবে। প্রয়োজন হইলেই তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিতে হইবে।

"স্মর বাকাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ॥"

'রোগ-লক্ষণ প্রকট হইলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীর কানে এই মন্ত্রটি একটি বার জপ করিবে সুস্পষ্টভাবে। তাহাতে তখনি ফল না পাইলে উচ্চৈঃস্বরে আর একবার আবৃত্তি করিবে। তখনি ভূত ছাড়িয়া যাইবে। তৃতীয়বার আবৃত্তি করিবার আবশ্যক হইবে না।

'এ মন্ত্র কাহাকেও বলিয়ো না। বলিলে ফল হইবে না!'

'এই পত্র প্রিয়বর ক্ষেমরক্ষিতকে দেখাইবে। জামাতা বাবাজীকেও দেখাইতে পার। কিন্তু আর কাহাকেও নয়। পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

মন্ত্র প্রয়োগের ফলাফল অবশ্য অবশ্য আমাকে জানাইবে।

তুমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কল্যানপরম্পরা ভোগ করিতে থাকহ এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। ইতি উজ্জয়িনীতঃ শ্রীকালিদাসস্য। সংবৎসর ২৪ হেমন্ত পক্ষ ৬ দিবস ৮॥'

পত্রটি চন্দন কাষ্ঠের পাটার মধ্যে রেখে রেশমি সুতায় বেঁধে মুদ্রাঙ্কিত হল। তার উপরে ঠিকানা লেখা হল, 'শ্রীশ্রীমতী বন্ধুভদ্রা পট্টমহাদেবী কর কমলে।' সেটি আর দুটি বৃহত্তর পাটার মধ্যে বেঁধে দিয়ে সিল করা হল। এর উপরে ঠিকানা রইল, 'কুমারপাদীয় মহামন্ত্রীবর শ্রীযুক্ত ক্ষেমরক্ষিতেন প্রাপ্তব্যা দ্রষ্টব্যা চেয়ং কীলমুদ্রা'।

বিকালে অগ্নিশর্মা এলে চিঠিটি তার হাতে গচ্ছিত করে দিয়ে কালিদাস বললেন, 'এটি যত শীঘ্র পারো ভদ্রাবতীতে গিয়ে মহামন্ত্রী ক্ষেমরক্ষিতের হাতে দিয়ে এস।' অগ্নিশর্মা চিঠি নিয়ে চলে গেল।

মন্ত্রবলে বলীয়সী কন্যারানী এখন সাহস করে পতির শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। রাত্রিতে ঘুমোবার আগে রোজই মনে একটু চাঞ্চল্য আসে, কি হয় কি হয়। একদিন ঘটে গেল গুহগুপ্তের রোগের প্রকাশ। বন্ধুভদ্রা প্রহার উপেক্ষা করে স্বামীর কানের কাছে অনুচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণ করে মন্ত্র পড়লে

'স্মর বাকাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরীং নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ॥'

শুনেই গুহগুপ্ত ঠাণ্ডা, একেবারে জল। এক মুহূর্তে মানুষটা বদলে গেল। বাঘ হয়ে গেল পোষমানা কুকুর। কিছু না বলে সে বালিসে মুখ গুঁজে শুয়ে রইল। বন্ধুভদ্রা তাকে কিছু বললে না।

পরের দিন সকালে গুহগুপ্ত পত্নীকে বললে, 'কাল রাত্রিতে যে শ্লোক শোনালে ওটি আমার খুব মনে লেগেছে। ওটি কার লেখা? কোথায় পেলে?

'কালিদাসের লেখা। আমায় দিয়েছেন তোমার উপর ভূতের নজর লেগেছিল, তা কাটাবার জন্যে।'

জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে গুহগুপ্ত বললে, 'লোকে ঠিকই বলে। "জিহ্বাগ্রেহস্য সরস্বতী"। আর ও কথা ভুলে যাও॥'

ডঃ সুকুমার সেন : জন্ম বর্দ্ধমান জেলার রায়নার গোটান গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে বর্দ্ধমান শহরে লেখা পড়া সমাপ্ত করে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার্থে আগমন ও দিগবিজয়ী ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন পণ্ডিত, অধ্যাপক ও বৈয়াকরণ। তবে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক যে গল্পকার ও বিশেষ করে গোয়েন্দা গল্পের অনুরাগী পাঠক, তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলেও বোধ হয় অনেকেই জানেন না। ডঃ সুকুমার সেন "কালিদাস তাঁর কালে"-গ্রন্থে তৎকালীন জীবন ও পারিপার্শিকতার প্রেক্ষাপটে বিচিত্রও বিভিন্ন রসসিক্ত বেশ কিছু গোয়েন্দা-ধর্মী গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। সুকুমার বাবুর নিজের কথায় বলি "আমি কালিদাসকে ডিটেক্‌টিভ কল্পনা করে কয়েকটি গল্প খাড়া করেছি"। কালিদাসের কাল বলতে লেখক সাদামাটা ভাবে আজ হতে প্রায় দেড় দুই হাজার বছর পূর্বের জন-জীবনকে প্রেক্ষাপটে এঁকে গল্পিক বিন্যাস সৃষ্টি করেছেন। গল্প কাহিনী হলেও গল্প গুলির অধিকাংশই ইতিহাস আশ্রিত তাই উদ্ভট নহে। লেখক গল্পগুলি লেখার প্রেরনা পেয়েছেন ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল জমানতে সিদ্ধকাম রিহার্ড ভ্যান গুলির ও লিলিয়াম ডেলা টরের রচনা হতে।



ডিটেকটিভ

মনোজ বসু

কলমটা নেই। সোনালি দামি কলম—এজিনিস বড় দুর্লভ এখনকার দিনে। সকলের বড় কথা, কলমটা বড্ড মেনে দিয়েছিল, অভ্যাসের গুণই হয়তো—এ কলম হাতে নিয়ে বসলে ঝরঝর করে লেখা বেরিয়ে আসে। ভাবতে হয় না মোটে, কলমই যেন বানিয়ে বানিয়ে লিখে যায়।

এ হেন কলমটা গেল। সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজছি। লেখা-টেখা শিকেয় উঠে গেছে। হাত মুচড়ে নুলো করে দিল, লিখব আর কেমন করে?

শান্তা আর আমি—দুজনের সংসার। আর ছোকরা চাকর একটা—রঞ্জিত। হেন অবস্থায় স্ত্রীর কাছে লোকে সহানুভূতির প্রত্যাশা করে। ঠিক উল্টো। রণং দেহি ভাব শান্তার: কে তোমায় নুলো করল শুনি? মানুষটা কে?

চোর—

ঠারেঠোরে বললে হবে না। কাকে সন্দেহ করছ, শুনতে চাই—

মোটমাট তিনজন তো আমরা। আমার জিনিসটা নিজে আমি চুরি করতে যাই নি। আর টাকাকড়ির ব্যাপার হলে না হয়—

ঢোক গিলে বলি, মানে নিজের জন্য নয়—ভাবতে পারতাম, সংসার খরচের দায়ে নিয়ে নিয়েছ তুমি। কলম কেন তুমি নিতে যাবে?

শান্তা এগিয়ে দিল: তিন জনের ভিতর দুজন তবে বাদ হয়ে গেল। রইল গিয়ে—

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল: সে জানি। রঞ্জিত দু-চোখের বিষ হয়েছে তোমার। 'মা' বলে ঐ যে আমার কাছে কেঁদে এসে পড়েছিল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি। অনাথ গরীব মানুষ—সে চোর না হয়ে অন্য কে হতে যাবে?

তা বলে কলম টেবিল থেকে পাখনা মেলে উড়ে পালাতে পারে না। গর্জে উঠল শান্তা: তুমি সরিয়েছ দোষটা রঞ্জিতের ঘাড়ে পড়বে বলে। তাড়ানোর অজুহাত।

কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব। এমনি সময় যাকে নিয়ে ব্যাপার সেই রঞ্জিত কেঁদে এসে পড়ল: সর্বনাশ হয়েছে মাগো। ঘুমিয়েছিলাম দুপুরবেলা, বালিশের তলায় চাবি—চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দশটাকার নোটখানা নিয়ে নিয়েছে। আর বাবু যে সেই রুমাল দিয়েছিলেন—

আরো জিনিস নিয়েছে হয়তো। কিন্তু রুমালের কথায় স্বররুদ্ধ হয়ে রঞ্জিত আর বলতে পারে না। বম্বে থেকে আমার এক বন্ধু ডজন খানেক ছাপা রুমাল পাঠিয়েছিল, একটা তার মধ্যে বখশিস করেছিলাম রঞ্জিতকে। মানে শান্তাই দিয়েছিল তাকে। সামনের ফাল্গুনে রঞ্জিতের বিয়ে—বিয়ে করতে যাবার সময় বুকপকেট থেকে শৌখিন রুমালের একটা কোন বের করে দেবে, বরের বাহার খুলবে তাতে। রুমাল পরম যত্নে সে বাক্সে রেখে দিয়েছিল।

শান্তা চোখ পাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ রঞ্জিতকে বড় যে সন্দেহ করছিলে—এবার? নেহাৎ রঞ্জিত সামনের উপর বলে কথাগুলো বলল না তোলা রইল জানি, নিরিবিলিতে সুদে-আসলে শোধ নেবে। আমি সান্ত্বনা দিই: ভাবছ কেন রঞ্জিত? রুমাল আরও আছে, আর একটা দেবো। টাকা দশটাও দিয়ে দেবো। বিয়ের সাতটা মাস মাত্র বাকি—টাকা এখন তোমার কাছে দশ মোহরের সমান। তোমার টাকা-রুমাল যে নিয়েছে সেই লোকই আমার লেখার ঘরে ঢুকে কলম চুরি করেছে। দিন দুপুরে

ঘরে ঢুকে চুরি করেছে। ছাড়ব না আমি, ডিটেকটিভ লাগিয়ে চুরির আস্কারা করব।

ধাপ্পা নয়। একেবারে হাতের কাছেই ডিটেকটিভ—দুর্গাদাস। আমার খুব খাতির করে। রঙ্গক্ষেত্রে যতক্ষন রঞ্জিত মাত্র ছিল, ডিটেকটিভের নামোচ্চারণের উপায় ছিল না, শাস্তা আস্ত রাখত না তা হলে আমায়। তৃতীয় লোক এসে পড়ায় এখন আর বাধা নেই।

কলমটা চাই দুর্গাদাস, তবে বুঝবতোমার ক্ষমতা।

দুর্গাদাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আদ্যোপান্ত শুনল। বলে, তদন্ত আমরা বাড়ি থেকে শুরু করি। আগে চাকর-বাকর

শিউরে উঠে বারণ করি: দাদা বলে মান্য করো, আমায় কেন বিপদে ফেলবে। চাকর নামে যিনি এ বাড়িতে বিচরণ করেন, আসলে তিনি গুরুঠাকুর—

খাতিরে দুর্গাদাস পদ্ধতি বদলায়। বলে, ড্রয়ার থেকে কলম নিয়ে গেছে। বাকি ড্রয়ার শুদ্ধ হাতড়েছে নিশ্চয়? যেমন আছে ঠিক তেমনি থাকবে, আপনার কি বউদির কারো হাতের ছাপ না পড়ে।

রঞ্জিতকে ডেকেও সেই কথা: তোমার খোলা ট্রাঙ্ক যেমনটি আছে, রেখে দাও। রাতটা থাকুক এমনি, সকালবেলা আমাদের লোক আসবে।

পরের দিন ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা এসে গেল। ম্যাগ্নিফাইং-গ্লাস ঘুরিয়ে এখানে-ওখানে বিস্তরক্ষণ প্রণিধান করে দেখে। টেবিলের উপর আর রঞ্জিতের বাক্সে শাদা মতন গুঁড়ো ছড়িয়ে সন্তর্পনে মুছে দেয়। ক্যামেরা নিয়ে এসেছে টুকটুক করে ফোটো তুলল বিস্তর। দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

ক'দিন পরে দুর্গাদাসের আবির্ভাব।

হদিস পেলে কিছু?

তাচ্ছিল্যের সুরে দুর্গাদাস বলে, পাব না মানে? এই বিজ্ঞানের যুগে চোর ধরা তো ডাল-ভাতের সামিল। চুরি করতে এসে চোর নাম-ধাম লিখে রেখে যায়। লেখা সব নিয়ে এসেছি, শুধু পড়ে নেবার অপেক্ষা। আঙুলের ছাপের একগাদা ফোটোগ্রাফ ব্যাগ থেকে বের করল। দুখানা বাছাই করে নিয়ে মেলে ধরল সামনে: দেখুন—

আমি কি বুঝব? তুমি পড়তে জানো—পড়ে দেখে যা বলবার বলো। কিছু বিরক্ত হয়ে দুর্গাদাস বলে, কেন বুঝবেন না? কাণা মানুষেও বুঝতে

পারবে—ফোটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, মিলিয়ে দেখুন। এই ছাপ আপনার টেবিলের উপরের, আর এটা রঞ্জিতের বাক্সের। কি দেখছেন বলুন এবারে?

দেখছি তো অন্ধকারেই শুধু। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে বলা যায় না। দুর্গাদাসই সদয় হয়ে বুঝিয়ে দিল: কার্ড মিলিয়ে দেখুন, হুবহু এক। একই হাতের আঙুলের ছাপ। দুটো মানুষের মুখের আদল কিম্বা হাতের লেখা যেমন এক হয় না, আঙুলের ছাপও তেমন একরকম হবার জো নেই। চাক্ষুষ প্রমান দেখিয়ে দিই, আসুন।

ব্যাগের মধ্যে দেখছি কালির প্যাডও রয়েছে। সম্মতির অপেক্ষা মাত্র না করে প্যাডের কালি আমার বুড়ো আঙুলে মাখিয়ে দুর্গাদাস ছাপ তুলে নিল। রঞ্জিতকে ডাকে: তুমি এসো। তারও আঙুলের ছাপ নিল।

দুটো ছাপ চোখের সামনে নিয়ে ভাল করে দেখে আমার হাতে দিল: একেবারে আলাদা দেখছেন? হতেই হবে। সিদ্ধান্ত তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে?

আনাড়ির মতো বলে ফেলি, আমার কলম আর রঞ্জিতের রুমাল একই লোকে নিয়েছে।

সায় দিয়ে দুর্গাদাস আরও জুড়ে দেয়: সেই লোক আপনি নন, রঞ্জিতও নয়। যেহেতু ছাপ আলাদা। চোর হল বাইরের, দিন দুপুরে বাইরে থেকে এসে ঢোকে—পয়লানম্বরের ঘুঘুচোর সে মানুষ—

কিন্তু মানুষটা কে, ধরো।

দুর্গাদাস তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, তদন্তের পনের আনা সেরেছি তো ঐ একআনাও বাকি থাকবে না দাদা। মানুষ ধরব, দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

অবাক হয়ে বলি, একআনা কি বলছ দুর্গাদাস? আরও তো বাড়ল গোলমাল—ঘর নাকচ করে অজানা সমুদ্রে দাপাদাপি।

দুর্গাদাস বলে, অজানা নয়, সমুদ্রও নেই আর। ঘুঘুচোর বলেই সুবিধা-পুকুরের মাছের মতন তারা সব আমাদের কাছে জিয়ানো থাকে।

রেজেস্ট্রি-খাতায় নামধাম কাজকর্মের ফিরিস্তি, লাইব্রেরীতে ফিংগার-প্রিন্টের বিপুল সংগ্রহ। ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে হাত কড়া পড়ানোর কাজ-টুকু মাত্র বাকি এখন। মানুষ আমি আন্দাজে ধরছি একজন দু-জন নয়—ভারী-সারি দিব্যি একটি দল। একলা তোমার বাড়ি নয় দাদা, পাড়ায় পাড়ায় এমনি রহস্যময় চুরি হচ্ছে।

করিৎকর্ম বটে দুর্গাদাস। পরের দিনই হাতকড়া পরানো একটি লোক

নিয়ে আমার বাড়ি হাজির। চোর দেখতে সকলে বারাণ্ডায় এসে জুটেছি। কঙ্কালসার চোর—সামনে থেকে টানছে এক কনস্টেবল, পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে আর একজন। দুই ইঞ্জিনে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত নিশ্চয়।

দুর্গাদাস রঞ্জিতকে বলে, চিনতে পারো কিনা দেখ। এ বাড়ির আশে-পাশে কিম্বা পাড়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখছ কিনা।

রঞ্জিত একনজরে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। থতমত খেয়ে বলে উঠল, কই না—

দুর্গাদাস হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: ঠাহর করে দেখে বলো। চোর হুট করে ঘরে ঢোকে না। আগে থেকে ঘোরাঘুরি করে সুলুক—সন্ধান নেয়। তখন বুঝি দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়: হুঁ, দেখেছি বটে—

চোর লোকটা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, দেখছ আমায়, কোথায় দেখেছ? ধর্মকথা বলো—

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্গাদাস তার চুলের মুঠি ধরল: আবার চালাকি খেলছিস? খেলা করে পার পাবিনে, সত্যি জিনিস সরল-ভাবে স্বীকার কর—

লোকটা তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে। এই রাস্তায় এই বাড়ি থেকেই নিয়েছি আমি। টিনের বাক্স থেকে টাকা নিয়েছি, টেবিলের খোপ থেকে কলম।

প্রশ্ন করি কি রকম টেবিল আমার—বড় না ছোট? কি রঙের? টেবিল আছে কোন ঘরে।

দুর্গাদাস আহত কণ্ঠে বলে, ঐটা কিন্তু জুলুম আপনার দাদা।

অত্যাচারই বলব। টুক করে এসে কাজ সেরে চলে গেছে—তার মধ্যে ফিতে মেপে টেবিলের মাপজোখ করবে? ঘর নিরিখ করে রাখবে? এত সময় ছিল কোথা? জেরা করবেন না, জেরায় হেরে যাবে।

লোকটাও কবুল—জবাব দিল: আজ্ঞে না, জেরায় পেরে উঠব না। বেশ, জেরা বন্ধ। পায়ের উপর ছড়া-ছড়া দাগ কিসের বাপু? এটা কিছু মাপ-জোখের ব্যাপার নয়, এটা বলো।

দুর্গাদাস হেসে বলে, জবাব দেরে। সত্যি কথাই বলবি। দাদা কত কি সন্দেহ করছেন হয়তো। এত খেটে মরি, বদনামের তবু অন্ত নেই। কি হয়েছিল, পায়ের উপর কিসের দাগ ওগুলো?

একবার দুর্গাদাসের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে, মশা বড্ড লকআপে—খানিকটা আপন মনে দুর্গাদাস বলে,, এতদূর বুঝতে পারিনি। আজকেই মশারির বন্দোবস্ত হবে, মশা আর কামড়াতে পারবে না।

আমি বললাম, তা-ই তো উচিত। গড়গড় করে সবই স্বীকার করে গেল, এর উপরে আর মশা দিয়ে কামড়ানো উচিত হবে না। কিন্তু আসলের কিছু হয়নি দুর্গাদাস। চোরের গরজ নেই, আমি চাই কলম। অমন কলম একটা বই দুটো হয় না।

দুর্গাদাস মাথা চুলকে বলে, সেই তো মুসকিল দাদা। বমাল চোরে সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দেয়। খুন করে ফেললেও তারপরে আর খোঁজ দিতে পারে না। চোর ধরে এনে দেখিয়ে গেলাম, কলম আনতে পারব কিনা কথা দিতে পারি নে।

সরেজমিন তদন্ত সেরে চোর নিয়ে দুর্গাদাসের দলটা চলে গেল। এতক্ষণের নির্বাক দর্শক শান্তা এইবারে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে; তুমি যেন খুশি নও, মনে হচ্ছে। রঞ্জিত ফসকে গেল সেই দুঃখে? সংসারের মালিক হলে তুমি—আমায় মা বলতে অজ্ঞান, সেই দোষে রাখতে না চাও স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলেই তো হয়। নির্দোষীকে কলঙ্ক দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা কেন?

রঞ্জিত জানতাম সিঁড়ির ঘর মুছতে চলে গেছে। তা নয়, হতভাগাটা ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল, দোর ঠেলে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে ঢুকল। বলে, এখন চলে গেলে সন্দেহ আসবে, সেই জন্য আছি। নয় তো সেই চুরির দিনই বিদায় হয়ে যেতাম। গণ্ডগোল মিটে গেলে তারপর একটা দিনও আর থাকব না, এই আমার বলা রইল। শান্তা কটমট করে তাকাচ্ছে। বিগলিত কণ্ঠে আমি বলে উঠি: এটা কি হল বাবা রঞ্জিত, আমাদের দুজনের কথা বার্তার মধ্যে ছেলে হয়ে কেন আড়ি পাতবে? শান্তা বকাবকি করে সেই সঙ্গে তুমিও যদি লাগো, বাড়ি ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। মায়ে ছেলেয় মিলে চালাওগে তোমাদের সংসার।

তবু পড়ে না দেখে আচ্ছা এক তাড়া দিয়ে উঠলাম: যাও, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চেহারাখানা কি দাঁড়িয়েছে, আয়না ধরে দেখ। চানটান করে খেতে বসোগে এবার।

রঞ্জিতকে ঠাণ্ডা করলাম। তবু শান্তা ভ্রূকুটি করে: গোড়া কেটে আগায় জল, সবাই বুঝতে পারে। মুখেই ছেলে ছেলে করছ—বিশ্বাস করো ওকে? তা যদি হত, লেখার ঘরে তালা দিয়ে বেরুতে না অমন।

সেটা বাচ্চুর অত্যাচারে। সেদিন দেখলাম, ঘরে ঢুকে টেবিল হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করছে।

বাচ্চু হল পাশের ফ্লাটের। আসে সে প্রায়ই, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জেঠা-জেঠা করে আমায়।

শান্তা তাই বলল, বাচ্চার অত্যাচার তো নতুন নয়। কলমচুরি যাবার পর থেকেই তুমি তালা আঁটাআঁটি করছ। রঞ্জিত কি মানে বোঝে না এর ?

তারপরে ঠাণ্ডা মাথায় আদ্যো পান্ত ভেবে নিয়ে পড়ার ঘরের চাবি রঞ্জিতকেই দিয়ে দিলাম : দেখ বাবা, চাবি হারানো আমার রোগ। কত যে চাবি হারিয়েছে, গোনাগুণতি নেই। অথচ ঘর খুলে রাখবারও জো নেই— বাচ্চুটা ইদানীং বড্ড বাড়িয়েছে। তুমি রেখে দাও চাবি, আমি এলে খুলে দিও।

এই মাত্র নয়, ক'দিন পরে আলমারির চাবিও গুঁজে দিই তার হাতে। যে আলমারিতে আমার টাকা পয়সা থাকে : এই ভারটাও নিতে হবে বাবা। তোমার মা খরচে-মানুষ, এক হপ্তায় খরচা করে ফেলে সারা মাস উপোস করাবে। আর আমিই বা লেখাপড়া ফেলে এক টাকা দু-টাকা করে কাঁহাতক বের করে দিই। তোমাকেই সব দেখেশুনে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু উপায় নেই বাবা।

চাবি হাতে নিয়ে রঞ্জিত কেমন এক আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে যেন তার। শান্তাই তখন বলে, বাড়াবাড়ি তোমার। মিছে সন্দেহ করবে না—তা বলে কি অমনি ঢেলে বিশ্বাস করতে হবে! এমনি ব্যবস্থার ভিতরেও আবার চুরি হল। হাতঘড়ি আমার। সন্দেহ পাছে রঞ্জিতের উপর পড়ে, সেই শঙ্কায় আমিই শতকণ্ঠে নিজের দোষ বলছি : ভুলো স্বভাব যে আমার! ঘড়িটা হাতে করে নিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে ছিলাম। কথায় কথায় পরতে আর মনে নেই, ওখানে ফেলেই চলে গিয়েছি। তারপর দফাদার এসেছে, ডাকপিওন এসে চিঠি দিয়ে গেছে—পেশাদারি চোরও হতে পারে। দুর্গাদাসকে ডাকি। বেঞ্চির ওদিকটা কেউ তোমরা যেও না—সে এসে হাতের ছাপ-টাপ নিয়ে তদন্ত করুক।

ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞা ভরে রঞ্জিত বলে, করবে কচু আর ঘেঁচু। ভাঁওতা দিয়ে গুচ্চের টাকা নেবার ফিকির।

তা বললে হবে কেন রঞ্জিত। কলমের চোর ওই তো ধরল। বাড়ি এনে দেখিয়েও গেল চোরকে।

রঞ্জিত বলে, কলম দিল কই ?

আরো কঠিন ব্যাপার সেটা। চেষ্টা করছে। ভরসা দিল, এই মাসের ভিতরেই পাওয়া যাবে।

রঞ্জিত বলে, ঘোড়ার-ডিম।

মুহূর্ত কাল ভেবে নিয়ে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে: আমি নিয়েছি কলম। মারতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন। আমারই দোষে একটা লোক মিছামিছি মারগুতোন খেয়ে মোলো।

দু-চোখে জল পড়ছে তার, তুলে ধরে আমি হাসছি। রঞ্জিত বলে, বিয়ের জন্য ধরেছে তো সকলে—পনের টাকার দরকার। লোভে পড়ে নিয়ে ছিলাম। কলম আবার আমি বাড়ি এনে রেখেছি। আপনি ধরেছিলেন ঠিকই। আপনার দুর্গাদাস কিছু জানেন না, ওঁকে আনা অনর্থক।

হাসতে হাসতে বলি, না, আনব না। ঘড়ি আমি নিজে নিয়েছি। এবারের চোর আমি।

শান্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে বলি, শুনেছ সব? দুর্গাদাসের চেয়ে বড় ডিটেকটিভ তবে আমি—কি বলো?

মনোজ বসু ॥ জন্ম ১৯০২ সালে যশোহর জেলার ডাঙ্গাঘাটা গ্রামে। বাগের হাট ও কলকাতায় কলেজী শিক্ষালাভ। কলকাতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য অনুশীলন লেখককে অনতিবিলম্বে অবিভক্ত বাংলার এক যশস্বী সাহিত্যিকের মর্যাদা দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভুলি নাই" একদা জনপ্রিয়তায় ঝড় তুলেছিল। "চীন দেখে এলাম" লেখকের নবীন চীন ভ্রমণের এক জনপ্রিয় মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত। এছাড়া শিক্ষক সত্তার অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান "মানুষ গড়ার কারিগড়" লেখকের অন্যতম বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। তবে প্রথম জীবনে যুদ্ধপূর্ব্ব ও যুদ্ধোত্তর কালের ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জগৎ ও জীবনের হতাশার দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যেও লেখক বোমাক্সের "বনমর্ম্মর" ধ্বনিতে আমাদের আন্দোলিত করেছেন। পরবর্ত্তীকালে বাস্তবাশ্রয়ী পটভূমিকায় তাঁর পদশ্চারন তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। লেখকের সৃষ্ট গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকথা ও নাটকের বিরাট ও বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পও একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। তাঁর "**ডিটেকটিভ**" গল্পটি কেবল গোয়েন্দা গল্পই নয়। গোয়েন্দা গল্পও যে সার্থক গল্প হয়ে ওঠে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



তরুণগুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা

গজেন্দ্রনাথ মিত্র

তরুণ গুপ্ত ঢাকুরিয়ায় মামার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। তা ঐ যে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে বাধ্য হয়, আমাদের তরুণের ও তাহাই হইল। বড় মামা সকালে চা খাইতে খাইতে বলিলেন—কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছিস? তরুণ তখন দিস্তা খানেক লুচি লইয়া বড় ব্যস্ত। ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না।

—কাল রাত্রে যে গুড্‌স ট্রেনখানা ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতায় গেল তার মধ্যে থেকে একখানা গাড়ী চুরি গেছে।

কথাটা শুনিয়া ভাগিনেয় যতটা আশ্চর্য হইবে মনে করিয়াছিলেন ততটা আশ্চর্য্য কিন্তু সে হইল না। তবুও কহিল, গাড়ী চুরি গেল কি রকম।

—কলকাতায় পৌঁছে দেখা গেল মধ্যের একটা ওয়াগন নেই।

—তাহলে পেছনে ছিল, কি রকম ক'রে খুলে পেছনে রয়ে গেছে।

—না রে বাপু না: এখানা ঠিক মাঝখানে ছিল; পিছনের গাড়ি যেমন ছিল তেমনিই আছে, প্রথমের গাড়ীও তাই—মাঝখান থেকে একখানা গাড়ী নেই।

এইবার তরুণ সত্যই আশ্চর্য হইল। এত রকমের চুরির কথা সে শুনিয়াছে কিন্তু ট্রেন চুরি—এ যে বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক হইয়া কহিল—মাঝখান থেকে গেল কি রকম? তার পরের গুলো পৌঁচেছে।.

—হ্যাঁ! তাইতেই এত বেশী অবাক হয়ে গেছে সকলে। গাড়ী সোনারপুর থেকে ছেড়ে একেবারে কলকাতায় গেছে, পথে কোথাও থামে নি। সোনারপুর থেকে যখন ছাড়া হয় তখনও সে গাড়ী দেখা হয়েছে এবং সব গাড়ী গুনে ছাড়া হয়েছে।

—যে খানা চুরি গেছে তাতে কি ছিল?

—তা বেশ দামী জিনিষই ছিল। মজিলপুরের চক্রবর্ত্তীরা কংগ্রেস একজিবিসনে খানকতক গাল্‌চে পাঠাচ্ছিল। মুঘলদের আমলের গালচে সব, এক এক খানার দাম খুব কম ক'রে আট দশ হাজার টাকা হবে। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকার মাল ছিল ঐ গাড়ীখানায়। রেলকোম্পানীর কাছে Consignment insure করা ছিল। যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, বালীগঞ্জের ষ্টেশন-স্টাফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।···চাকরী নিয়ে টানাটানি-ত বটেই —জেল খাটতে না হয়।

তরুণ খাইতে খাইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, চলুন দেখি, ব্যাপারটা দেখা যাক্।

মামা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, খেতে খেতে উঠলে কেন কি মুস্কিল! খাওয়া শেষ ক'রে গেলেই হ'ত। এল দু'দিন জিরোতে, তোর ওসব গোল মালে কাজ কি বাপু!

তরুণ হাসিয়া কহিল, আর আমি খাব না! সত্যিই অনেক খেয়েছি। ···এই যখন আমার পেশা, তখন কি আমি এমন তাজ্জব কাণ্ড শুনেও চুপ ক'রে থাকতে পারি!

বড় মামা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলেন, কহিলেন, কোন দিকে যাবে? চুরি ত বালিগঞ্জের দিকেও হ'তে পারে যাদবপুরের দিকেও হ'তে পারে।

তরুন কহিল, তা হয়ত পারে, কিন্তু বালিগঞ্জের থেকে যাদবপুরের দিকে চুরি যাবারই সুবিধা বেশী।

কখনও ডায়মণ্ডহারবার লাইনে যাঁহারা যান নাই তাঁহাদের সুবিধার জন্য ষ্টেশনগুলির অবস্থান একটু বোঝাইবার চেষ্টা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতা, বালিগঞ্জ,
ঢাকুরিয়া, যাদবপুর,
গড়িয়া, সোনারপুর,

কলিকাতা হইতে সোজা দক্ষিণদিকে ষ্টেশনগুলি পরপর চলিয়া গিয়াছে।

তাহার মধ্যে ঢাকুরিয়া ফ্ল্যাগ ষ্টেশন। অর্থাৎ ইহার নিজস্ব সিগন্যাল রুম বা সাইডিং কিছুই নাই।

শুধু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি যাত্রী লইবার জন্য একবার করিয়া থামে মাত্র।

সুতরাং ঢাকুরিয়ায় কিছু করা সম্ভবপর নয় হয় গড়িয়া, নয় যাদবপুর, নয় বালিগঞ্জের পর কিছু করা হইয়াছে। যেহেতু বালিগঞ্জের দিকে চুরি করিবার মত নির্জ্জন স্থান অল্প সেহেতু সেখানেও কিছু করা কঠিন। সুতরাং তরুণ যাদবপুরের দিকে যাওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। পথেই ঢাকুরীয়ার ষ্টেশনমাস্টারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বড় মামাকে দেখিয়াই কহিলেন, মশাই, খালি গাড়ীখানা পাওয়া গেছে, যাদব পুরের সাইডিং-এ, কিন্তু গালচে একখানাও নেই। সর্বনাশ হয়ে গেল।···

বড়মামা তরুণের সঙ্গে ষ্টেশনমাস্টারের পরিচয় করাইয়া দিলেন: এটি আমার ভাগ্নে তরুণ, সখ ক'রে গোয়েন্দাগিরি করে, নাম শুনেছেন বোধ হয়?

ষ্টেশনমাস্টার কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বৈকি। আমাদের সৌভাগ্য যে এই সময়ে উনি এখানে এসে পড়েছেন। মশাই তরুণবাবু, যদি তাড়াতাড়ি এর একটা কিনারা করতে পারেন তা হলে আমরা এই কজন ষ্টেশনমাস্টার চাঁদা ক'রে আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

তরুণ একটু হাসিয়া কহিল, চলুন ত দেখা যাক—তারপর আপনাদের বরাত, আর আমার হাত যশ!

তিনজনে লাইন ধরিয়া যাদবপুরের দিকে রওনা হইলেন। খানিকটা দূর গিয়াই নজরে পড়িল একখানা খালি মালগাড়ী একটা সাইডিং এ দাঁড়াইয়া —এবং তাহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক জটলা করিতেছে।

ঢাকুরীযার ষ্টেশন মাস্টার যাদবপুরের ষ্টেশনমাস্টারের সহিত তরুণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। একপালা নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর তরুণ কাজ আরম্ভ করিল।

যাদবপুর ছাড়াইয়া আসিয়াই আপলাইন হইতে যে সাইডিং বাহির হইয়াছে সেইটিতেই গাড়ীখানি কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া···

সাইডিং যেখানে মেন লাইনের সহিত সংযুক্ত হয়, সেইখানটা তরুণ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিল। হাঁটু গাড়িয়া লাইনে বসিয়া খালি চোখে এবং লেন্সের সাহায্যে সবরকমেই পরীক্ষা করা হইল। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তরুন কহিল,—এ সাইডিং কি ব্যবহার করা হয়? ষ্টেশনমাস্টার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, গত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও ব্যবহার হয় নি বোধ হয়—

তরুন কহিল, হুঁ। তাহ'লে এর জয়েণ্টের মুখে যে তেল দেওয়া হয়েছে সে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন লোক দেয় নি?

—নিশ্চয়ই না। বহুকাল ব্যবহার হয় নি, তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহার সম্ভাবনাও নেই। শুধু শুধু কর্তব্যের খাতিরে ওরা জয়েণ্টের মুখে তেল দিতে যাবে এত ভাল মানুষ আমার পোর্টাররা নয়।

তরুণ কহিল, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কারুর কাছে ক্যামেরা আছে?

ষ্টেশনমাস্টারের বড় ছেলেটি লাফাইয়া উঠিল। আমার কাছে আছে, নিয়ে আসছি।

সেই জয়েণ্টের মুখে লাইনের উপর একটি তৈলসিক্ত ময়লা আঙ্গুলের ছাপ পড়িয়াছিল, তরুণ সাবধানে ক্যামেরার সাহায্যে তাহারই ছবি তুলিয়া লইল।

তারপর রেলওয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টরকে কহিল, এই আঙ্গুলের ছাপটা নিয়ে একবার হেড-অফিস খোঁজ ক'রে দেখুন দেখি কোনও পুরানো পাপী কিনা। আমার বিশ্বাস যে এমন কাজ যে করতে পারে, তার এই প্রথম কেস নয়।

তারপর ষ্টেশনমাস্টারের দিকে ফিরিয়া কহিল, বহুদিন অব্যবহারে জয়েণ্টটা পাছে ঠিকমত কাজ না করে এই ভয়ে তেল দিতে গিয়েছিল। আঙ্গুলের ছাপটা উঠে গেছে - আচ্ছা আসি আমি আজ, যদি কোনও খবর পান—আমায় জানাবেন।

*　　*　　*

পরের দিন ভোর হইতে না হইতে ইন্স্পেক্টর আসিয়া হাজির। আঙ্গুলের ছাপের প্রতিলিপি হেড অফিসের দপ্তরে মিলিয়াছে, লোকটার নাম সীতানাথ ইহার আগে ভীষণ ভীষণ চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং বার দুই জেল খাটিয়াছে। বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, মাথার মধ্যে ঈষৎ একটু টাক আছে। নাকটা খাঁড়ার মত সোজা নামিয়াছে!······কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা গিয়াছিল যে সে যাদবপুর ও ঢাকুরিয়ার মাঝামাঝি বৈষ্ণব-ঘাটায় থাকে।

তরুন কহিল, চলুন, একবার খোঁজ ক'রে দেখা যাক্!

দুই জনে বাহির হইয়া পড়িল। তরুণ কিছুদূর গিয়া কহিল, লোকটাকে শাস্তি দিতে চান, না জিনিসগুলো ফিরে চান?

ইন্স্পেক্টর কহিলেন, জিনিসগুলো আগে চাই—নইলে রেল-কোম্পানীকে কত টাকা খেসারৎ দিতে হবে তার ঠিক আছে? ভালয় ভালয় যদি মালগুলো ফেরৎ পাওয়া যায় তা' হলে ওকে ছেড়ে দিতেও রাজি আছি।

বৈষ্ণববাটা বেশী দূর নয়। সাতটা বাজবার আগেই দু'জনে পৌছিলেন। একজন মুসলমান দাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। তরুন ইন্‌স্পেক্টরকে একটু আড়ালে থাকবার অনুরোধ করিয়া খুব জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক কড়া নাড়িবার পর ভিতর হইতে মোটা ভারী স্ত্রীকণ্ঠে জবাব আসিল—কে-রে?

তরুন কোনও কথা না কহিয়া কড়া নাড়িয়াই চলিল। তখন কপাটটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এক স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। যেমন মোটা তেমনি বেঁটে এবং তেমনি কালো, তাহার উপর নাকটা থ্যাবড়া। কেশ বিরল মাথার গুটিকতক চুল উপর-ঝুঁটি করিয়া বাধা।

সে যেন খিঁচাইয়া মারিতে আসিল। কি রকম লোক তুমি বাছা? খালি কড়া নেড়ে চলেছ। জবাব দাওনা কেন?

তরুণ সে সব কথা গায়ে না মাখিয়া কহিল, সীতানাথ আছে?

স্ত্রী লোকটি যে লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আছে, কিন্তু সে কারো সঙ্গে দেখা করে না!

বলিয়াই সাহসা কপাট বন্ধ করিয়া দিতে যাইতে ছিল কিন্তু তরুণ তাহার পূর্বেই ডান পা-টা দরজার মধ্যে বাড়াইয়া দিয়াছে সুতবাং বন্ধ করা গেলনা।

সে চেঁচাইয়া কহিল, একি গো, জোর ক'রে ঢুকবে নাকি?

তরুণ বীরস্বরে কহিল, সেই রকমই ত ইচ্ছে আছে। আসুন ইন্‌স্পেক্টর।

ইন্‌স্পেক্টর নামটা শুনিবামাত্রই স্ত্রীলোকটা একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তরুন নিমেষে পাশ কাটাইয়া স্ত্রী লোকটার আগে চলিয়া গেল।

সীতানাথ একটা গোলমাল শুনিয়া বাহির হইতেছিল—কিন্তু তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল তরুন এবং তাহার পিছনে ইন্‌স্পেক্টর হাতে পিস্তল লইয়া।

সে বিবর্ণমুখে পা পা করিয়া পিছাইয়া গেল। তরুণ ভিতরে আসিয়া ইন্‌স্পেক্টরকে ভিতরে টানিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে কহিল, তারপর সীতানাথ, গাল্‌চেগুলো কোথায় বল দেখি?

সীতানাথ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া কহিল। কি গাল্‌চে, কোথাকার গাল্‌চে?

ইন্‌স্পেক্টর চটিয়া উঠিলেন, ন্যাকামি ক'রনা আমরা সব টের পেয়েছি, লাইন-জয়েন্টের মুখে তোমার আঙুলের ছাপ ধরা পড়েছে—চালাকী রাখ, কোথায় আছে বল।

সীতানাথ লোকটা বোকা নয়। সে আর অবাক হইবার চেষ্টা না করিয়া কহিল, আমি বলব না, যা খুশী করুন গে!

তরুণ ইন্‌স্পেক্টরকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া কহিল, বাপু, ধরাত পড়েইছ, তুমি কি মনে কর খুঁজে আমরা বে'র করতে পারবনা?

সীতানাথ কহিল, না—পারবেন না। সে যেখানে আছে পুলিশের চোদ্দ পুরুষের ক্ষমতা নেই যে বার করে।

ইন্‌স্পেক্টর একটা কটূক্তি করিয়া উঠিলেন, ভদ্রলোকের মত কথা বল্!

সীতানাথ কহিল, রাগ হ'লে আপনার কথাই প্রায় ভদ্র লোকের মত থাকে কিনা! আমিত ছোট লোক বটেই।.........

তা যাহোক, সে পাবেন টাবেন না। জেলে টেলে যা দেবেন দিন। জেলেও দেবেন আর মালও আমি ছেড়ে দেবো এত কাঁচা ছেলে আমি নই।

—ফিরে এসে ত বাঁচতে হবে, তখন টের পাবোনা আমরা?

সীতানাথ তাহাতেও থামিলনা, কহিল। আমি জেলে গেলে অন্য লোক তার ব্যবস্থা করবে।

ইন্‌স্পেক্টরের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, সেখানে গিয়ে মারের চোটে কথা আদায় ক'রে নেব।

তরুণ সীতানাথকে মনে মনে অজস্র বাহবা দিতে লাগিল। সে নির্বিকার মুখে কহিল, আমি পুলিশের সঙ্গে এ বাড়ীর বাইরে পা দেবামাত্র তার ব্যবস্থা হবে। তখন আমারও আর বলবার উপায় থাকবে না। ইচ্ছে থাকলেও না।

তরুণ ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া কষ্টে হাসি দমন করিল। তাহার পর মোলায়েম কণ্ঠে কহিল, যদি না ধরি, যদি ছেড়ে দিই?

সহসা সীতানাথ সামনে ঝুঁকিয়া আগ্রহ ভরে কহিল, দেবেন, দেবেন ছেড়ে?......জেলে দেবেন না?......ছেলেটার বড় অসুখ বাবু—আমি জেলে গেলে দেখবার লোক থাকবে না।

তরুণ কহিল, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি তুমি গালচেগুলো ফিরে দিলে আমি আর এবার তোমার কেস উঠতে দেবনা। কিন্তু একটা মুচলেকা দিতে হবে।

সীতানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, একটা লোহার চাদরের বাক্সের মধ্যে পুরে ধারগুলো ঝাল ক'রে পুকুরের মধ্যে ফেলে রেখেছি। জেলে ডেকে জাল ফেলে উঠাতে হবে। কাছেই আছে।

তরুণ কহিল, কিন্তু তুমি চুরি করলে কি ক'রে?

সীতানাথ হাসিয়া কহিল, একলা পারিনি বাবু। আর একজনছিল, তার নাম করব না। যখন সোনারপুর থেকে গাড়ী ছাড়ে তখন একটা ওয়াগানের ওপর লম্বা দড়ি নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। গাড়ী ছাড়বার পরই কাজ আরম্ভ করে। যে গাড়ীর মধ্যে গালচে ছিল তার আগের গাড়ীর সঙ্গে তার পরের গাড়ী আগে অনেকখানি ঢিলে ক'রে বাঁধা হয়। ধরুন চুরির গাড়ীখানা এক নম্বর, আগেরটা দু'নম্বর আর পরেরটা তিন নম্বর। তিন নম্বরে আর দু'নম্বরে বেঁধে এক নম্বর আর তিন নম্বরের জোড়টা খুলে দেওয়া হয়। লম্বা দড়িটায় আটকে রইল বটে কিন্তু অনেকটা মধ্যে ফাঁক রইল। তারপর দু'নম্বর আর এক নম্বরের বাধন হ'ল খোলা, তখন এক নম্বর গাড়ীখানা দু'নম্বর আর তিননম্বরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে চলতে লাগল। এবারে আমি যাদবপুরের ঐ সাইডিংটায় তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। যেমন দুনম্বর গাড়ীটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সাইডিং-এ লাইন জয়েন ক'রে দিলুম, ফলে এক নম্বরটা গড়াতে গড়াতে সাইডিং'এ চলে এল। আমিও সাইডিং-এর সঙ্গে যেন লাইনের জোড়া খুলে দিলুম। তিন নম্বর আর পিছনের গাড়ীগুলো আবার মেনলাইনে চলে গেল তখন দড়িটা খাটো ক'রে ক'রে এনে গাড়ীর দুটো ভাগ বেমালুম জুড়ে দেওয়া হ'ল।

তরুণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে ছিল। ইনস্পেক্টর শুধু একটা 'স্-স্' শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাহার পর একটা মুচলেকা লিখাইয়া লইলেন! তরুণ প্রশ্ন করিল, তুমি টের পেলে কি ক'রে গালচের কথা?

সীতানাথ কহিল, আপনাদের ভদ্দর ঘরের কাণ্ড।······আর একজন জমিদার অনেক টাকা কবলান, চক্রবর্ত্তীদের ঐ গালচের ওপর বড় লোভ তাঁর।····· তা অত পরিশ্রম বৃথা গেল। ছেলেটার বড় অসুখ, টাকার দরকার বলেই অমন অসীম সাহসিক কাজে লেগেছিলুম।

তরুণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, এই পঞ্চাশ টাকা দিলুম। আমার সঙ্গে আবার দেখা ক'র। তোমার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব এসব কাজ আর ক'রনা। এই ঠিকানাটা দেখে দাও।

সীতানাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

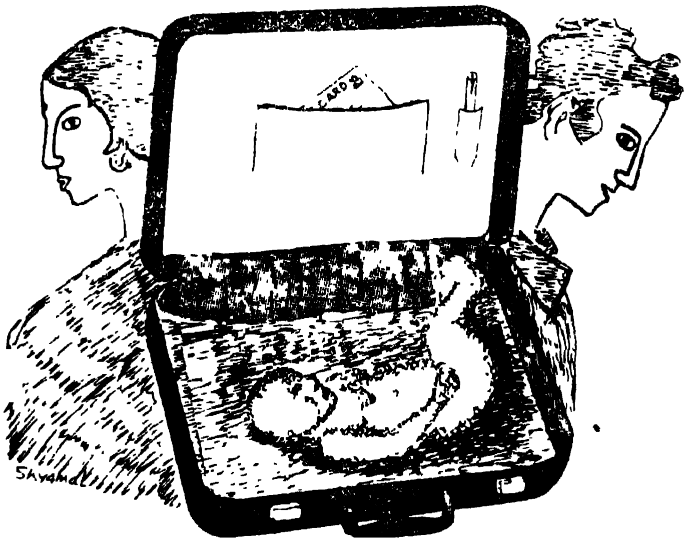
বাহিরে আসিয়া ইনস্পেকটর কহিলেন, একে-ত এমনি ছেড়ে দিলেন, তার ওপর আবার টাকা?

তরুণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যার মাথায় অমন চুরীর

মতলব আসতে পারে তার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে, টাকা ত তুচ্ছ কথা।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র সেই সমস্ত লেখকদের অন্যতম যাঁরা সাহিত্য করেন, সাহিত্য ভালবাসেন ও কথাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গজেন মিত্র মশাই গল্প ও উপন্যাস লিখছেন সেই তিনের দশক হতে। বিচিত্রা ও শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-সাধক একদা যাত্রা আরম্ভ করেন আজ আটের দশকে পদার্পণ করে তিনি তাঁর শেষতম উপন্যাস পাঞ্চজন্য প্রকাশ করেন। মহাভারতের কথা অমৃতসমান। তাই পাঞ্চজন্য লেখকের অন্যতম-বহুল প্রচারিত গ্রন্থ।

গজেন মিত্র নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। গোয়েন্দাধর্মী ও রহস্য রচনাও নেহাৎ কম নয়। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্যতীত আর কোন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবী গোয়েন্দা গল্পের ভিতর দিয়ে সমাজ ও মানব মানবীর অন্তর ও বহিপ্রকৃতির অন্বেষণ করেন নি। সেই পাঁচকড়ি দের যুগ হতেই রহস্য, রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্প এক দ্বিতীয় শ্রেণীর আর্টের পর্য্যায় ভুক্ত হয়ে আছে। তবে গজেনবাবু প্রমুখ কিছু খ্যাতিমান কথাশিল্পির শৈল্পিক প্রয়াসে গোয়েন্দা গল্পও ধন্য হয়েছে। তরুণ গুপ্তের বিচিত্র কীর্তিকথা গোয়েন্দা গল্প হিসাবে অনন্যতার দাবি রাখে।



হত্যার পরের ঘটনা

-বিমল মিত্র

মা-জননীরা, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। গল্প লেখা আমার নেশা। আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের কখনও গল্প শোনানোর নাম করে মিথ্যে কথা শোনাতে পারিনা। সে-কাজ আমার দ্বারা হয় না। প্রতিদিন লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা আর মাতা-বসুমতীকে সাক্ষী রেখে আমি লিখতে শুরু করি, যাঁরা শোনেন, তাঁরা কেউ ভাল বলেন, প্রশংসা করেন, আবার কেউ নিন্দে করেন। তা নিন্দে করুনগে, তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। আমি আপনাদের গল্প শুনিয়ে খালাস। নিজের বিবেকের কাছে আমি খাঁটি, এই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। এর চেয়ে বেশি সুখ আমি চাই না। আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি, আপনাদের আমি ভক্তি করি। মায়ের জাতির ওপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু এ-গল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এটুকু না বললে আপনারা আমাকে ভুল বুঝতে পারেন, তাই বলছি। এবার আপনারা গল্পটা শুনুন।

ছোট গল্পের আগে নায়ক-নায়িকার বা পাত্র-পাত্রীর নাম বলা দরকার। কিন্তু এ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম আমি প্রথমে জানতাম না। শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে কত লোক সেদিন ভবানীপুর থানায় ছিল, কেউই জানত না।

ভবানীপুর থানার দারোগাও বার বার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার নাম কী?

মহিলাটি কিছুই উত্তর দেন নি। চুপ করে ছিলেন শুধু।

—বলুন, আপনার নাম কী?

—আপনি কোথায় থাকেন?

—আপনার স্বামীর নাম কী?

কোন কথারই উত্তর সেদিন দেননি মহিলাটি।

ভবানীপুর থানা তখন মানুষের ভিড়ে ভেঙে পড়েছে। দু'নম্বর বাসে যত লোক ছিল, প্রায় সবাই তখন এসে থানার ভেতরে ঢুকে পড়েছে। যারা ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা বাইরে থেকে উঁকি মারবার চেষ্টা করছে। পুলিশ কনস্টেবলরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না আর।

—এখানে কী হয়েছে মশাই?

রাস্তায় বেকার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে। উত্তেজনার খোরাক চাই সকলের। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে কোথাও কিছু মানুষের ভিড় দেখলেই উঁকি মেরে দেখি। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে খুশি হই।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? ভিড় কিসের?

—কে জানে মশাই, আমিও আপনার মত, কিছুই বুঝতে পারছি না।

পাশ থেকে একজন বললে, চোর ধরেছে বাসে—

—চোর?

—হ্যাঁ মশাই, শুনছি নাকি মেয়ে মানুষ চোর।

মেয়েমানুষ চোর কথাটা বারুদের মত হঠাৎ যেন বাতাসকে বিষাক্ত করে দিলে। যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কানে কথাটা যেতেই

থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দেখা দেখি আরো কয়েকজন। যারা জরুরি কাজে বেরিয়েছিল, তারা কাজ পণ্ড করে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করলে।

কয়েকটা কনস্টেবল তখন একেবারে থানার সামনে রুল উঠিয়ে হেঁকে এল—ভাগো, ভিড় হঠাও—ভিড় হঠাও—

কিন্তু কে আর তখন শুনছে তাদের কথা। যারা ভেতরে ঢুকেছে, একেবারে মহিলাটির কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, তাদেরই বেশি সুবিধে। তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলাটিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখে আসছে। সেই যখন বৌবাজারে দু'নম্বর বাসে উঠেছিল। উঠে লেডিজ সীটে বসেছিল। অবশ্য তখন এমন করে তার দিকে নজর করবার সুযোগ আসেনি। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও কোনও মহিলার মুখের দিকে ক্যাট-ক্যাট করে চেয়ে থাকা যায় না। চাওয়া উচিতও নয়। অমন কত মেয়ে বাসে উঠেছে, বাস থেকে নামছে, কে আর তার হিসেব রাখছে।

—আপনি কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন ?

ডবল-ডেকার বাসের একতলায় ঢুকেই দু'পাশে লম্বা লেডিজ সীট। একজন লেডী ওঠে তো আর একজন নামে। কখনও বাসে চাপাচাপি ভিড়। পুরুষেরা প্যাসেজের ওপর, পা-দানিতে সিঁড়ির ধাপে ধাপে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে, ঝুলছে। তখন হয়তো লেডিজ-সীটের ওপর একটি মেয়ে সব জায়গাটা জুড়ে বসে আছে। সবাই পকেট সামলাচ্ছে, জামা-কাপড়-জুতো বাঁচাচ্ছে। তার ওপর অফিসের ছুটির সময়। সে-সময়ে কারো জ্ঞান ছিল না কোনও দিকে। এক-একটা স্টপেজ এসেছে আর যেন মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কারো হাতে ছাতা, কারো পুঁটলি, কারো ফাইল। জামা ছিঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। সে সময় লেডিজ-সীটের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

—আপনি ঠিক জানেন এটা আপনার এটাচি কেস ?

মনে আছে এক ভদ্রলোক উঠেছিলেন ঠিক বোধ হয় মেডিক্যাল কলেজের সামনের স্টপেজ থেকে। ট্রাউজার—ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ছিল। খুব জরুরি কাজেই বোধ হয় যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল একটা এটাচি কেস। বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে বললেন—মশাই একটু সরে যাবেন —

কে আর সরে যাবে। কে আর অন্য লোকের দুঃখ বোঝে। কার এত মাথাব্যথা।

কিন্তু তারই মধ্যে ভদ্রলোক এক হাতে এটাচি কেস আর এক হাতে হ্যাণ্ডেলটা ধরে একটা পা পা-দানিতে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন কোনমতে। তারপর ঝুলতে ঝুলতে চলতে গিয়ে হাতটা একটু ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাড়া কার নেই? সকলেরই তো জরুরী কাজ। সকলেই তো কাজ করতে ছুটেছে। কেউ বাড়ী যাবে, কেউ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, কেউ হাসপাতালে যাবে। নানান্ ঝঞ্ঝাটে সবাই জ্বলছে। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু, মনে আছে, ভদ্রলোক শেষ পর্য্যন্ত পা-দানি পেরিয়ে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর একটা লেডিজ-সীট খালি দেখে হাতের বোঝাটা খালি করবার জন্যে এটাচি কেসটা সেখানে এককোণে রেখে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনা কেউ দেখেছে, অনেকে দেখেওনি।

আজকের দিনে কারোর এমন সময় নেই যে সব দিকে চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। আর তাছাড়া বাসের মধ্যে কেউ কাউকে চেনে না। কে কার পাশে বসলো, তা দেখবারও সময় নেই। শুধু কোথায় কোন্ সীটটা খালি হলো কিম্বা খালি হতে পারে, সেই দিকেই নজর। একটা সীট খালি হবার সূচনা হলেই দশজনে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে আগে বসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। সেই পাইকপাড়া থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভেতরের ইতিহাস। ভেতরের প্রাত্যহিক মর্মান্তিক ইতিহাস।

ইন্সপেক্টর বললেন—তারপর?

যে ভদ্রলোক গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে এসেছেন, তিনি বললেন—তারপর এলগিন রোডের কাছে আসতেই এক ভদ্রলোক তাড়াহুড়ো করে সকলকে ঠেলেঠুলে চিৎকার করে বললেন, বাঁধকে— বাঁধকে—

বাস তখনও ভালো করে বাঁধেওনি। ভদ্রলোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আর ভালো করে থামবার আগেই কণ্ডাক্টর আবার বেল বাজিয়ে দিয়েছে, আর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল-ল্যাম্প গ্রীন ছিল, ড্রাইভারও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

—তারপর?

—তখন আমার খেয়াল হলো ভদ্রলোক তো এটাচি কেসটা ফেলে

গেলেন। এই ট্রাউজার আর ওপন্-ব্রেস্ট কোট পরা ভদ্রলোকই তো মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠে ছিলেন, অতি কষ্টে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে শেষকালে ভেতরে ঢুকে ওই খালি লেডিজ—সীটটার ওপর এটাচি কেসটা রেখেছিলেন।

কথাটা কণ্ডাক্টরকে বলতেই সেও ঘণ্টা দিলে।

সবাই মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলুম—ওমশাই, আপনার এটাচি কেস ফেলে গেলেন, ওমশাই, শুনছেন—

ভদ্রলোক তখন কোথায় রাস্তায় নেমে কোন দিকে গেছেন, তার আর পাত্তা নেই। আর বাসটাও তখন পুরোস্পীডে এগিয়ে চলেছে। সবাই মিলে আলোচনা করা হলো ওটাকে বাসের ডিপোতে গিয়ে জমা দেওয়া ভালো। যদি বাড়ি গিয়ে মনে পড়ে, তাহলেও একবার খবর নিতে পারেন বাস-অফিসে।

—কণ্ডাক্টর, ওটা ডিপোতে জমা দিয়ে দেবেন। আহা, দামী জিনিস হয়তো ভদ্রলোক ফেলে গেছেন।

কিন্তু এটাচি কেসটা নিতে যেতেই মহিলাটি কেমন বিরক্ত হলো।

বললে—এটা তো আমার—

—আপনার?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আমার, এটা আমার জিনিস—

কণ্ডাক্টর প্রথমে একটু কিন্তু—কিন্তু করেছিল। বেশ ধোপ-দুরস্ত মহিলা। গলায় সরু সোনার চেন-হার রয়েছে। হাতে সোনার বালা রয়েছে। ছাপা শাড়ি, লং-স্লিভ ব্লাউজ, ডোনাট খোঁপা। যেমন অন্য মেয়েদের থাকে, সেই রকমই। কোনও তফাৎ নেই। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা। বেশ ছিমছাম গড়ন। বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। কেমন যেন বেশ একটা মিষ্টি মাধুর্য মুখের আদলে।

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিলে। মহিলা ততক্ষণে এটাচি কেসটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু বাসের মধ্যে দু-একজন জাঁদরেল প্যাসেঞ্জারও থাকে। তারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সব সময় দুর্বলের পক্ষে। তারা ভয়ত্রাতা, পতিত পাবন।

—আপনার কী রকম? ওটা তো ওই ভদ্রলোক ফেলে গেলেন। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি।

বাসশুদ্ধ লোক এতক্ষণ সচেতন হয়ে উঠেছে। সবাই চেয়ে দেখলে মহিলাটির দিকে। সকলের দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে মহিলাটি।

—আপনি দেখেছেন ?

—হ্যাঁ, মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ভদ্রলোক উঠলেন হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে, শেষকালে কোথাও রাখবার জায়গা না পেয়ে ওই খালি জায়গায় রেখে দিলেন।

আর একজন পাশ থেকে বললেন, না, না, মশাই, আমিও দেখেছি, ভদ্রলোকের হাতে এটাচি কেসটা ছিল।

—আহা, এতক্ষণ বোধ হয় সে ভদ্রলোক বাড়িতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।

—মশাই, বাসে এ-রকম কত লোক কত কী ফেলে যান।

উপদেশ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। কণ্ডাক্টরকে একজন বললে, আপনি কারো কথা শুনবেন না মশাই, আপনি ডিপোতে গিয়ে ওটা জমা দেবেন—

কণ্ডাক্টর মহিলাটির দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—দিন, এটাচি কেসটা দিন—

—এটা আমার।

—আমার মানে ?

—আমার মানে আমার ?

এতক্ষণ যারা কোন কিছুতেই মাথা ঘামায় না, সেই শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের দলও মুখ ঘোরাল এবার।

—আপনার জিনিস বললেই হল। আমরা দেখলুম অন্য এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে ওখানে রেখে দিলেন, আর আপনি বলছেন আপনার ? আপনার বললেই আমরা ছেড়ে দেব ?

বেশ গরম হয়ে উঠল ভেতরে। ড্রাইভার তখন ফুল-ফোর্সে গাড়ি চালিয়েছে। কণ্ডাক্টরের টিকিট কাটা ঘুচে গেল।

—আপনি জিনিসটা দেবেন কিনা বলুন ?

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বললে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা।

—কথা বলতে আপনাকে কে বলছে ? জিনিসটা দিয়ে চুপ করে থাকুন।

অন্য লেডিজ-সীটে যে সব মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও

ব্যাপারটা সংক্রামিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। একজন বুড়ি মতন মহিলা বললেন, কেন বাবা, তোমরা অমন করে বলছ? কেউ কি কারো জিনিস এমন করে নিতে পারে?

—নিতে পারে কিনা সে আমরা জানি। যা জানেন না, তা নিয়ে আপনি কথা বলতে আসবেন না।

আর একজন মাঝ-বয়েসী মহিলা ওপাশে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা কেন ওঁকে অমন করে বলছেন? মেয়েদের সম্মান রেখে কথা বলতে পারেন না।

—আপনি আর এর মধ্যে কথা বলতে আসবেন না মা, আমরা যথেষ্ট সম্মান রেখে কথা বলছি।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ভদ্রমহিলা এবার উঠল। স্টপেজ এসেছে একটা। একেবারে নেমে চলে যাবার চেষ্টা।

কণ্ডাক্টর, যেতে দেবেন না ওঁকে।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

মহিলাটি বললে, আমি নামব এখানে, সরুন।

—নেমে যাবেন মানে। এটাচি কেসটা দিয়ে নেমে যান।

ভদ্রমহিলা তবু নামবার উদ্যোগ করছে। কয়েকজন সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে, জিনিস চুরি করে নেমে যেতে পারবেন না।

ভদ্রমহিলা বললে, জানেন, আপনাদের পুলিশ ডেকে অ্যারেস্ট করাতে পারি।

ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললে, আঃ আপনারা যেতে দিন না ওঁকে কেন রাস্তা আটকাচ্ছেন?

সে কথায় কান দিলে না কেউ। বললে, পুলিশের ভয় দেখাবেন না, তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন—

একজন বললে, চলুন, ওঁকে ধরে নিয়ে থানায় চলুন, সব হিল্লে হয়ে যাবে।

কথাটা তুলতেই হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। বাস ছেড়ে দিচ্ছিল। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই নামল। ভদ্রমহিলা নামল। বাসশুদ্ধ লোকই নামল। কিছু বাইরের লোকও জুটল। সামনেই ভবানীপুর থানা। ভবানীপুর থানাতেই নিয়ে চলুন মশাই। মুখোমুখি ফয়সালা হয়ে যাক।

—তারপর ?

ইন্সপেক্টর এতক্ষণ কোনও কথারই সঠিক জবাব পান নি। আবার বললেন, এঁরা সবাই দেখেছেন, এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন, আর আপনি বলছেন এটা আপনার ?

চারিদিকের ভিড়ের মধ্যে তখন তুমুল হৈ চৈ চলছে।

কনস্টেবল কয়েকজন ভিড় সরিয়ে ঘর খালি করার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে বাইরে যাবে ? এমন মুখরোচক দৃশ্য দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নাকি ? তারা রুল উঠিয়ে এগিয়ে এল—হাটো, বাহার যাও সব—হাট্‌ যাও—

—কথার জবাব দিন। চুপ করে আছেন কেন।

ভদ্রমহিলা বললে, আপনি বিশ্বাস করুন, এ এটাচিকেস আমার—

—আপনি কোথা থেকে উঠেছিলেন ?

—বৌবাজার থেকে।

—যে ভদ্রলোক হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, তিনি কি আপনার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এটা ?

মহিলাটি বললে, তিনি রাখতে দেবেন কেন ? তাঁর জিনিস হলে তিনি তো যাবার সময় এটা নিয়ে নেমে যেতেন। এটা তো আমার,

—আপনার বাড়ি কোথায় ?

—ভবানীপুরে রামময় রোডে।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

ভদ্রমহিলা বললে, বৌবাজারে আমার বোনের বাড়ি, আমি সেখান থেকেই আসছি।

—এ এটাচি কেসের মধ্যে কী জিনিস আছে।

ভদ্রমহিলা বললে, আমার শাড়ি একটা আর টাকা কিছু আছে।

—কত টাকা আছে ?

ভদ্রমহিলা বললে, তা মনে নেই।

—মনে করার চেষ্টা করুন না। নিজের টাকা রেখে দিয়েছেন আর কত টাকা আছে মনে করতে পারছেন না ?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—চাবি। এর চাবি আছে আপনার কাছে ?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

সে কী ? নিজের এটাচি কেস, আর নিজের কাছে এর চাবি নেই ?

ভদ্রমহিলা বললে, আমার বোনের বাড়িতে ভুলে চাবিটা ফেলে এসেছি।

—আপনার বোনের বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

ইন্সপেক্টর হুঁসিয়ার লোক। বললেন, তাতে ক্ষতি নেই, আমার কাছে মাস্টার কী আছে, তা দিয়ে সব খোলা যাবে।

বলে তিনি একজন কনস্টেবলকে মাস্টার কী'র গোছাটা আনতে বললেন। এক মিনিটের ধৈর্য পরীক্ষা। কিন্তু সকলের মনে হল, সেই এক মিনিটই যেন কল্পকালে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিন, সেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের ভেতর। আর এটাচি কেসটা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ-শতাব্দীর সমস্ত পাপ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক যেন এক চাবির মোচড়ে হাঁ করে উঠল।

আশেপাশের ভিড়ের মানুষ তখন উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ভদ্রমহিলা আর থাকতে পারলেনা। যেন ভেঙে পড়ল। বললে, এটাচি কেস আমার নয়, আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, এ আমার নয়, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি না।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা সেই অবস্থাতেই চেয়ার থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

—তারপর ?

মা-জননীরা, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বই মিথ্যে জানি না। আমি প্রতিদিন লেখার আগে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা, মাতা-বসুমতীকে সাক্ষী রেখে কলম ধরি। লেখা আমার নেশা, আবার পেশাও বটে। কিন্তু তা বলে গল্প শোনানোর নাম করে কখনও আমি আপনাদের মিথ্যে কথা বলতে পারিনি। আপনারা আমার শ্রদ্ধার পাত্রী, আপনারা আমার ভক্তির পাত্রী। আপনাদের মর্য্যাদাহানি আমার কল্পনার বাইরে। আমি আপনাদের আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাই।

যারা শুনছিল এতক্ষণ তারা অধৈর্য হয়ে উঠল।

বললে, ওসব কথা থাক, তারপর কী হল বলুন ? এটাচি কেসের ভেতর কী ছিল ?

সে কথাই তো বলছি। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য মানুষের কল্যাণ বোধকেই জাগ্রত করেছে, সাহিত্য জাতির মনের মুকুর……

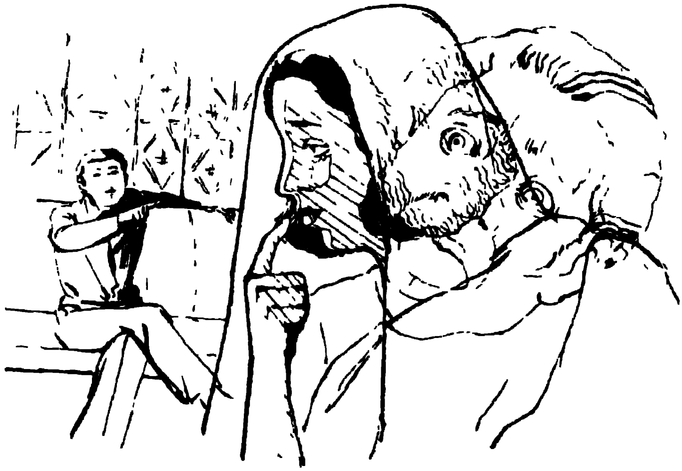
—ও সব কথা থাক, এটাচি কেসের মধ্যে কী পাওয়া গেল বলুন শীগগির ?

—একটা ছোট একদিনের মরা ছেলে।

সমস্ত লোক তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

—কিন্তু সেদিন যারা সেই থানার মধ্যে ছিল তাদের সকলেরই মনে হয়েছিল ও যেন মরা ছেলে নয়, মানুষের ধর্ম মানুষের কীর্তিকে কেউ যেন খুন করে রেখে গেছে একটা এটাচি কেসের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আত্মার গলা টিপে কেউ যেন ওখানে হত্যা করে এই রকম করে তার সৎকার করতে চেয়েছে।

বিমল মিত্র সাহিত্য ও ইতিহাসের তন্নিষ্ঠ পাঠক বিমল মিত্র মশাই সমকালীন সাহিত্যে প্রবাদ পুরুষ। তাঁর বৃহদায়তন ও এপিকধর্মী উপন্যাসগুলির অনেক চরিত্রই আজ কিংবদন্তি হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মুৎসুদ্দি বেনিয়ান শোভিত বাবু কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিবিম্ব "সাহেব বিবি গোলাম" সমকালীন সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। তার যা ইতিহাসে নেয়, আমি, পরস্ত্রী, এর নাম সংসার, রাগ ভৈরব ইত্যাদি গ্রন্থ বহু পঠিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেও লেখকের পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইতিহাসবোধ ও ঐতিহাসিক চেতনার জীবন্ত অনুভূতি আমাদের সম্মোহিত করে। অনুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসা লেখকের যৌবনের জীবন ও জীবিকার সাথে একাত্ম হয়ে আছে। ফলে সীমিত সংখ্যায় হলেও লেখকের রহস্য ও গোয়েন্দাধর্মী লেখা আমাদের আকৃষ্ট করে, আমোদিত করে। লেখক আবাল্য ও আযৌবন সঙ্গীতের অনুরাগী বান্ধব। একদা গীতিকার ও সুরকার হিসাবে হিন্দুস্থান স্টুডিওর সাথেও যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের সাথে সাথে সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ লেখকের অপর এক বিপু। লেখক কলকাতার এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯১২ সালে।



লাল নেশা

সুমথনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি, মানস মল্লিক যে কি করেন, কি তাঁর জীবিকা কেউ-ই তা জানে না। পরিচিত আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে সে একজন বনেদী বেকার। অর্থাৎ দীর্ঘদিন কোন কাজকর্ম না করে চুপচাপ ঘরে বসে শুধু বিধবা মায়ের অন্ন ধ্বংস করে চলেছে। এর জন্যে মাকে সবাই দায়ী করে। তিনিই নাকি অত্যধিক আদর দিয়ে ছেলের মাথাটি খেয়েছেন। স্বামী ছিলেন বড়লোক। আলিপুর ফৌজদারী আদালতের সবচেয়ে বড় উকিল। যেমন প্রচুর উপার্জন করেছেন তেমনি কলকাতা শহরে বিপুল সম্পত্তি রেখে অকালে মারা যান। তিন ছেলের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি ভাগা-ভাগি হয়ে গেলে, বসতবাড়িটাই পড়ে মানস মল্লিকের অংশে। মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ছোট ছেলেটি, তাই মাকে নিয়ে এই বাড়িতে থাকেন। সেকালের তিনমহলা বাড়ি। তার দুটো অংশ ভাড়া দিয়ে একটাতেই সুখে-স্বচ্ছন্দে মা ও ছেলের দিন কেটে যায়। ছেলে থার্ড ক্লাস পেয়ে বি. এ. পাস করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও বিয়ের জন্যে মেয়ের অভাব হয় নি। বড় বড় ঘর থেকেই তার সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু মা কিছুতেই রাজী করাতে

পারেন নি। ছেলে বলেছে, আমার বিয়ের জন্যে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। আমি নিজেই সে-ব্যবস্থা করবো, যখন খুশী হবে।

কিন্তু চব্বিশ বছর থেকে বয়েসটা উনচল্লিশে পৌঁছে গেছে, আজও তাঁর সেই খুশীর দিনটি এলো না। মা বলে বলে হয়রান হয়ে, তাই এখন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য, বড়লোকের ছেলেদের যেমন অনেকের অনেক রকম উপসর্গ থাকে, কেউ মদ খায়, কেউ রেস খেলে, কেউ বা বাইরের মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটায়। এ ছাড়া আরো কত রকমের বিকৃত ও অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শোনা যায়। কিন্তু মানস মল্লিকের নামে এ-পর্যন্ত কোন বদনাম, কোন কলঙ্ক কেউ দিতে পারে নি। বরং ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ বড়লোকের ছেলেদের মধ্যে যা কল্পনা করা যায় না, এমনি নির্মল চরিত্রের অধিকারী তিনি! জীবনে তাঁর একটি মাত্র নেশা, বই পড়া। তাও এক বিশেষ ধরণের বই। 'ক্রিমিনোলজি' বা অপরাধতত্ত্বের বই অপরাধ-আইন, অপরাধীদের জবানবন্দী, বড় বড় সব হত্যাকাণ্ডের মামলা দলিল ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। সাক্ষীসাবুদ, বিচারের ধারা, জুরীদের মন্তব্য, প্রকৃত আসামী নির্বাচন ও দণ্ডাদেশ, তাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব ইত্যাদি বিচিত্র মনস্তত্ত্বমূলক নানা ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকা। কেবল ভারতবর্ষের নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমদানি করা স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে তাঁর সময় কেটে যায়। বহু টাকা তিনি এর পেছনে ব্যয় করেছেন এবং এখনো নিয়মিত করেন। দেশ-বিদেশের প্রকাশকদের কাছে তাঁর স্থায়ী অর্ডার দেওয়া আছে, হত্যাকাণ্ড ও হত্যা সম্পর্কিত কোন নতুন বই প্রকাশ হওয়া মাত্র যেন তাঁকে ভি. পি. করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তখন তাই ডাকঘরের পিওন মোটা মোটা বইয়ের প্যাকেট নিয়ে আসে তাঁর কাছে।

এইভাবে অপরাধতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা ও গবেষণা করতে করতে, ও সম্বন্ধে এমন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন যে কোথাও কোন জটিল হত্যারহস্যের মামলা নিয়ে যখন উকিল, ব্যারিস্টার ও ডিটেকটিভরা হিমশিম খেয়ে যায়, তখন তিনি ঘরে বসে কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসেন। এবং ওই ধরনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর আর কোন্ দেশে, কবে সংঘটিত হয়েছে, আলমারি ঘেঁটে ঘেঁটে মোটা মোটা সব বই বার করে, বাদী ও বিবাদী পক্ষের সওয়াল মামলার বিবরণ মিলিয়ে লিপিবদ্ধ করতে

করতে যখন প্রকৃত আসামীকে ধরে ফেলেন, তখন সেই ভাবে সমাধান পথ বাতলে দেন প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গোপনে ঘরে ডেকে এনে।

এটাই মানস মল্লিকের পেশা, যে খবর গুটিকয়েক ডিটেকটিভ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতি গোপনে, এই লেনদেনের কাজ চলে। এবং তাদের কাছ থেকে যে বিপুল অর্থ তিনি পান, একটা বড় উকিল ব্যারিস্টারও তা উপার্জন করতে পারে না। এইসব টাকা তিনি ব্যয় করেন বই কিনতে। নিজে থাকেন অতি সাধারণভাবে।

ওঁর দেওয়া প্ল্যান অনুসরণ করে যত সাফল্য লাভ করে ডিটেকটিভরা, তত টাকার অঙ্কও বেড়ে যায় মানস মল্লিকের। ঘরে যেচে যখন এত টাকা আসে তখন কার ইচ্ছা হয় বাইরে ছুটোছুটি করার। তা ছাড়া এসব কাজে বিপদও আছে অনেক। ডিটেকটিভদের প্রাণের আশঙ্কা যে পদে পদে তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই কোন ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই মানস মল্লিক! তিনি সত্যি সত্যি কি কাজ করেন, কি তাঁর পেশা, এ নিয়ে আত্মীয়স্বজন মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা সত্ত্বেও কেউ জানে না তাঁর আসল পরিচয়। গুরুর যেমন মহাগুরু, কোথায় কোন্ দুর্গম অরণ্যে, কিংবা অন্ধকারে পর্বতগুহায় ধ্যানমগ্ন, কেউ তা ধারণা করতে পারে না তেমনি বইয়ের পাহাড় তুলে তার মধ্যে একাকী দিন কাটান এই জ্ঞানতপস্বী মানস মল্লিক, তাঁর আসল পরিচয়ও সকলের কাছে অজ্ঞাত!

বড় বড় জটিল সব হত্যা-রহস্য, যার কোন হদিস করতে পারে না ডিটেকটিভরা, গভীর রাত্রে গোপনে আসে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মানস মল্লিক একটা 'প্লান' তৈরি করে দেন প্রচুর টাকার বদলে। এর জন্যে 'কেস' হিসেবে টাকা দাবি করেন। দশ, পনেরো, চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার, কাজের গুরুত্ব হিসেবে এবং সময়ও নেন এক মাস, দেড় মাসপর্যন্ত। আবার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মীমাংসা করার আগে, নিজেই গোপনে তথ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েন।

সেদিন সংবাদপত্রে এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়ে সবাই শিউরে উঠলো। নিউ আলিপুরে তালপুকুরের জমিদার দর্পনারায়ণের একমাত্র পুত্র শুভনারায়ণকে তাঁর নবনির্মিত বিরাট অট্টালিকায় চারতলার শয়নকক্ষে রক্তাক্ত কলেবরে মৃত্যু অবস্থায় দেখা যায়, ঘর বন্ধ অথচ দুটি দরজাই ভিতর থেকে চাবি দেওয়া। সে ঘরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী সেইদিনই সকালের বিমানে দিল্লীতে

প্রাইভেট ডিটেকটিভ আদিত্য কুমার এই কেসটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। আত্মবিশ্বাস ছিল তারি খুব বেশী। তিনি লেগেছিলেন শুভনারায়নের অপিসের কয়েকজন খুব বিশ্বাসী কর্মচারীর পিছনে। এবং তাঁর ধারণা, তিনি গোপনে যে জাল পেতেছেন তাতে অনেক রুই-কাতলা ধরা পড়বে। তারা জালের মধ্যে এসে গেছে প্রায়। কিন্তু পুরোপুরি এখনো ধরা যাচ্ছে না। দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে একদিন কাগজপত্র সবকিছু তৈরী করে নিয়ে গভীর রাত্রে মানস মল্লিকের সঙ্গে দেখা করলেন।

কেসটা আগাগোড়া সব শুনে এবং মিঃ কুমারের যতদূর যা কিছু অনুসন্ধান ও ধ্যানধারণা সবকিছু কাগজে লিখে নিয়ে তিনি দু'মাস সময় চাইলেন।

দু'মাস লাগবে স্যার! একটু তাড়াতাড়ি যদি করেন তো বড় উপকার হতো। তাড়াতাড়ি হবে না, সাফ বলে দিলেন মানস মল্লিক। কারণ আপনি যে পথে অগ্রসর হয়েছেন এবং ভাবছেন মাছ জলে পড়েছে, এখন খেলিয়ে তুললে হয়, আমার ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো, আপনার পথের ঠিক বিপরীত!

কি বলছেন স্যার?

মানস মল্লিক শুধু একটু মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, এক আর একে দুই হয় সবাই জানে, অতি সহজ অঙ্ক! কিন্তু এক আর একে তিন হয় যখন, অঙ্ক তখন জটিল রূপ নেয়, বুঝেছেন মিঃ কুমার?

আহাম্মুখের মত ফ্যালফ্যাল করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মিঃ কুমার বললেন, না স্যার কিছুই বুঝতে পারলুম না এ হেঁয়ালির।

বুঝবেন, তবে একটু দেরি হবে! হ্যাঁ, এ-কেসটার জন্যে আমার কিন্তু পঞ্চাশ হাজার চাই।

পঞ্চাশ কেন স্যার, 'আই উইল গিভ ইউ মোর'—সিক্সটি! কিন্তু তাড়াতাড়ি কেসটা চাই!

তাড়াতাড়ি সম্ভব নয় মিঃ কুমার। আমাকে এই কেস-এর জন্যে এখুনি দিল্লী যেতে হবে!

এই কেস-এর জন্যে দিল্লী কেন স্যার?

শুভনারায়ণের স্ত্রী ভদ্রাদেবী তো দিল্লীর মেয়ে, সেখানেই তো ছেলেবেলা থেকে মানুষ, লেখাপড়া খেলাধুলো সবই তো সেখানে। ওঁর বাপ ছিলেন একজন কেন্দ্রীয় সরকারের হোমরা-চোমরা অফিসার।

হ্যাঁ স্যার—তা ঠিক। কিন্তু···

ও কিন্তুটা আমার, আপনার নয়। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

আচ্ছা তাহলে এখন আসি। বলে পকেট থেকে পঁচিশ হাজার টাকার নোটের তাড়া ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিঃ কুমার। রাস্তায় তাঁর পুরনো 'মরিস মাইনর'টা অপেক্ষা করছিল। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে উঠেই স্টার্ট দিয়ে দিলেন।

পাঁচ সপ্তাহ পরে মানস মল্লিক দিল্লী থেকে ফিরে এসে মিঃ কুমারকে ডেকে পাঠালেন। উল্লসিত মনে কুমার ছুটে আসতে মানসবাবু বললেন, আমি একবার ওই ভদ্রাদেবীর সঙ্গে নিরিবিলি সাক্ষাত করতে চাই। সাধারণতঃ আমি নিজে 'ফিল্ড-ওয়ার্ক' করি না কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আমাকে করতেই হবে! বিশেষ প্রয়োজনে।

মিঃ কুমার ভদ্রার শাশুড়ীর সঙ্গে চুপিচুপি দেখা করে বললেন, আপনার বৌমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে, আমারই সহকর্মী একজন নির্জন ঘরে তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবেন।

বেশ তো। মঙ্গলবার দুপুরে বেলা ঠিক দুটোর সময় তাঁকে নিয়ে আসবেন, ওই সময় চাকর-বাকররাও সব ঘুমিয়ে থাকে।

মানসবাবুকে সঙ্গে করে গিন্নীমা তিনতলার একটা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, বৌমাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা, একটু অপেক্ষা করুন।

সাদা ধবধবে লক্ষ্ণৌ-চিকনের শাড়ির আঁচল অল্প মাথায় টানা, ঘাড়ের দু'পাশে বব-করা রুক্ষ চুলের গুচ্ছ, কাজল-টানা বাঁকা ভ্রূর নীচে বিস্ফারিত দুটি চোখ নিয়ে ধীরপদে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন ছিপছিপে তন্বী, গৌরাঙ্গী ভদ্রা, শুভনারায়ণের বিধবা স্ত্রী।

মানসবাবু দু'হাত জোড় করে নমস্কার করলে ভদ্রাদেবীও হাত তুলে প্রতিনমস্কার করে সামনের সোফাটায় বসে পড়লেন। মানসবাবু বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসুন। কারণ আমাদের কথা বাইরের কারুর কানে না যায়। আমি তাই চাই।

নিঃশব্দে উঠে দরজাটা ভেজিয়ে তার ওপর পর্দাটা টেনে দিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে বসে ভদ্রা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? আপনি কি আমাদের কেস করছেন? গোয়েন্দা?

মানসবাবু বললেন, আমি গোয়েন্দা নই, তবে গোয়েন্দার বাবা!

তার মানে?

তার মানে গোয়েন্দারা যেগুলো বুঝতে পারে না ধরতে পারে না, আমি সেগুলো ধরিয়ে দিই।

নিমেষে ভদ্রার চোখের দৃষ্টি যেন ভয়ার্ত হরিণীর মত দেখায়। একটু ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা আমাদের এই ব্যাপারে কোন আসামীকে কি ধরতে পেরেছেন ?

আস্তে আস্তে মানসবাবু তাঁর চোখ দুটো ভদ্রাদেবীর চোখের ওপর রেখে বললেন, পেরেছি।

পেরেছেন ? কে, কে বলুন না ? আগ্রহ ও আতঙ্ক মিশ্রিত এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

সহসা মানসবাবু তাঁর চোখ দুটো ভদ্রাদেবীর চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে বলেন, যদি বলি তিনি আমার সামনে ?

অ্যাঁ ! শিউরে ওঠে ভদ্রা ! তারপর চোখ দুটো মানসবাবুর চোখের ভেতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে বলে, কাকে কি বলছেন, জানেন ?

জানি ! দাঁতের ওপর দাঁত চেপে হিস-হিস করে মানসবাবু বলেন, শঙ্কর-দয়াল শর্মাকে চেনেন ?

চকিতে যেন তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। ভদ্রা বলে, না। ও-নাম জীবনে শুনি নি কখনো।

খপ্ করে পকেট থেকে একখানা ফটো বার করে, তাঁর সামনে তুলে ধরেন মানসবাবু। তাতে লেখা, 'এভার ইয়োরস'—ভদ্রা।

ভদ্রা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ফটোটা কেড়ে নিতে গেলে, ছবিটা পকেটের মধ্যে পুরে ফেললেন মানসবাবু।

কোথা থেকে পেয়েছেন আমার এ ছবি, বলুন শীগগির ?

চুরি করেছি, শঙ্করদয়ালের ঘর থেকে !

চুরি করেছেন কি করে ?

দু' আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গী করে মানসবাবু বললেন, টাকা দিয়ে কি না করা যায় ভদ্রাদেবী। আপনি একটা মানুষের জীবন নষ্ট করেছিলেন, আর এতো সামান্য একটা ফটো। তারপর সংযত কণ্ঠে বললেন, দেখুন ভদ্রাদেবী, আমার কাছে মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে আপনারই বেশী অনিষ্ট হবে। শুধু ওই একখানা ছবি নয়, আরো অনেক কিছু তথ্য আছে আমার কাছে, যা প্রমাণ যে আপনি ভালবাসতেন শঙ্করদয়ালকে। আপনার লাভার ছিল সে। জাতকুল ভেঙে বিয়ে আপনার বাবা একটা অর্ডিনারী কেরানীর

সঙ্গে না দিয়ে, বড়লোক স্বজাতি ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন, তাই এইভাবে প্রতিহিংসা নিলেন বেচারী নিরীহ ভাল মানুষ শুভনারায়ণের ওপর। তিনি আপনাকে এত ভালবাসতেন এবং আপনি তাঁর সঙ্গে যে এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে প্রেমের অভিনয় করে এসেছেন, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে নি, সাবাস অভিনেত্রী আপনি!

যা কেউ কল্পনা করতে পারে নি, আপনি তা কেমন করে করলেন! ভদ্রাদেবীর কণ্ঠে মৃদু অনুযুগের সুর।

বললুম তো আপনাকে, আমি বাবার বাবা। ডিটেকটিভরা কেউ কল্পনা করতে পারে না যা, আমি তাই পারি। ভগবান সবাইকে দুটো চোখ দিয়েছেন কিন্তু কাউকে কাউকে দেন আরো একটি বেশী—যার নাম তৃতীয় নয়ন! তারপর মোলায়েম সুরে মানসবাবু বললেন, জানি আপনার বাবা ছিলেন অত্যন্ত কড়াপ্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভয়ে তখন সুড়সুড় করে ভালো মেয়ের মত শুভনারায়ণের গলায় মালা দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কিন্তু বিয়ের দুটো বছর যেতে না যেতেই, আপনার বাবা করনারি থ্রম্বসিস-এ যেই মারা গেলেন, আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, তাই নয় কি?

এবার হাত জোড় করে ভদ্রাদেবী বলে উঠলেন, প্লিজ, ও-সব ব্যক্তিগত কথা আর তুলবেন না।

ব্যক্তিগত কথাই তো আমি জানতে চাই আপনার কাছে। যে সব কথা কেউ জানে না, আপনার একেবারে মনের গভীরে ছিল লুকানো, সেই কথাই আমি শুনতে চাই আপনার মুখে। তবে এ-কথা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ জানতে পারবে না। আমি আপনার কাছে 'প্রমিস' করছি। এই বলে গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে এনে মানসবাবু বললেন, শঙ্করদয়াল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এবং তিন দিন পরে হাসপাতালে যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন ডাক্তারকে বলে, কেন আমায় বাঁচালেন—আমাকে মেরে ফেলুন। আমি মরতে চাই। ভদ্রাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না কিছুতেই! এ কি সত্যি?

এবার আছড়ে পড়লেন ভদ্রাদেবী মানসবাবুর পায়ের ওপর। বললেন, দোহাই আপনার, এ-কথা আর দ্বিতীয়বার মুখে উচ্চারণ করবেন না। কেউ যেন না জানতে পারে। আপনি যত টাকা চান, লাখ টাকা আমি দেবো, শুধু কোন প্রশ্ন করবেন না। ভগবানের দিব্যি। বলুন, এ-কথা যেন দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় প্রাণী জানতে না পারে।

পা ছাড়ুন। আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি।

আপনি ভগবানের নামে শপথ করুন আগে তবে পা ছাড়বো।

মানসবাবু বললেন, আচ্ছা। শপথ করছি। কিন্তু আমার আর যা জিজ্ঞাস্য রয়েছে সেগুলো সরল ও সত্যভাবে আমায় বলতে হবে এবং তার জন্যে আপনাকেও ভগবানের নামে দিব্যি করতে হবে।

ভদ্রাদেবী ঘাড় হেঁট করে নীরবে যখন চোখের জল ফেলতে লাগলেন তখন মানসবাবু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, যে আপনার সম্বন্ধে এত সব জেনেছে তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, নিশ্চিত জানবেন। তবে আরো কিছুদিন বেশী সময় লাগবে এই যা।

এবার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে, মানসবাবুর দিকে তাকালেন ভদ্রাদেবী।

আচ্ছা, আপনার স্বামী শঙ্করদয়ালের এই আত্মহত্যার ব্যাপারটা কি শুনেছিলেন?

না। আস্তে উত্তর দিলেন ভদ্রাদেবী। তবে সেইদিন থেকে আমার স্বামী আমার চোখে অনেক নেমে গেলেন, শঙ্করের প্রেমটা বড় হয়ে উঠলো।

বেশ তো, তখন ডিভোর্স করে দিলেই পারতেন আপনার স্বামীকে। তা করলেই তো সবদিক থেকেই শোভন হতো।

যদি তা সম্ভব হতো তাহলে সেই পথেই যেতাম। কিন্তু আমার স্বামী আমায় এত ভালবাসতেন যে তিনি যখন তখন বলতেন, যদি কোন দিন আর কারুর দিকে মুখ ফেরাতে দেখি তাহলে সেই মুহূর্তে তোমায় গুলি করে আমি ফাঁসি যাবো জেনে রেখো।

মানসবাবু মুচকি হেসে বললেন, তাই, না অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা বলেই হঠাৎ একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। আচ্ছা ভদ্রাদেবী, দিল্লীতে দেখে এলুম শঙ্করদয়াল নিজে গ্রেটার কৈলাসে সুন্দর এক অট্টালিকা তৈরী করেছেন। এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?

কেন, শুনেছি তিনি এখন অনেক টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেন সরকারকে, কি সব কনট্রাকটারি বিজনেস করছেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন মানসবাবু। লোকে তাই জানে বটে কিন্তু আমি জানি অন্য কথা। যে মোটা টাকা সরকারকে ইনকাম-ট্যাক্স দেন তিনি সেটা আপনারই টাকা। ভূয়ো বিজনেস দেখিয়ে শঙ্করদয়াল এইভাবে

সকলের চোখে ধুলো দেয়। যাতে এত বড় বাড়ি কোথা থেকে, কেমনভাবে করা সম্ভব হলো, সরকারের মনে প্রশ্ন না জাগে।

আবার ঘাড় হেঁট করে রইলেন ভদ্রাদেবী। অর্থাৎ যা কিছু তথ্য মানসবাবু জেনেছেন ওর সম্বন্ধে, কোনটাই মিথ্যা নয়। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।

বাঁকা হাসি ঠোঁটের কোণে এনে মানসবাবু এবার বললেন, বুঝতেই পারছেন আমার অনুসন্ধান কত দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে? কিন্তু একটা হিসাব আমি আজও মেলাতে পারছি না। বন্ধ চাবি-আঁটা ঘরের মধ্যে থেকে আসামী কি করে কোন্ পথে অদৃশ্য হলো! একমাত্র আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কারো সাধ্য নেই সে-পথের সন্ধান জানা! বলুন! চুপ করে থাকবেন না।

এ আর এক কাহিনী। বলে মুখ তুললেন ভদ্রাদেবী। শোবার ঘরের পায়ের দিকের জানলাটার গ্রীল-এ যে স্ক্রু আঁটা আছে, সেটা সম্পূর্ণ স্ক্রু নয়। শুধু স্ক্রুর মাথাটা দেওয়া আছে—নীচেটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল আমারই ইচ্ছায়। ওখানে একটা রাধাকৃষ্ণের ডিজাইন বসাবো বলেছিলাম। তাই মিস্ত্রী বলেছিল, মা এটা তাহলে আলগা করে রেখে দিলুম, যাতে চট করে খুলে ওটা বসানো যায়। কিন্তু সেটা হয় নি। স্বামী ঠাকুরদেবতা পছন্দ করেন না বলে ওকেই বলেছিলুম, তুমিই এসে এটা বসিয়ে দিয়ে যেয়ো বাবা। (ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা মিস্ত্রীটাকে ধরে নিয়ে এলো পুলিস আমার কাছে। সে নাকি খুনী। নকশাল দলের লোক। ছোকরা আমার হাতে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। বললে, মিথ্যে কথা। আমি তো আপনার বাড়িতে কতদিন কাজ করেছি, আপনি জানেন।) কথাটা যে সত্যি, আমার জবানবন্দী লিখে নিয়ে চলে গেলেন পুলিস ইন্‌সপেক্টার।

মানসবাবু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ওই যে জানলার গ্রীলটায় শুধু স্ক্রুর মাথা লাগানো রয়েছে, আপনার স্বামী যখন রাধাকৃষ্ণের ডিজাইনওলা গ্রীল সেখানে বসাতে নিষেধ করলেন, তখন একবারও আপনার মনে হলো না যে সেটাকে তাহলে মিস্ত্রী ডেকে ভাল করে এঁটে দেওয়া উচিত।

না, ও-কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তা ছাড়া ওটা ছিল বারান্দার ভেতর দিকে এবং ওখানটায় আলগা স্ক্রু আঁটা মনেই হতো না।

মানসবাবু প্রশ্ন করলেন, ওই ছোকরাটি ছাড়া আর কেউ যখন জানতো না, তখন পুলিসের কাছে ওর নামটা কি আপনার করা উচিত ছিল না।

ভদ্রাদেবী এবার মৃদুস্বরে বললেন, এর একটা কারণ ছিল তাই আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছে।

কি এমন কারণ থাকতে পারে, স্বামীর মৃত্যুর চেয়েও সেটা বেশী? জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

একটু ভেবে তারপর বললেন ভদ্রাদেবী, হঠাৎ একদিন নিউ মার্কেট থেকে বেরুচ্ছি। দেখি, ওই ছেলেটি খালি গায়ে, খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। গলায় এক চিলতে সরু কাপড়ের ফালি তাতে চাবি বাঁধা। আমি মোটরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় কাছে এসে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, ওর চাকরি নেই। বেকার। তার ওপর বাপ মারা গেছে, দু'দিন পরে শ্রাদ্ধ তাই ভিক্ষা করছি এখানে দাঁড়িয়ে। আপনি যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন তাহলে আমি চিরদিন আপনার দাস হয়ে থাকবো। তখন আমার কাছে বিশেষ টাকা-পয়সা ছিল না। মার্কেটিং করতেই সব শেষ। বলেছিলুম তাকে পরদিন বাড়িতে যেতে। একশো টাকা তাকে দিয়ে বললুম, আর ভিক্ষে করবি না, এতেই তোর বাবার শ্রাদ্ধ হয়ে যাবে। টাকাটা হাতে নিয়ে সে কাঁদতে লাগল। বললে, নকশাল দলে আমি আছি এটা রটে যাওয়াতে কেউ চাকরি দিতে চাইছে না আমায়। বাবার অসুখে চিকিৎসা করাতে পারি নি বলে, বাবা মরলো। ওদিকে মা ও ছোট দুটো ভাই বোনের না খেয়ে দিন কাটছে। মা লোকের বাড়ি দাসীবৃত্তি করছে। ছেলেটি পায়ের ওপর মাথা রেখে বললে, আপনি যদি একটা যে কোন কাজ আমায় দেন তো ভাই বোন দুটোকে উপোষ করতে হয় না। তারা বড় ছোট। যখন বলে, দাদা বড্ড খিদে পেয়েছে, তখন আমার বুক ফেটে যায়। এই বলে একটু থেমে ভদ্রাদেবী বললেন, আহা বেচারীদের সেই শুকনো মুখগুলো আমার সামনে যেন ভেসে উঠলো। তাকে বলেছিলুম, শ্রাদ্ধ চুকে গেলে একদিন দেখা করতে। শ্রাদ্ধের ঠিক পরদিন ন্যাড়া মাথায় এসে হাজির হলো। একটা চিঠি লিখে ছেলেটিকে আমার স্বামীর কাছে, অপিসে পাঠিয়ে দিলুম পাটকলে যা হোক একটা কিছু চাকরি ওকে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। উনি চাকরি সেই দিনই করে দিলেন জগদ্দলের দু'নম্বর জুটমিলে। কিন্তু মাস ছয়েক তখনো হয় নি, হঠাৎ শোনা গেল গুদাম থেকে যে বিরাট চুরি হয়েছে, তার মধ্যে আছে সেই ছেলেটি। সে-ই নাকি দলের সর্দার। তার সঙ্গে নকশালদের যোগাযোগ আছে। বুঝতেই পারছেন, স্বামী এসে আমার ওপর রাগঝাল

করতে লাগলেন। তুমি এমন একটা শয়তানকে না জেনেশুনে একেবারে চাকরি দিতে বললে। এ পর্যন্ত বলে তারপর আর কি বলা উচিত যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না ভদ্রাদেবী।

মানসবাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, পাছে সেই ছেলেটি ধরা পড়লে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ওপর লোকের সন্দেহ এসে পড়ে তাই চেপে গিয়েছিলেন, বুঝেছি। অঙ্কটা এবার আমার মিলে গেল।

অবশ্য আরো একটা কারণ, ঠিক যেদিন আমি দিল্লী চলে গেলুম সকালে, সেইদিনই রাত্রে ওই অঘটন ঘটলো!

মানসবাবু বললেন, ঈশ্বর যেন আপনার মনের কথা অদৃশ্য থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই এমনি নাটকীয়ভাবে আপনার পথের কাঁটা দূর করে দিলেন। সেই মিস্ত্রী ছেলেটি ছাড়া আর কেউ জানবেনা ওই খোলা জানলার কথা, এ কাজ তার।

ভদ্রাদেবী এবার ধরা গলায় বলে ফেললেন, ছিঃ-ছিঃ, ও-কথা বলবেন না। দৈবাৎ ঘটনাচক্রে জিনিসটা এই রকম এসে দাঁড়িয়ে গেছে। মিথ্যে কথা। আপনি টাকা দিয়ে খুন করিয়েছেন আপনার স্বামীকে।

মানসবাবু মৃদু হেসে বললেন, দিল্লীতে গ্রেটার কৈলাসে 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের' অফিস থেকে জেনেছি, আপনার সঙ্গে শঙ্করদয়ালের বিয়ে শীগ্‌গির হচ্ছে। আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না। তাই সেই ছেলেটিকে হাত করেছিলেন জানি। কত টাকা তাকে দিয়েছেন।

আবার মানসবাবুর পায়ের ওপর হাত রেখে ভদ্রাদেবী বললেন, মনে রাখবেন, আপনি ভগবানের নামে দিব্যি করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানবে না এসব।

মানসবাবু বললেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহ তো অনেকেই করেন। তবে এত লুকোচুরির কি আছে!

এ বাড়িতে থেকে, এদের বৌ হয়ে এ-কথাটা আর এঁদের জানাতে চাই না। বলে চট করে ভেতরের ঘর থেকে লক্ষ টাকার নোটের তাড়া এনে ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

সুমথনাথ ঘোষ : ঝড় ও ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ত্রিশের দশকে যৌবন অতিবাহিত করেও যে সমস্ত লেখক যুদ্ধ, মহামারি ও রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব মুক্ত হয়ে তন্নিষ্ঠ স্বকিয়তায় সাহিত্য ও শিল্পের জগতে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন ও সাহিত্যানুশীলন করেছেন সুমথবাবু তাঁদের অন্যতম। পুস্তক সরবরাহ ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্প প্রয়াস লেখককে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। সাহিত্যের কোন ধারায় বা গোষ্ঠীতে যুক্ত না হয়েও গতানুগতিকতার বহমান স্রোতে গা না ভাসিয়ে লেখক গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গীতে অনন্য। ১৯৭৯ সালে মতিলাল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ভৌতিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত।

নিজস্ব প্রকাশন শিল্পের ব্যস্ত প্রাত্যহিকতার ফাঁকে ফাঁকে লেখক বহুগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তার রহস্য ও গোয়েন্দাধর্মী লেখাগুলি এক বিশেষ আস্বাদন বহন করে। উল্লিখিত "লাল নেশা" গল্পটি বাংলা গোয়েন্দা গল্পের গতানুগতিকতার স্রোতধারায় এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। লেখক ১৯১২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমানে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এক অজ্ঞাত পাড়ার বাসিন্দা।



শঙ্খচূড়

নীহার রঞ্জন গুপ্ত

বাইরে আকাশ কালো করে মুষলধারায় বর্ষণ চলেছিল

ঘণ্টা দুই আগে বর্ষণ শুরু হয়েছিল, এখনো তার বিরামের কোন চিহ্নমাত্রও নেই যেন। থেকে থেকে বিদ্যুতের চাবুক যেন কালো বর্ষণমুখর আকাশটাকে চিরে দিয়ে যাচ্ছিল।

তার সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দ।

কিরীটীর গৃহে আটকে পড়েছিলাম।

গৃহে যে আজ আর ফেরা হবে না জানতাম—তাই আরাম করে ডিভানটার উপর গা এলিয়ে সর্বাঙ্গ শিথিল করে দিয়েছিলাম। কৃষ্ণা খিচুড়ী ও ভাজা-ভুজির ব্যবস্থা করেছে জানি।

কৃষ্ণা একটা পিকটোরিয়াল ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল কিরীটীর পাশে বসে। কিরীটীর মুখে পাইপ। সামনে হুইস্কির গ্লাস।

হঠাৎ কৃষ্ণা বলল, যেভাবে সরকার পিছু লেগেছে—দেশ ড্রাই হয়ে গেলে তোমার কি অবস্থা হবে ভাবছি।

কিরীটী মৃদু হেসে গ্লাসের তরল পদার্থে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললে, তিনি আমার চিন্তামণিই যোগাবেন কৃষ্ণা, মা ভৈষী।

মানে কর্নেল বোস তো! তা তিনিই বা পাবেন কোথায়?

পাবেন—পাবেন। ভদ্রলোকটিকে তুমি চেনো না। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়—অতএব ও চিন্তা আমি করি না। জীবনের বাকি কটা দিন কেটে যাবে—আর কটা দিনই বা!

কৃষ্ণা মৃদু হাসল।

কিরীটী---

উঁ!

তোর জীবনের কোন একটা কাহিনী বল—যা আমার শোনা হয়নি। জানা হয়নি।

জানিস সুব্রত—এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে একজনের কথা মনে পড়েছে। মানে হঠাৎই মনে পড়ে গেল। আমার সত্যসন্ধানের জীবনে—দু-একটি ছায়া—অমন একটি মানুষ চোখে পড়েনি। জীবনে এই সুদীর্ঘ সত্যসন্ধানের জীবনে বোধ হয় তিনজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি—যাদের কথা যত দিন বেঁচে থাকব ভুলব না। এক কালো ভ্রমর—আমাদের ডাঃ সান্যাল, দুই পাল সিং আর তিন হচ্ছে—

কে?

সুলতান আহম্মদ। জাতে পাঠান। শুনেছিলাম পেশোয়ারে এক গরীব চাষার ঘরে ও জন্মেছিল। তেরো বছর বয়সে ঘরে তুলে রাখা তার ডাকাত বাপের রাইফেলটা দিয়ে তার কাকাকে খুন করে ল্যাণ্ডি কোটালে পালিয়ে যায়। বলিস কি।

হ্যাঁ। সেই যে হাতে রাইফেল তুলে নিয়েছিল সে রাইফেল তার হাতে থেকে নামেনি। এনকাউনটারে মিলিটারির মেশিনগানের গুলি থেকে লোকটা তক্ষশিলার লুপ্ত নগরীর স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করে তার প্রিয়ার মৃতদেহটা কাঁধে করে—ঘণ্টাখানেক ধরে গুলি বিনিময়ের পর তার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা যখন পুলিস আবিষ্কার করে তখনো তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল তার রাইফেলটা আর পাশে পড়েছিল তার দিন পাঁচেক আগে তারই হাতে গুলিতে মৃতা প্রিয়ার পচা লাশটা।

কৃষ্ণা বললে, সে তো অনেকদিন আগেকার কথা!

তা ঠিক—সেটা ব্রিটিশ আমল এবং সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু

হয়েছে। থাকি তখনো বাণীভবন মেসে। আর ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪১ সনের গোড়ায়—আজকের পাকিস্তানের ক্যাপিটাল ইসলামবাদে। —অর্থাৎ তখনকার রাওলপিণ্ডিতে।

গল্পটা শোনার জন্য আমি আর কৃষ্ণা বলাই বাহুল্য দুজনেই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

সুব্রত, তোর সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার সলিল সেনের নামটা নিশ্চয়ই মনে আছে!

বললাম, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।

তার এক কাকা প্রসূন সেন মশাই তখন পাঞ্জাব পুলিসের একজন এস. পি। কাকামশাইয়েরই এক চিঠি পেয়ে আমি আর সলিল রাওলপিণ্ডি যাই। কিছুদিন আগে কাকামশাই ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলেন—তখুনি আমার কথা গল্প করেছিল সলিল তাঁর কাছে।

সলিল যখন আমার মেসে এসে তার কাকামশাইয়ের চিঠি দেখিয়ে পিণ্ডিতে যাবার আমন্ত্রণ জানাল, একটু অবাকই হয়েছিলাম কারণ তাঁর নামও তখনো শুনিনি দেখা তো দূরে থাক।

বললাম, কি ব্যাপার রে—তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন পরিচয়ই নেই!

সলিল বললে, পরিচয় আছে।

মানে?

মানে তিনি আমার মুখ থেকে তোর কথা শুনেছেন।

আমার কথা?

হ্যাঁ।

তা আমার আবার কি কথা তাঁকে তুই বলেছিস?

তোর প্রখর বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের কথা। শুনে তিনি বলেছিলেন—

কি বলেছিলেন?

ছেলেটি পুলিস লাইনে চাকরি নেবে তো বল্।

তা তুই কি বললি?

বললাম, না কোন দিনই তা নেবে না। স্বাধীন ভাবে সে detection করতে চায়।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে তাঁর কি প্রয়োজন হল?

নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছে, নচেৎ এত করে তোর কথা লিখবেন কেন? কবে যাবি বল্?

যেতে আর আপত্তি কি, একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে—তবে বর্তমানে একটা কোকেনের চোরাকারবারীকে নিয়ে ব্যস্ত আছি—পেশোয়ার থেকে বর্মা পর্যন্ত তার চোরাই কারবার—ডি. আই. জির বিশেষ অনুরোধে—

চল্ না বাবা—তেমন প্রয়োজন বুঝলে না হয় চলে আসিস। না করিস না।

আমি টিকিট কাটতে যাচ্ছি ফ্রনটিয়ার মেলে।

বেশ।

সলিল চলে গেল। সলিল তখনো পুলিসের চাকরিতে ঢোকেনি। অন্য কি একটা কাজ করছিল—বোধ হয় কোন সংবাদপত্রের অফিসে।

কিরীটীর হাতের পাইপটা নিভে গিয়েছিল।

নতুন করে তামাক ভরে আবার সে পাইপে অগ্নি সংযোগ করল।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি তখনো ঝরছে।

ডিসেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যায় গিয়ে পিণ্ডি ষ্টেশনে দুজনে অবতরণ করলাম। মনেই ছিল কাকামশাই প্রসূন সেনের বাংলো। একটা টাঙ্গা করে দুজনে গিয়ে বাংলোর সামনে নামলাম।

কাকা ছিলেন না—কিন্তু কাকীমা ছিলেন। কাকার দুই ছেলে কনভেন্ট থেকে পড়াশুনা করে। বাড়িতে তাই কাকা, কাকীমা ও ভৃত্য-বেয়ারার দল।

হাঁ কাকীমা, এই আমার বন্ধু কিরীটী রায়। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো কাকীমা, হঠাৎ আমাকে কিরীটীকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবার জন্য জরুরী পত্রাঘাত করলেন কেন?

কাকীমা বেশ মোটাসোটা গিন্নীবান্নী গোছের এক মহিলা। বললেন, তা তো জানি না।

জান না! সলিল বললে।

না রে, শুধু একদিন সুলতান আহম্মদের কথা বলতে বলতে—

সুলতান আহম্মদ? কে সে?

কে জানে বাপু—শুনেছিলাম তোর কাকার মুখে একটা ভয়ের চোরা-কারবারী—ঐ নামটা কিন্তু কাকামার মুখ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কান দুটো আমার খাড়া হয়ে উঠেছিল—কারণ কলকাতায় যে মানুষটার চোরাই কারবার ধরার জন্য আমি ব্যস্ত ছিলাম তার নামটা ঐ সুলতান আহম্মদ।

লোকটা একটা পাঠান। প্রচণ্ড দুর্ধর্ব—সর্বত্র তার নাকি গতিবিধি এবং তাকে পুলিস আজ পর্যন্ত স্পর্শও করতে পারেনি—বাঘা বাঘা পুলিস অফিসারদের ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায়।

আমিই বললাম কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কি নাম বললেন কাকীমা, সুলতান আহম্মদ ?

হ্যাঁ।

সলিল আমায় বললে, তুই নামটা শুনেছিস নাকি কিরীটী ?

আমি সলিলের কথার কোন জবাব দিলাম না। সুলতান আহম্মদের কথাই তখন আমি ভাবছি। এ সেই সুলতান আহম্মদ নয় তো! যার চেহারাটা মাত্র ফটোতে দেখেছি ডি. আই. জির কাছে। বয়স মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী নয়, পাতলা দোহারা গঠন—চেহারা দেখলে দুর্ধষ কোন পাঠান বলে মনেই হয় না। মুখখানা কিছুটা লম্বাটে ধরনের—ধারালো চিবুক, প্রশস্ত কপাল, চোখ দুটো নিরীহ গোবেচারীর মত—শান্ত উদাস—উদাস কিছুটা যেন চোখের দৃষ্টি। পরনে পেশোয়ারী কুর্তা—তার উপর জরির কাজ করা একটা ওয়েস্টকোট, মাথায় পাগড়ি। মোটমাট ভারী সুশ্রী চেহারা।

ঐ চেহারার একটা লোক যে একটা দুর্ধষ ক্রিমিন্যাল—দেখে আদৌ বোঝবার উপায় নেই।

ডি. আই. জি. কে বলেছিলাম, এই আপনাদের খতরনাক ক্রিমিন্যাল ? চোরাকারবারী সুলতান আহম্মদ ?

হ্যাঁ কিরীটী, this is the person ! এই ফটোর copyটা তুমি রাখ। ডি. আই. জি. এক কপি ফটো আমায় দিয়েছিলেন। ফটোটা আমার স্যুটকেসেই ছিল তখন।

তারপর ? আমি শুধালাম।

কিরীটী বলতে লাগল, রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ কাকামশাই এলেন। আমাদের আহারপর্ব আগেই চুকে গিয়েছিল—ঘরের ফায়ার প্লেসের সামনে দুজনে বসে গল্প করছিলাম। কাকামশাই আহারাদির পর আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন, তারপর কাকামশাই একটা চেয়ার টেনে আমাদের পাশে বসলেন।

সলিল আমার পরিচয় দিল। কাকামশাই আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

তুমিই কিরীটী রায় ?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

কাকামশাই তখন বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি আমায় বোধ হয় সাহায্য করতে পারবে। এবারে বলি, কিরীটী, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। একটা দুর্ধর্ষ স্মাগলার—যার কর্মক্ষেত্র ল্যাণ্ডিকোটাল থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, মায় সুদূর সেই বর্মা পর্যন্ত—অথচ আশ্চর্য কি জান কিরীটী, লোকটার বয়স খুব একটা বেশী না—ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যেই হবে, রোগা দোহারা চেহারা, কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্র। আর—

আর কি ?

রাইফেল চালানোর ব্যাপারে সে বোধ করি গাণ্ডীবধারী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সমকক্ষ। আর কেবল রাইফেলই বা বলি কেন, তার হাতের পিস্তল ও ছোরাও সমান চলে তার শত্রুকে লক্ষ্য করে। ঘোড়ায় চড়ায়, মোটর বাইক ও গাড়ি ড্রাইভ করতে সে সমান দক্ষ।

আমি তখন বললাম, কাকাবাবু, লোকটার চোরাকারবার ও গতিবিধির কথা আমি অনেকটা জানি।

জান ?

জানি।

কি করে জানলে ?

কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক বড় অফিসারের মুখে। আর তার ফটোও দেখছি।

তবে তো দেখছি সেই ক্রিমিন্যালটা সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জান কিরীটী।

অনেক কিছু নয়—তবে কিছু কিছু জানি, আর তাই থেকেই একটা প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে—

কি প্রশ্ন ?

লোকটা বেশীর ভাগ সময় কোথায় থাকে ?

এই রাওলপিণ্ডি শহরেই—যতদূর জানতে পেরেছি—এখানেই ?

হ্যাঁ। তবে ঠিক কোথায় থাকে জানতে পারিনি, অনেক চেষ্টা করেও।

আচ্ছা আর একটা কথা কাকাবাবু—

কি, বল তো ?

লোকটা বিবাহিত কি শুনেছেন ?

Yes! That reminds me—একটা কথা—

কি?

ওর স্ত্রীর নাম শুনেছি রৌশন।

রৌশন!

হ্যাঁ। মেয়েটা শুনেছি কাশ্মিরী। অসাধারণ সুন্দরী। বয়েসও খুব বেশী নয়—ষোল-সতের হবে।

আচ্ছা কাকাবাবু, লোকটা যে এই শহরেই থাকে বেশীর ভাগ সময় সেটা অনুমান করলেন কি করে আপনারা? প্রশ্ন করলাম তখন আমি।

সর্বত্র লোকটার সুলুকসন্ধানের জন্য অনেকদিন ধরেই গুপ্তচর লাগানো হয়েছে—সেই গুপ্তচরদের মধ্যে গত এক বছরে চারজনের মৃত্যু ঘটেছে, এই শহরের মধ্যেই—

মৃত্যু ঘটেছে?

হ্যাঁ। প্রত্যেকেরই বুকে রাইফেলের গুলির ক্ষতচিহ্ন এবং প্রত্যেকেরই বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছে। পোষ্টমর্টেমে একটা ব্যাপার জানা গিয়েছে, প্রত্যেকেরই হার্টে—হৃৎপিণ্ডে সোজা গিয়ে গুলি প্রবেশ করেছে, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে। প্রায় বলতে গেলে প্রতিটি গুলি হার্টের রাইট ভেন্ট্রিকেলকে গিয়ে বিদ্ধ করেছে—

আশ্চর্য!

হ্যাঁ কিরীটী, কাকামশাই বললেন, আশ্চর্য লোকটার হাতের নিশানা!

আমি বললাম, শুধু তাই নয় কাকাবাবু, ঐ ব্যাপারটা থেকে আরও একটা জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে—

কি রকম? কাকামশাই প্রশ্ন করলেন।

প্রতিটি হত্যাই যে একই হাতের কাজ সেটাও বোধ হয় সে পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে—যার পশ্চাতে রয়েছে তার একটি সাবধান বাণী—আমার পিছনে লাগলে এই পরিণতিই হবে সকলের। আর আপনি ঠিকই বলেছেন কাকাবাবু, আমি বললাম, সে হয়ত বেশীর ভাগ সময় এই শহরের মধ্যেই থাকে এবং তা না হলেও হয়তো—

কি বল তো? প্রশ্ন করলেন কাকামশাই।

বলছিলাম হয়তো তার কোন নিকট আত্মীয় এই শহরেই কোথাও না কোথাও থাকে যার কাছে সুলতান আহম্মদ নিয়মিত আসা যাওয়া করে।

তোমার অনুমান হয় তো ঠিকই কিরীটী। কাকামশাই বললেন।

আচ্ছা, শেষ হত্যাকাণ্ডটি কবে সংঘটিত হয়? আমি এবারে প্রশ্ন করলাম।

মাত্র মাসখানেক আগে—

হুঁ। আমি বললাম, তাহলে এও প্রমাণিত হচ্ছে, অন্তত মাসখানেক আগে সে এখানেই ছিল!

ঐ চার-চারটি মৃত্যু যে একই লোকের হাতে ঘটেছে কিরীটী—তার আরও একটা প্রমাণ বোধ হয়—অন্তত পুলিসের ধারণা—

কি বলুন তো?

সবুজ রেশমী রুমাল!

২

সবুজ রেশমী রুমাল? প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ। প্রত্যেকের—মানে ঐ গুলিবিদ্ধ চার মৃত ব্যক্তিরই গলদেশে একটি করে সবুজ বর্ণের রেশমী রুমাল পেঁচানো ছিল।

গলায় প্রত্যেকেরই সবুজ রংয়ের রেশমী রুমাল পেঁচানো ছিল বলছেন?

হ্যাঁ। আচ্ছা কাকাবাবু, ঐ যে রৌশন নামে কাশ্মিরী মেয়েটির কথা বললেন—পরমা সুন্দরী - ওর কথা জানলেন কি করে? কেউ কি আপনাদের মধ্যে কখনও দেখেছে তাকে এবং সে যে ঐ সুলতান আহম্মেদেরই স্ত্রী সে ধরনের ইঙ্গিত বা সংবাদ কোথা থেকে কিভাবে পেলেন?

শেষ যে গুপ্তচরটির মৃত্যু হয় মাসখানেক আগে—তার নাম পীর মহম্মদ, জাতে লোকটা পাঠান ছিল, পেশোয়ারে বাড়ি, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ মত ছিল—লোকটা যেমন তাগড়াই চেহারার তেমনি দেখতে লম্বাচওড়া। সে একদিন মাস চারেক আগে আপনা থেকেই এখানে আমার দপ্তরে আসে।

তার পর? প্রশ্ন করলাম।

বললে, সাহেব আমাকে একটা কাজ দাও।

বললাম, কি কাজ দেব? তোমাদের পুলিস ডিপার্টমেণ্টে।

বাড়ি কোথায়? পেশোয়ারে।

গুপ্তচর বিভাগে কাজ করবে? কি করতে হবে?

পুলিসের প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করে আনতে হবে।

কি ধরনের প্রয়োজনীয় খবর সাহেব?

ধর কোন চোর ডাকাতের সংবাদ—কোন লুঠেরার—কোন স্মাগলারের

খবর—আমার কথায়, কাকাবাবু বললেন, হঠাৎ চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল, সে বললে, আমি চেষ্টা করলে সাহেব একজনের সংবাদ এনে দিতে পারি—কার সংবাদ? কাকামশাই প্রশ্ন করলেন।

ভীষণ খতরনাক আদমী সে—ইবলিশের বাচ্চা।

কে বল তো? কে এমন লোক? সুলতান আহম্মদের নাম শুনেছেন?

কাকামশাই চমকে উঠলেন মনে মনে, কিন্তু মুখে সেটা আদৌ প্রকাশ করলেন না। কেবল একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের সঙ্গে বললেন, তুমি তাকে জানো নাকি? জী সাব। চেনো তাকে। জী।

কাকামশাইয়ের একবার মনে হয়েছিল, লোকটা সুলতান আহম্মদেরই চর নয় তো—পুলিসকে ফাঁসাবার জন্য পাঠিয়েছে। তবু বললেন, কি করে চিনলে তাকে?

ও বাৎ মাত্ পুছিয়ে সাব। আমি তাকে চিনি। সে আমার জীবনটা একদম বরবাদ করে দিয়েছে। আমার জীবনের সবসে বড়া দুশমন—

কি করেছে সে তোমার?

আমার রৌশনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমার বুক থেকে—

রৌশন? আমার জরু। কবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

প্রায় এক সাল হয়ে গেল। সেই থেকে সেই দুশমনটাকে আমি সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। একবার যদি তার পাত্তা পাই তো তার কলিজাটা আমি দু'টুকরো করে ফেলব।

পাবে তার পাত্তা? আমাকে পেতেই হবে। দেখবেন সাহেব আমার রৌশনের তসবীর! বলে লোকটা তার মলিন কুর্তার পকেট থেকে সযত্নে কাগজে মোড়া একটা ফটো বের করল। দেখলাম অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী।

এই রৌশন? হ্যাঁ, এই—এই আমার জরু। কাশ্মীর থেকে ওকে নিয়ে এসেছিলাম। এক হাউসবোটের মালিকের মেয়ে। শিকারা চালাত—

চুরি করে? হ্যাঁ সাহেব, চুরি করেই। তবে রৌশনও হামাকে ভালবেসেছিল—নচেৎ কি পারতাম তাকে আনতে?

পেয়েছ তার কোন রকম সন্ধান পীর মহম্মদ?

শেষ সংবাদ যা পেয়েছি—ডেরা ইসমাইল খান থেকে সুলতান আহম্মদ তাকে এখানেই এই শহরেই এনে কোথায়ও রেখেছে। সাহেব, আমি তো একা তার হাত থেকে রৌশনকে ছিনিয়ে আনতে পারব না, তাই—

পুলিসের সাহায্য চাও! কাকাবাবু বললেন।

কেবল তাই না সাহেব, পুলিসের চাকরিতে ঢুকলে আমার অনেক সুবিধা হবে—

ঠিক আছে—আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও। দু-চার রোজ পরে এস।

পীর মহম্মদ সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

কাকামশাই একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, পরের দিনই ডি, আই, জি, মিঃ রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম।

মিঃ রবার্টসন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল তাকে সেপাইয়ের একটা চাকরি দিতে। দিন তিনেক বাদে পীর মহম্মদ এলে তার চাকরি হয়ে গেল।

আমি তাকালাম কাকামশাইয়ের মুখের দিকে, তারপর?

চাকরি নেবার তিন মাস বাদে একদিন সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল!

কি খবর পীর মহম্মদ?

সন্ধান পেয়েছি সাহেব—পেয়েছ?

হ্যাঁ। কোথায়?

আরো কিছুদিন আমাকে সময় দিতে হবে। তারপর এসে সঠিক সংবাদ দেব। তবে এটা জানুন, সে ঘন ঘন এই শহরে আসে—তাই নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু তার দলের লোকেরা তো নয়ই—এমন কি কাক পক্ষীতেও জানতে পারে না তার আসার খবর। আচ্ছা আমি চলি সাহেব—শীগ্গিরই আবার মূলাকাত হবে—সেলাম।

পীর মহম্মদ চলে গেল।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম, আবার কবে এল সে?

বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় দোলালেন কাকামশাই। বললেন, না কিরীটী, আর সে আসেনি। আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। দেখা হল মাসখানেক বাদে ক্যানটনমেন্ট এরিয়া—মানে আমাদের বড় সাহেব ডি, আই, জি, —রবার্টসনের বাংলোর হাতার মধ্যে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়। বুকে গুলিবিদ্ধ—গলায় সবুজ রঙের রেশমী রুমাল!

আমি বললাম সব শুনে, বড় সাহেবের বাংলোর হাতার মধ্যে পীর মহম্মদের মৃতদেহটা পাওয়া গেলেও নিশ্চয়ই সেখানে তাকে হত্যা করা হয়নি—অন্য কোথাও হত্যা করে ওখানে মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সম্ভবত!

তাই আমাদেরও ধারণা কিরীটী। কাকামশাই বললেন।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী থামল। আমি বললাম, তারপর ?

কিরীটী বললে, রাত বারোটা বাজে—পেট চোঁ চোঁ করছে—

সকলে আমরা খাবার জন্য উঠে পড়লাম।

খাওয়াদাওয়ার পর কিরীটী বলেছিল, বাকিটা আর একদিন শুনিস। কিন্তু আমি আর কৃষ্ণা সম্মত হলাম না। কাজেই আহারের পর তিনজনে এসে আবার বাইরের ঘরে বসলাম। বৃষ্টি তখন কিছুটা কমের দিকে। জানালাপথে চেয়ে দেখি বাড়ির সামনে প্রায় একহাঁটু জল।

বুঝলাম কলকাতা শহর ভাসছে।

কিরীটী আবার তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করল। পীর মহম্মদের মৃত্যুসংবাদটা দেবার পর কাকামশাই বললেন, এই সুলতান আহম্মদের একটা কিনারা করবার জন্যই তোমাকে ডেকে আনিয়েছি কিরীটী। বড় সাহেবকে তোমার কথা বলেছিলাম। তিনি সম্মত হতেই তোমাকে চিঠি দিয়ে আনিয়েছি।

আমি তখন বললাম, কলিকাতায় আমিও সেখানকার পুলিসের বড়-কর্তার অনুরোধে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা শুরু করেছিলাম কাকাবাবু—বোধ হয় এখান থেকেই সেখানে সাহায্য চাওয়া হয়েছে—

আমি সেটা জানি। জানতাম না কেবল তোমার সাহায্য তারাও চেয়েছেন। তা কিছু জানতে পেরেছ ?

না। কোন কূলকিনারাই যেন পাচ্ছিলাম না, এখন আপনার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে লোকটার একটা কিনারা হয়তো করতে পারব।

কিন্তু লোকটা সাংঘাতিক টাইপের দুর্ধর্ষ কিরীটী !

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু দুর্ধর্ষ নয় কাকাবাবু—অসাধারণ চতুর ও বুদ্ধিমান, তবে যা বুঝতে পারছি লোকটার একটা দুর্বলতাও আছে—উইক পয়েন্ট তার চরিত্রের মধ্যে বলতে পারেন।

কি বলতো ? প্রশ্ন করলেন কাকামশাই।

লোকটার মেয়েমানুষের ওপরে আসক্তি—

তুমি বলতে চাও কিরীটী—

আমি মৃদু হেসে বললাম, বলতে এই মুহূর্তে আমি কিছুই চাই না কাকাবাবু—তাছাড়া **it is too early to say anything**—

বেশ বেশ, তা এখন তুমি—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, দুটো দিন আমাকে ভাবতে দিন—তবে একটা কাজ আপনাকে করতে হবে কাকাবাবু—কি বল তো ?

রেল স্টেশনে—বাস স্ট্যাণ্ডে সর্বত্র প্লেন ড্রেসে কতকগুলো বিশ্বস্ত লোককে পাহারায় রাখুন এবং তাদের ফোটো দেখিয়ে ভাল করে চিনিয়ে দিন সুলতান আহম্মদকে—একটা করে ফোটোর কপি প্রত্যেককে দিতে পারলে আরও ভাল হয়—যাতে করে—

লোকটাকে দেখামাত্রই তারা identify করতে পারে, তাই তো !

হ্যাঁ। তবে লোকটা যদি ছদ্মবেশ ধারণে পারদর্শী হয়, তাকে হয়ত চট্ করে Spot out করতে পারা যাবে না, তবু সাবধানের মার নেই।

সেদিনকার মত অতঃপর আসর ভঙ্গ হল। আমরা যে যার শয্যায় আশ্রয় নিলাম। যাই হোক, দুদিন নয়—চারটে দিন আমি শুয়ে—বসেই কাটিয়ে দিলাম। বাংলো থেকে কোথায়ও বের হলাম না। পঞ্চম দিনে কিন্তু বেরুতেই হল সুব্রত—আমি প্রশ্ন করলাম, কেন ?

আবার একজন লোক নিহত হল।

নিহত হল।

হ্যাঁ, সুব্রত।, একটা প্লেন—ড্রেস গুপ্তচর। সেই আগের মতই বাঁদিকে বুকে রাইফেলের গুলির ক্ষতচিহ্ন ও গলায় সবুজ রেশমী রুমাল। খবরটা কাকাবাবুর মুখে শুনেই আমি তার সঙ্গে অকুস্থানে গেলাম। যে সব লোককে স্টেশনে ও বাস স্ট্যাণ্ডে মোতায়েন করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে তাদেরই একজন। লোকটার নাম সফিউল্লা। একজন পাঞ্জাবী। বয়স অনুমান চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ। রোগা পাতলা চেহারা। গত পাঁচ বছর ধরে পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছিল। লোকটা ছিল যেমন বিশ্বাসী তেমনি বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম। কিরীটী বলতে লাগল আবার একটু থেমে, ঘটনাটা ঘটেছিল পুরাতন শহরের মধ্যে, মল থেকে অনেকটা দূরে, বাড়িগুলো সেখানে খুব ঘিঞ্জি নয়। দেখলাম একটা সাদা রংয়ের দোতলা বাড়ির হাত পনের দূরে রাস্তার ওপরে মৃতদেহটা পড়ে আছে।

পুলিস মৃতদেহটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল—কিছু দূরে আসল কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেছে, কিন্তু পুলিসের ভয়ে সামনে আসতে পারছে না।

সকলের চোখেমুখেই একটা ভীতি যেন স্পষ্ট। আমি একবার মাত্র মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জায়গাটার আশপাশে নজর দিলাম।

কাঁচা ধুলোর সড়ক—কংক্রিট রাস্তা নয়। কিছু বাড়ি আছে বটে ঐ

তল্লাটে—কিন্তু ঐ সাদা রংয়ের দোতলা বাড়িটা যেন কিছুটা স্বতন্ত্র অন্যান্য বাড়িগুলো থেকে। লোহার গেটও পার হলেই খানিকটা বাগানের মত চোখে পড়ে। নানা ধরনের গাছগাছালি আছে সেখানে।

আমি কাকাবাবুকে প্রশ্ন করলাম, ঐ সাদা বাড়িটা কার কাকাবাবু?

ওটা জোহরা বাঈজীর বাড়ি।

বাঈজীর বাড়ি! হ্যাঁ। খুব নাম করা গাইয়ে। গজল গায় অতি অপূর্ব।

বাঈজীর সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় না কাকাবাবু?

কেন যাবে না। কিন্তু কেন বলতো—বাঈজীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও কেন?

আমি বললাম, এমনিই—

এখুনি যাবে? কাকামশাই শুধালেন।

না এখুনি না। আজ সন্ধ্যার পর যদি হয় তো ভাল হয়।

কিন্তু সন্ধ্যার পর তো সুবিধা হবে না কিরীটী।

কেন? ওর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যার পর মাইফেল বসে। শহরের সব রহিস লোকেরা গান শুনতে আসে।

তা হোক। আপনি বরং একটা কাজ যদি করতে পারেন তো ভাল হয়—

কি বল তো?

লোক পাঠিয়ে একটা সংবাদ দিয়ে রাখবেন যে আমরা যাব ওর বাড়িতে সন্ধ্যার পর—

বেশ তো!

ঐ সময় কালো রংয়ের একটা অস্টিন গাড়ি দেখা গেল ঐদিকে আসছে। গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে গেল—এবং ঠিক সেই সময় চলন্ত গাড়ির জানালা পথে চকিতের জন্য একটি অপরূপ সুন্দরী নারীব মুখ দেখতে পেলাম।

কাকামশাই বললেন, ঐ তো জোহরা চলে গেল!

বললাম, ঐ জোহরা? হ্যাঁ। বয়স তো ওর খুব বেশী মনে হল না!

না, কুড়ি—একুশ হবে। ওর মা জদ্দনবাঈ ছিল এ শহরে নামকরা বাঈজী। তারই মেয়ে। আগে ও সকলের সামনে বেরুত না—গান ও শোনাত না, বছর দুই হল ওর মা মারা যাবার পর থেকে ও ব্যবসা শুরু করেছে।

গায় কেমন?

কাকামশাই আমার প্রশ্নে মৃদু হেসে বললেন, গান মোটামুটি গায়—তবে শুনি ওর গানের চাইতে সকলের কাছে ওর রূপের আকর্ষণটাই নাকি বেশী।

তাই বুঝি? হ্যাঁ, তাই ভিড়ও খুব হয় আসরে—

তা সত্যিই দেখবার মতই চেহারা বটে মেয়েটির।

কাকাবাবু আড়চোখে একবার দিকে তাকালেন। আমি কিন্তু ব্যাপারটা গায়েই মাখলাম না। বললাম, আমি তাহলে চলি—

যাবে? হ্যাঁ। আর কিছু তোমার এখানে দেখবার নেই?

না কাকাবাবু—বলতে গিয়ে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, পথের ধারে ধুলোর ওপর কিছু ঘোড়ার খুরের এলোমেলো দাগ। বললাম, ঐ দেখুন কাকাবাবু—

কি বল তো? ঘোড়ার খুরের দাগ।

কাকামশাই যেন নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দাগগুলো একবার দেখলেন। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। কাকামশাইয়ের গাড়িতেই আমি ফিরে এলাম। একটু থেমে কিরীটী বললে, একটা কথা আজ অকপটে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই সুব্রত—

কি কথা? আমি বললাম।

সেদিন সুলতান আহম্মদ যদি ভুলটা না করত—

ভুল?

হ্যাঁ, পরে বলব। যাকগে, কথা হচ্ছে সে সেদিন ঐ ভুলটা যদি না করত—তবে হয়ত অত তাড়াতাড়ি ওর মৃত্যু ঘনিয়ে আসত না। আমাকে হয়ত সেদিন শুধুহাতেই ফিরে আসতে হত। সুলতান আহম্মেদের পাত্তাও কেউ কোনদিন পেত না।

এ কথা কেন বলছিস কিরীটী! প্রশ্ন করলাম আমি।

বলছি এই কারণে যে, ঐ পাঞ্জাবী যুবকের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই সুলতান আহম্মেদের ভাগ্যে শনি প্রবেশ করেছিল।

যাক গে, যা বলেছিলাম। সলিল বাড়িতেই ছিল, আমাকে ফিরে আসতে দেখে প্রশ্ন করল, কি হল—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে কিরীটী?

বললাম, দেখা হয়ে গেল তাই চলে এলাম।

দেখা হয়ে গেল সব কিছু?

হ্যাঁ, আমার যা দেখবার ও জানবার ছিল দেখে এলাম জেনে এলাম। সলিল—

বল ?

আজ এক জায়গায় গান শুনতে যাব—গান শুনতে যাবে—তা কোথায় ?

জোহারা বাঈজীর গৃহে। বাঈজীর গান শুনতে যাবে !

কেন হে, তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি ? সময়টা বেশ আনন্দেই কেটে যাবে—যাবে নাকি আমার সঙ্গে !

না ভাই, রক্ষে কর। কাকা শুনলে—

কি হবে ? না, বলছিলাম মানুষটা অত্যন্ত মরালিস্ট—

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, পুলিসের চাকরি করছেন এতদিন ধরে কিন্তু কখনও একটা পয়সা ঘুষ নেননি আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে—

অন্যায় করছেন :

মানে ? দেখ যে পূজায় যে মন্ত্র বা যা উপাচার—না মানলেই গোলমাল !

কাকা জানতে পারলে কথাটা—

কাকাবাবু জানেন।

জানেন !

হ্যাঁ, বলেছি তাঁকে।

তা কি বললেন কাকা ?

ব্যবস্থা করবেন বলেছেন—

সত্যি বলছ ?

মিথ্যে নয় সন্ধ্যার পরই জানতে পারবে।

ঠিক সন্ধ্যায় নয়।

রাত সোয়া নটা নাগাদ গেলাম জোহরার গৃহে। কাকাবাবুর কাজ ছিল কিছু—সেরে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল—জোহরা বোধ হয় সেদিন আমাদের যাবার কথা শুনেই তার আসর শেষ পর্যন্ত বসায়নি, সারা বাড়িটা নীরব নীস্তব্ধ।

গাড়ি থেকে নেমে গেট দিয়ে ভেতর প্রবেশ করলাম। কাকামশাই আগে আগে, তাঁর পশ্চাতে আমি। কাকামশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম, জোহরার গৃহে ঐ রাত্রে যাবার ব্যাপারটা তিনি ঠিক সহজ মনে নিতে পারেননি। আমার প্রস্তাবে যেন তাঁর মনের মধ্যে এতটুকু সায় ছিল

না—অথচ প্রস্তাবটা তিনি অস্বীকারও করতে পারছিলেন না। তাই বোধ করি ভেতরে ভেতরে তিনি একটু অস্বস্তিই বোধ করছিলেন।

তিনি একবার বলেছিলেনও, জোহরা বাঈজীর ওখানে গিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর কিরীটী, সে তোমার এই ব্যাপারে কোনপ্রকার সাহায্য করতে পারবে?

আমি বলেছিলাম, কোনই হয়ত লাভ হবে না, তবু—

তবে সেখানে যাবার কি প্রয়োজন?

কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলতেও তো কোন ক্ষতি নেই কাকাবাবু।

তা নেই—তবু কি তুমি মনে কর সে তোমাকে সত্যি কোন কথা জানলেও বলবে?

তা হয়ত বলবে না। আমি তবু তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কাল রাত্রে কোন সময় সে কোন গুলির আওয়াজ পেয়েছিল কিনা—

ঐ তল্লাটে তো সেকথা সকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—কেউ তো কিছু শুনতে পায়নি। তাই আমার মনে হয়েছে, হয়ত লোকটাকে অন্য কোথাও হত্যা করে ঐখানে সে ফেলে রেখে গিয়েছে এক সময়।

তা বিশেষ করে ঐখানেই বা ফেলে গেল কেন মৃতদেহটা—প্রশ্নটা আমার মনে প্রথম থেকে জাগলেও একটিবারও উচ্চারণ করিনি কাকাবাবুর সামনে, তখনো চুপ করেই রইলাম।

আমাদের সাড়া পেয়ে একজন দাসী বের হয়ে এলো, আইয়ে সাব—বাঈ আপকো ইন্তাজার কর রহে হে—

কেয়া, বাঈজী বৈঠা হ্যায়?

জী। আইয়ে পধারিয়ে—

অতঃপর দাসী জোহরা যে ঘরে বসেছিল সেই ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরটি মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। দামী দামী সব কৌচ দেওয়ালের দু'ধারে—মেঝেতে দামী পারস্য কার্পেট বিছানো, তারই মাঝখানে গাঢ় রক্তবর্ণ ভেলভেটের গালিচার উপরে বসে জোহরা।

ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেস জ্বলছে। ঘরের বাতাস বেশ উষ্ণ। আরামপ্রদ। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে ভেতরে প্রবেশ করে বেশ আরাম বোধ হল।

রূপ বটে বাঈজীর। যাকে বলে সত্যিকারের চোখ-ঝলসানো রূপ। পরনে শালোয়ার কামিজ, গায়ে সোনালী জরির কাজ করা একটা কালো

রংয়ের দামী শাল। লম্বা কেশ বিনুনি করা। সামনে একটা তানপুরা শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে জোহরা তানপুরার তারে মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিল। আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ করল, পাধারিয়ে সাব—

এ গরীব খানামে—আপ যেইসা আদমি—কেইসে সুক্রিয়া ওয়াদা করু।

তোমার নাম জোহরা? কাকামশাই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

জী জনাব।

কাল রাত্রে তুমি ঘরেই বোধহয় ছিলে বাঈজী? জী।

গান—বাজনার আসর বসেছিল? নেহি।

কেন? হঠাৎ ঐ কেন-র উত্তরে আমার মনে হল যেন বাঈজী একটু থতমত খেয়ে যায়। কেমন বিব্রত ভাবে তাকাতে থাকে বাঈজী।

কাল গানের আসর তাহলে বসেনি? না।

কত রাত্রে কাল নিদ গিয়েছিলে? আমি একটু রাত করেই শুই। তা বোধহয় বারোটা হবে তখন।

এবার মাঝখানে আমিই প্রশ্ন করলাম, অত রাত্রে এ পাড়াটা বেশ নিঝুম হয়ে যায় না?

হ্যাঁ বাবুজী রাত নটার পরই চুপচাপ হয়ে যায় একদম পাড়াটা—বিশেষ করে এখন তো শীতের রাত।

আবার আমিই প্রশ্ন করলাম, কাল রাতে কোন গুলির আওয়াজ পেয়েছিলে বাঈজী শুনতে?

গোলী! নেহি তো বাবুজী!

পাওনি? আমিই আবার প্রশ্ন করলাম, পাওনি শুনতে একটা মানুষের চিৎকার?

না।

সুলতান আহম্মদের নাম শুনেছ বাঈজী? প্রশ্নটা করে আমি বাঈজীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। মনে হল আমার, বাঈজী যেন কেমন বিমূঢ় দ্বিধাগ্রস্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম ওকে কোন চিন্তার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে, সে তো মধ্যে মধ্যে তোমার এখানে আসে।

দেখলাম বাঈজীর দুই চোখে কেমন একটা যেন অসহায় ভীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, কোন ভয় নাই তোমার বাঈজী। বল যা জান!

বাবুজী হামি—বাঈজীর মুখের কথাটা শেষ হল না, বদ্ধ কাচের সাসী ঝন ঝন শব্দে গুঁড়ো হয়ে গেল আর গুলি এসে বাঈজীর বাম বক্ষে বিদ্ধ করল। বাঈজী লুটিয়ে পড়ে গেল লাল জাজিমের ওপরে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন সে।

আমরা বিমূঢ়—হতবাক। কি করব বোধগম্য হচ্ছে না। ঐ সময় দ্রুত ধাবমান একটা অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল।

বাঈজীর প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিল। তার ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে কাকামশাই মৃদুকণ্ঠে বললেন, **I never dreamt of it**—

চল—কাকাবাবু, ঐ দাসীকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

এবারে আর কাকামশাই কোন প্রতিবাদ জানালেন না। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। প্রথমেই থানায় গেলেন। কয়েকজন কনস্টেবল জোহরার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন অবিলম্বে। তারপর আমার নির্দেশে দাসীকে সামনে আনা হল। দাসী তখন ভয়ে কাঁপছে।

কি নাম তোর?

মরিয়ম।

কতদিন বাঈজীর বাড়িতে কাজ করছিস? প্রশ্ন করছিলাম আমিই বাংলোতে। একজন সিপাহী উর্দুতে ওকে প্রশ্ন করে তার জবাবটা আমাকে তর্জমা করে করে শোনাতে লাগল।

চার সাল হুজুর। সুলতান আহম্মদ এখানে প্রায়ই আসত, না?

সুলতান আহম্মদ কে—আমি চিনি না।

আমি তখন সুলতানের ফটোটা ওকে দেখালাম। বললাম, এই আদমীকে চিনতে পারছিস? জী।

এ আসত না মধ্যে মধ্যে বাঈজীর ঘরে? আ—আসত বাবুজী।

কাল রাতে এসেছিল? এসেছিল। বিকেলেই এত্তালা পাঠিয়েছিল সে আসবে রাত্রে দশটার পর, তাই বাঈজী আসর বসায়নি।

ঐ লোকটা তোর বাঈজীকে পিয়ার করত, তাই না?

তা জানিনা। তবে ও এলে বাঈজীর ঘরে খিল পড়ে যেত। কারও ভেতরে যাবার হুকুম ছিল না।

কাল কত রাত্রে সে এসেছিল? জানি না।

জানিস না?

না। আমাদের রাত নটা বাজতেই বাঈজী ছুটি দিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের কথা শেষ হল। কিরীটী বলতে লাগল, একটা গাড়ি থানা কমপাউণ্ডে প্রবেশ করল। হাবিলদার এসে কাকাবাবুকে ও থানা অফিসারকে সেলাম করল। থানা-অফিসার শুধালেন, কি সংবাদ ইসমাইল খান? সেখান থেকে চলে এলে কেন? তোমাকে বলেছিলাম না পাহারায় থাকতে হবে।

লেকিন সাব, ও কোঠিমে তো কোই নেহি—নেই?

নেহি। কোই লাশ ভি নেহি!

কাকামশাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর মরিয়মের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মরিয়ম, তোর বাঈজীর জেবর ছিল না?

ছিল হুজুর। বহু সোনাদানা হীরে জহরৎ ছিল। নগদ রূপেয়াভি ছিল।

কোথায় থাকত সে সব?

বাঈজীর শোবার ঘরে—লোহার সিন্দুকে। চাবি?

সব সময় বাঈজীর কাছেই থাকত হুজুর।

সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

হাবিলদার সাব? কাকামশাই ডাকলেন। হুজুর!

সে বাড়িতে পাহারায় কোন সেপাই রেখে আসোনি হাবিলদার? কাকামশাই শুধালেন?

এসেছি। পাঁচজন আছে পাহারায় সাহেব।

কথাটা বলে কাকামশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মাথার মধ্যে তখন একটি কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে—জোহরার লাশটা উধাও হয়েছে, এবং ব্যাপারটা তো একটিমাত্র সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, লাশটা সুনিশ্চিত ভাবে সুলতান আহম্মদই বা তার অনুচরেরা জোহরার গৃহে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং—এবং—

শুধালাম আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

সুব্রত, কিরীটী বললে, এও ঐ সঙ্গে আমি স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলাম—সুলতান আহম্মদ পিণ্ডি ছেড়ে এখনো কোথায়ও যায়নি। আর—

আর কি?

আর—কিরীটী বললে, জোহরার কাছে সুলতান কেবল তার দেহের ক্ষুধা মেটাতেই আসত না—ওখানে মধ্যে মধ্যে আসত সে জোহরার দেহের আকর্ষণেই কেবল নয়—আরো কিছু ছিল। সুলতান সম্ভবতঃ জোহরাকে ভালবাসত। ভালবাসত? প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ, সুব্রত। আর অনুমান যে মিথ্যে নয় সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল দিন পাঁচেকের মধ্যে। তার ভালবাসার ঋণ শোধ করে গেল ঐ পাঠান যুবক নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

তবে সেই মেয়েটি—রৌশন না কি যেন নাম—

না সুব্রত—সেটা ছিল তার নিছক রৌশনার রূপ ও যৌবনটাকে ভোগ করবার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—বলতে পার যৌনক্ষুধা। তা যদি না হত—যাক গে শোন সব ঘটনা, শুনলেই বুঝতে পারবে কথাটা আমার সত্য না মিথ্যা!

ইতিমধ্যে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঘরের খোলা জানালাপথে রাত্রি শেষের আকাশে একটা চাপা আলোর ইশারা ছড়িয়ে পড়ছিল। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু ছিন্ন এলোমেলো মেঘ ইতস্ততঃ আকাশের গায়ে ভাসছিল।

কিরীটী বললে, কাহিনী আমার শেষ হয়ে এসেছে। কৃষ্ণা, এ সময় এক কাপ কফি হলে মন্দ হত না! কৃষ্ণা উঠে গেল নিঃশব্দে।

কফি পানের পর আবার শুরু করল কিরীটী তার কাহিনী।

আমি কাকামশাইকে বললাম, কাকাবাবু, সুলতান আহম্মদকে যদি ধরতে চান তো খুব চটপট কাজ করতে হবে।

কি বলছ কিরীটী! কাকামশাই বললেন।

হ্যাঁ, কাকাবাবু। এখানকার যে আকর্ষণে সে মধ্যে মধ্যে ছুটে ছুটে আসত—সে ঐ বাঈজী জোহরা। জোহরা তার সব কথাই জানত—সম্ভবত তার গতিবিধি ও জোহরার অজ্ঞাত ছিল না। তাই সে দূর থেকে রাইফেলের গুলি চালিয়ে তাকে শেষ করে দিয়েছে—পাছে সে আমাদের কাছে কোন কিছু ফাঁস করে দেয়। কিন্তু তাকে শেষ করে দিলেও তার মৃতদেহটার মায়া সে ছাড়তে পারেনি—তার প্রতি তার প্রগাঢ় প্রেম প্রলুব্ধ করেছে জোহরার মৃতদেহটা তুলে নিয়ে যেতে। কিন্তু—

কিন্তু কি কিরীটী? আমার মতে ঐটাই হয়েছে তার চরম ভুল!

ভুল? হ্যাঁ। কারণ তার মৃত্যুবাণ সে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে যে মুহূর্তে সে জোহরার লাশটা তার গৃহ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

ও কথা কেন বলছো কিরীটী?

আমার মন বলছে ঐ কথা। ভেবে দেখুন, যতই সে চতুর শক্তিশালী ক্ষিপ্রগতি ও দুর্ধর্ষ হোক না কেন—জোহরার লাশটাই তার হাতে হাতকড়া

পড়াবে প্রেমে অন্ধ হয়ে যদি সে ঐ লাশটার দিকে আর ফিরে না তাকাত। ও এমন জায়গায় চলে যেত যে আপনাদের সাধ্য ছিল না তাকে trace করা। সে আর কিছু চিরদিন কাঁধে করে ঘুরে বেড়াতে পারবে না, কোন নিভৃত জায়গায় লাশটা তো সে গোর দেবেই।

গোর দেবে? দিতে তো হবেই। আপনি সর্বত্র পুলিসের ব্যবস্থা করুন যতটা সম্ভব এই শহরের আশে পাশে। আর দেরি করবেন না।

কাকামশাই সেই ব্যবস্থাই করলেন।

সে রাত্রে থানা থেকে যখন ফিরে এলাম গৃহে কিরীটী বলতে লাগল, শীতের রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে দেখি সলিল তখনো জেগে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, জোহরার সঙ্গে আলাপ করলি?

নিজেকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। আরাম-কেদারার ওপরে জামা কাপড় ছেড়ে সোজা গিয়ে কম্বলের তলায় প্রবেশ করলাম।

সলিল বললে, কি হল? আমি বললাম, কাল হবে সলিল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

৮

দুটো দিন কেটে গেল। কোন সংবাদ নেই।

কাকামশাই ছট্‌ফট করছিলেন। আমি কিন্তু আদৌ ব্যস্ত হইনি; কারণ আমি জানতাম ঐ শহরের আশেপাশেই কোথাও না কোথাও সুলতানের সন্ধান মিলবেই।

ইতিমধ্যে আরও একটা কাজ করা হয়েছিল—শহরের সর্বত্র সুলতানের ছবি ছাপিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, কেউ যদি সুলতানের সন্ধান দিতে পারে সে পাঁচ হাজার টাকা পাবে। পরামর্শটা অবিশ্যি আমিই কাকামশাইকে দিয়েছিলাম।

তাঁর তখন বোধ হয় কিছুটা বিশ্বাস আমার ওপরে জন্মেছে। ওঁর বড় সাহেবের—পুলিসের বড় কর্তারও বোধ করি কিছুটা আস্থা আমার ওপরে জন্মেছিল। ইতিমধ্যে কাকামশাই নির্দেশ দিয়েছিলেন বাড়ি বাড়ি এক-একটা এলাকা জুড়ে সার্চ করতে—যদিও আমি তাঁকে সে ব্যাপারে কোন পরামর্শ দিইনি, কিন্তু আমি বাধাও দিইনি।

আরো দুটো দিন কেটে গেল।

চতুর্থ দিন রাত্রে চরম ঘটনাটা ঘটল। ঐ রকমের একটা কিছু যে ঘটতে পারে—একটা ক্ষীণ আশা আমার মনের মধ্যে জাগছিল।

রাত্রি তখন প্রায় সোয়া এগারটা।

আমি আর কাকাবাবু বাইরের ঘরে বসে সুলতানের ব্যাপারটাই আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ দরজা ঠেলে এক বোরখা-পরা নারী আমাদের ঘরের মধ্যে এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কে? কে? বলতে বলতে কাকামশাই উঠে দাঁড়ান।

সাব্—কে তুমি?

ঐ শয়তানটাকে আপনি ধরতে চান?

কে--কার কথা বলছ?

সুলতান—সেই ডাকু—জান তুমি তার খবর?

একটু আগে সে ঘোড়ার উপর বাঈজীর লাশটা তুলে নিয়ে ট্যাকসিলার দিকে গিয়েছে।

ট্যাকসিলা মানে তক্ষশিলা। ঠিক বলছ?

হ্যাঁ সাহেব, সাচ্—তুমি—তুমি কে? আমি?

এবারে আমিই কথা বললাম, তুমি কি পীর মহম্মদের জরু? বাবুজী, হ্যাঁ—আমি রৌশন। সে আমার জিন্দেগী বরবাদ করে দিয়েছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আর দেরি করবেন না। এই কদিন আমার মনই বলছিল এই রকমই একটা কিছু ঘটবে।

আমার কথায় কাকামশাই আর দেরি করলেন না।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে দুটো ট্রাক ভর্তি মিলিটারী ও আর্মড পুলিস নিয়ে আমরা ছুটলাম তক্ষশিলার পথে। চমৎকার মেটাল বাঁধানো রাস্তা।

শীতের রাত হলেও আকাশ পরিস্কার ছিল।

ত্রয়োদশীর চাঁদ ছিল আকাশে।

সেই চাঁদের ক্ষীণ আলোয় আমাদের দুটো ট্রাক ছুটে চলল।

তক্ষশিলার ব্যাপারটা তোমরা জান বোধ হয়, এক্সক্যাভেশন করে বৌদ্ধ যুগের পুরাতন এক নগরী ও সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই লুপ্ত নগরী আজকের দিনে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। একটি নির্জন জায়গা। আশে-পাশে বহুদূর পর্যন্ত কোন মানুষের বসবাস নেই।

রাওলপিণ্ডি শহর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জায়গাটি অবস্থিত।

প্রায় তার কাছাকাছি এসে আমরা দেখতে পেলাম ধুলো উড়িয়ে এক অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটে চলেছে।

চারদিকে ভোরের আলো ঝাপসা- --ঝাপসা ফুটে উঠেছে তখন।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ট্রাক দুটোর গতি আরো বাড়িয়ে দেওয়া হল।

অগ্রগামী অশ্বারোহী সেই লুপ্ত নগরীর স্তূপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ট্রাক দুটো এসে ততক্ষণে থেমেছে তক্ষশিলার কিউরেটারের অফিসের সামনে। কিউরেটার তখন ছিলেন ওখানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। ভোররাত্রে ট্রাকের শব্দ পেয়ে মিঃ গুপ্ত এসে হাজির হলেন।

কাকামশাই তাঁর অভিযানের কথা তাঁকে বললেন। তখন তাঁরই পরামর্শমত আর্মড্ পুলিশ ও মিলিটারীরা জায়গাটা ঘিরে ফেলল।

তারপর শুরু হল লুকোচুরি। প্রায় ঘণ্টাখানেক লুকোচুরির পর শুরু হল দু-পক্ষের গুলিবর্ষণ।

মিলিটারীরা মেশিনগান এনেছিল সঙ্গে।

বিশেষ একটি জায়গায় মেশিনগান বসানো হল।

তা প্রায় ঘন্টা দুই ধরে গুলি বিনিময় চলল। পুলিসের এবং মিলিটারীর প্রায় আটজন লোক মৃত ও আহত হয় সেই এনকাউন্টারে।

অবশেষে একসময় গুলি থামল এবং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে অনুসন্ধানের পর একটি দালানের মাথায় সুলতানের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হল—

পাশে পড়ে আছে পচা জোহরার মৃতদেহটা।

আমি বললাম, কাহিনী শেষ!

কিরীটী বললে, না, আরও একটু আছে সুব্রত।

কি রকম?

কিরীটী বললে, বছর পাঁচেক বাদে আমি আবার পিণ্ডি যাই। দেখলাম জোহরার বাড়িটা তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আর কিংবদন্তী শুনলাম, ওই বাড়ির চারপাশে মধ্যরাত্রে অনেকে নাকি এক অশ্বারোহীকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে এবং ঐ বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যায় নারীকণ্ঠের গান।

আমি বললাম, তা তুমি যে সুলতানকে ধরতে পারবে বুঝেছিলে কি

করে? জোহরাকে গুলি করে মারার পর তার লাশটা সে তুলে নিয়ে গিয়েছিল—তাতে করে দুটো ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক জোহরাকে সে ভালবাসত—আর দুই জোহরার মৃতদেহটা নিয়ে চট করে অন্যত্র চলে যেতে পারবে না—সে ঐ শহরেই তখনো আছে, যে কারণে তার ছবি ছাঁপিয়ে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

কৃষ্ণা শুধাল, আর রৌশন?

কিরীটী বললে, সেটাও আমি অনুমান করেছিলাম আমার কথিত পূর্বের ঐ দুটি ব্যাপার থেকে। এখন একমাত্র রৌশনই সরকারকে জানাতে পারে সুলতান কোথায় আছে।

কেন?

নারীর প্রতি নারীর সহজাত হিংসা। সেটাই ছিল আমার হাতে শেষ তুরুপের তাস।

কৃষ্ণা আবার বললে, রৌশনের কি হল?

জানি না। কারণ পরের দিনই রাত্রের গাড়িতে আমি কলকাতায় ফিরে আসি। কিরীটী বললে একটু থেমে আবার, ছোটবেলায় গাঁয়ের বাড়িতে একটা শঙ্খচূড় সাপ দেখেছিলাম—অমন সুন্দর অথচ ভয়ংকর একটা জিনিস আমি খুবই কম দেখেছি জীবনে। সুলতান আহম্মদের কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে সেই শঙ্খচূড় সাপটার কথা।

নীহার রঞ্জন গুপ্ত: বিজ্ঞানের সাধনায় সাফল্য অর্জন করেও যে কয়জন সাহিত্যসেবী শিল্পের রূপোলী আবেশে আবিষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন নীহার রঞ্জন গুপ্ত মশাই তাঁদের অন্যতম। ইংরাজী সাহিত্যের "শার্লক হোমসের" স্রষ্টা পুরুষ ডাঃ কোনান ডয়েলের ন্যায় ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তও বাংলা রহস্য ও গোয়েন্দা সাহিত্যে এক স্বকীয়তায় উজ্জ্বল নাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাফল্য তাঁর সাহিত্য কর্মে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। নীহার রঞ্জনের "উল্কা" কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক ইতিহাস।

লেখকের কস্তুরীগন্ধ, আলোকের আঁধারে, রহস্যভেদী কিরীটি, বিচারিণী, অগ্নিস্বাক্ষর, নক্ষত্রের রাত্রি ইত্যাদি গ্রন্থ বহু পঠিত ও বহুল প্রচারিত।

দক্ষিণ কলকাতাবাসী বর্ষিয়ান লেখক আজও তার সোনালী আচরে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন।



সোনার খনি

কুমারেশ ঘোষ

প্রায়ই মাঝরাত্রে ছাদে আওয়াজ হয়—খট খট খট খট।

খড়মের আওয়াজ। কেউ যেন রাত্রে ছাদের উপরে খড়ম পায়ে হাঁটছে। কে?

অজ পাড়াগাঁ। চারদিকে ঝোপঝাড়। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। অনেক দূরে দূরে কাঁচা বাড়ি। আম বাগান কাঁঠাল বাগানের মধ্যে, বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে। এক নজরে দেখাও যায় না বাড়িগুলো।

সেই গাঁয়ে ঐ একটিমাত্রই পাকাবাড়ি। পয়সাওলা এক জোতদারের বাড়ি। বাড়িটির মাঝখানে উঠোন, একপাশে ধানের গোলা, এক কোণে গোয়াল, আর এক কোনে কুয়োতলা। পেছনে আমবাগান, কলাবাগান।

বাড়িটায় এধরণের কোন উৎপাতই ছিলো না। বাড়ির বড় কর্তা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে এই খড়মের শব্দ—খট খট খট খট। বড় কর্তা খড়ম পায়ে দিতেন।

বড় কর্তা মারা গেছলেন শনিবারের অমাবস্যায়। আরো কী কী যেন দোষ পেয়েছিলেন তিনি। তাইতো এই কাণ্ড!

যে রাত্রে এই রকম শব্দ হয়, বাড়ির লোকেরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকেন।

যে যার দরজায় খিল এঁটে মড়ার মত পড়ে থাকে, আর অন্ধকারে কান পেতে শুনতে থাকে ব্রহ্মদৈত্যের এই খড়ম পায়ের চলা—খট খট খট খট!

সব সময় যে শব্দটা হয়, তা নয়। কিছুক্ষণ শব্দ হবার পর থেমে যায় শব্দটা। বেশ খানিকক্ষণ থেমে থাকে। তারপর আবার খানিকক্ষণ শব্দ হবার পর যখন থামে, তখন আর কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। এছাড়া ব্রহ্মদৈত্য কারোর কোন ক্ষতি করে না।

কাজেই বাড়ির ছোটকর্তা বলেন, দাদা হয়তো আমাদের মায়া কাটাতে না পেরে মাঝে মাঝে আসেন, কিন্তু কোন ক্ষতি তো করেন না। অতএব……

অতএব, ওঝা ডাকবার কথা হয়েছিলো, তা আর হয়নি। গ্রামের লোকেরা স্বস্তি স্বস্ত্যয়ণ করতে বলেছিলো, তাতেও রাজি হননি ছোটকর্তা।

এখন ছোটকর্তার উপরই সংসারের ভার। তিনিই বাড়ির কর্তা। এবং টাকার মানুষ বলে গাঁয়েরও মাতব্বর তিনি।

কাজেই ছোটকর্তার কথামত কেউ আর কোন কথা বলেনি। তাছাড়া সত্যিই তো কোন রকম উৎপাত করে না ব্রহ্মদৈত্য।

এই ভৌতিক কাহিনী আমি শুনেছিলাম আমার এক বন্ধুর মুখে। বন্ধু সে গাঁয়ের নাম ঠিকানা কিছুই কিছুতেই বলতে রাজি হয়নি। বললে একবার দেখে আসতাম। তবে যে কাহিনী সে বলেছিলো, তা সত্যিই রোমাঞ্চকর।

ঐ বন্ধুর এক আত্মীয়ের বাড়ি নাকি ঐ গাঁয়ে। সেখানে গিয়ে সে শুনতে পেলো পাকাবাড়ির ঐ ভৌতিক কাণ্ডের কথা। শুনে সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

তবে বাড়ির কাউকে কিছু বললো না। সে রাতও ছিলো কৃষ্ণপক্ষের রাত। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধুটি সেই তার সঙ্গে আনা বড় টর্চটা হাতে নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

সোজা গেলো সে পাকাবাড়ির পেছনে আমবাগানের মধ্যে। ছাদের কাছে একটা গাছের ডালে সে উঠে বসলো। অন্ধকারে চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে মশার কামড় খেতে লাগলো সে।

এবং খানিক পরেই শুরু হলো সেই ভৌতিক কাণ্ড। ভৌতিকই কাণ্ড বটে। একটা আবছা ছায়ামূর্তি ছাদে ওঠবার সিঁড়ির কাছ থেকে খড়ম পায়ে চলছে একবার এদিক একবার ওদিক। শব্দ হচ্ছে খট খট খট খট।

ন্যাড়া ছাদে মূর্তির সবটাই দেখতে পেলো সে। প্রেত মূর্তি দেখে গায়ে তার কাঁটা দিয়ে উঠলো। দুহাতে ভাল করে জড়িয়ে ধরলো গাছের ডালটা।

তারপর একি! আর একটা ছোট আকারের ঐরকম ছায়ামূর্তি ঐ সিঁড়ির দিক থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো ছাদে। আগেকার ছায়ামূর্তি চলা বন্ধ হয়ে গেলো। এবং দুই ছায়ামূর্তি মিশে গিয়ে এক হয়ে গেলো। আর হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কোথায় গেলো, বন্ধুটি টর্চ ফেললো। জোরালো আলো গিয়ে পড়লো শোয়া অবস্থায় দুটি পুরুষ ও নারীর উপর। দুজনে অর্ধনগ্ন এবং আলিঙ্গন অবস্থায়।

গায়ে জোরালো আলো পড়তেই দুই মূর্তি শশব্যস্তে সিঁড়ির দরজার মধ্যে ঢুকে গেলো। বন্ধুটি আর উচ্চবাচ্য না করে গাছ থেকে নেমে আত্মীয়ের বাড়িতে এসে ভালো মানুষের মত নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

বন্ধুকে বললাম, দেখে চেঁচালিনে কেন?

বন্ধু বললো, চেঁচিয়ে কী লাভ হতো? একটি কেলেঙ্কারি হতো শুধু। তাই পরদিন ভোরে উঠে আমার আত্মীয়ের কাছে জেনে নিলাম, ঐ বাড়ির ছোট কর্তাই এখন সব। তিনি বিয়েথা করেন নি। আর তাঁর দাদা মারা যাবার পর সব সংসারের ভার তাঁরই উপরে পড়েছে। দাদার দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে চাকরি করে বাইরে। বাড়িতে থাকে দাদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আর তার ছোট চার বছরের মেয়ে। তাছাড়া ঝি-চাকর রাঁধুনী ইত্যাদি।

হেসে বললাম, তাহলে ব্যাপারটা শুধু রোমাঞ্চকরই নয়। রোমান্স করও বটে।

হ্যাঁ। তারপর শোন্।—বন্ধু বললো এক সময় দিনের বেলায় আমি গিয়ে ছোট কর্তার সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললাম। কাল রাত্রে টর্চের আলো আমিই ফেলেছিলাম। বুঝলেন।

শুনেই কর্তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। বললো দাঁড়াও, আমি আসছি।

দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই কর্তা কাছে এসে চাদরের তলা থেকে একটা টাকার বাণ্ডিল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললো দুহাজার টাকা দিলাম। মুখটি বন্ধ রাখবেন।

হেসে বললাম, রাখালেই রাখবো।

কর্তা বললো আচ্ছা।

আমি হেসে বললাম বান্ধুকে তুইতো দেখছি সোনার খনির খবর পেয়েছিস রে।

বন্ধু বললো, গোয়েন্দাগিরির রেকারিং পুরস্কার। তাইতো ঐ সোনার খনির ঠিকানা দিতে চাইনে।

কুমারেশ ঘোষঃ হাসির উজ্জ্বলতা আজকের গুরুগম্ভীর অভিজাত সাহিত্যের অঙ্গনে এক হরিজনসুলভ অপাংক্তেয়তায় অবহেলিত। তবে লেখক বিংশশতাব্দীর আধুনিক জীবন যাত্রার আর্তনাদের মধ্যেও হাস্য পরিহাসের লঘু চপল বাকোর বিদ্যুৎছটায় আমাদের আলোকিত করেন, উদ্ভাসিত করেন। আজকের ম্রিয়মান, ক্লান্ত, শ্রান্ত প্রাত্যহিকতায় ভরা জীবনে হাসি এক নিষিদ্ধ বস্তু। কিন্তু কুমারেশ বাবু এই অপ্রবেশ্য জগতে অম্ল মধুর রসের ফোয়ারার অর্গল খুলে দেন। যে কয়জন দুর্লভ সাহিত্য সেবী জীবনভোর হাসির কারবারী কুমারেশ ঘোষ মশাই তাঁদের অন্যতম। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "যষ্টিমধু" সাময়িকী সমসাময়িক কালের একমাত্র হাস্য মধুর রসাপ্লুত পত্রিকা। গোয়েন্দা ধর্মী রহস্য রচনাতেও তাঁর স্বাভাবিক রসবোধের অম্লান পরিব্যাপ্তি।

লেখকের "কাঠের ঘোড়া' বহু পঠিত গ্রন্থ। লেখক ১৯১৬ সালে অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে পূব কলকাতাবাসী একজন সফল ব্যবসায়ী ও সার্থক সাহিত্য কর্মী।



কুয়াশায় ঢাকা মুখ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পারিজাত বক্সি সবে দরজার বাইরে পা দিয়েছেন, এমন সময় ফোনের শব্দ।

এ সময়ে আবার কে ফোন করছে। অবশ্য পারিজাত বক্সির কাছে ফোন করার কোন সময় অসময় নেই। থাকতে পারে না। মানুষের বিপদ তো আর দিনক্ষণ বুঝে আসে না। পারিজাত বক্সি ফিরে গেলেন।

ক্র্যাডল থেকে ফোনটা তুলে কানের কাছাকাছি নিয়ে যেতেই বাজ খাঁই কণ্ঠ শুনতে পেলেন, পারিজাত বাবু আছেন?

চেনা কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠ কানের ভিতর দিয়ে মরমে যেতে দেরী হয় না।

আছি এবং কথা বলছি —পারিজাত বক্সির মোলায়েম স্বর।

কোথায় থাকেন মশাই। আধঘণ্টা ধরে ফোন বেজে যাচ্ছে।

যাঁর কণ্ঠ তিনি ভবানীপুর থানার অফিসার-ইনচার্জ মহিম রুদ্র। এমন সার্থক-পদবী লোক সচরাচর দেখা যায় না।

প্রশ্নটা এড়িয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, কি ব্যাপার বলুন?

ব্যাপার গুরুতর। আসতে পারবেন একবার?

একটু দেরী হবে।

কত দেরী?

একবার ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট-এ যাব। অসিতবাবু তলব করেছেন। কতক্ষণ লাগবে জানি না।

যতক্ষণই লাগুক, আমি অপেক্ষায় থাকব। চলে আসবেন।

পারিজাত বক্সি জানেন, ফোনে মহিম রুদ্র এর বেশী একটি কথাও বলবেন না। কেসের সম্বন্ধে তিনি সামনা-সামনি ছাড়া কিছু বলেন না।

ফোন নামিয়ে রেখে পারিজাত বক্সি বেরিয়ে পড়লেন।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে পারিজাত বক্সি ছাড়া পেলেন বারোটা নাগাদ। সেখান থেকে সোজা ভবানীপুর থানা।

ঢুকতেই কল্যাণ সোমের সঙ্গে দেখা হল। চালের চোরাকারবারীদের নিয়ে ব্যাস্ত।

কল্যাণ সোম মহিম রুদ্রের সহকারী। কিন্তু স্বভাবে একেবারে বিপরীত।

পারিজাত বক্সিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যান, স্যার আপনার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

একেবারে ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখল, মহিম রুদ্র অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন। হাতদুটো পিছনে।

আমি এসে গেছি মিঃ রুদ্র।

বলার অপেক্ষা না করে পারিজাত বক্সি নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

উদ্ধার করেছেন। বলেই মহিম রুদ্র নিজেকে সামলে নিলেন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, একেবারে বেলা কাবার করে এলেন!

পারিজাত বক্সি কোন উত্তর দিলেন না।

মহিম রুদ্র নিজের চেয়ারে বসলেন। সামনের টেবিলের ওপর দুটো হাত রেখে বললেন—আর তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি মশাই। আমার আর এক্সটেনশনে দরকার নেই।

কি হল ?

কি হল না তাই বলুন। রায় বাহাদুর অতুল সিংহের মেয়ে মারা গেছে। পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, বিষ ক্রিয়ায় মৃত্যু, কিন্তু বিষ এল কোথা থেকে, কে দিল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েটির বয়স কত ?

বছর বারো।

তাহলে ব্যর্থ প্রেমের প্রসঙ্গটা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়।

অবশ্য আজকালকার মেয়েরা বারোতেই ঝানু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ মেয়েটি খুবই ক্ষীণজীবি। সে রকম কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

মাত্র পরশু ব্যাপারটা ঘটেছে, এর মধ্যে সহকারী কমিশনারের তিনবার ফোন এসেছে কেসটার সম্বন্ধে। অতুল সিংহের সঙ্গে কমিশনারের আবার খুব দহরম মহরম। আচ্ছা ঝামেলা।

কেসটা গোড়া থেকে আমাকে বলুন তো।

পারিজাত বক্সি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

শুনুন তাহলে, মহিম রুদ্র র‍্যাক থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, অতুল সিংহের বাড়ী টার্ফ রোড়ে। এক সময়ে অভ্রপতি ছিলেন। লোকে বলে মাইকা কিং। নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বিলাতে স্কেটিং করতে গিয়ে বরফ ফেটে মারা গেল। সেই শোকে, এক মাসের মধ্যে অতুল সিংহের স্ত্রী মারা গেলেন। অতুল সিংহ বাতে পঙ্গু হলেন। কারবার এক গুজরাটিকে বিক্রি করে বাড়ীতেই বসে রইলেন। সম্বল ওই মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখবার জন্য নবদ্বীপ থেকে দূর সম্পর্কের এক বোনকে নিয়ে এলেন। বিধবা বোন।

একটা কথা, মেয়েটি লেখাপড়া করত না ?

না, স্কুলে যেত না, বাড়ীতে এক দিদিমণি পড়িয়ে যেত।

তারপর ?

তারপর রোজ সকালে অতুল সিংহ দু পায়ে বাঘের চর্বি মাখতেন বাতের জন্য। সেই সময়ে মেয়ে রোজ কাছে বসে থাকে, সেদিন মেয়েকে দেখতে পেলেন না।

বোনকে ডাকলেন, নীহার মলিকে দেখতে পাচ্ছি না।

ঘুমুচ্ছে।

এখনও ঘুমচ্ছে।—অতুল সিংহ দেয়াল ঘড়ির দিকে দেখল। ন'টা বেজে গেছে।

ন'টা বেজে গেছে, এখনও ঘুমচ্ছে? শরীর খারাপ হ'ল নাকি?

চেয়ারের পাশ থেকে মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে অতুল সিংহ বোনের সঙ্গে মেয়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বললেন? মলি, মলি, অনেক বেলা হয়ে গেছে মা। উঠে পড়।

কোন সাড়া নেই।

নীহার মলির পাশের ঘরে শুত। দু ঘরের মধ্যে যাওয়া আসার দরজা আছে। অতুল সিংহ সেই দরজা দিয়ে মেয়ের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

মলি বিছানায় শুয়ে। তার শোয়ার ভঙ্গীটা অতুল সিংহের ভাল মনে হল না। তিনি মেয়ের কাছে এসে একটু ঝুঁকেই চাৎকার করে উঠলেন।

ডাক্তার এল। পাড়ার ডাক্তার। জানিয়ে দিল, মলি আর বেঁচে নেই। তারপর থানায় খবর এল। আমরা গেলাম। আমাদের করণীয় সব করলাম।

এখানে পারিজাত বক্সি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, অতুল সিংহের বাড়ীতে কে কে থাকে।

অতুল সিংহ, মেয়ে মলি, বোন নীহার। বাইরের লোকের মধ্যে একজন রান্নার লোক, একটি ঝি, একজন ড্রাইভার। ড্রাইভার নেপালী। নাম জং বাহাদুর। সে আউট হাউসে থাকে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখতে পারি।

এই তো ফাইলেই আছে। মহিম রুদ্র গোটা ফাইলটা পারিজাত বক্সির দিকে এগিয়ে দিলেন।

পারিজাত বক্সি মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

শুধু পোস্টমর্টেম রিপোর্টই নয়, সকলের জবানবন্দী।

এই সময়ে মহিম রুদ্র বেরিয়ে গেলেন। ওপরেই তাঁর কোয়ার্টার। সেখানে উঠে গেলেন। একটু পরে যখন নেমে এলেন, তখন পারিজাত বক্সির ফাইল পড়া শেষ। তিনি দু হাত কপাল চেপে চুপচাপ বসে আছেন।

মহিম রুদ্রর পিছনে হাতে ট্রে নিয়ে একজন চাকর ঢুকল। ট্রের ওপর প্লেটে লুচি তরকারি, ধূমায়মান চায়ের কাপ।

পায়ের আওয়াজে পারিজাত বক্সি মুখ তুলে দেখলেন।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন? আরে অসময়ে একি করেছেন?

মহিম রুদ্র হাসলেন। আমাদের আবার সময় অসময়। নিন, মুখে তুলে দিন।

খেতে খেতে পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন আচ্ছা ওই মেয়েই তো অতুল সিংহের সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিনী ছিল তাই না?

মহিম রুদ্র ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ তাই।

সব হত্যাকাণ্ডের পিছনে একটা মোটিভ থাকে। এ ক্ষেত্রে মলির মৃত্যুতে লাভবান কে হবে?

মানে?

মানে মলি না থাকতে অতুল সিংহের সম্পত্তি কার পাবার সম্ভাবনা?

মহিম রুদ্র প্রশান্ত হাসলেন।

সেদিকটা যে আমি ভাবি নি, তা মনে করবেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম অতুল সিংহের ভাইপো সম্পত্তি পেতে পারে। কিন্তু সে থাকে পাটনায়। ব্যবসা করে। আজ দু বছর এদিকে আসেনি।

ঠিক আছে, খাওয়া শেষ করে পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন, আজ বিকেলে একবার অতুল সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সুবিধা হবে?

মহিম রুদ্র বললেন, আলাবৎ হবে। ক-া নাগাদ?

ধরুন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা।

ঠিক আছে, আপনি সাড়ে চারটে নাগাদ এখানে চলে আসুন। এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি বলে দিয়েছি, আমার হুকুম ছাড়া ও বাড়ীর কেউ শহর ছেড়ে যেতে পারবে না।

পারিজাত বক্সি চলে এলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর নিজের লাইব্রেরীতে বসে 'টক্সিন' সম্বন্ধে মোটা মোটা গোটা চারেক বইয়ের পাতা ওল্টালেন। গোটা তিনেক ফোন করলেন।

যখন ভবানীপুর থানায় পৌছলেন তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে।

মহিম রুদ্র তৈরী হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। পারিজাত বক্সির মোটরে এসে উঠলেন।

মোটর যখন সিংহ লজ-এর সামনে এসে থামল, তখন প্রায় পাঁচটা।

সাদা রংয়ের আধুনিক ডিজাইনের বাড়ী। সামনে বাগান। বড় লোহার গেট। মোটর গেট পার হয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কলিং বেল টিপতেই একটা লোক এসে দাঁড়াল।

মহিম রুদ্রকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। বোঝা গেল এর আগে জেরায় জেরবার হয়েছে।

বাবু আছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

খবর দাও, আমরা একটু দেখা করতে চাই।

চাকর ভিতরে গিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এল।

আসুন।

চাকরের পিছন পিছন দুজনে বসবার ঘরে এল।

মেঝের ওপর দামী কার্পেট, বৃহৎ আকারের সোফা সেট, সুদৃশ্য পেলমেট শুধু গৃহস্বামীর অবস্থা নয়, তাঁর রুচিরও নিদর্শন।

একটু পরেই অতুল সিংহ ঘরে ঢুকলেন। মাথায় কাঁচায় পাকায় মেশানো চুল, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, হাতে লাঠি। বিষণ্ণ মুখের চেহারা। ভদ্রলোক যেন বিধ্বস্ত।

মহিম রুদ্র পারিজাত বক্সির পরিচয় দিতেই অতুল সিংহ এগিয়ে এসে পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনি আমার মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটার একটা কিনারা করে দিন। ফুলের মতন মেয়ে। তার এ সর্বনাশ কে করবে ? মেয়েকে আর ফিরে পাব না জানি, কিন্তু তবু আততায়ীকে আমি চিনতে চাই।

অতুল সিংহ যে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, সেটা তার কথাবার্তাতেই বোঝা গেল।

পারিজাত বক্সি চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাকে সন্দেহ হয় ?

আমার ? কাকে সন্দেহ হবে ? নিজের কপাল ছাড়া আমি কাউকে দায়ী করি না।

আপনার ভাইপোর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ?

ভাইপো ? মানে সুনীল যে পাটনায় থাকে ? তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই নেই। এমন কি চিঠিপত্রেও নয়।

তিনি তো ব্যবসা করেন ?

হ্যাঁ, শুনেছি ঠিকেদারি ব্যবসা।

আপনাকে একটা নির্মম প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। এখন যা

অবস্থা, আপনার অবর্তমানে আপনার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক তো সুনীলবাবুই হবেন?

তখনই অতুল সিংহ কোন উত্তর দিলেন না। লাঠির ওপর মুখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আইন অনুসারে অবশ্য তাই হবার কথা, কিন্তু তা হবে না। আমি স্থির করেছি আমার সব কিছু আমি এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করে যাব।

ভাইপোকে বঞ্চিত করবেন?

পারিজাত বক্সির এ প্রশ্নের উত্তরে অতুল সিংহ নিজের দুটো হাত জোড় করল, মাপ করবেন। এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

পারিজাত বক্সি আর মহিম রুদ্র দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর পারিজাত বক্সি বললেন, একবার নীহার দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অতুল সিংহ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, ভুবন, ভুবন।

ভুবন বোধ হয় কাছাকাছিই ছিল। শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল।

বাবু।

পিসিমাকে একবার আসতে বল।

মিনিট পনের পরই নীহার এসে দাঁড়াল। বয়সের তুলনায় অনেক শক্ত সমর্থ চেহারা। ফিনফিনে ধুতি, সরু কাল পাড়। ধবধবে সাদা ব্লাউজ। শোকার্ত কিন্তু একেবারে মুষড়ে পড়া নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার মহিম রুদ্রের দিকে আর একবার পারিজাত বক্সির দিকে দেখল।

কোণের একটা চেয়ার দেখিয়ে পারিজাত বক্সি বললেন, বসুন।

নীহার বসল। কোলের ওপর দুটি হাত রেখে।

পারিজাত বক্সি প্রশ্ন করলেন, আপনি তো মলির পাশের ঘরেই থাকতেন।

পাশের ঘর কেন বলছেন, বলুন একই ঘর। মাঝখানে শুধু একটা কাঠের পার্টিশন।

ভাল। মলি কি ভাবে মারা গেল, তা আপনি কিছু টের পান নি?

একেবারেই না।

সেদিন মলির কাছে কে কে এসেছিল মনে আছে?

হ্যাঁ, মনে আছে বই কি। দাদা আর আমি তো গেছিই। ভুবন আর জং বাহাদুরও একবার গেছে।

বাইরের কেউ?

না, বাইরের কেউ আসে নি।

ভুবন কেন গিয়েছিল?

ওভালটিন দিতে। মলি ঘুমচ্ছে দেখে ওভালটিন ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আর জং বাহাদুর?

জং বাহাদুর মোটরে করে অপেক্ষা করছিল। ভোরবেলা মলি বেড়াতে যায়। তার দেরী দেখে খোঁজ করতে এসেছিল।

আচ্ছা নীহার দেবী, শুনেছিলাম মলির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, এরা ভিতরে গেল কি করে?

আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে। আমি খুব ভোরে উঠে ঠাকুর ঘরে যাই। আমার দরজা খোলাই থাকে।

আপনি তো শুনেছেন মলির বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে।

দাদার কাছে শুনলাম।

এদের ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

মোটেই না। এরা প্রায় বাড়ীর লোকের মতন। ভুবন বহু বছর রান্নার কাজ করছে, ড্রাইভার জং বাহাদুরও খুব বিশ্বাসী।

মহিম রুদ্রের দিকে ফিরে পারিজাত বক্সি জিজ্ঞাসা করল, একজন ঝি আছে না এ বাড়ীতে? নীহার উত্তর দিল, শোভার মা। ঠিকে ঝি সে দুবেলা বাসন মেজে, ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে যায়। তাকে এখন পাওয়া যাবে না।

পারিজাত বক্সি উঠে দাঁড়ালেন, আজ তাহলে চলি। দরকার হলে পরে একদিন আসবো।

মহিম রুদ্র জিজ্ঞাসা করল, ভুবন আর জং বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলবেন না।

আজ থাক। অন্য একটা কাজ আছে।

পারিজাত বক্সি বেরিয়ে এলেন। পিছন পিছন মহিম রুদ্র।

দরজা পার হতে গিয়েই পারিজাত বক্সি সামলে নিলেন। আর একটু হলেই হোঁচট খেতেন।

ছোট আকারের কুকুর চৌকাঠের পাশে শুয়ে। কুচকুচে কালো কুণ্ডলি পাকানো লোম। ঠিক যেন কালো তুলোর বস্তা। এত বড় বড় লোম যে চোখগুলোও ঢাকা পড়ে গেছে।

বেশ কুকুরটি তো!

পারিজাত বক্সি কুকুরের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

অতুল সিংহ বললেন, রুবি মলির খুব ফেবারিট ছিল। ওর কাছেই থাকত। ওই এর দেখাশোনা করত। মলি চলে যাবার পর থেকে বেচারি কি রকম নিঃঝুম হয়ে গেছে।

পারিজাত বক্সি রুবির লোমে হাত বোলাতে বোলাতে একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, তারপর বললেন, মনে হচ্ছে খুব শক্‌ড হয়েছে। চলুন যাই।

পারিজাত বক্সি বাড়ী গেলেন না। ভবানীপুর থানায় এসে নামলেন। মহিম রুদ্রকে বললেন, মিষ্টার রুদ্র, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি?

কাল অতুল সিংহ আর নীহার দেবীকে কোন ছুতোয় থানায় ডেকে এনে ঘণ্টা দুয়েক কথাবার্তায় আটকে রাখতে হবে।

কারণ?

কারণ আমি একবার ওদের ঘরগুলো সার্চ করতে চাই।

সে তো সোজা ভাবেই হতে পারে।

তা হয়তো পারে, কিন্তু এটা আমি এদের জানতে দিতে চাই না। পারবেন তো?

না পারার কি আছে? কিন্তু বাড়ীতে তো আরও লোক থাকবে।

ভুবন আর জং বাহাদুর তো?

হ্যাঁ।

অতুল সিংহ আর নীহার দেবী নিশ্চয় মোটরে আসবেন। জং বাহাদুর সঙ্গেই থাকবে। ভুবনকে আমি ম্যানেজ করে নেব।

তাই ঠিক হ'ল।

পরের দিন মহিম রুদ্র অতুল সিংহকে ফোন করল, নীহার দেবীকে নিয়ে দুপুরের দিকে একবার আসতে হবে।

আবার কি হ'ল?

এলে জানতে পারবেন। জং বাহাদুরকেও আনবেন।

মোটরে যখন যাব, তখন জং বাহাদুর তো সঙ্গে থাকবেই। ঠিক আছে বারোটা নাগাদ যাব।

খবরটা মহিম রুদ্র পারিজাত বক্সিকেও ফোনে জানিয়ে দিল।

ঠিক সাড়ে বারোটা।

পুলিশের পোশাক পরা, পাকানো গোঁফ, চোখে কালো চশমা এক ভদ্রলোক অতুল সিংহের বাড়ীতে ঢুকলেন।

কে?

ভুবনের প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বললেন, আমি থানা থেকে আসছি। অতুল বাবু তাঁর শোবার ঘরের টেবিলে একটা কাগজ ফেলে গেছেন, সেটা নিতে এসেছি।

আসুন।

ভুবন লোকটিকে নিয়ে অতুল বাবুর শোবার ঘরে ঢুকল।

কোন কাগজ?

ভুবন আর কথা বলতে পারল না। লোকটা তার নাকে একটা রুমাল চেপে ধরল।

শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। দুচোখে অন্ধকার দেখে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

লোকটা দ্রুতপায়ে নীহারের শোবার ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে দুটো সুটকেশ টেনে বের করলেন। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে একটার পর একটা লাগিয়ে দুটো সুটকেশই খুলে ফেললেন। খুঁজে খুঁজে কাগজ পত্রগুলো পড়তে লাগলেন, তারপর একসময়ে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন।

বিকালের দিকে অতুল সিংহ আর নীহার থানা থেকে ছাড়া পেলেন। কেন যে ডেকেছিল বুঝতেই পারলেন না। মামুলি কতকগুলো প্রশ্ন।

বাড়ী ফিরতেই ভুবন হাঁউমাউ করে উঠল. সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু। ডাকাতি হয়ে গেছে।

সে কিরে?

ভুবন সব বলল.

কি হারিয়েছে খোঁজাখুঁজি শুরু হ'ল। অতুল সিংহের একটা ঘড়ি পাওয়া গেল না। আর সব ঠিক আছে।

আশ্চর্য কাণ্ড, তুচ্ছ দামের একটা ঘড়ির জন্য এত কাণ্ড!

নীহার নিজের আলমারি সুটকেশ সব খুঁজে দেখল: না, কিছু হারায় নি, সব ঠিক আছে।

দিন চারেক পর:

নীহারই বলল, দাদা, মলি যাবার পর থেকে রুবিটা কেমন মনমরা হয়ে আছে। ভাল করে খায় না। কেবল খাবার ওপর মুখ রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

অতুল সিংহ উত্তর দিলেন, রুবি মলিকে খুবই ভালবাসত। কুকুরটা বাঁচলে হয়।

তুমি একবার ডেকে আদর কর।

ডাকব? অতুল সিংহ বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে ডাকলেন, রুবি, রুবি এদিকে আয়।

রুবি চৌকাঠের কাছেই শুয়ে ছিল। প্রভুর ডাকে প্রথমে মুখ তুলে দেখল তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

আয়, আয়। অতুল সিংহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

রুবি আরো এগিয়ে এল। মুখ তুলে আবার দেখল তারপর লাফিয়ে অতুল সিংহেব কোলে উঠে পড়ল।

তার লোমের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে অতুল সিংহ চমকে উঠলেন, এ কিরে, কি হয়েছে?

লোমগুলো সরাতে গিয়েই অতুল সিংহ থেমে গেলেন। বাইরের জানলায় পারিজাত বক্সিকে দেখা গেল।

অতুল বাবু, সাবধান।

অতুল সিংহ চমকে উঠতেই রুবি তার কোল থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে নীহারের আর্তনাদ।

অতুল সিংহ ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলেন, মহিম রুদ্র দাঁড়িয়ে। দুজন পুলিশ নীহারের দু পাশে।

কি হ'ল অতুল সিংহ চেঁচিয়ে উঠলেন। এদিকে আসুন, আমি বলছি।

অতুল সিংহ ফিরে দেখলেন. পারিজাত বক্সির কোলে রুবি।

মহিম রুদ্র নীহারকে নিয়ে জীপে উঠলেন।

অতুল সিংহ পারিজাত বক্সিকে নিয়ে বসবার ঘরে এলেন।

প্রথমে একটা জিনিস আপনাকে দেখাই।

পারিজাত বক্সি রুবির লোমগুলো ফাঁক করে দেখাল। খুব সরু একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা কাঠের বাক্স।

এই বাক্সের মধ্যে হাইড্রোসায়ানিক গ্যাস ভরা। যেই রুবিকে কোলে

নেবে, সেই কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে বাক্সের ডালাটা খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবে। এই ভাবেই আপনার মেয়ে মলির মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু কে এ কাজ করলে?

যে করেছে মহিমবাবু তাকে অ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে গেছেন।

আমি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।

শুনুন, আমি তাহলে বুঝিয়ে বলছি। নীহারদেবী আপনার নাম সম্পর্কে বোন। তার অতীত জীবন খুব কলঙ্ক মুক্ত নয়। তাঁর সঙ্গে আপনার ভাইপো সুনীলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেলাইয়ের ক্লাসে যাবার নাম করে নীহার দেবী যে বাইরে যেতেন, তা শুধু সুনীলবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

ডাকাত সেজে একবার এ বাড়ীতে হানা দিয়েছিলাম। নীহারদেবীর বাক্স তল্লাসী করে দুটো চিঠি উদ্ধার করেছি। অবশ্য পাছে নীহারদেবী সন্দেহ করেন বলে সে চিঠিদুটো আমি নিয়ে যাইনি। শুধু ফোটোস্ট্যাট কপি করে নিয়েছি। এই হাইড্রোসায়ানিক গ্যাসের জোগানটা সুনীলবাবুই দিয়েছিলেন। প্রয়োগ পদ্ধতিও তাঁর।

অতুল সিংহ প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এর আগে পুলিশ তো সব কিছু সার্চ করে গেছে, তখন তারা এ চিঠিদুটোর সন্ধান পায় নি?

তখন নীহারদেবী চিঠি দুটো সরিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর পুলিশের হাঙ্গামা মিটে যেতে চিঠিদুটো আবার বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। এ চিঠি দুটোই তাঁর পরম অস্ত্র। এ দুটো চিঠির ভয়ে সুনীলবাবু তাঁর প্রতিশ্রুত টাকা নীহারদেবীকে দেবেন।

তারপর যখন সুনীলবাবুর কাছে খবর পেল আপনি সম্পত্তি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবেন, তখন আপনাকে সরাবার প্রয়োজন হল। দানপত্র করার আগে আপনার মৃত্যু হ'লে উত্তরাধিকার-আইন মাফিক সম্পত্তি সুনীলবাবুর পাবার পথে কোন বাধা থাকবে না। সেইজন্য রুবিকে আপনার কোলে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্কাউণ্ড্রেল। তার কি ব্যবস্থা করছেন আপনারা?

আজ সকালে বিহারের পুলিশ সুনীলবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। এতক্ষণ বাংলার দিকে রওনা হয়ে গেছেন

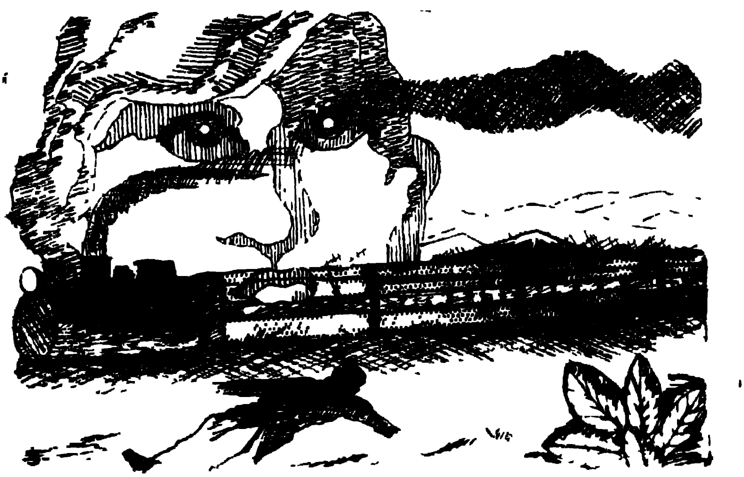
অতুল সিংহ পারিজাত বক্সির দুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনি এক গভীর ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

পারিজাত বক্সি মুচকি হাসলেন।

চলি অতুলবাবু, একবার থানায় যেতে হবে। মহিম রুদ্র অপেক্ষা করছেন।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৯১৬ সালে রেঙ্গুনে। হরিনারায়ণ বাবুর পিতা ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সরকারের একজন পদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন। রেঙ্গুনে আইনের স্নাতক হওয়ার পর ভারতে আগমন। কলকাতায় কোন এক আধাসরকারী সংস্থায় উচ্চপদে আসীন থেকে অবসর গ্রহণ করে সর্বক্ষণের সাহিত্যকর্মী। থাকেন বালিগঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের সুশোভিত হর্ম্যমালায়।

বর্ষণ মুখরিত শ্যামল ইরাবতী উপত্যকায় আযৌবন বসবাস তাঁকে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক কাব্য প্রীতি ও অনুভূতি হতে বঞ্চিত করে নি। তিনিপ্রবাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় তাঁর লেখায় ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার এক বিশেষ গুণ। তিনি দেশ কাল পাত্রের সীমায়িত পরিধি অতিক্রম করে সীমাহীন বিশ্বচরাচরে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র ও প্রেক্ষাপটকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ও ছিটিয়ে রেখেছেন। তাঁর রচনায় গল্পের গল্পত্ব এক বিশেষ আকর্ষণ। মানুষের প্রতি অপার ভালবাসা অপরিসীম অনুভূতি ও মমত্ব তাঁকে মনুষ্য চরিত্রের দুজ্ঞেয় রহস্যের অন্বেষণে ব্রতী করেছে। ফলে তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলিও শুধু গোয়েন্দা গল্প নয়। তাঁর হাতে রহস্য রচনাও সার্থক গল্পের এক অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা কিশোর সাহিত্যের দুর্বল শাখাকেও তিনি তাঁর অকৃপণ দানে ধন্য করছেন, করেছেন।



খুনী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমাগত মোটরের অধৈর্য হর্ন! রাত দেড়টার সময়, এই হাড়জমানো শীতে, কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা বিশ্রী গাল উচ্চারণ করলে হাজারী।

প্রাইভেট গাড়ী কিংবা লরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথ এ নয়। যুদ্ধের আমলে মিলিটারী যা খেয়ো ছড়িয়েছিল, কিন্তু সে খেয়োর খবর নিতে গেলে এখন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হয়। এখন পায়ের পাতা ডোবানো লাল ধুলো আর গোরুর গাড়ীর দয়ায় এলোমেলো গর্ত। কয়েকটা আদিবাসীদের টুকরো টুকরো গ্রাম, কিন্তু শাল-পলাশের বন, ছোট ছোট দু'তিনটি পাহাড়, তারই ভেতর দিয়ে পথটা দামোদরের বালুচরে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ঘরের ভেতরে গণগণে তাওয়া জ্বালিয়ে তাই নিশ্চিন্তে কম্বলের তলায় ডুব দিয়েছিল লেভেল ক্রসিঙের প্রতিহারী হাজারী। আন্দাজ চারটের সময় মেল ট্রেন পাস করবে, গেট বন্ধ করে নির্ভাবনায় শুয়েশুয়ে পড়েছিল সে।

এমন সময় মোটরের হর্ণ তাকে ঘুম থেকে জাগাল। ঘুঁটের ধোঁয়ায় জমাট হয়ে আসছে ছোট্ট ঘরটা। চোখ জ্বালা করে উঠলো হাজারীর। কিন্তু হর্ণের তাড়ায় চোখটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেলোনা। দরজা খুলতেই তীব্র হিম হাওয়ায় এসে আছড়ে পড়ল গায়ে, কান দুটো কনকন করে উঠল। কম্বলটাকে ভালো করে মাথায় গলায় জড়িয়ে দু'পা এগোতেই একরাশ বীভৎস গালাগাল তাকে অভ্যর্থনা করল।

—উল্লুক, রাস্কেল, ইডিয়ট। মরে ছিলি নাকি?

একটি ল্যাণ্ডরোভরে গাড়ী গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে। তার প্রকাণ্ড আলোটা সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। গায়ে ওভারকোট চড়ানো তিনটি মানুষ। একজনের হাতে চুরুট।

চুরুটওয়ালা আবার কটুগলায় ধমক দিয়ে উঠল: এমন করে ডিউটি করো তুমি? রিপোর্ট করব তোমার নামে। সন্ধ্যে হতেই গেট বন্ধ করে তুমি নাক ডাকাচ্ছ আর আধ ঘন্টা ধরে আমরা সামনে হর্ণ বাজাচ্ছি।

নির্বিকার মুখে চাবি খুলছিল হাজারী, এবার ফিরে তাকালো এদের দিকে। হয়তো বলতে যাচ্ছিল, রাত দেড়টাকে সন্ধ্যে বলে না। উত্তরটা তার আর দেওয়া হল না—চুরুট হাতে মানুষটির ওপর চোখ পড়তেই ঠাণ্ডা হাত পা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

—সেলাম হুজুর।

—সেলাম হুজুর?—চুরুটধারী মুখ বিকৃত করল:—সেলামটা ছিল কোথায় এতক্ষণ? ট্রেনের সঙ্গে খোঁজ নেই—দিব্যি গেট বন্ধ করে রেখে সুখ নিদ্রায় শুয়ে পড়েছে! পাবলিকের সঙ্গে বুঝি এই রকম ব্যবহারই করো তোমরা?

পাথুরে ঠাণ্ডায় এমনিতে হাত-পা কাঁপছিল, প্রায় ঠক্‌ঠকানি শুরু হল এবার। হাত জোড় করল হাজারী।

—কসুর মাপ করুন মালিক। এদিকের দেহাতী লোক এত রাতে কেউ তো গাড়ী নিয়ে বেরোয় না, তাই—

—তাই যা খুশি করবে? ভেবেছো ইংরেজের আমল আছে এখনো? মনে রেখো, জমানা বদলে গেছে। এখন চাকরি রাখা নয়—দেশের সেবা করাই তোমাদের কাজ।

আর একজন সিগারেট ধরালেন: করাপশন্, চ্যাটার্জি, করাপশন্। টপ্ টু বটম্।

চ্যাটার্জী এবার কথা বললেন না, কদর্য মুখ করে নাক দিয়ে ঘোড়ার মতো আওয়াজ তুললেন একটা। তা থেকে বোঝা গেল, তিনি শুধু এ ব্যাপারে যে একমত তাই নন, এর চাইতে উগ্র মতামত পোষণ করে থাকেন।

—কিচ্ছু হবে না দেশের। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি।—চুরুটের মুখ থেকে একরাশ মোটা ছাই ঝরিয়ে দিয়ে চ্যাটার্জি বললেন,—নাও হে, এবার ওঠো গাড়ীতে। যা শীত—প্রায় জমিয়ে দিলে!

তৃতীয় লোকটি চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চমকে নড়ে উঠলেন,—অ্যাঁ!

দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছিলেন নাকি মিষ্টার মাইতি? হাউ ফানি!—চ্যাটার্জি এবং তাঁর সঙ্গিটি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

চ্যাটার্জির মোটা ভাঙা গলার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সরু গলার আওয়াজ মিলল, কেমন আঁৎকে উঠল হাজারী। আর আঁতকে উঠল একটু দূরের আকন্দ ঝোপের ভেতরে বসে থাকা একটা শেয়াল—খ্যাঁক্ করে একটা লাফ দিয়ে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটে পালালো সেটা।

—ওঠো হে ঘোষ, উঠে পড়ো।—চ্যাটার্জি তাড়া দিলেন: ঠাণ্ডায় নাক কান ছিঁড়ে গেল যে।

ঘোষের কিন্তু গাড়ীতে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল না, কেমন উশ্‌খুশ করতে লাগলেন। আর তেমনি নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন মিষ্টার মাইতি—খুব সম্ভব আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শীতল অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ শিখার মতো উল্কা ঝরল একটা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘোষ বললেন, এখনো পনেরো মাইল পেরুলে তবে ডাক-বাংলো। কী যে বোগাস্ এরিয়া—যেন পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। সত্যি বলছি, ষ্টিয়ারিঙ ধরতে আর ইচ্ছে করছে না—হাত অসাড় হয়ে গেছে। একটু যদি গরম হওয়া যেত—

গেট্ খুলে দিয়ে হাজারী অপেক্ষা করে আছে। শীতের হাওয়ায় তারও মুখচোখ কালিয়ে যাচ্ছে। আপদগুলো চলে গেলেই বাঁচে—কতক্ষণ আর এই ঠাণ্ডায় এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কিন্তু সে কথা বলা তো দূরে থাক, হাজারী ভাবতেও সাহস পেলনা। চ্যাটার্জির মহিমা সে জানে—জানে তিনি কে এবং কী! তাঁর কলমের একটি খোঁচাতেই তার চাকরি খতম হয়ে যেতে পারে।

চ্যাটার্জি বললেন, এখানে গরম হবে কোথায়? কাছাকাছি গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল আছে ভেবেছো নাকি?

মিষ্টার মাইতি আবার ঘুম থেকে জাগলেন। শেষ কথাটা বোধ হয় তাঁর কানে গিয়েছিল। —চলুন না, পয়েন্টস্ম্যানের ওই ঘরটা তো রয়েছে। বসা থাক্ একটু ওখানেই।

সভয়ে হাজারী একবার নড়ে উঠল। কথাটা ঠিক শুনেছে কিনা বুঝতে পারল না।

—ওই ঘরে? সে কি হে!—চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন

ঘোষ যেন লুফে নিলেন কথাটা।

—তা আইডীয়াটা মন্দ কী। ম্যাস্ কন্টাক্ট আমাদের কাজের একটা বড় অঙ্গ। আর এ-ও ম্যাসের একজন। না হয় একটু কন্টাক্ট-এর সঙ্গে করা যাক। সত্যি বলছি, এই শীতের মধ্যে পনেরো মাইল কেন, এক মাইল যাওয়ার কথা ভাবতেও আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

মিস্টার মাইতির মুখ দিয়ে ঘর্ ঘর্ করে একটা চাপা আওয়াজ হচ্ছিল, আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খুব সম্ভব। কিন্তু ঠিক স্ট্রাটেজিক পয়েন্টে ওঁর ঘুম ভাঙে। জেগে উঠে বললেন, চলুন না—একটু বসাই যাক ওর ঘরে। ডাক-বাংলোতে গিয়েও জায়গা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। কয়েকজন ভি-আই-পি আসবার কথা আছে শুনেছি। তার চাইতে এখানে একটু বসে গেলে—

—মেজরিটি মাস্ট বিগ্র্যান্টেড্—চ্যাটার্জি দাক্ষিণ্যের হাসি হাসলেন। তারপর ডাকলেন: ওহে, কী নাম তোমার? এসো এদিকে।

সম্ভাষণ হাজারীর উদ্দেশ্যে।

শীতে আর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মুমূর্ষ হাজারী সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্বল গলায় বললে, সেলাম হুজুর।

—সেলাম ইতিপূর্বেই তুমি করেছ, ভক্তিতে আর প্রয়োজন নেই।—চ্যাটার্জি গণ-সংযোগের জন্যে বক্তৃতা করে থাকেন, তাই সাধুভাষা ব্যবহার করলেন। তারপর বললেন, কী নাম তোমার?

—হুজুর, হাজারী সিং।

—বাড়ি কোথায়?

—জী, ছাপ্রা জিলা।

ছাপ্রা জিলা?—ঘোষ ফোড়ন কাটলেন: তবে আর তোমার ভাবনা

কি হে? দিল্লী তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে—এক্ষুনি অ্যাম্‌ব্যাসাডার। তুমি কেন ভ্যারেণ্ডা ভাজছ এখানে বসে?

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কেমন বেয়াড়া ধরনে হেসে উঠলেন মিষ্টার মাইতি—ব্যাঙের সাপ গেলার মতো ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করে আওয়াজ হল।

চ্যাটার্জি মৃদু হেসে বললেন, 'ওয়েল সেড্'।

কিন্তু এমন উঁচু ধরনের রসিকতাটা মাঠেই মারা গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল হাজারী. এক বর্ণও বুঝতে পারল না।

—শুনেছ—সদয়ভাবে এবার চ্যাটার্জি বললেন, তোমার ঘরে একটু বসব আমরা।

হাজারী বার কয়েক খাবি খেলো কেবল।

—জী, গরীবের ঘর, দড়ির খাটিয়া—

এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে চ্যাটার্জি আরো উদার হয়ে উঠলেন।

—সারা ভারতবর্ষই গরীবের দেশ বুঝেছ হাজারী?—চ্যাটার্জির হৃদয়ে গণসংযোগের প্রেরণা এসে গেল: সেই কোটি কোটি গরীবই হচ্ছে দেশের শক্তি, তার প্রাণ, তার আত্মা। সেই আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য—আমাদের মিশন—অর্থাৎ ব্রত। চলো আজ আমরা তোমারই অতিথি।

মাইতির কেমন আশা হচ্ছিল চ্যাটার্জি এবার জড়িয়ে ধরবেন হাজারীকে কিন্তু ধরলেন না দেখে একটু নিরাশই হলেন মনে মনে। ঘোষের ইচ্ছে হল, হাততালি দিয়ে ওঠেন, নেহাৎ একলা হাততালি জমবে না বলেই থেমে গেলেন।

হাজারীর হাঁটু এবার শব্দ করেই কাঁপতে লাগল। —কিন্তু হুজুর—

—এসো এসো, তোমার কোনো ভয় নেই—হাজারীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন চ্যাটার্জি।

মাটির একটা বড় মালায় গনগন করছে আগুন। বাইরের তীক্ষ্ণ শীতল হাওয়ার মধ্যে থেকে এই ঘরে পা দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই।

ঘোষ বললেন, নট্ ব্যাড্! অবশ্য ধোঁয়াটা না থাকলে আরো ভালো হত।

আর মাইতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালেন খাটিয়াটার দিকে। তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ময়লা ধুঁষো কম্বল। ছারপোকাও নিশ্চয় আছে কয়েক লাখ। তবু মাইতির বাসনা হল, সোজা বিছানাটাতেই লম্বা হয়ে পড়েন। চ্যাটার্জির পাল্লায় পড়ে সারাদিন এক ফোঁটা বিশ্রাম জোটেনি।

হুজুর এইটুকু তো ঘর। কোথায় যে আপনাদের বসতে দিই—

কথাটার ভেতরে বিনয়ের আতিশয্য নেই এক বিন্দুও। ঘরটা হাত ছয়েক লম্বা, হাত চারেক চওড়া হবে বলে মনে হয়, সামান্য কিছু বেশি হতেও পারে। ভেতরে হাজারীর খাটিয়া, একটা চৌপাই, কোম্পানির গোটা দুই বাতি, ফ্ল্যাগ, উনুন, হাঁড়ি-কড়াই দড়িতে ঝোলানো পোষাক, একটা মোটা লাঠি। টিনের বাক্সও আছে—তবে সেটা খাটিয়ার তলায়।

ঘুঁটের হাল্কা ধোয়ায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, তবু চ্যাটার্জি বললেন, আরে, এক কম্বলে অনেক ফকিরের জায়গা হয়। ভালোই হল, তোমার ঘর দেখে গেলাম। নাঃ, স্পেস্ সত্যিই খুব কম। ফ্যামিলি নিয়ে তো থাকাই যায় না দেখছি। ওয়েল, আমি দিল্লীতে লেখালেখি করব এ-নিয়ে।

চ্যাটার্জি খাটিয়ায় বসে পড়লেন, তাঁর দৃষ্টান্তে ঘোষ এবং মাইতিও আসন নিলেন। খাটিয়াটা খট্‌খট্ করে উঠল—হাজারীর বরাত গুণেই ছিঁড়ে পড়ল না। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল হাজারী সিং—বিছানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস চাপল একটা।

—দাঁড়িয়ে কেন হাজারী, বোসো।

—হুজুর আপনাদের সামনে—

—আরে বোসো, বোসো—চ্যাটার্জির মুখে অনুগ্রহের হাসি: বসে পড়ো। নাউ উই আর ফ্রেণ্ডস্। এ-যুগে সবাই সমান।

অগত্যা বসতে হল হাজারীকে। আধখোলা দরজায় পিঠ দিয়ে। পেছন থেকে কন্‌কনে হাওয়া আসছে—কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েও তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।

—কত মাইনে পাও তুমি?—ঘোষের জিজ্ঞাসা।

হাজারী জানালে।

—এত কম?—ঘোষের চোখ বিস্ফারিত হল: চলে কি করে?

এর উত্তর নেই। বিনীত হাসিতে চুপ করে রইল হাজারী।

চুরুট নিভে গিয়েছিল, চ্যাটার্জি সেটাকে ধরালেন। তারপরে আস্তে আস্তে বললেন, রেলওয়েতে মাইনে সত্যিই বড্ড কম দিচ্ছে। আমি ভাবছি, এ নিয়ে মুভ্ করব। বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওয়ার্কিং ক্লাসকে নেগলেক্ট করবার আর কোন মানেই হয় না।

—এক্‌জাকট্‌লি!—ঘোষ কথাটা লুফে নিলেন: এইগুলোই তো সুইসাইডাল্ পলিসি। নইলে কি এসব যা-তা সেট্ ব্যাক হয় ইলেকশনে?

চ্যাটার্জি গভীরভাবে চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ।

—কিন্তু কি জানো ঘোষ, এদের লোভ যে-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে যতই করো পেট ভরাতে পারবে না। অথচ, সত্যিই খ্যাখো—এদের নীড কতটা? ফ্রী কোয়ার্টার পাচ্ছে নেচারের ভেতরে কেমন হেল্‌দি হ্যাপি লাইফ—

মাইতি এর মধ্যেই দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচমকা জেগে উঠে জড়ানো গলায় বললেন, সেদিন কাগজে দেখছিলাম আসামে কোন এক লেভেল-ক্রসিং থেকে গেটম্যানকে বাঘে নিয়ে গেছে।

চ্যাটার্জি শুনতে পেলেন না। কিংবা শুনলেও কর্ণপাত করলেন না।

—খায় শাক্‌শব্জী—ক্ষেতের টাট্‌কা চাল—

—চালের মণ পঁয়ত্রিশ টাকা, আর আটা—বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে গেলেন মিঃ মাইতি। চ্যাটার্জি এবার তাঁর দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ফেললেন একটা।

ঘোষ বললেন, ঘুমের ঘোরে কথা কইছেন।

—হুঁ, তাই দেখছি।—কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চ্যাটার্জি এবার হাজারীর দিকে ফিরলেন।

—দেশে কত পাঠাও হাজারী?

—জী দশ-পন্দেরো—

চ্যাটার্জির মুখে এবার জয়ের পরিতৃপ্তি দেখা দিল!

—দেন ইউ সি ঘোষ, এই টাকাতে চালিয়েও দশ-পনেরো টাকা দেশে পাঠাতে পারছে—তার মানে, যা পায়, তাতে প্রয়োজন মিটিয়েও ওর বাড়তি থাকছে। তা থেকে বোঝা যায়, এর বেশি নীড্‌ ওর নেই। হোয়্যারঅ্যাজ একটা উচুঁদরের গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টকেও মাসের শেষের দিকে টানাটানিতে পড়তে হয়—গাড়ীর তেলে ঘাঁট্‌তি পড়ে!

—সবই স্ট্যাটাস্‌ আর স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্‌ লিভিং—

শীতে আর ঘুমে হাজারীর সারা শরীর কুকড়ে আসছে। কতক্ষণে এরা নড়বে তার ঘর থেকে? না হয় তার খাটিয়াতেই শুয়ে পড়ুক এরা—সেও মেজেতেই খানিকটা গড়িয়ে নিক। এই রাত দুটোর সময়, এমনি হিম ঠাণ্ডার ভেতরে কেন খামোখা বকবক করছে বসে বসে?

চ্যাটার্জি বলে চলেছেন, হ্যাঁ—স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্‌ লিভিং। একটু খোঁজ করলে দেখবে, ইভ্‌ন তোমার জেনারেল-ম্যানেজারের চাইতেও কত সুখী এরা—কী কন্‌টেন্টমেন্ট! আর সাধারণ মানুষের এই যে সন্তোষ—ভারতবর্ষের

আইডিয়াল হচ্ছে ঠিক এইটেই। আজ যারা এদের ক্ষেপিয়ে তোলে, তারা শুধু নিজেদের পোলিটিক্যাল্ অ্যাম্বিশনটাকেই ফুল্ফিল্ করতে চায়। যে অভাব এদের কোনোদিনই নেই, কৃত্রিমভাবে তাকেই সৃষ্টি করে তারা। আর—

ঘোষ মুখ ফিরিয়ে হাই তুললেন, সেই সঙ্গে ঈর্ষাতুর চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাইতির দিকে মাইতি এবার সত্যি নিথর ঘুমে তালিয়ে গেছেন। মুখটা একটু ফাঁক হয়ে আছে, ঘরঘর করে চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ঘোষের মনে হল, একটা চিমটি কেটে, মাইতিকে জাগিয়ে দেন তিনি। দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, অথচ চ্যাটার্জির মত বক্তৃতা সমানে শুনতে হচ্ছে তাঁকেই।

চ্যাটার্জি বললেন, দেশ গড়তে হবে—সকলকে নিতে হবে কর্তব্যের ভার। আজ যাঁরা লীডার, তাঁরা একদিন কত স্যাক্রিফাইস করেছেন। কিন্তু শুধু তাঁদের ত্যাগেই তো চলবে না. আজ দেশের সব মানুষকে ত্যাগ শিখতে হবে—শিখতে হবে কর্তব্য—

ঘোষ হঠাৎ উঃ করে উঠলেন। ভুরু কোঁচকালেন চ্যাটার্জি।

—কী হল হে? ছারপোকা নাকি?

—না হুজুর, খটমল নেই—নির্বাক হাজারী এতক্ষণে ত্রস্ত কৈফিয়ত একটা।

—খট্মল ছাড়া তোমাদের খাটিয়া আর কলের জল ছাড়া কলকাতার গয়লার দুধ—দুই-ই অ্যাবসার্ড!—ঘোষ গজগজ করে উঠলেন। ঘোষকে সত্যিই ছারপোকা কামড়ায়নি—কিন্তু সরব স্বগতোক্তির ত্রুটিটা এ-ভাবে ছাড়া ঢাকবার কোনো উপায় ছিল না।

চ্যাটার্জি থামবার পাত্র নন। আবার আরম্ভ করলেন: দুশো বছরের একটা পরাধীন জাতকে রাতারাতি ঘুম থেকে জাগানো যায় না. প্রত্যেকে যদি ত্যাগ করতে পারে—কর্তব্য যদি—

এবারেও শেষ করতে পারলেন না। লেভেল-ক্রসিং এর ঠিক পিছনেই সাতটা আটটা শেয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল। পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে শাল পলাশের বন কাঁপিয়ে হু হু করে ছুটে এল উত্তরের হাওয়া। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল এক ঝটকায়—ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ঘুমন্ত মিষ্টার মাইতি পর্যন্ত চোখ মেলে ধড়্ধড় করে উঠে বসলেন।

ঘোষ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—বাপরে, নর্থ পোলে এসে পড়েছি নাকি ? কী যেন নাম তোমার—ওহে হাজারী, দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও না—

—না—না, খোলা থাক খানিকটা। —চ্যাটার্জি কোটের কলারটা তুলে দিয়ে বললেন, ধোঁয়া দেখছ না ঘরে ? গ্যাস পয়জনিং হয়ে মরবে নাকি শেষে ?

—হুঁ, তাও বটে !—একটু চুপ করে থেকে ঘোষ বললেন, আর তো পারা যায় না। নিয়ে আসবো ব্যাগটা ?

চ্যাটার্জি একবার আড় চোখে তাকালেন হাজারীর দিকে। ঘুমে আর শীতে অদ্ভুত রকম কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে হাজারী। বললেন, আমিও সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। তবে কিনা আমরা পাবলিক ম্যান—আমাদের কর্তব্য হল লোকের কাছে সবসময় নিজেদের ডিগনিটি বাঁচিয়ে চলা। এই লোকটার সামনে—

ঘোষ মুখ বাঁকালেন। ইংরাজীতে বললেন, এর জন্য ভাবতে হবে না। এরা আমাদের চাইতে এ-সবের মর্ম অনেক ভাল বোঝে। একেও একটু গরম করে দেওয়া যাক—খুশিই হবে।

ঘোষ ওঠে দাঁড়াতে হাজারীও দাঁড়িয়ে পড়ল। হায়, মিথ্যে আশা! ঘোষ বেরিয়ে গেলেন, নির্বিকার ভেবে নেভা চুরুটে আবার আগুন ধরালেন চ্যাটার্জি। মাইত্রি ঘুমোতে লাগলেন এক মনে।

—দেশে-টেশে যাওনা হাজারী ?

—যাই হুজুর। দো-চার বরিষমে এক দফে !

—চাষ-বাস আছে ?

এক মুহূর্তে হাজারীর মন দূরে চলে গেল। চাষ-বাস ছিল বই কি এক সময়। রহড়ের খেত ছিল, ছোট একটা ফলের বাগিচা ছিল, একটা তালাও ছিল। কিন্তু সে-সব যে কোথায় গেল তার খবর জানত তার বাপ—যে চোখে ভালো দেখতে না পায় শাদা কাগজে টিপসহি দিয়েছিল, আর জানে জমিন্দার ব্রিজনন্দন চৌধুরীজি যার বাড়িতে নন্তং ভাবা ভাবী আদমী পাটনা থেকে এসে খানাপিনা করে।

—চাষ এক সময় ছিল হুজুর। এখন নেই

—হুঁ, চাকরির লোভে সে-সব বিসর্জন দিয়েছ ? —চ্যাটার্জীর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন ; এই স্লেভ মেন্টালিটির জন্যই দেশটা উচ্ছন্নে গেল ! মাটিই

যে সব চাইতে খাঁটি জিনিস—তোমাদের কে বোঝাবে সে কথা? আমরা কেবল বকেই মরি!

ঘোষ একটা ছোট ট্রাভেলিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলেন।

—জাগাব মাইতিকে?

—কী হবে জাগিয়ে? ওর চলে না।

ব্যাগ খুলে বোতল-গ্লাস বার করতে করতে মুখভঙ্গি করলেন ঘোষ।

—এদিকে রাইট অ্যাণ্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছে, আর একটুখানি এ সব ঠোঁটে ছোঁয়ালেই ক্যারাক্টার নষ্ট হয়। হিপোক্রিট।

সোডা খোলবার আওয়াজে একটুখানি নড়ে উঠলেন মাইতি, মুখটা কপ করে বন্ধ হয়ে গেল! পাছে ঘুমের ঘোরে তাঁর খোলা মুখে খানিকটা ঢেলে দেওয়া হয়—সেই ভয়েই যেন সতর্ক হয়ে গেলেন আগের থেকে।

দুটি গ্লাসের তরল সোনালীর ওপর শাদা ফেনা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল হীরের মতো। আর চক্‌চক্ করে উঠল হাজারীর চোখ। এই শীত, এই জড়তা আর ওই গন্ধটা। তাকেও চকিত করে তুলল।

চ্যাটার্জী লক্ষ্য করেছিলেন। একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণায়।

—এ চীজ মালুম হায় হাজারী?

মালুম আছে বইকি হাজারীর। নইলে তার মতো গরীব-গরবর এক আধটা দিন খুশি হবে কী করে। তবে মতোয়ালা নয় হাজারী। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধটা হাটের দিন সামান্য হাঁড়িয়া মেলে আদিবাসীদের কাছে থেকে।

বিনীত হাসিতে হাজারী মাথা নিচু করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার জ্বলন্ত চোখ দুটো আবার উঠে এল সোনালীর উপর হীরের ফেনা জমে ওঠা গ্লাসের দিকে। বড্ড জাড়া পড়েছে আজ—বড় বেশি।

চ্যাটার্জি বললেন, খাবে হাজারী?

বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল হাজারীর। প্রাণপণে সামলাতে চাইল নিজেকে।

—না হুজুর।

—আপত্তি কেন হে? যা শীত—একটু তাজা হয়ে নাও না। ভয় নেই—আমরা তো রয়েছি।

—ডিউটি আছে হুজুর। একটু পরেই মেল ট্রেন পাশ করাতে হবে—

—যে রকম কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়েছ, তাতে মেল ট্রেন পাস্ করাতে পারবে বলে তো ভরসা হয় না। আরে, গিলে ফেলো এক চুমুক—গা গরম হয়ে যাবে।—চ্যাটার্জির মুখে দেবদুর্লভ হাসি। স্নেহ, অনুকম্পা, বন্ধুত্ব—কী নেই সেই হাসিতে?

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষীণ গলায় হাজারী বললে, না হুজুর, সরকারী কাজ—

ঘোষ ইংরাজীতে বললেন, ইন্‌সিস্ট করছ কেন? না খায় রয়েই গেল।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন ইংরেজীতেই: উইট্‌নেস্ রাখতে চাই না—পার্টি করে ফেলতে চাই—বুঝতে পারছ না? আমাদের পজিশনের কথাটাও ভেবে দেখো।

—দ্যাট্‌স্ রাইট!

চ্যাটার্জির মুখে রঙ বদলেছে এর মধ্যেই। মেজাজ খুশি হয়ে উঠেছে আরো। এখন তিনি ধীরে ধীরে জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন।

—ওই পেতলের গ্লাসটা বুঝি তোমার? ধরো—

—হুজুর—

—আমি বলছি তোমাকে।—হাজারী আর একটু কাছে থাকলে চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে বোধ হয় তার গলা জড়িয়েই ধরতেন: আরে, অভি জমানা বদল গো গয়া। আমরা সব ভাই ভাই। তোলো গেলাস—

এবার শেষ বাধাটাও উপড়ে গেল হাজারীর। আর মনে পড়ল, চ্যাটার্জি বলেছিলেন, ডিউটি নেহি করেগা—সামনে গেট বন্ধ করে নিল লাগাও—তোমার নকরি আমি—! না—হুকুম মানতেই হবে।

কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে বললে, হুজুর—বহৎ থোড়া—

ঘোষ ইংরেজিতে বললেন, র' রিয়্যাল স্কচ—গুল্ড স্মাগলার—

দ্যাটস অল রাইট্! ওরা ওস্তাদ লোক—অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের এক গ্যালনেও ওদের কিছু হয় না। ঢালো—

কিন্তু সাঁওতালী হাঁড়িয়া আর রিয়্যাল স্কচের তফাৎ জানা ছিল না গরীব হাজারীর। এক চুমুকে সবটাই শেষ করতে গিয়ে বুক পর্যন্ত আগুন ধরে গেল। তারপর মনে হল, এইবারে উঠে দাঁড়িয়ে তার চীৎকার করে একখানা গান গাওয়া দরকার, শুনে হুজুরেরা খুশি হবেন। তারপর—

কখন ঘুমন্তপ্রায় মাইতিকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখন খুশির ঝোঁকে হাওয়ার মতো ল্যাণ্ডরোভার উড়িয়ে বেরিয়ে গেছে ঘোষ

তার কোন খবর হাজারী জানত না। হঠাৎ একটা বীভৎস বিকট আওয়াজে তার ঘোর কাটল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে।

মেল ট্রেন ঠিকই বেরিয়ে গেছে। গার্ডের গাড়ীর লাল আলো অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তবিন্দুর মতো। শুধু লাইনের পাশে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে গোরুর গাড়ীটা—আহত বলদদুটো গোঙাচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায়। আর তার ঘুমের সুযোগে খোলা গেট পেয়ে যে লোকটা গাড়ী নিয়ে লাইনে উঠে এসেছিল, সে-লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে প্রায় দশ বার গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে—শেষ রাতের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় লাইন-স্লিপার নুড়ী রক্তে স্নান করছে।

চাকরি যাবেই—সে ভাবনায় নয়। খুনী—বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা মনে পড়তেই হাজারী টলতে টলতে সেই রক্তমাংস ছড়ানো লাইনের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

মার্ডার কেশ হিসট্রিটা পড়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা শ্যামল সেন ভাবতে লাগলেন: খুনে সব মৃত্যুর পরিণামই সত্য। কিন্তু এ ধরনের খুনীকে চিহ্নিত করা শক্ত। তবু কর্ত্তব্য তো করতেই হবে—অন্তত একটা তদন্ত!

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ জন্ম বরিশাল জেলায় ১৯১৮ সালে। কল্লোল উত্তর যুগের লেখকগণের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র ও সন্তোষ কুমার ঘোষ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য নাম।

সূক্ষ্ম ঘটনা সংস্থাপন, গভীর অভিনিবেশ ও বেগবান ভাষা প্রয়োগ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বল্প কালের মধ্যেই এক বিশিষ্ট আসন দান করে। নারায়ণ বাবুর ভাষার কারুকার্য ও নিপুণ প্রয়োগ সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে স্বাতন্ত্র ও স্বকিয়তা দান করেছে। তাঁর লেখায় বিস্মৃত প্রায় অতীতের স্মৃতি আচ্ছন্নতা ও ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা প্রবাহ লেখকের অনবদ্য ভাষায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন সাহিত্যে বুদ্ধির দীপ্তি, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বৈদগ্ধের অভিভাস তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর লেখায় বারেন্দ্রভূমের বিশেষত দিনাজপুরের ভৌগোলিক দৃশ্যপট অনিবার্য ভাবেই উপস্থিত।

তবে নদীমাতৃক দক্ষিণের পলিসঞ্চিত উপনিবেশের চিত্রনমাধুর্যও তাঁর অনেক লেখায় সমুপস্থিত। লেখকের লালমাটি, শিলালিপি, উপনিবেশ, ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক পঠিত।



কে যেন

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি।

সব শুনেছিল সব জানত বলবীর সিং আগে থেকেই। তবু কেন যে কারো কথা মেনে নেয়নি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কোন বিবরণ বিশ্বাস করতে পারেনি কেন—তা নিজেও বোধহয় ভেবে দেখেনি একটি বারও। দেখলে একটা নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখ দাঁড়াতে হত না কখনো। হয়তো রক্ত জল করা ভয়ংকরের হাতছানির কবলে গিয়ে পড়তে হত না।

পড়তে হল বলবীর সিং এর নিজেরই গোঁয়ার্তুমির জন্য। কিন্তু তখন নিরুপায়। বিভীষিকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে আটকে পড়েছিল সে। বেরুবার পথ খুঁজে পায়নি কোন দিক দিয়েই। বেরুতে চেষ্টা করেছে, পালাতে চেষ্টা করেছে, মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। পারেনি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তার। বাঁচবার জন্য প্রাণপণে খুঁজেছে পথ না। এক পা পিছু হটতে গিয়ে, মৃত্যু গহ্বরের দিকেই এগিয়ে গেছে আরো পা পা।

নিয়তির আকর্ষণের মতো একটা অশুভ আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে খেলিয়ে নিয়ে আসছিল নিজের খপ্পরে ফেলবার জন্য—প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি

মোটে। ভয়ত্রাস মনের কোণে উঁকি মারেনি একবারও। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ তরুণ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলছে। হাসিখুশি মানুষটা সঙ্গীদের সঙ্গে হাসি মস্করা করতে করতে চলেছে পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে—চড়াইয়ে উঠে উড়ছে রাইয়ে নেমে। সময় সময় আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ ফুটে উঠছে সারা মুখখানায়।

গভীর খাদের ধার দিয়ে নির্ভীক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আবার কখনো বন্ধুদের হাত ধরে টানাটানি করছে তাকে অনুসরণ করে চলতে। খাদের দিকে তাকিয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে বন্ধুরা। একটু উনিশ-বিশ হলে, পা ফসকে গেলে রক্ষে নেই আর। কোন্ অতল তলে যে তলিয়ে যাবে তার হদিস পাবে না আর জীবনে কেউ। বন্ধুদের অনেকে বলবীরের কাছ থেকে ছুটে পালায় দূরে—অনেক দূরে।

হো হো করে হেসে ওঠে বলবীর সিং। কেঁপে ওঠে ওর দীর্ঘ দেহ। কেঁপে ওঠে পাহাড়-বন। কাঁপন ধরে কাছের বন্ধুদের বুকের তলায় তলায়। হাসিটা ভালো লাগছে না একদম। বিচ্ছিরি রকমের। হাসি দেখে মানুষের হাসি পায়, কিন্তু এ হাসিতে একটা কান্নার সুর বেজে উঠছে তাদের কানে।

পথের ভয় মনের ভয় ঘোচাবার জন্য যে হঠকারিতা করছে সে, যে আত্মম্ভরিতা দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, মানুষটা বুঝি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আরো হ'য়ে উঠেছে তার আচার-ব্যবহারে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। একটা উন্মত্ত ভাব পেয়ে বসেছে ওকে। এই উন্মত্ততাই তাদের ভয় সরাতে ভয় ধরাচ্ছে বেশী করে। গুরুজনদের আদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে। যে রাস্তায় পা বাড়াতে নিষেধ, জঙ্গল খাদের যে দিক দিয়ে যেতে একেবারে বারণ—ইচ্ছে করেই ও সেই রাস্তায় সে দিক দিয়েই যাচ্ছে। এ জিদের ফলাফল ভালো হবে না। হতে পারে না জানা কথাই। তবু অবাঞ্ছিত অলক্ষণকে ডেকে আনবার জন্য ও যেন খুব তৎপর হয়ে উঠেছে।

অদৃশ্যলোকের এক অজানা দুর্দান্তমন দারুণ প্রভাব বিস্তার করছে বুঝি বলবীর সিং-এর মনের ওপর। কেমন ঠেকছে ওকে। পরিচিতদের কাছে ও অপরিচিত। অন্য দুনিয়ার অন্য মানুষ। বন্ধুদের চোখে ক্রমে মূর্তিমান ত্রাস হয়ে উঠতে লাগল বলবীর সিং।

যে ক'জন কাছে ছিল, তাদের অভয় দিতে গিয়ে, অতি দুঃসাহসী ভাব

দেখাতে গিয়ে কাল হল বলবীর সিং-এর। নানা অজুহাত দেখিয়ে এক এক করে সরে গেল তারা। অন্য পথ ধরল। পিতৃদত্ত জীবনটা তারা বেঘোরে খোয়াতে পারবে না।

সকলকে চলে যেতে দেখে বলবীর সিং ফেটে পড়ল রাগে। ফর্সা লোকের মুখখানা দিয়ে রক্ত ফেটে বেরোয় আর কি! বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বলে উঠল—যে ভয়ের জন্য তোরা সব পালাচ্ছিস, সেই ভয়ই ধরবে তোদের দেখিস। বুকে হাত চাপড়েছিল।—এ বান্দা তোদের আগেই গাঁয়ে ফিরে যাবে বহাল তবিয়তে। যত সব ডরপোক—ভীতুর দল।

ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে চলার মোড় ঘুরিয়ে দিল বলবীর সিং। আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। যারা ছেড়েছে ওকে তাদের যেন হাড় পাঁজরা মাড়িয়ে দলে পিষে-দিয়ে চলতে লাগল।

মনে উদ্ধত ভাবটা পেয়ে বসলে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকেনা। ঘোলাটে ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বিভ্রান্তির মোহে আচ্ছন্ন মনে তখন ভুল দেখা ভুল পথে চলা ভুল বোঝা সবই ঠিক ঠিক মনে হয়। বলবীর সিং-এরও হয়েছিল তাই। সে যা কিছু ভাবছে ঠিক। যা কিছু বুঝেছে ঠিক। যে পথে চলেছে সে পথও ঠিক।

এই মনগড়া সব ঠিকই বেঠিক হয়ে গেছল বলবীর সিং-এর শেষ পর্যন্ত।

দুপুর রোদ্দুরের প্রখর তেজটা কমেছে তখন। বিকেলের ছায়া স্নিগ্ধ ঠাণ্ডামিঠে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বলবীর সিং-এর মনে মুখে খুশির আমেজ। একা চলার মুক্তিস্বাদ জীবনে পেয়েছে এই প্রথম। এই প্রথম যেন নতুন আনন্দের দুনিয়ায়। একবার ও মনে হচ্ছে না সে একা। মনে হচ্ছে সে অনেক। একাই একশো।

পাহাড়-বনের জন্তু-জানোয়ার গাছ-গাছালির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আমগাছটার তলায় ঝরণার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তরতরিয়ে বয়ে চলেছে ঝরনার স্ফটিক জল। ঝরনার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগল সেও। জলে ভর্তি ডোবা টার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। দু'হাতে আঁজলা আঁজলা জল তুলে মাথায় মুখে দিতে লাগল। খেতে লাগল।

হাসছে বলবীর সিং। জল খাবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মাথা টলে। গা

ঝিম ঝিম করে। চোখে ধোঁয়া দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। হুঁশ ফিরে আসে না আর কখনো কারো। সব ভুল। সব মিথ্যে। ভয় দেখানো স্রেফ। এ-জলে মৃত্যুবিষ নেই। তার প্রমাণ বলবীর সিং বেঁচে রয়েছে। পায়ের চাপে শুকনো ডালপালা ভেঙে যাওয়ার মড়মড় আওয়াজে ফিরে তাকাল সে ফার্ণ গোল্ডেন-রড গাছগুলোর দিকে। হয়তো কোন বন্ধু তাকে নিয়ে কৌতুক করবার জন্য এইভাবে শব্দ করছে। তাকে ছেড়ে দিয়েও গাছের আড়ালে আড়ালে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে।

ভুল ভাঙল। গাছগুলোর কাছে এসে ফাঁকে চোখ রেখে রেখে কোন লোককে দেখতে পেল না সে। দেখতে পেল কেবল মখমল-মসৃণ শিং নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে একটা শম্বর। শম্বরটা যে খুব ভয় পেয়েছে, ওর আকাশ ফাটানো চিৎকারে তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওর চিৎকারের সঙ্গে নীলরঙা ম্যাগপাই পাখি দুটোও গলা মিলিয়ে ভয় ধরানো চিৎকার করছে।

এদের এ-ভাবের চিৎকারের পেছনে, দৌড়নোর পেছনে, ওড়ার পেছনে যে একটা সত্যি ভয়ের কারণ আত্মগোপন করে থাকে, পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা ভালো রকমেই জানে বলবীর সিং। অন্য সময় হলে সে-ও ভয় পেত। আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় খুঁজতে দৌড়দৌড়ি করত দিক্‌বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে। সে জানে, এই দৌড়াদৌড়ির ফলেই অনেকে বাঁচতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও একই দশাই পড়তে হয়েছে কাউকে কাউকে।

এতসব জানা সত্ত্বেও, শম্বর-ম্যাগপাই-এর অলুক্ষুনে চিৎকার শুনে ও ঘাবড়াল না বলবীর সিং। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নির্দ্বিধায় চলতে শুরু করে দিল আবার। একটা অজানা অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে তার ভেতরে। সে বীর। নামে যেমন প্রকৃতিতেও তেমন। এই থকগাঁও-এর মধ্যে তার সমকক্ষ নেই তার কেউ।

মনে মনেই নিজের গর্ব-অহঙ্কারের তারিফ করতে করতে বলবীর সিং-এর বুকখানা ফুলে দশহাত হয়ে উঠতে লাগল যেন। নিজেকে খুব আশ্চর্য ঠেকল ওর। কেমন করে কোন্ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে হঠাৎ এরকম হয়ে গেল ও। আগেকার মনটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে একেবারে। মনে হচ্ছে সে সকলের চেয়ে জ্ঞানী। সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান। ভয় ডর তার জন্য নয়। দুর্বলদের জন্য, অজ্ঞানীদের জন্য।

ইচ্ছে করেই কাঁটা ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে চলতে লাগল বলবীর সিং। কোন কিছু লক্ষ্যে পড়ে কি না। খারাপ কিছু পড়ছে না ওর চোখে। খারাপের ভিতর সৌন্দর্যের পসরাই দেখছে ও।

মাথার ওপর ম্যাগপাই পাখি দুটো একনাগাড়ে উড়তে উড়তে চলেছে। শম্বরটা ওপাশ দিয়ে ওর সামনে এসে পড়ে আবার দৌড়তে শুরু করল প্রাণ-পণে। এরা সাধারণত হিংস্র প্রাণঘাতী বাঘ বা অন্য জন্তুর আবির্ভাবেই এই রকম করে থাকে। এসব জানা-কথা বলবীর সিং-এর মনের কোণ থেকে মুছে গেছে একেবারে। মৃত্যুর হয়তো মাদকতা আছে একটা। ম্যাগপাই-এর নীলরঙে বলবীর সিং-এর চোখে নেশা লাগছে। তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। দু'চোখে ঘুম নামছে বুঝি।

এইভাবে আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ চলেছিল, কতক্ষণ কেটেছিল, তার কোন খেয়াল ছিল না! খেয়াল হল একটা হিমেল বাতাসের ঝাপটা লেগে সর্বশরীরে। সচেতন হয়ে উঠল বলবীর সিং। দু' হাতের তালু ঘষে ঘষে গরম করতে লাগল। বুকের তলায় রক্তটা বুঝি জমাট বেঁধে যাবে এক্ষুনি। সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচলের জন্য পাহাড়ের ফাটল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ পূব দিকে তাকিয়েই যেন কেমন হয়ে গেল বলবীর সিং। নেপাল পাহাড়ের পেছনে সূর্য ঢলে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্ত লালে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু। যতখানি দৃষ্টি যায়, চক্কর দিয়ে এল দু' চোখ।

ভয় ধরছে ভেতরে। দিশেহারা হয়ে পড়ছে। গাঁও- ডরায় ফেরবার পথ থেকে একদম অন্য পথে সরে এসেছে। সঙ্গীদের সঙ্গ ছেড়ে বেকুবি করেছে বেশ বুঝতে পারছে। এতক্ষণ যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক মানুষে ফিরে এসেছে আবার বলবীর সিং। জন-মানবশূন্য পাহাড় বনভূমিতে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গণছে। কি করবে কোথায় যাবে কোথায় আশ্রয় পাবে ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছেনা।

অলক্ষ্যে থেকে একটা অশুভ ছায়া যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে তখন মানুষের অনুভূতি একটা অজানা আশঙ্কার আঁচ পায়। কেন পায় তা কেউ জানে না। কিন্তু তবু পায়। এক্ষেত্রে বলবীর সিংও সেই আঁচ পেতে লাগল বুঝি। মৃত্যুর বিভীষিকা অনুভূতির স্তরে স্তরে জেঁকে বসতে

লাগল তার। বেরুবার সময় মা-বাবার ফিরতে বারণ করার কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল। দেরী হলে ফিরো না। সঙ্গীদের কাছ ছাড়া হবে না মোটে। যে-ই বেপরোয়া হয়েছে, তারই বিপদ ঘটেছে। অনেক সময় অনেককে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে—

মায়ের সজল দু'চোখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেবল বলবীর সিং-এর।

বাড়িতে ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছে না চোখের সামনে। যেখান থেকে আসছিল, সেই টনকপুর বাজারে ফিরে যাবারও পথ দেখতে পাচ্ছে না। পেলেও কোন জায়গায় পৌছনো সম্ভব নয় সন্ধ্যের আগে। সন্ধ্যে নামছে। অন্ধকারে যেন আলোর ক্ষীণ রেখা দেখতে পেল বলবীর সিং। পূর্ণিমা হয়ে গেছে সবে দু'দিন আগে। চাঁদ উঠবে খানিক পরে। জ্যোৎস্না ঝরে পড়বে আকাশ থেকে। পাহাড়ী ছেলের পাথুরে রাস্তায় চলতে অসুবিধে হবে না। জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর সামান্য একটু ক্ষয়া চাঁদ উঠল আকাশে। খুব সচেতন হয়ে চলছে বলবীর সিং। বাঁচবার আকুলি বিকুলিই তাকে ঠেলে ঠেলে চালাচ্ছে। বলবীর সিং তার ভীতসন্ত্রস্ত মন আর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারছে না আর।

জামবনটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আচমকা ও কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল স্পষ্ট। চমকে উঠল মুহূর্তে—কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারল না। প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

বেশ বুঝতে পারছে, জামবনের আড়ালে তার পা ফেলার সমান তালে তালে পা ফেলে তাকে অনুসরণ করে দৌড়চ্ছে অন্যজন। সময় সময় মনে হচ্ছে যেন একজন নয়, আরো কেউ কেউ আছে। একসঙ্গে অনেকের পায়ের শব্দ। এত পায়ের শব্দের কথা শোনেনি। এখানের ভয়াবহ কাহিনী শোনার সময়। হয়তো মনের ভ্রম। ভয় থেকে উৎপত্তি। একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছে আবার বোধ হয় শোনা কথাই সন্ধ্যে নামতে মনের কানে প্রতিশব্দ হয়ে বেজে উঠছে নিজেরই পায়ের শব্দ। এইভাবেই মনের চোখে এবার শোনা কথারই অনেক রূপ দেখতে পাবে। পূর্ণমাত্রায় মনের সাহস বজায় রাখতে এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে বলবীর সিং পথ চলতে লাগল।

খানিক যেতে না যেতেই আবার একটা ধাক্কা খেল। নিজের চোখকে

বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। দু'হাতে চোখ রগড়ে নিল বার বার। না, মনের ভুল নয়, চোখের ভুল নয়। যা দেখেছে সত্যি। যা দেখছে সত্যি। তবে এ দেখা যে একেবারে দ্বিধা-সংশয় মুক্ত তা নয়। যাকে দেখছে, সে শরীর না অশরীরী—কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছে। জায়গাটা সম্বন্ধে বহু রকমের ঘটনা অনেকেরই কানে কানে হেঁটে বেড়ায় প্রায় সময়। সম্পূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই মাটিতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কেউ কেউ। ওদের অতৃপ্ত আত্মাই আসে নাকি এখানে। ঘুরে বেড়ায় নাকি পাহাড়ের চুড়োয়, খাদে, বনে-জঙ্গলে গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

এসব মনে নেয়নি কোনদিন বলবীর সিং। বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এই মুহূর্তের পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সাহসের ভিতে বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরছে।

জামবনটা পেরিয়ে এসেছে। এদিকটা বেশ ফাঁকা। একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের ব্যবধান অনেকখানি। গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে রেখে চলতে গিয়ে ছায়ামূর্তিটা বালিমাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে অন্যগাছের গুঁড়ির আড়ালে এসে পৌঁচচ্ছে। বুকটা কেঁপে উঠল বলবীর সিং-এর। এ যেন শিকারীর শিকার ধরবার প্রস্তুতি চলছে। ছায়ামূর্তি তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে বেশ বুঝতে পারছে।

অশরীরী নয় ও, শরীর। অশরীরীদের কুলুজিতে একটা গাছ থেকে আর একটার ব্যবধান পূরণ করতে দেরী লাগে না একটুও। চোখের পলক পড়ার আগেই কার্য সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে হামাগুড়ি দিয়ে পূরণ করতে হচ্ছে। এ ছায়ামূর্তি নির্ঘাৎ মানুষ। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মিশে কালো বিভৎস দর্শন মানুষটা শেষ গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এরপর আর গাছ নেই খানিক দূর পর্যন্ত। হয়তো মাথায় নতুন কিছু মতলব আঁটছে বলেই তার চলার পথে অনুসরণ করছে না আর।

করবে না যে এমন কোন কথা নেই। হঠাৎ ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে তার ওপর। পড়লে সেও ছেড়ে কথা কইবে না যত শক্তিই ধরুক না কেন লোকটা, মস্ত সুবিধে—একা। ওকে ঘায়েল করতে অসুবিধে হবে না কোন। ঠাকুর্দার রক্ত বয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং-এর ধমনীতে শিরা-উপ-

শিরায়। জঙ্গলে বাঘের খপ্পরে একা পড়ে গেছল একবার ঠাকুর্দা। তার মতো সঙ্গীরাও পালিয়ে গেছল ওকে ছেড়েও। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়বার মুখেই ধারালো টাঙি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ঠাকুর্দা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুর্দার হাতেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়েছিল বাঘটার।

যাকে দেখল, সে এদেশের নয়। রঙে চেহারায়ই মালুম হচ্ছে গুজব—কিছুদিন হল এসেছে এখানে। একজনকে দেখলেও—শুনেছে, আরো নাকি অন্য অন্য লোক আছে এদের দলের চারদিকে ছড়ানো। লোকগুলো বাঘের চেয়েও না কি হিংস্র। দেরী হলে তবুও বাঘকে মারতে পারা যায় ধরতে পারা যায় কিন্তু এদের ব্যাপারে কেউ কিছুই করতে পারছে না। বছর খানেক ধরে ওদের ধরবার জন্য চেষ্টা চলছে দারুণ ভাবে। সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ওরা পথিকের সর্বস্ব লুঠ করে নেয় মওকা বুঝে। কেউ বাধা দিলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এ হেন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ধন-প্রাণ বাঁচবার জন্যই কতকগুলো এলাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব এলাকার ধারে কাছে আসে না কেউ। জিদের বশে এসেছে বলবীর সিং। বাড়ির লোকের কথায় অবিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে ফলতে বসেছে। তার প্রমাণ সাক্ষাৎ যমদূত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছতলায়।

মির্জাই-এর তলায় কোমরের কাছে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে নিল ভালো করে। কোমরে জড়ানো টাকার থলিটা পাক দিয়ে শক্ত করে ঠিক বাঁধা আছে। ডানদিকে ভোজালিটাও ঠিক আছে। ভোজালিটার ওপর হাত রেখে চলছে। এ-পথে এ-সময় এটাই একমাত্র সম্বল।

চোখ কান বুদ্ধি সজাগ রেখেই চলছে বলবীর সিং। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে পিছনে। লোকটা এখনো দাঁড়িয়েই আছে একভাবে। কিন্তু এর মুখটা ঘুরছে ফিরছে তার চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে।

ম্যাগপাই পাখি দুটো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। আচমকা এসে মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিকৃত স্বর পাহাড় বনভূমি কাঁপিয়ে তুলে দু'কানের পরদা ফাটিয়ে দিল যেন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষটা। ছুটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ডানপাশ ফিরতেই বুক টিপ টিপ করে উঠল আরো। প্রথম জনের মতো ওই রকম চেহারায়ই আর একজনও ছুটে আসছে ওদিক থেকে।

বুঝতে আর বাকি রইল না বলবীর সিং-এর– বিকৃত স্বরের চিৎকারটা কিসের ইঙ্গিত। একজন শিকারী আর একজনকে কাছে ডাকল। শিকার ফাঁদে পড়ে গেছে। ফাঁদ থেকে যাতে বেরুতে না পারে—ভালো ভাবে শক্ত করে আটকে ফেলতে হবে ঘিরে ফেলে।

সম্মুখ সময়ে একজনের সঙ্গে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল বলবীর সিং। এখন দেখছে দুজন। আরো আছে কিনা, তাই বা কে জানে। এখানে যদি হারিয়ে যায় বলবীর সিং—কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না কি করে কোন খানে হারাল সে।

জানছি এ মরণফাঁদ থেকে উদ্ধার হবার কোন উপায় নেই আর তার, তবুও খাপ থেকে ভোজালিটা ধার করে নিল তাড়াতাড়ি। টনকপুর বাজারে বাদাম-কমলালেবু বিক্রির টাকার থলিটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার। তাকে শেষ না করে কোমর থেকে খুলে নিতে পারবে না ওরা এটা। জীবন থাকতে সে এটা নিতে দেবেওনা ওদের কিছুতেই। এই টাকা থেকেই তাদের পরিবারের জীবন চলে। এ টাকা মায়ের জীবন, ভাইবোনদের—সবার।

দাঁড়িয়ে পড়ল বলবীর সিং। দৌড়ে পালিয়ে এদের কব্জা থেকে রেহাই পাওয়া যাওয়া যাবে না। আর তাছাড়া কোন পথই পাচ্ছে না। কোন দিকে যাবার। মাথার ভেতর সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের রাস্তার নিশানা ঠিক করতে। একটা চৌকোনা পাথরের ওপর বসল নিজের অগোচরেই।

বসে বসে দেখছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং: লোক দুটো তার কাছ বরাবর এসে থমকে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ইঙ্গিতে কি যেন নীরবে বলল একজন আর একজনকে। তারপর যে ভাবে ওরা এসেছিল সেইভাবেই ছুটতে ছুটতে চলে গেল আবার সেই পথ ধরেই।

দেখছে বলবীর সিং ডাইনে বাঁয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চলে যাচ্ছে ওরা দু'জনে দু'দিকে। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শিকারকে গ্রাসের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে চলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? বলবীর সিং নিজের ডান হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা ভোজালিটার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় বেশ চক চক করছে। এতে ভয় পেয়ে চলে যাবার কারণ নেই ওদের, ওদের দুজনের হাতের ভোজালিও তার লক্ষ্য এড়ায়নি। এর চেয়ে ঢের বেশী বড়। ঢের বেশী চকচকে। হঠাৎ নীচের দিকে নজর পড়তেই

শিউরে উঠল বলবীর সিং। পায়ের তলায় দু'পাশে আর এক মৃত্যু-ফাঁদ—গভীর খাদ। চৌকোনা পাথরটার একটা কোণের সামান্য অংশ পাহাড়ের একটা দিকে ঠেকে আছে মাত্র। বাকি তিন দিক ফাঁকা। শূন্যে ঝুলছে। এই জন্যই শিকার ছেড়ে চলে গেছে শিকারীরা। শিকার ধরতে গিয়ে তাদের নিজেদের হারাবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। দুর্বৃত্ত হলেও নিজেদের প্রাণের মমতা থেকে এক পাও সরতে পারেনি ওরা। অপরের প্রাণ নেওয়া যাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, নিজের প্রাণ দেবার সময় তারাই আবার অতি ভীরু।

এবারে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে বলবীর সিং। এই খাদের ধার দিয়ে দিয়ে এদের খপ্পর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে সে। বেরুতে পারবে নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে খাদ, সেখান দিয়েই চলবে। অতি সন্তর্পণে বসে বসেই পাথরটা থেকে নেমে পড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চলতে শুরু করল আবার।

চলছে তো চলছেই। এবার কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কোন দিক থেকেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ওকে ছেড়েছে দুর্বৃত্তরা তাহলে সত্যিই।

অনেকটা পথ এসে গেছে। ম্যাগপাই পাখি দুটো আবার মাথার ওপর দিয়ে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। দুর্বৃত্তরা ছেড়েছে তাকে কিন্তু এরা তো কিছুতেই ছাড়ছে না। এখানে আসার শুরু থেকেই মাঝে মাঝে এই পাখি দুটো তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে আবির্ভাব হচ্ছে কে জানে। চিৎকার করে যেন একটা মহা বিপদের সঙ্কেতই জানিয়ে যাচ্ছে। এ ধারণাটা এর আগে হয়নি কিন্তু আশ্চর্য, এখন তোলপাড় করছে ভিতরে। একটা আশ্রয় একটা বিশ্বাসী মানুষকে পাবার জন্য বড্ড ছটফট করছে মন। ছুটতে ইচ্ছে করছে খুব। ছুটছে ছুটছে ছুটছে। সামনে কুঁড়েঘর দেখে ধড়ে প্রাণ এল যেন। লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে এবার। আর ভয় নেই।

কুঁড়েঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আধ ভেজানো দরজার পাল্লায় টোকা মেরে আওয়াজ করল। কোন সাড়া পেল না ভেতর থেকে। আস্তে আস্তে ঠেলতে খুলে গেল দরজা। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দক্ষিণ দিকের ভাঙা জানলা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরে কেউ নেই। এটা একটা পোড়ো ঘর। ভেতরে ঢুকল বলবীর সিং। অবসন্ন হয়ে পড়েছে খুব। রাতের মতো নিজেকে লুকিয়ে

রাখবার, মাথা গোঁজবার যে একটা জায়গা পেয়ে গেছে—এটাই মস্ত ভাগ্যের জোর তার।

ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানলার দিকে গিয়ে বসল—একটু বিশ্রাম করবার জন্য। রাতে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বৃথা পথ খুঁজে হয়রান হওয়ার চেয়ে এই আশ্রয়টুকু যথেষ্ট নিরাপদ। সকালে রাস্তা খুঁজে বার করা সহজ হবে।

ঘুমে দু' চোখ ঢুলে আসছে বলবীর সিং-এর। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্য বাদ জানাচ্ছে তাঁর এই করুণার জন্য—আশ্রয় মিলিয়ে দেবার জন্য ঈশ্বরের স্মরণে বাধা পড়ল, ঘুম মাথায় উঠল পিঠে মাথায় গরম নিশ্বাস পড়তে।

পেছন ফিরে তাকাল। জানলার ভাঙা খুপীটায় একটা ছোট্ট মুখ আটকে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে ন'দশ বছরের ছেলের মুখ ওটা। ছেলেটার সর্বশরীর দেখে মনে হয় ও খুব হাঁপাচ্ছে। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে ছাড়ছে। বাইরে থেকে ভাঙা খুপীটায় মুখটায় বলবীর সিংকে এক দৃষ্টে দেখছে। চোখের জল পড়ছে না।

ছেলেটাকে দেখে খুব আনন্দ হল বলবীর সিং-এর। মানুষের মুখ দেখতে চেয়েছিল। প্রকৃত মানুষের মুখ দেখতে পেয়েছে সে। এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবশিশু। চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হাসল ছেলেটি। বলল, তুমি কি ভয় পেয়েছ?

ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না পায়নি।

হেসে উঠল জোরে ছেলেটি, তোমার সঙ্গে আছে কেউ?

আবারো ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না কেউ নেই।

আমি কি তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি?

কচি গলায় ভরসা দেওয়ার কথা শুনে ছেলেটাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভেবে বসল বলবীর সিং। তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন স্বয়ং।

নিজের বিপদের কথা জানাল বলবীর সিং ছেলেটিকে। অনুরোধ করল তাকে উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ছেলেটি এদিক ওদিক তাকাল। কি যেন দেখল, কি দেখে হাসল। তারপর হাসিমুখেই ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। লোক নিয়ে এসে নিয়ে যাচ্ছি তোমায়।

দৌড়ে চলে গেল ছেলেটি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে দু'জন লোক। যারা এল, তাদের দেখে কাঁপুনি শুরু হল ভেতরে। এরা বলবীর সিং-এর অজানা অচেনা নয়। ভেবেছিল,

ওরা পালিয়ে গেছে, তাকে ছেড়েছে। তাদের ধারণা ভুল। পালানোটা ওদের মস্ত কৌশল। শিকারের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজেদের কঠিন ফাঁদে আটকে ফেলা।

এবার এদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু তার। বাঁচবার কোন আশা নেই। সব দিক দিয়েই নিরুপায় সে। বাচ্চাটা দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে। দেবশিশুর মুখোশ পরা সাক্ষাৎ দানব ও। মানুষ শিকারী দুটোর মতো ওরও হাতের ভোজালিটা তাক করা রয়েছে তার দিকে। ওদের চর বাচ্চাটা এখন দিনের অলোর মতো সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে। পোড়ো ঘরটায় আসবার আগে অবধি এতখানি পথ নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে অনুকরণ করে চলেছিল দুর্বৃত্তরা তাকে।

অনেককে এই ভাবেই সকলের অগোচরে গুম খুন করেছে ওরা। এদের একজনকেও শেষ করে মরতে পারে যদি সে, তাহলে তার অনেক পুন্যি। মরেও শান্তি।

যে রকম তৈরি ওরা, সামনা সামনি আক্রমণ প্রতিরোধ খুব মুশকিল। ভোজালিটা বার করেই ওদের সামনে থেকে কোণের দিকে সরে গেল।

মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝতে পারল না। বোঝবার আগেই সব কিছু ঘটে গেল।

কোণটায় সরে যাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। পায়ের তলার নরম মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠে সজোরে ওপর দিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল মেঝেয়।

বলবীর সিং-এর পড়ে যাওয়ার সুযোগ নিতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদের একজন। ভোজালি উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়বে। পড়া হল না। আর্তনাদ করে নিজেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বলবীর সিং-এর সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে। হাত পা দেহের কোন অঙ্গই নড়ছে না। চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না। চোখের পলক পড়ছে না। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছে।

মেঝেয় পা রাখেনি সে। রেখেছিল বিষাক্ত পাহাড়ী হ্যামাড্রায়াড সাপের দেহের ওপর। সাপটার সুখ নিদ্রা ভেঙে যেতে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠেছিল। বিরাট লম্বা সাপটা ভীষণ হয়ে উঠেছিল। অসংখ্য নিশ্বাসের গর্জন গর্জেছিল। সবার মতো ফণা বিস্তার করে, চেরা লকলকে লাল জিভ বার করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল মানুষ প্রমাণ। বলবীর সিংকে মরণ ছোবল মারবার

মুখে মানুষ শিকারীর প্রথম জন সামনে এসে পড়ায় বিষাক্ত ছোবল বসিয়ে দিয়েছিল ওর পিঠেই।

দ্বিতীয় জন আর বাকীটা প্রাণভয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছল বলবীর সিংকে ছেড়ে। বলবীর সিংকে ওরা ছাড়লেও হ্যামাড্রায়াড ওদের পিছু ছাড়ল না। বিদ্যুত গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু।

এরপর আর কিছু জানে না সে। কিভাবে রাত কেটেছে—ঘুমিয়ে না একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়—তার কিছুই মনে নেই একেবারে।

ভোরের আলো যখন চোখে এসে পড়ল, তখন সচেতন হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাতের বিভীষিকা। মনে পড়ল এক এক করে সব। শিউরে উঠল সর্বশরীর সামনেই দুবৃত্তটার মৃতদেহ দেখে। ওর সারা অঙ্গ নীলে নীল হয়ে গেছে।

উদয় সূর্যের আলো লেগে যেন দেহমন স্নায়ু সতেজ সবল হয়ে হয়ে উঠল আবার বলবীর সিং-এর। উঠে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে ঘর থেকে। ফিরে যাবে বাবা-মার কাছে আবার। কুমায়ুন রেজিমেণ্টের অবসর-প্রাপ্ত হাবিলদার বলবীর সিং-এর মুখে তার নিজের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে নতুন করে উপস্থিত হল আর একটা।

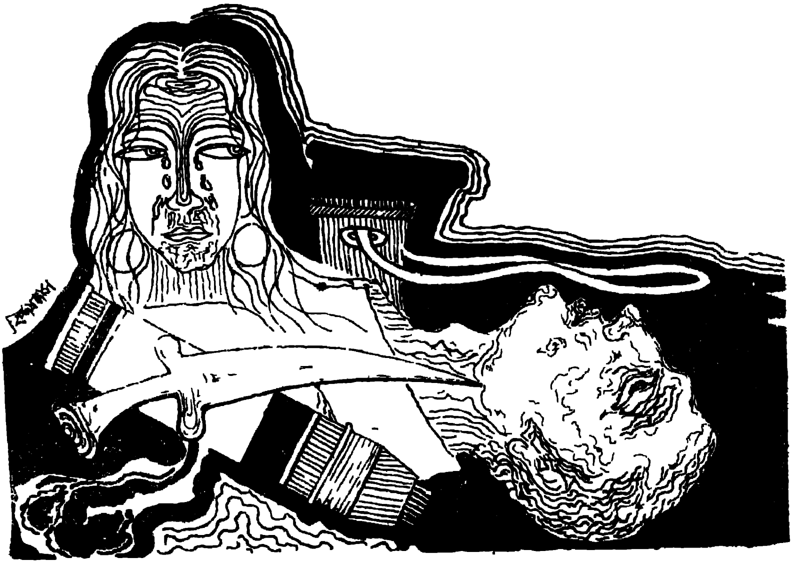
গায়ের মির্জাইটা খুলে ফেলে বলবীর সিং দেখাল। জানাল, আঠারো বছর বয়েসের জীবন তার যেন বিস্ময়কর—অক্ষত দেহে বেঁচেছে, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে যেখানে তার দলের একজনও ফেরেনি—সেখানে আশ্চর্যভাবে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে সে।

---

* শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীর সংকলনে লেখাটি দিলুম। বাস্তবের গোয়েন্দা কাহিনী থেকেও রোমাঞ্চকর অদৃশ্য লোকের কোন এক অজানা শক্তির গোয়েন্দা'র কথা বলা হয়েছে এ কাহিনীতে। ঘটনাটি সত্যি।

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী॥ আজকের বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের পটভূমিকায় যে সমস্ত লেখক অভিনবত্ব ও অনন্যতা এনেছেন তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী মশাই তাঁদের অন্যতম।

তন্ত্রসাধনার সাথে রহস্য ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে লেখকের অপার কৌতূহল ও কুশলতা আমাদের সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে গল্পের জাল বুনে ঘনীভূত রহস্যের ক্রম অগ্রগমন তাঁকে বহুল পঠিত লেখকদের অন্যতম করেছে। তিনি ভ্রমণ করেছেন পর্ব্বত, কন্দর, গুহা ও হিমালয়ের পরপারের বহুস্থান, বহু নিভৃত প্রকৃতির নিরব প্রান্তর যেখানে মানুষ আমাদের সভ্য ও আধুনিক জীবনের জটিলতা হতে অনেক দূরে হয়ত আরও জটিলতর কোন রহস্যাবৃত জীবনের সাধনায় নিরত।



একটি সূত্র

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শুধু একটি পাতা, চায়ের পাতা। ছোট্ট ভাঙ্গা কাঠির একটা টুকরো।

কিন্তু তার প্রতাপ অসীম। ছাঁকনি থাকুক বা নাই থাকুক, কখন কোন্ ছিদ্রপথে চায়ের পেয়ালায় এসে পড়ে এবং ঘুরপাক খায়, তা বলা যায় না। চামচ দিয়ে চিনিটা স্ট্যার করতে গেলেই যত গণ্ডগোল। চামচের মাথাটা বাগিয়ে ধরে অতি সন্তর্পণে তুলে ফেলার চেষ্টা করে দেখবেন, ব্যাপারটা কি রকম ঘোরালো হয়ে ওঠে। কখনও তলিকারে ডুব দিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে। কখনও বা থিতিয়ে গেলে, চকিতে দেখা দেয়। ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে, কিন্তু ধরা দেয় না। চা হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিরীহ চেহারার ঐ ক্ষুদে শয়তানকে পাকড়াবার জন্তে রোখ চেপে যায় এবং

যতক্ষণ না পলাতক ইঙ্গিতটিকে বাস্তবে ধরা যায়, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

তাই বলছিলুম—মাত্র একটি ভিজে অল্প-ফোলা পাতার টুকরো। কিন্তু দুনিয়ার দুর্ভাবনা ভয় কার তারই ওপর। কাঠির মতন চেহারা। চায়ে-দুধে ডুবে আর ভেসে-ভেসে রংটা ফিকে হয়ে এসেছে। যেন ক্ষীণদেহ মানুষের বিবর্ণ আকৃতি। অনেকদিনের পুরানো অসুখ এবং শেষ পর্যন্ত মারাত্মক। চায়ের পাতার মতো চোখের পাতা, একটু ফোলা-ফোলা। অনেকটা যেন তার বাবার মুখ, ঈষৎ স্ফীত চোখের কোল। তীক্ষ্ণ মন, সজাগ দৃষ্টি আর অসহিষ্ণু মেজাজ, ক্রনিক রোগীর যা হয়ে থাকে। টান-টান চেহারা, স্নায়ু শিরাগুলো চড়া তারে বাঁধা। মানুষটি যা নাকানি-চোবানি খাইয়াছেন এবং এখনও খাওয়াচ্ছেন, শিবানী ভাবে।

কী প্রচণ্ড তার দায়িত্ব, এই জটিল সমস্যার সমাধান! তিনি মারা গেছেন, কিন্তু মৃত্যুর জের মেটেনি। গত একমাস ধরে শিবানী কত ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে। রাতে ঘুম নেই অর্ধেক দিন, কিন্তু হদিস মেলেনি। ঝোপের আশে-পাশে হারানো জিনিসের কানাচে সে ঘুরে মরছে। কিন্তু জিনিসটি করায়ত্ত হচ্ছে না। টুনুর বাড়ী থেকে ফেরবার পথে এই কথাই ভাবছিল শিবানী। ভেবে কূল পায় না। বাবা গেছেন তিন মাস হল। কিন্তু শেষ তিরিশ দিনের মধ্যে সে একবারও বাড়ী ছেড়ে বেরোয়নি। আজ নিতান্তই টুনুর উপরোধে পড়ে বাড়ীর বাইরে খোলা রাস্তায় জনতার মুখ দেখল।

সাদার্ণ অ্যাভেনিউ দিয়ে হাঁটছিল শিবানী। ক্ষান্তবর্ষণ ভাদ্রের আকাশ। সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু কি আশ্চর্য রঙ ঢেলে দিয়ে গেছে। দিগন্তে মেঘের পাড়, তাতে কে যেন প্যাস্টেল শেডগুলো পরতে-পরতে মাখিয়ে গেছে। শিবানী চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখ জুড়িয়ে যায়, জড়িয়ে যায় ঘুমের আমেজে ঝির-ঝিরে ভিজে হাওয়ায়। কিন্তু মন জুড়োয় না! টুনু ঠিকই বলে—'ভেবে-ভেবে মাথা খারাপ করিসনি। কত হোমরা-চোমরা হিমসিম খেয়ে গেল, তুই আর করবি কি? ধরে নে, তোর অনুমানটা ঠিক হল। কিন্তু সেটা কি সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেবে কেউ? বলবে—প্রমাণ কি ও কোথায়? আর প্রমাণ তুই জোগাড় করবি কোত্থেকে—যেখানে সব চিহ্ন উধাও?'

শিবানী তো তাই খুঁজছে, এক মাস ধরে। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট আসবার পর সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কি করে হয়। তার বাবাকে হত্যা করল কে? শেষ পর্যন্ত শিবপদকেই পুলিশ সন্দেহ করেছে এবং

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে প্রথমে কয়দিন নজরবন্দী রেখেছে। নানা ভাবে সওয়াল করে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। এখন শিবপদ হাজতে। করোনারের কোর্টে শুনানী শেষ হলে রায় বেরিয়েছে—অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকায় মৃত ব্যক্তির জীবন নাশ, অর্থাৎ সরাসরি খুন! এখন দায়রায় সোপর্দ শিবপদ বিচারাধীন। আদালতে মামলার কয়েকটা তারিখও হয়ে গেছে। দু-একদিন শিবানীকে যেতে হয়েছে, তার জবানবন্দী দিতে। তবে সওয়ালে তাকে বিশেষ বেগ দেওয়া হয়নি।

শিবানী যতদূর জানে, শিবপদ খুনী নয়। ধীরেসুস্থে আঁটঘাট বেঁধে মানুষ খুন করার মতো সে মানুষ নয়। শক্তিপদ বাবুর সঙ্গে তার সদভাব ছিল না, এ কথা সত্যি। বনিবনা হত না নানা কারণে। একাধিক বিষয় নিয়ে তাদের মতান্তর ঘটেছে,—রাজনীতি, অর্থনীতি, সঙ্গীত এবং ফুটবল-ক্রিকেট, কোনো ব্যাপারেই উভয়ের মধ্যে মতের মিল ছিল না। বহুদিন প্রচণ্ড তর্ক হয়েছে। শক্তিপদ বাবু ছেলেমানুষের মতন চেঁচামেচি করেছেন, অকারণ উত্তেজিত হয়েছেন এবং কখনও কখনও কড়া কথা বলতেও ছাড়েন নি। শিবপদর মেজাজটাও মোটেই সুবিধের নয়। তবে চট্ করে চটে উঠতে যেমন, খপ করে নিভে যেতেও তেমনি। ওর স্বভাবটা হল খড়ের আগুন। দপ করে জ্বলে ওঠে, আবার ভস্ করে থেমে যায়। ধোঁয়া কিছুক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু নরম হয়ে ঝিমিয়ে গেলেই সব পরিষ্কার।

শক্তিপদবাবুর স্বভাব অন্যরকম। তিনি রাগেন, রাগ পুষেও রাখেন। কিছু জটিল চরিত্র, অসুখে ভুগে ভুগে কমপ্লেক্স সৃষ্টি হয়েছে। মনটা নিরুদ্ধ বক্রগতি, দেহ ক্লিষ্ট, দৃষ্টি তির্যক্। অসন্তোষ বিরক্তির গোপনে লালিত হতে থাকে। মিলোতে দেন না, এটেই হল বিলাস। বিপত্নীক এক সন্তান মানুষ, শিবানীকে ভালোবাসেন প্রচণ্ড! কিন্তু সেই পিতৃ-স্নেহে অধিকার বোধের খাদ মেশানো। খুব অপদস্থ হলে, হিংসার পাল্টা জবাব দেবার মতো তীক্ষ্ণতা আছে তাঁর মগজে। শিবপদরও মর্যাদাবোধ প্রবল বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। তবে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি নেই, অন্ততঃ, তাই মনে হয়।

ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল শিবপদর প্রস্তাবে। বিয়ে করতে চায় সে শিবানীকে। শিবানীর চরিত্রে দুটি গুণ তাকে আকর্ষণ করে—একটি হল ওজন-জ্ঞান আর একটি হল রোমান্টিক উচ্ছ্বাস বর্জিত দৃষ্টিভঙ্গী। তার চেহারায় পুরুষের মন-ভোলানো রূপ নেই, আছে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য। এক

কথায় যাদুর চেয়ে লাবণ্যটাই বেশি। মনটা একটু গম্ভ ঘেঁষা। স্বল্পসংখ্যক বন্ধুরা তাই বলে থাকে—শিবানীর লজিক আছে, ম্যাজিক নেই। পুরুষরা তার সঙ্গে তর্ক করে আলোচনা করে তৃপ্তি পায়। কথা বলার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করে, কিন্তু ওর স্থির দৃষ্টির সামনে প্রেমে পড়তে ভরসাই পায় না। শিবপদর কাছে এইটেই হল প্রধান গুণ। শিবানীর ঠাণ্ডা মাথা, সুনির্দিষ্ট বাহুল্যহীন ভাষা এবং যুক্তিনিষ্ঠ মন তার নিজের স্বভাবের সঙ্গে মিল খাবে। যেখানটায় গরমিল—তা হচ্ছে মেজাজে। কিন্তু শিবপদ মনে করে এবং আশা রাখে, ঐখানেই শিবানী তার ব্যালাস্ট-এর কাজ করবে। যথা সময়ে যথাস্থানে, চাপ দিয়ে কিংবা হাল্কা হয়ে, শিবপদর টাল-খাওয়া টেম্প্যারের ভারসাম্য বজায় রাখবে।

গোলপার্ক এসে গেল। এবার বাঁ-দিকে বাঁক নিলেই একটি নির্জন রাস্তায় তাদের বাড়ী। পরিচিত কালো ফটক—গ্রিলে এস্ হরফটা উজ্জ্বল অ্যালুমিনিয়াম পেণ্টে ঝক ঝক করছে। ট্যাণ্ডেম প্লট—তাই গেট খুলে বেশ খানিকটা যেতে হয় ভেতর দিকে। শিবানী ড্রয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল। শক্তিপদবাবুর সখের বাড়ী—ছোট-খাটো, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাগানটি লতায় ও ফুলগাছের সুবিন্যাসে সত্যিই মনোহর। চার-পাঁচটি ঘর মাত্র, কিন্তু প্রত্যেকটি প্রশস্ত। দরজা জানলা বড়-বড়, আলো-হাওয়ার অভাব কোনোকালে হবে না। পুব আর দক্ষিণ খোলা। নিরিবিলি বাড়ী, পিছন দিকে উঁচু পাঁচিল। এবং তারই সংলগ্ন তিন দেয়ালের একটি টানা হলঘর। ওপরে মোটা টালির ছাউনি। এটি শক্তিপদবাবুর লেবরেটরি। এইখানেই তাঁর অবসর-সময় কাটত। বড় এক কোম্পানির বায়ো-কেমিস্ট ছিলেন তিনি। সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তারপর শরীরটা হঠাৎ ভাঙতে শুরু করল। মাস ছয়েক ভোগার পর শক্তিপদবাবু একেবারে অপটু হবার আগেই কাজে ইস্তফা দিলেন এবং বাড়ীতে বসে ঐ নিজস্ব ঘরটিতে নানা টুকিটাকি কাজ করতেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেন।

শিবানী কতদিন আপত্তি করেছে, বলেছে,—'তোমার শরীরটা কি হচ্ছে, মুখের চেহারা একবার দেখো আরশিতে! বয়সের আগে বুড়িয়ে গিয়ে লাভ আছে? তা ছাড়া, পেটে ও বুকের দিকে প্রায়ই পেন্ হয় বলো। অথচ ঘাড় নীচু করে হেঁট হয়ে একটানা কাজ করা কি তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ঐ একই ঘরে আবদ্ধ থেকে?'

শক্তিপদ জবাব দেন না, দিয়ে লাভ নেই। মেয়ের যুক্তি-বিচারের কাছে তিনি কখনোই পেরে ওঠেন না। মুখটা একটু বিকৃত করে, যেন উঠন্তি ব্যথাকে মনের জোরে দাবিয়ে রেখে বলেন, 'নাঃ আর কুলোবে না। কোনও লাভ নেই থেকে…'

শিবানী একটু থমকে থেকে জিজ্ঞাসা করে '—মানে?'

শক্তিপদ জবাব এড়িয়ে যান। বলেন, 'বাজে বকিসনি… ..তোর আর কিছু কাজ নেই?'

একদিক থেকে শক্তিপদ নির্লিপ্ত। ঘরোয়া বন্দোবস্তে, সংসার-চালনায়, টাকাকড়ির হিসাবে, মেয়ের পড়াশুনো ঘোরাফেরা প্রভৃতি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেন না। তবে গত ছয় মাসে তাঁর স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা অসম্ভব বেড়েছে, বদমেজাজ আরও বদ হয়েছে। মুখে সর্বক্ষণ একটা ক্লিষ্ট তিক্ততা ও বিরক্তির ছাপ এবং সেটা ক্রমশঃই গভীর হয়ে উঠছে। শিবপদর সঙ্গে যেদিন বচসা থেকে খোলাখুলি ঝগড়া হয়ে গেল এবং পরস্পর কটু-কাটব্যের মধ্যে দিয়ে একটা বিশ্রী ব্যাপারে পরিণত হল, তারপর থেকেই শক্তিপদর শরীর আরও শীর্ণ হতে লাগল।

শিবপদ খুব ধীর গলায় এবং যথাসাধ্য সম্ভ্রম রক্ষা করে শিবানীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল। কিন্তু কি যে কদর্য ব্যাপারে পরিণত হল, তা বলবার নয়। তর্কাতর্কি চেঁচামেচি, শেষকালটা গালিগালাজ। মতের মিল কোনদিনই ছিল না, কিন্তু একটু দূরত্ব রেখে মৌখিক ভদ্রতা অন্ততঃ বজায় ছিল। এখন আর সেটুকুরও বালাই রইল না। বাদবিতণ্ডার শেষে শক্তিপদ বারুদের মতো হটাৎ ফেটে পড়ে শুধু বললেন,—'বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! ড্যার্টি সোয়াইন, এতবড় আস্পর্ধা—দেখে নেবো তোমায়, এই বলে রাখছি আমি· · ·'

শিবপদ মেজাজে হঠবার পাত্র নয়। জবাব দিল সমান উঁচু গলায়, 'ছোট লোকের মতো মুখ······বুড়ো শকুন কোথাকার! ওল্ড টাইরেণ্ট–এবার মরে গেলেই তো পারেন।' শক্তিপদ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, 'তা—তা পারি বটে।'

এবংবিধ মিষ্ট সম্ভাষণের পর ভাবী শ্বশুর-জামাতার মধ্যে কি রকম সম্পর্ক থাকতে পারে, তা বোঝা শক্ত নয়। শিবানী বাপের দোষগুণ সবই জানত। এ ক্ষেত্রে প্রথম অভদ্র আক্রমণ শক্তিপদর তরফ থেকে, এ কথা জেনে ও বুঝেও শিবপদর ধৈর্যচ্যুতি ও প্রত্যুত্তরকে সে ঠিক ক্ষমা করতে পারল না।

শিবপদ যখন বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ী থেকে, পিছন থেকে শিবানীর মুখ দিয়ে বেরুল একটি স্থির ওজন করা উক্তি—'আপনি এ বাড়ীতে কখনও আসবেন না।'

শিবপদ একটু হকচকিয়ে গেল। বোধহয়, ঠিক এই জিনিসটা প্রত্যাশা করেনি। তবু ঘুরে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল—শেষ কথা......?'

'হ্যাঁ—তা ছাড়া আর কি হতে পারে?' বলেই শিবানী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু অনেক কিছুই হতে বাকী ছিল এবং শেষ কথারও শেষ নেই। এই ঝগড়া-ঝাঁটির পর, বাপ-মেয়ে দুজনের মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের আড়াল নেমে এল। পরস্পর নিজেকে ঠিক দোষী মনে না করলেও কেমন যেন একটা দূর-দূর অস্বস্তির ভাব। শক্তিপদ ভাবছেন, শিবানী ভেতরে ভেতরে বোধহয় শিবপদকেই সমর্থন করে, যদিও বাইরে তার ভাবান্তর নেই। আর শিবানী ......? কি যে ঠিক ভাবে, তা বোঝা যায় না। শিবপদর অপরাধ কার কাছে এবং কতখানি, হয়তো তার বোঝাপড়া করে মনে-মনে।

তবে ইদানিং সে লক্ষ্য করছে, বাবার শরীরটা হুড়হুড় করে ভাঙছে। কি যে অসুখ, ডাক্তারে বলেন না। অথচ ব্যথা আর ঘুমের ওষুধ ছাড়া আর কিছু দেন না, দিতেও চান না। শিবানী আড়ালে তাঁকে জেরা করেছে, কিন্তু ডায়েগনোসিস আদায় করতে পারে নি। মোটামুটি শক্তিপদর রুটিন বদলায় নি। ঘুম থেকে উঠতে যা দেরী হচ্ছে আজকাল। দিনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পালা কিছু বেড়েছে। সন্ধ্যায় লন-এ খানিকক্ষণ সময় কাটে। চা-সিগারেট গত দু-তিন মাস মুখে করেন নি। আর রাতে সামান্য কিছু খেয়ে ইজিচেয়ারে বুকের কাছটায় হাত দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকেন। ব্যথার কথা; শারীরিক যন্ত্রণা ও অস্বস্তির কথা বলেন না। তারপর টেনে-টেনে যে ভাবে বিছানায় শুতে যান, তাতে মনে হয় পা দুটো তার নিজের নয়। শিবানীর কেমন যেন ভয়-ভয় করে আজকাল......

শুধু একটা বিষয়ে শক্তিবাবু খুব দৃঢ়। প্রতি বুধবার বিকেলে তাঁর চৌরঙ্গী অঞ্চলে যাওয়া চাই। সেখানে এক ক্লিনিকে স্টীমবাথ নেওয়া তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। ডাক্তারে বলেছিল, রিউম্যাটয়েড আরথ্রাইটিস্ বড় কষ্টকর ব্যাধি। ইনজেকশনে সাময়িক উপশম হতে পারে, কিন্তু ম্যাসাজ ও

টার্কিশ বাথ নিয়মিত নিলে স্থায়ী উপকারের আশা আছে। শক্তিপদবাবুর পেশা গেছে অবসর নেবার পর থেকে। কিন্তু নেশা ঠিক আছে ঐ দুটো। ল্যাবরেটরি আর টার্কিশ বাথ। ইদানিং শিবপদকেও দীক্ষিত করেছিলেন। দুজনে একই দিনে ক্লিনিকে যেতেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মেজাজে ফিরে আসতেন শক্তিপদ। ম্যাসাজে ও উত্তপ্ত বাষ্প-স্নানে যখন গলগল করে ঘাম বেরিয়ে যায়, তখন বোধ হয় মেজাজ কিছু ঠাণ্ডা হয়, একবার হেসে বলেছিলেন শিবপদকে।

কিন্তু ঐ বিশ্রী সিন-এর পর শক্তিপদবাবুর সঙ্গে শিবপদর যখন বাক্যালাপ বন্ধ, তখন পরস্পর দেখা হলে কে কি করে জানতে একটু কৌতূহল হয় শিবানীর। কারণ, মুখ দেখাদেখি একেবারে বন্ধ হবার নয়। শক্তিপদবাবু যতই গোপন স্বভাবের লোক হোন, শিবপদর গোঁ আছে যথেষ্ট। ভয়ে বা বিরক্তিতে নিজের কোট ছাড়বার পাত্র নয় সে। ড্রাইভারের কাছে শুনেছিল ক্লিনিকে প্রতি বুধবারই যাচ্ছে শিবপদ। এবং শিবানী বেশ অনুমান করতে পারে, হঠাৎ মুখোমুখি হলে শক্তিপদবাবু কিভাবে চাপা গর্জন করে সরাসরি পিঠ দেখান আর শিবপদ অবজ্ঞাভরে নাক উঁচিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই ভাবেই চলছিল মাস খানেকের ওপর।

সেদিন সন্ধ্যার পর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল দেখে শিবানী বাবার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। টেলিফোন করল বার দুই, কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। তৃতীয়বার কে যেন ফোন ধরল, কিন্তু ওপাশ থেকে একটা ব্যস্ততা ও আওয়াজের মধ্যে সে যে কি বলল বা বলতে চাইল, তা বোঝা গেল না। শিবানী এইটুকু বুঝল তার অবিলম্বে যাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে কি একটা বলে বাইরে এসে দেখে, কোথাও ট্যাক্সির দেখা নেই। অতঃপর পদব্রজে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত এসে বাস-ই ধরল। প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে ক্লিনিকে পৌঁছে দেখল লাল পাগড়ি আর দুজন সার্জেন্ট ভিড় সরাচ্ছে। শিবানী নিজের পরিচয় ও প্রয়োজন বলতেই একজন সার্জেন্ট তাকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে বসাল। কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকলেন।

তারপর······কি রকম যেন ঝাপসা হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ। কানের মধ্যে একটা ক্ষীণ শব্দ ক্রমে তীব্র হতে লাগল আর সারা গায়ে চিন্‌চিনে জ্বালা। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আর ডাক্তারের কথা, দুটোই যেন দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে চলেছে, থামবার কোন লক্ষণ নেই। বেশ খানিকটা সময়

লেগেছিল শিবানীর ধাতস্থ হতে। চৈতন্য হারাবার মতন মেয়ে সে নয়, শুধু অবশ স্নায়ুর দুর্বলতা কাটিয়ে এই অবস্থা বুঝে নিতে এবং পুলিশের কয়েকটা প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে বেশ সময় লেগেছিল। দেহ যেমন চেম্বারে চেয়ারের ওপর এলানো অবস্থায় ছিল, তেমনিই রইল। দরজা একপাট খোলা। পুলিশ যখন শিবানীকে বাইরে নিয়ে আসছিল তখন একবার চকিত দৃষ্টি পড়েছিল বাবার মুখের দিকে। ঘাড় পিছনের দিকে একটু হেলে আছে, মুখ ঈষৎ উঁচু দিকে। নাঃ—মুখে একটুও বিকৃতি নেই। মানুষটা যেন শিথিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ডান পা টান করে সামনে বাড়ানো……

এরপর বাড়ীতে একলা থাকাই সমস্যা। কিন্তু শক্তিপদবাবু থাকতেও শিবানীর আপন মনে একলা থাকা অভ্যাস ছিল না। দুজনেরই স্বভাবটা চুপচাপ। তবে এই ঘটনার পর টুনু কারুর মানা শুনল না। সাত-আট দিন এসে রইল শিবানীর কাছে। টুনু শিবানীর স্কুলের বন্ধু, কাজেই শিবানীর চালচলন পছন্দ-অপছন্দ কিছুই তার অজানা নয়। তা ছাড়া শিবানী টুনুকে পেয়ে অনেকখানি শান্তি পেল। একে তো হত্যাকাণ্ড এবং আনুষঙ্গিক ময়না তদন্তের ঝামেলা। তার ওপর রিপোর্ট নিয়ে ডিটেকটিভ পুলিশের আনাগোনা বারে বারেই একই ধরনের প্রশ্ন, শিবপদর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা রকমের সওয়াল, মামলায় তার সাক্ষ্য সম্বন্ধে আগামী নির্দেশ—এ সবের বিরাম ছিল না একটি দিনের জন্য। টুনুর উপস্থিতি এ দিক থেকে খুবই সাহায্য করেছিল, অনেক ভার সে সামলে নিত রাত্রে একঘরে শুয়ে দু'জনে মাঝে মাঝে শক্তিপদবাবুর এ হেন শোচনীয় পরিণাম নিয়ে জল্পনা করেছে। কিন্তু কেউই রহস্যের কিনারা করতে পারেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে, শিবপদ কি করে ছুরি মারল, আর সে ছুরি গেল কোথায়?

পুলিশের অবশ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডিটেকটিভ উপন্যাসে যে ধরনের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ পড়া যায় আর আসামী ছাড়া সকলকেই সন্দেহের আওতায় এনে শেষ পর্যন্ত এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌঁছে প্রকৃত অপরাধীকে কোণঠাসা করা হয়, এখানে সেরকম কোনো মির‍্যাকল ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। শক্তিপদবাবুর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে পুলিশের তরফে কোনো সংশয় থাকবার কথা নয়। ব্যাপারটা এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ ক্লিনিকের লোকদের জবানবন্দী এত স্পষ্ট ও ত্রুটিহীন যে শিবপদর অপরাধ স্খালনের কোন প্রশ্নই

উঠতে পারে না। যে দিক দিয়েই দেখা যাক। সমস্তই ইঙ্গিত শিবপদকেই জড়িত করছে।

প্রথম কথা, সেই বুধবার দুজনেই ক্লিনিকে এসেছিলেন বারান্দায় উঠে সামনেই ওয়েটিং-রুম—সেখানে দুজনের অবাঞ্ছিত মুখ দেখাদেখি হয়েছিল। পরস্পর দুদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন, সেটা দু-একজন ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন। তিন নম্বর কামরায় শক্তিপদবাবুর ম্যাসাজের জন্য ঢোকেন আর ঠিক উলটো দিকে তেরো নম্বর, মাঝে করিডর। এই তেরো নম্বর কামরায় যখন শিবপদ প্রবেশ করেছিল, তখন হঠাৎ দুজনের উঁচু সুরে কথাবার্তা শোনা যায়। হয়তো দু-এক মিনিটের বাক্যালাপ, কিন্তু সেটা যে অত্যন্ত গরম মেজাজের, দুই কামরার অ্যাটেণ্ডেন্টই তা শুনতে পেয়েছিল। কি নিয়ে অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটল, তা তারা জানে না। উভয়ের মনোমালিন্যের পূর্ব ইতিহাস তাদের জানবার কথাও নয়। শুধু এইটুকু তারা নজর করেছিল— উভয়ের মুখ বিরক্ত ও আরক্ত। আর 'ওল্ড ভিলেন - আপনার দ্বারা সবই সম্ভব……!' এই শেষ কথাগুলো বলে শিবপদ নিজের কামরায় ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেয় ও রাগে ফুঁসতে থাকে।

তিন নম্বরের অ্যাটেণ্ডেন্ট এ সবই সমর্থন করে তেরো নম্বরের লোকটির জবানবন্দীর সঙ্গে বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই; উকীলের জেরায় কেউই টলেনি। তাদের উক্তিতে কোথাও অস্পষ্টতা ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

শক্তিপদবাবুর অ্যাটেণ্ডেন্ট প্রাথমিক তদন্তে এজাহার দেয় এবং পরে সাক্ষী হিসেবে সওয়াল-জবাবে যে সব কথা বলে, সে সবই শিবপদর বিপক্ষে এবং মারাত্মক রকমের। শিবপদর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যখন শক্তিপদ নিজের কামরায় এলেন, তখন তিনি উত্তেজনায় দুর্বল, কারণ, তাঁর হাত-পা কাঁপছিল। ম্যাসাজের সময় সে ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে তাঁর পেশী ও স্নায়ু ক্রমশঃ শিথিল ও ধাতস্থ হয়! আর একটা জিনিসও সে নজর করে, শক্তিপদবাবু তার দু-একটি দরকারী প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি। বরং অন্য-দিনের চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক, হয়তো শিবপদের সঙ্গে বচসার ফলেই এই ভাবান্তর এবং কায়িক ক্লান্তির জন্য আনমনা ভাব। ম্যাসাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন শক্তিপদবাবু আপনমনে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন—'কে কাকে খুন করে, দেখা যাবে!' খুব পরিষ্কার শুনেছে, এ কথা সে হলপ করে বলতে পারে।

এর পর শক্তিপদ আসন ছেড়ে ওঠেন। বাঁ হাতে ফ্লাস্কটা কোণ থেকে

ফ্লাস্ক নিয়ে ধীরে ধীরে কামরা থেকে বেরিয়ে ঠিক পাশেই চার নম্বর মার্কা স্টীম-বাথ নেবার ছোট কক্ষে ঢোকেন। এটি তাঁর বরাবরের অভ্যাস, চার নম্বরের অ্যাটেণ্ডেণ্ট দেখেছে, গা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাম না বেরুলে, শক্তিপদবাবু ফ্লাস্ক খুলে অল্প অল্প চা পান করতেন। সেদিন স্টীম-বাথ শেষ হলে অ্যাটেণ্ডেণ্ট বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ায়। ওদিকে তেরো নম্বর কামরার অ্যাটেণ্ডেণ্ট বলে শিবপদর ম্যাসাজ শেষ হলে সেও কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসে, কারণ তারপর শিবপদর স্টীম-বাথের জন্য গরম কামরায় যাবার পালা। মোটমাট ঐ চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকবে।

এর বেশি তারা কিছু জানে না এবং দেখেও নি। একেবারে গিয়ে দেখল, চারদিকে ব্যস্ততা ছুটোছুটি ও চেঁচামেচি। স্বত্বাধিকারী পুলিশকে ডাকার আয়োজন করছেন, ইত্যবসরে চার নম্বর কামরায় মুখ গলিয়ে দেখে ভয়াবহ দৃশ্য। শক্তিপদবাবু এলিয়ে রয়েছেন চেয়ারে। বুকে রক্তের দাগ, তাজা ও ভিজে রক্তের ধারা নেমে আসছে গা দিয়ে ফ্লাস্কটা পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে। মুখ খোলা। প্লাস্টিকের ছিপিটা একটু দূরে একখানা চেয়ারের পায়ার নীচে, আর ফ্লাস্কের গলার কাছে কয়েকটা শুকনো চায়ের পাতা।

মামলার শুনানীর সময় এসব কথাই সমর্থিত হল। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী দুজন হত্যার দিন ফোনে খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যা যা দেখতে পায়, সব কথা ব্যক্ত করে। যেটি প্রধান 'এক্সহিবিট'—ঐ চায়ের ফ্লাস্ক, আদালতে পেশ করে জুরিদের তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু জুরিদের একটি প্রশ্নের উত্তর ঐ সার্জেণ্টরা কিংবা তদন্তের ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন কর্মচারী কেউই দিতে পারেন নি। হত্যার সময়ে কিংবা অব্যবহিত পরে শিবপদ কোথায় ছিল? একজন অ্যাটেণ্ডেণ্ট বলে, শিবপদর নিজের কামরা তেরো নম্বরের দরজার গোড়ায় ছিল। ক্লিনিকের আর এক দিক ছিল ঘটনা স্থল চার নম্বর ঘর থেকে প্রায় দশ-বারো গজ দূরে, করিডরে শিবপদ দাঁড়িয়েছিল এবং তখন তার মুখের চেহারা খুব উত্তেজিত।

আর যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা—সেটা হল যে, কি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, তার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। তিন নম্বর কামরা তন্নতন্ন করে খোঁজ হয়েছিল। মেঝের জুট কার্পেট তুলে, দেয়ালের গায়ে কাঠের ছোট কাবার্ড খুলে যথেষ্ট সন্ধান করা হয়। শিবপদর কামরায় এবং চার নম্বর স্টীম বাথ-এর কক্ষেও জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে পুলিশের লোক সন্ধানের কোনও ত্রুটি

করেনি। বারান্দায়, সামনের করিডরে, এমনকি বাইরে রাস্তায়, পাশের প্যাসেজেও তাঁতিপাঁতি করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু অস্ত্র নিখোঁজ। এইটাই রহস্য। হায়রায় প্রথম দিনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট দাখিল হলে ডাক্তারকে যথারীতি সওয়াল করা হয়। তিনি তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, তীক্ষ্ণ-মুখ এবং ধারালো কোন অস্ত্র দ্বারাই খুন করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরেই অস্ত্রের আঘাত এবং ক্ষতের গভীরতা যেখানে প্রায় চার ইঞ্চি, তখন নিঃসন্দেহে বলা চলে ফলার বাইরে হাতলের মতো জিনিসটাও লম্বায় অন্ততঃ আরও তিন-চার ইঞ্চি। নইলে হাতের মুঠোয় ধরা যায় না এবং ভালো করে গ্রিপ্ না করলে, দেহের মধ্যে চার ইঞ্চির কাছাকাছি একটি ফলা সজোরে প্রবেশ করানো যেতে পারে না।

প্রথম দিনে আদালতে বসে শিবানী সরকার তরফের সব জবানবন্দী নিবিষ্টমনে শুনে এল। আর এইটেই তার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর রহস্য যে সাইজে এতটা বড় একখানা ধারালো ছুরি রক্তচিহ্ন মেখে একেবারে গায়েব হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে! ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী এবং সাত-আটজন অ্যাটেণ্ডেণ্ট, তার উপর কয়েকজন পেশেণ্ট এবং ওয়েটিং রুমে প্রতীক্ষমান চার পাঁচজন ভদ্রলোক, কেউই পুলিশ এসে পৌঁছানো কাল পর্যন্ত ক্লিনিক ছেড়ে যান নি। কাউকে ছুটে পালাতে কিংবা এমনি সাধারণভাবে বেরিয়ে যেতেও দেখেন নি। শক্তিপদবাবুর অ্যাটেণ্ডেণ্ট মাত্র অল্পক্ষণ ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিল সিগরেট খেতে। আধখানা খেয়েই সে সিগরেট নিভিয়ে ঘরের ভিতর আসে এবং দেখে শক্তিপদবাবুর এই অবস্থা! দেখেই ভয়ে আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে এবং সমস্ত লোক জড় হয়। যেই ঘাতক হোক, ক্লিনিক ছেড়ে তার পালাবার কোন উপায় ছিল না এবং ছুরি বা ঐ জাতীয় কোন অস্ত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলাও সম্ভব ছিল না। খুন হয়েছে শুনেই স্বত্বাধিকারী ক্লিনিকের মেন্ দরজা বন্ধ করে দেন এবং এ সমস্ত ব্যাপার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়। তাহলে আসল প্রমাণ তো নিশ্চিহ্ন!

পুলিশও এই নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বিগ্ন। আদালত জুরির সামনে ভালোভাবে কেস প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ছুরি জাতীয় যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা দেখাতে না পারলে কেস্ দুর্বল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সরকারী উকিলও একটু দ্বিধা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। তবে ভরসার কথা এই যে, পারিপার্শ্বিক সমস্ত তথ্য ও অবস্থা শিবপদকেই দোষী সাব্যস্ত করছে।

দু পক্ষের মনোমালিন্য, দুর্ঘটনার ঠিক আগেই দুজনের মধ্যে তীব্র ঝগড়া, শিবপদর উত্তেজনা, শক্তিপদবাবুর শেষ উক্তি—'কে কাকে খুন করে, দেখা যাবে' ইত্যাদি সব জিনিস একত্র বিবেচনা করে দেখলে শিবপদর অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। যে কয়দিন মামলা চলেছে, তার মধ্যে জুরিদের হাবভাব দেখে, তাঁদের প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে যে, তাঁরাও আসামী সম্বন্ধে অনেকটা একমত। যেখানে মারণ-অস্ত্র আবিষ্কার, আসামীকে খুন করতে দেখা কিংবা ঐ কামরা থেকে বেরুতে দেখা, এইরকম আইনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব, সেখানে সমবেত পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অবস্থা থেকেও দোষ প্রমাণ করা চলে। অবশ্য এই পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা তথ্যের মধ্যে এমন কোনও খুঁত বা গলদ থাকা চলবে না। তাহলে কেস ফেঁসে যাবে। জজ ও জুরি, উভয়ের কাছেই অপরাধ সন্দেহের ঊর্ধ্বে, ন্যায্য ও সিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হওয়া দরকার।

শিবানীর মনেও এ প্রশ্ন একাধিকবার উঠেছে। শিবপদকে কি নিঃসংশয় রূপে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায়? তার মনে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে এ সম্বন্ধে। অপক্ষপাত দৃষ্টি দিয়েই সে বিচার করে দেখেছে এবং এখনও দেখছে। 'রীজনেব্‌ল ডাউট' কিন্তু থেকে যাচ্ছে—দুটি কারণে। শিবপদকে কেউ তার বাবার কামরায় ঢুকতে দেখে নি কিংবা সেখান থেকে বেরুতেও দেখেনি। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রটা গেল কোথায়? এত তাড়াতাড়ি সেটা উধাও হওয়া সম্ভব নয়। এখন সবচেয়ে বড় কথা শিবানীর কাছে,—শিবপদর কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না, এই কথাটা প্রমাণ করা। ছুরি সঙ্গে নিয়ে সে যায়নি, ছুরি বলে কোনো জিনিসই নেই—এইটে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়! কিন্তু কি করে?

খুনের মামলায় কাউকে দোষী প্রমাণ করতে হলে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার, সকলেই জানে। প্রথমতঃ, আসামীর মতলব বা উদ্দেশ্য এস্থলে বলা যায় এবং জেরায় শিবানীর কাছ থেকে তা আদায় করা হয়েছে, যে শিবপদর উদ্দেশ্য ছিল। প্রমাণ—বিয়ের প্রস্তাব এবং তা নাকচ। দ্বিতীয় কথা, সুযোগ। সুযোগ অবশ্যই ছিল, যেহেতু মনোমালিন্যের পর শিবানীদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হলেও, ক্লিনিকে পরস্পরের দেখা হত। পাশাপাশি কামরা, সুতরাং হত্যার সুযোগ অবর্তমান নয়। তৃতীয় কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা হত্যার উপায় এবং তার সন্ধান। এখানে সেইটেরই অভাব। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ও ডাক্তারের জবানবন্দীতে হত্যার উপায়স্বরূপ যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার আকৃতি এবং আঘাতের প্রকৃতি আইনতঃ গ্রাহ্য। কিন্তু অস্ত্রের

কোনো পাত্তা নেই।

শিবপদর বিপক্ষে প্রথম দুটি সর্ত একত্র নিলে যথেষ্ট সাংঘাতিক। কিন্তু তৃতীয় সর্ত…? অবশ্য আইনের তর্কে ও বিচারে অস্ত্রটা পাওয়া যায়নি বলে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা হয়নি, একথা প্রমাণ হয় না। শিবানী পাকা কৌসুলীর মতোই আপনমনে প্রশ্ন তোলে—প্রমাণ হয় না, মেনে নিলুম। কিন্তু তাই বলে কি প্রমাণ হয় যে, বিশেষ একটি ব্যক্তি যাকে আসামী বলা হচ্ছে, এস্থলে শিবপদ, সেই হত্যা করেছে? এক কথায়, একটা নেগেটিভ তথ্যকে পজিটিভ প্রমাণে দাঁড় করানো যায় কি? শিবানী যতটুকু শিবপদকে চেনে, তাতে তার বিশ্বাস, মানুষ খুন শিবপদর পক্ষে সম্ভব নয়।

ভাবতে সঙ্কোচ হয় এবং ভালোও লাগে না—তবে, শক্তিপদবাবুর পক্ষে এ কাজ বরং হয়তো…হয়তো বা কল্পনা করা যায়। কারণ, তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিক, পরিকল্পনা-প্রবণ এবং একটু নির্মম। তাঁর চরিত্র জটিলতর এবং রাগ বা আক্রোশ গোপনে পোষণ করা তাঁর কিছুটা অভ্যাস ছিল। সে যাই হোক, তিনি তো খুন করেন নি, নিজেই খুন হয়েছেন।

ভাবতে ভাবতে, এই জায়গায় এসে শিবানীর মন থমকে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, উঠে দাঁড়াল। কি যেন একটা নতুন চিন্তা তার মনকে পেয়ে বসেছে। পায়চারি করতে লাগল শিবানী অস্থির হয়ে, যে অস্থিরতা তার স্বভাবে নেই। কিন্তু এমন এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়লে, অতিবড় স্টোইক-এরও স্থৈর্য ভেঙ্গে পড়ে। তবু সে প্রাণপণে নিজেকে অবান্তর কথা ও ভাবনা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল। কারণ এখন থেকে শিবানীকে সমস্ত শক্তি ও নিবিষ্ট মন নিয়ে কাজে লাগতে হবে। যে-কোনো উপায়ে, যত কঠিনই হোক, তাকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। নইলে কে করবে? পুলিশ…? তাদের মন তো তৈরী, কেসও তৈরী। যে জাল জড়িয়েছে, তা দুর্ভেদ্য। গ্যালভানাইজড্ তারের মতো শক্ত সে জাল। ছুরি দিয়ে তাকে কেটে ফেলা যাবে না। সেই ছুরি…আর ছুরি! কিন্তু কোথায় গেল সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে? শুদ্ধ ইস্পাতে তৈরী যে ধারালো ফলা বাবার বুকে বিঁধেছিল, তা কি উবে গেল…গলে গেল?

এ হতেই পারে না, শিবানী মনের জোর আনে। তাকে সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলতে হবে, ঝানু ডিটেকটিভের মতো কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যেসব তথ্য মামলায় প্রকাশ পেয়েছে এবং আরও যদি কিছু অজানা থাকে, সব জড় করে ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় বাঁধতে হবে তাদের।

যাচাই করে দেখতে হবে, কোথায় তা দুর্বল, কোথায় ছিদ্র রয়ে গেছে। রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে যে মৃত্যু, তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু কিংবা হত্যা—তার মধ্যে কি শৃঙ্খলা পাওয়া যাবে? এ তো আকস্মিক মরণ।

বাবা যখন মুখ উঁচু করে ফ্লাস্ক খুলে চা খাচ্ছিলেন, সেই সময়ে, ঠিক সেই আশ্চর্য দৈবমুহূর্তে, ছুরি বিঁধল বুকে···। এই হত্যা না হয় সম্ভব হল, যুক্তির খাতিরে। কিন্তু মৃত্যু সম্ভব হলেও, জীবনে কি সম্ভব এই দুর্লভ সুযোগকে আয়ত্ত করে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগানো? অদৃশ্য ঘাতক কি দৈবজ্ঞ যে, চরম সন্ধি-লগ্নে তার নাটকীয় আবির্ভাব এবং বুকে রক্ততিলক লাগিয়ে দিয়ে উপচার-অস্ত্রকে ভোজবাজির মতো উড়িয়ে দিল··? নাঃ—এই হত্যার মামলায় যুক্তির যে লৌহজাল গড়ে উঠেছে বা রচনা করা হয়েছে, তা নিরেট নয়। জোড়াতালির একটা ঝুটো আওয়াজ যেন ধরা পড়ে, কোথায়·· সেই গলদ?

এর পর শিবানী উঠে পড়ে লাগল। আর বেশি সময় নেই, গত মাসে আরও তিন-চার দিন শুনানী হয়ে গেছে। সওয়াল জবাবের পালা প্রায় শেষ। এখন হয়তো একটা বা দুটো দিন মামলার জের চলবে গুটিয়ে নেওয়ার আগে। তারপর জজ জুরিদের কেস বুঝিয়ে দেবেন। জজের ভাব-গতিক বোঝা শক্ত, যেহেতু নিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক দুপক্ষকেই সমান সুবিধাসুযোগ দেন। চরম দণ্ড দেবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মনোভাব ঠিক ধরা যায় না। তবে জুরিকে চার্জ দেবার সময় কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, ঘটনা ও তথ্য একত্র সাজিয়ে পরিবেশন করার ভঙ্গীতে তাঁর যুক্তির ঝুঁকতি কোন্ দিকে, তা অনুমান করা চলে হয়তো। কিন্তু তারও তো আর বিশেষ দেরী নেই।

টুনুর কাছ থেকে ফেরবার পর শিবানীর চিন্তার বিরাম নেই। একমাত্র টুনুকেই সে ইঙ্গিত দিয়েছিল, যে ইঙ্গিত তার মনে উদয় হয়েছে। সেদিন এই কেসের যে একটা নতুন দিক চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল, তার আভাস টুনুকে দিয়েছিল শিবানী। পাছে শিবানীর ভরসা ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সেজন্য নিজের আশা-উৎসাহ চেপে রেখে টুনু অনেকটা দমিয়ে দিয়েছিল শিবানীকে। বলেছিল, তার অনুমান যদি খাঁটিও হয়, প্রমাণ কোথায়? শিবানী কোত্থেকে ঘটনার এতদিন পরে সে প্রমাণ জোগাড় করবে? শিবানী জবাব দেয়নি। কিন্তু বাড়ী ফিরে

আসা অবধি সে ক্ষীণ আশা ছাড়েনি। কি করে সেই পরম প্রয়োজনীয় 'ক্ল্যু' খুঁজে বার করা যায়! যদি প্রমাণ করা যায়, ছুরিটা আদৌ ছিল না কিংবা তার লোপাট হয়ে যাওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল তাহলে শিবপদর সঙ্গে এই হত্যার নাকচ করা যেতে পারে। যদি ঐ যদিটাই হল আসল কথা!

এর পর শিবানীর বেশি সময় কাটতে লাগল শক্তিপদর লেবরেটরিতে। সেখানে বসে নির্জনে ভাবে, এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখে। উঠে এসে নিজের ঘরে ঢোকে, কাগজে কিছু নোট করে। মাঝে দু-একদিন বাড়ীর উকিল শীতলাচরণের কাছে গেল, তারপর বাবারই এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এল। ইনি হলেন শচীকান্তবাবু, একজন নামকরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করে এখন অবসর কাটাচ্ছেন সৌখীন বাগান আর বিজ্ঞান চর্চায়। শিবানীর তৎপরতার যেন অন্ত নেই। সারাদিনই খাটছে, ভাবছে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছে শচীকান্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মামলা ইতিমধ্যে গুটিয়ে এসেছে, সওয়াল-জবাব শেষ। সাক্ষীসাবুদের জেরা মিটে গেছে, উকিলে-উকিলে আইনে নজিরে আর কচকচির পালা চুকেছে।

আগামী সোমবার দায়রার শেষ সিটিং, তার পর জজের বক্তৃতা এবং জুরির শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা। আর তারপরই রায়, এবং সেটা যে শিবপদর সম্পূর্ণ বিপক্ষে সে বিষয়ে জনমত প্রায় নিশ্চিত। আদালতে ভিড় জমে প্রত্যেক শুনানীর দিনে, খবরের কাগজেও এ মামলার পাবলিসিটি হয়েছে যথেষ্ট। বিচারে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, তা জানবার জন্য অনেকেই উৎসুক। তাই কেউ কেউ আসেন, রহস্য-সমাধানের খোঁজে। কেউ আসেন দুপুরে দিবানিদ্রা না দিয়ে এমনি সময় কাটাতে। কারুর উকিল-বন্ধু আছে, বার লাইব্রেরীতে নিখরচায় চা-টা জোটে আর মুফতে বেড়ানোও শোনা যায়। আর বেশির ভাগ দর্শক চায় উত্তেজনার খোরাক পেতে। কারুর কারুর খুন জখমের ওপর অসুস্থ রকমের আকর্ষণ কারুর বা শ্রেফ কৌতূহল। আর রিপোর্টারের দল—এই তাদের রুজি-রোজগার।

তবে কেসটা নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেছে শহরে। পাড়ায় ছেলেদের ক্লাবে, বয়স্কদের মজলিশে, এমনকি মেয়েলি বৈঠকেও এ মামলার আলোচনা হয়। শিবানীর পরিচিত গোষ্ঠী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দল শিবপদর ঘোরতর বিপক্ষে, তাদের মতি স্থির। ভাবটা এইরকম—বজ্জাত

লোক। মেয়েকে বিয়ে করতে পেল না তাই বাপকে খুন করে এল। বাইরে ভদ্রতার মুখোশ ভেতরে শয়তান। আর এক দলের মনোগত ইচ্ছা—শিবপদ নির্দোষ প্রমাণিত হোক, আসল আসামী বোধ হয় আর কেউ। সাধু ইচ্ছা মাত্র, কেননা আসল আসামী কে, কিভাবে হঠাৎ ক্লিনিকে চড়াও হয়ে শক্তিপদবাবুকে খুন করে গেল, কেনই বা খামোকা হত্যা করল আর অদৃশ্য অস্পৃশ্য হয়ে সরে পড়ল অত শীগগির, সে সব বিবেচনা তাদের মনে ঠাঁই পায় না। আসলে, এদের মন নরম। কেউ শিবপদকে চেনে ও জানে: তাদের ধারণা, সে খুনী নয়। তাই গোপন সহানুভূতি আসামীর দিকে। শিবানীকে অবশ্য কেউ খোলাখুলি কিছু বলেনি, বলতে ঠিক সাহস পায়নি। বাপের মৃত্যুর পর থেকে সে সঙ্গ এড়িয়ে চলছে তার ওপর তার স্বভাব গাম্ভীর্যের আভিজাত্য তো আছেই।

শুধু টুনুর কাছে কখন সখনও সে একটু মন খুলেছে, তার নিজস্ব সন্দেহের কথা ইঙ্গিতে বলেছে। কিন্তু গত পনের দিনের মধ্যে সে কারুর কাছেই মুখ খোলে নি। কেবল উকিল শীতলবাবু পারিবারিক বন্ধু ও হিতৈষী বলে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছে। আর শচীকান্তবাবু স্নেহশীল মানুষ, পিতৃতুল্য ও শ্রদ্ধেয়। কিন্তু ঠিক সেই কারণে তাঁর কাছে শিবানী যে যাতায়াত করছে ইদানীং তা নয়। তিনি বিজ্ঞানী, অধিকন্তু চাপা ধরনের মানুষ। সেইজন্য তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে। আর শচীকান্তবাবুর শুধু উপদেশ বা পরামর্শ নয়, যত্ন পরিশ্রম এবং সহযোগিতার ওপর শিবানীর কর্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় শচীকান্ত শিবানীকে যখন বিদায় দিলেন, তখন শেষ বারের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো করে ভেবে দেখেছ তো মা?' শিবানী মাথা নেড়ে সায় দিল। দরজার কাছে এসে অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন, 'আমি শক্তিপদর কথা ভাবছি না, সে এখন ভালো-মন্দর ওপারে। ভাবছি, তোমার জন্য। আমাদের পরীক্ষার ফলে কতবড় ঝুঁকি, বুঝতে পারছ বোধ হয়......'

শিবানী ম্লান হেসে বলল, 'বুঝেছি, কিন্তু আর কি করতে পারি বলুন!'

শচীকান্ত বিমর্ষভাবে জবাব দিলেন, 'অন্য কোনো পথও তো দেখছি না......'

সোমবার শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে এল। এদিনে সবাই হাজির—জজ-জুড়ি দু পক্ষের উকিল, তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোর্টের কর্মচারী, পুলিশের লোক,

প্রধান সাক্ষী দল আর বাছাই করা পাবলিক এবং যে কোনও অকুস্থলে প্রথম ছাড়পত্রওয়ালা প্রেসের প্রতিনিধি। স্টেনোগ্রাফাররা পেন্সিল শানিয়ে বসে আছে। বাড়ীর প্রবীণ উকিল শীতলাচরণবাবুর পাশে বসে শিবানী চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। পিছনেই টুমু তার চোখে আজ শিবানীর মুখখানা যেন অস্বাভাবিক রকমের পাংশু লাগল। শিবানী কোন দিন নার্ভাস হয় না। পরীক্ষার হলে যখন ভালোমন্দ সব মেয়েই কেঁদোকাটা হবার জোগাড়, শিবানী তখন একটু বেশী গম্ভীর বা অন্যমনস্ক হত, আর কিছু নয়। কিন্তু টুমুর মনে হল, আজ একটা চরম পরীক্ষা। তার নিজের এ অবস্থা হলে নিশ্চয়ই হার্ট ফেল হয়ে যেত। পিতার মৃত্যুর জন্য যে ব্যক্তি দায়ী, তার শাস্তি হোক—এ ইচ্ছা যেমন সঙ্গত, অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যি নিরাপরাধ হলে তার মুক্তিকামনা তেমনিই স্বাভাবিক। শিবানীর আজকের মনের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করে টুমু। শিবপদকে দেখা যাচ্ছে, বসে আছে আসামীর নির্দিষ্ট জায়গায়—দুপাশে দুজন সার্জেণ্ট। শুষ্ক বিরস মুখ, কিন্তু উত্তেজনার চিহ্ন বোঝা যাচ্ছে না। তার অপরাধ প্রায় প্রমাণিত হয়েই গেছে, এখন জুরিদের চূড়ান্ত রায় শুধু বাকী।

আচ্ছা, খুনের শাস্তি ফাঁসি তো একরকম উঠেই গেছে। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাবাস এখন হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তফাৎটা কোথায়, এটাই বা কম কিসে? এক মুহূর্তে মরা, আর তিলে তিলে মরা। ফাঁসির হুকুম থেকে ঝুলে পড়া পর্যন্ত কটাই বা দিন! আর গারদে ঢুকে জীবন্মৃত হয়ে সুদীর্ঘ মেয়াদ কাটানো প্রায় মনুষ্যত্বহীন অবস্থায়……ভাবতেও ভয় হয়। শিবানী কি ভাবছে? টুমু দেখল, শিবানী স্থির দৃষ্টিতে তার নিজের নখ দেখছে। আচ্ছা, শিবপদর ওপর শিবানীর কতটুকু কোমলতা? শিবপদর মনোভাব তো বিয়ের প্রস্তাব থেকেই বোঝা গিয়েছিল, কিন্তু শিবানীর নিজের……? বড় চাপা মেয়ে কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না ওকে…

ইতিমধ্যে জজ এসে বসেছেন, এবং সরকারী উকিল গলা ঝেড়ে কায়দামাফিক একটু কেশে আদালতের অনুমতি নিয়ে জুরিদের সম্বোধন শুরু করেছেন। আসামীর উকিল শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে। পিছন থেকে জুনিয়র ফিসফিস করে কি যেন বলছে… শিবানী ভাবে—এ সব অভিনয়! উকিলে-উকিলে এই ঝটাপটি যেন মোরগের লড়াই। কোর্ট থেকে বেরিয়ে ওরা আবার বন্ধু বা সহকর্মী হয়ে যায়। পিঠ চাপড়ায় পরস্পর, জেতে সে আত্মপ্রসাদে একটু ফুলে ওঠে,

---

একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

কেসের গল্প করে বেড়ায়। যে হারে কিছুক্ষণের জন্ত হয়তো একটু মুষড়ে যায় তারপর যে কে সেই। আসামী ফরিয়াদী, অবজেকশান, ঝি চর্চা—সব ভুলে গিয়ে আর এক কেস নিয়ে হাতড়ায়। সব অভিনয়!

অল দ্য ওয়ার্লস এ স্টেজ—শিবানী ঠোঁট নড়ে ওঠে আর কোর্ট রুম হল ফিনিশড মিনিয়েচার। যতক্ষণ পালা চলছে ততক্ষণ সবাই প্রাণপণে ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করছে, যে যার পার্টের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। আদালতে যারা ভিড় করছে, কাল সকালে যারা কাগজ পড়বে, ঐ সরকারী উকিল যার ইংরেজী সিনট্যাক্স নড়বড়ে কিন্তু মুখের তোড় আছে, আর শিবপদর ধূর্ত বৃদ্ধ উকিল—আর ঐ গম্ভীর মুখ আত্মসচেতন জুরির দল—ওদিকে দর্শক, রিপোর্টার, এদিকে স্বয়ং জজসাহেব—সবাই পাকা অ্যাক্টর। সবাই খুঁজছে, চাইছে এফেক্ট। সে নিজে......? কি জানি—হয়তো এই নীরব প্রতীক্ষা, এও একরকম অবচেতন আকাঙ্ক্ষা......।

সরকারী উকিল থামলেন। একটু থেমে জুরি বক্সের দিকে তাকিয়ে তাঁর শেষ চাল ছাড়লেন—আপনারা সাধারণবুদ্ধি কিন্তু তীক্ষ্ণ...তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। আপনারা স্থিরভাবে ভালো করে বিবেচনা করে দেখুন—আসামীর অপরাধ প্রমাণিত হল কিনা। উদ্দেশ্য, সুযোগ এবং উপায় এ তিনটি বিষয় নিয়ে আপনারা এ কয়দিন প্রচুর তর্ক-বিতর্ক, সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ শুনেছেন। উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আসামী মৃত ব্যক্তির কন্যাকে বিয়ে করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, কিন্তু সেখানে মস্ত বড় বাধা হল পিতার অমত। অবশ্য মেয়ে সাবালিকা। তাঁর ইচ্ছা থাকলে বাপের অসম্মতি সত্বেও বিয়ে হতে পারত। কিন্তু শিবানী দেবী আপনাদের সামনেই আদালতে আমার জেরায় স্বীকার করেছেন, তাঁর পিতার সঙ্গে ঝগড়ার পরও আসামী দু-তিন বার তাঁকে বাইরে পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে। কিন্তু প্রতিবারই সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। সুতরাং আসামীর আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং সে আক্রোশ গিয়ে পড়েছে মূল কারণ—বাপের ওপর। আশা করি—এটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, সুযোগ। সে সম্বন্ধে ক্লিনিকের যাবতীয় লোক অর্থাৎ তিন, চার ও তেরো নম্বর কামরার অ্যাটেণ্ডান্ট এবং স্বত্বাধিকারী, সকলের উক্তি আপনারা শুনেছেন এবং নিশ্চয়ই বুঝেছেন, সুযোগের কোনো অভাব ছিল না। উপরন্ত উভয়ের মধ্যে আবার তীব্র বাদানুবাদ হয় এবং মৃত ব্যক্তির শেষ কথা...'কে কাকে খুন করে দেখা যাবে'—এ দিক থেকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে, আসামী

তাঁকে শেষবারের মতো শাসিয়েছিল। চার নম্বর কামরায় যখন স্টীম-বাথ নেওয়া হচ্ছে, সে সময়ে তেরো নম্বরের অ্যাটেণ্ডেন্ট কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে আসে। এই সময়ের মধ্যে চট করে বেরিয়ে এসে কাজ হাসিল করা আসামীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়, বরঞ্চ সহজ। কেননা স্টীম-বাথের কামরা থেকেও অ্যাটেণ্ডেন্ট ঠিক ঐ সময়েই বাইরে এসে পিছন ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

এর পর আসছে তৃতীয় প্রশ্ন—উপায়। এই বিষয়ে আপনাদের হয়তো কিছু দ্বিধা থাকতে পারে। কিন্তু দ্বিধার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। আসামীর তরফ থেকে বলা হয়েছে, অস্ত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসামী সঙ্গে যে তোয়ালে এনেছিল গা মোছার জন্য সেটা তার তেরো নম্বর ঘরেই পড়েছিল যেখানে তার তোয়ালে রাখা অভ্যাস, ঠিক সেই জায়গাতেই। তোয়ালের মধ্যে ছুরি জাতীয় কোন অস্ত্র ছিল না, কোথাও রক্তের দাগ ছিল না, আসামীর জামা-কাপড়েও নয়। কিন্তু মারণ-অস্ত্র নিখোঁজ হওয়ার মানে এ নয়, আসামী খুন করতে পারে না। এমন কোনো জায়গায় সেটি হয়তো ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিম্বা লুকিয়ে রাখা হয় যে কারুর নজরে পড়েনি। তারপর খুনের দৃশ্য দেখে সবাই যখন চকিত ও ব্যস্ত, আসামীর পক্ষে তখন চারদিকের সেই উত্তেজনা ও অন্যমনস্কতার সুবিধা নিয়ে অস্ত্র কোথাও সরিয়ে ফেলা মোটেই আশ্চর্য নয়। এখন আমার নিবেদন—এর মধ্যে 'রীজনেবল ডাউট'-এর কোনো অবকাশ নেই···

শিবানী এবার অস্থির হয়ে উঠছে, ঘন ঘন ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিচ্ছে। দু-একবার এ-দিক ও-দিক তাকাল। আরও কিছুক্ষণ কাটল। সরকারী উকিল তখনও জুরিদের বোঝাচ্ছেন। জুরিদের মুখ অনেকটা নির্বিকার, শিবানীর মনে হয়—ওদের ছাঁচটা একই রকম এবং মতটাও এক······বোধ হয়, অপরাধ সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই ওঁদের মনে! কেবল একজনের দৃষ্টি শিবপদর দিকে নিবদ্ধ। যেন অন্যমনস্ক, কিছু ভাবছে বোধ হয়। ঘ্যানর ঘ্যানর বক্তৃতায় হয়তো বা অসহিষ্ণু। শিবানী আবার মুখ ঘুরিয়ে আদালত-কক্ষের প্রবেশ-দরজার দিকে তাকাল। দেখতে পেল শচীকান্তবাবু ঢুকছেন···হাতে একটা ব্রাউন রঙের মোড়ক। চোখোচোখি হতেই শচীকান্ত ঘাড় নাড়লেন। শিবানী মুখ আবার ফিরিয়ে নিল, আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়ল। স্বস্তির। কিন্তু সময় তো আর নেই।

শ্রীভলাচরণকে শিবানী আস্তে আস্তে কি যেন বলল। চমকে উঠে

তিনি একবার জজের দিকে তাকালেন, তারপর নিঃশব্দে আসন ছেড়ে শিবপদর জুনিয়র উকিলকে নিয়ে পিছন দিকে সরে গেলেন। সেখানে দুজনে শচীকান্তবাবুর সঙ্গে কি যেন বলাবলি করলেন। জুনিয়রের হাব-ভাবে একটা ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখা গেল। তারপর সকলে যে যার জায়গায় ফিরে এলে, জুনিয়র উকিল তাঁর সিনিয়রের পিছনে এসে বসলেন। ফিস্‌ফিস করে কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলল এবং একখানা কাগজ হাত-বদল হল। সরকারী উকিল বক্তব্য শেষ করে এনেছেন,—মাঝে মাঝে আড়-চোখে দেখে নিচ্ছেন ডিফেন্স তরফের গতিবিধি। সেদিকে একটা চাপা উত্তেজনা, মৃদু কণ্ঠে গুঞ্জন, সবাই এমন কি জুরিরাও লক্ষ্য করছেন দেখে তিনি একটু চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর বক্তৃতা আর না বাড়িয়ে জুরিদের কাছে অভ্যস্ত নিবেদন জানালেন প্রতিটি বাক্যের ওপর জোর দিয়ে—'আপনারাই হলেন শ্রেষ্ঠ বিচারক। জজের দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন তাঁর অনুমতি নিয়ে বললেন 'জজ হলেন আইনের চরম ব্যাখ্যাতা; তিনি আপনাদের আইন বুঝিয়ে দেবেন। কোনটা গ্রাহ্য প্রমাণ, কোনটা নয়—সেটা তাঁরই নিজস্ব এলাকা। কিন্তু তথ্যের বিচার করবেন আপনারা, দোষী অথবা নির্দোষ—এ রায় দেবেন আপনারাই। জজ এবং এখানে আমরা সকলেই আপনাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষা করব……'

শিবপদর উকিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জজসাহেবকে বললেন, কয়েকটি তথ্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হস্তগত হয়েছে। যদিও সাক্ষ্যদানের পালা শেষ হয়েছে, তবু সুবিচারের জন্য শিবানী দেবীকে আবার কয়েকটি প্রশ্ন করতে অনুমতি দেওয়া হোক।

জজ কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ তথ্যগুলি কি নতুন আবিষ্কার, আর এত দেরীতেই বা কেন উপস্থিত করা হচ্ছে? যদি ডিফেন্স এগুলি অত্যন্ত জরুরী মনে করেন, তাঁর ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সরকার তরফের সম্মতি থাকলে মৃত ব্যক্তির কন্যাকে আবার ডাকা যেতে পারে।' সরকারী উকীল দাঁড়িয়ে উঠে সায় দিলেন।

শিবানী ধীরভাবে উইটনেস-বক্সের দিকে এগিয়ে গেল। শিবপদর দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে প্রশ্নের জন্য যখন অপেক্ষা করছে, তখন টুনু ঘাড় নেড়ে তাকে দূর থেকে উৎসাহ দিল। সওয়াল শুরু হল:

'আচ্ছা, আপনার পিতার সঙ্গে ঝগড়ার পর আসামীর সঙ্গে আপনার

কয়বার দেখা হয়েছে? তিনি কি ক্ষমাপ্রার্থনা করে আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব পুনর্বার বিবেচনা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানান?'

'হাঁ—তিনবার। কিন্তু আমি রাজী হইনি। বদ মেজাজের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত বলে......।'

কোর্ট রুমে একটু চাপা হাসির শব্দ যেন শোনা গেল। জজ একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করার ইচ্ছা আপনার মনে ছিল কি......?'

শিবানী সোজা জবাব এড়িয়ে বলল, 'তার তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না... জানতুম আমার মন পরিবর্তনের জন্য সে অপেক্ষা করবে......'

ডিফেন্স উকিল প্রশ্ন শুরু করলেন, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকেই কি জানলেন, নাকি তার আগেই জানতেন, যে আপনার বাবা ক্যান্সার রোগে ভুগছেন...? তিনি কি এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছিলেন, মানে তাঁর অবর্তমানে বাড়ী-ঘর এবং আপনার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন কি......?'

'আগেই অনুমান করেছিলেন যে, ব্যাধি দুরারোগ্য। আমাকে সরাসরি কোনো দিন কিছু বলেন নি। বাড়ীর ডাক্তার নিশ্চয়ই জানতেন আর বাকিটা জানেন পারিবারিক উকিল শীতলাচরণবাবু।'

'আচ্ছা তিনি কি ইদানীং নিজের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, যেন বাঁচবার ইচ্ছা নেই......?'

'হাঁ, শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। আর বেশি দিন নয়, জানতেন। দু-একবার বলেছেন, নাঃ—আর বেঁচে লাভ নেই।'

'আচ্ছা, তাঁর দেহ যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, মনের জোর কি সেই সঙ্গে...'

শিবানী আগেই উত্তর দিল, 'তাঁর মনোবল অসাধারণ। প্রয়োজন হলে, নিজের জীবন নিজ হাতে শেষ করতে পারতেন। আর তাই করেছেনও...।

কোর্টে একটা সাড়া পড়ে গেল......প্রথমে সবাই স্তব্ধ, তারপর একটা চাপা আওয়াজ জমে উঠল। কোর্টরুম অপেক্ষাকৃত শান্ত হলে জজসাহেব শিবানীকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার এ উক্তির কারণ জানাবেন কি...?'

শিবানী তার বক্তব্য গুছিয়ে নিতে একটু সময় নিল। তারপর ধীর কণ্ঠে বলে চলল—'প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—খুনের রকম দেখে।

যে খুনী, সে প্ল্যান করে আসবে। যদি বাইরে থেকে লোক এসে ক্লিনিকে ঢোকে, তা হলে চটপট কাজ সেরে তাকে পালাতে হবে। এবং হত্যার জন্য সাত-আট ইঞ্চি লম্বা কোনো অস্ত্র আনার দরকারও নেই।'

সকলের মুখে বিস্ময়ের প্রশ্ন দেখে শিবানী যেন ব্যাখ্যা করে বলল : 'যে ব্যক্তির মগজে খুনের পরিকল্পনা তৈরী আছে, সে পাবলিক জায়গায় বড় ছুরি আনতে চাইবে না। একটা সরু ছুচ হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জেই তাব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। অতএব, খুনী বাইরে থেকে আসে নি,—এই আমার ধারনা হল। ক্ষতের গভীরতা যেখানে তিন-চার ইঞ্চি এবং আড়াআড়িভাবে আধ ইঞ্চি, সেখানে অবশ্য একটু বড় গোছের ধারালো ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে অনুমান করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। তারপর ভেবে দেখলুম—শিবপদর দ্বারা এ ধরনের হত্যা সম্ভব নয়।

শিবানী একটু থেমে আসামীর দিকে একবার তাকাল। বলল, 'সে বদরাগী হতে পারে কিন্তু আসলে, কিন্তু দুর্বল ও ভীরু। তার গায়ে জামা-কাপড়ে, তোয়ালেতে কোনো রক্তচিহ্ন ছিল না। অস্ত্র লুকিয়ে ফেলা অতটুকু সময়ের মধ্যে—তাও অসম্ভব মনে হয়। সুতরাং যুক্তি অনুসারে চিন্তা করে দেখলে, ছুরি আদৌ ছিল না—এই সিদ্ধান্ত ছাড়া গত্যন্তর নেই···

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে শিবানী এক গ্লাস জল চাইল। অল্প একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করল। কোর্টরুম একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে...'ক্ষতের ভেতরে এক টুকরো চায়ের পাতা ছিল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে প্রকাশ। ঐ থেকেই একটা নতুন দিকে আমার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলুম, সেদিন অর্থাৎ বুধবার সে চা তৈরী ক'রে দেয় নি। বাবা বারণ করেছিলেন। কেন? তাঁর বহু দিনের অভ্যাস হঠাৎ বদলালেন কিসের জন্য? যখন শূন্য ফ্লাস্কটা সঙ্গে নিলেন, তখন অন্য কিছু অভিপ্রায় ছিল বোধ হয়। তারপর গরম কামরার মেঝের ফ্লাস্ক খোলা অবস্থায় ছিল কেন? চা তো ছিল না। অথচ ফ্লাস্কের মুখের কাছে কয়েকটা চায়ের পাতা দেখা যায়, পুলিশও তা নজর করেছে। সম্ভবত, চাকর ফ্লাস্কটা পরিস্কার করে রাখেনি। কিন্তু চায়ের পাতাগুলো সব এক জায়গায় লেগে আছে আর একটি মাত্র পাতা বাবার বুকের ওপর গিয়ে পড়ল—ঠিক যেখানে আঘাত করা হয়েছে! আর সেই পাতাটা ক্ষতের ভিতরে গিয়ে দু টুকরো হয়ে গেল—এ রকম অদ্ভুত যোগাযোগ

আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হল। অন্ততঃ যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারলুম না।'

'বাবা অবশ্য জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন, বাঁচতে চাইছিলেন না। কিন্তু নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে, চেয়ার থেকে উঠে সেটা ছুঁড়ে ফেলা কিংবা কোথাও লুকিয়ে সরিয়ে রাখা, তাও অসম্ভব। আত্মহত্যা খুবই সম্ভব—কিন্তু প্রমাণ পাচ্ছিলুম না। অস্ত্র সম্বন্ধেও কোনো হদিস পাই নি···শেষে ভাবতে ভাবতে একদিন মনে হল—লেবরেটরিতেই সন্ধান করতে হবে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় তো সেখানেই মিলতে পারে। আর 'ক্লু' পেয়েও গেলুম খুঁজতে খুঁজতে···

ইদানীং বাবা লেবরেটরিতে বেশি সময় কাটাচ্ছিলেন। কি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, জানতে কৌতূহল হল। এটা-ওটা দেখতে দেখতে নজরে পড়ল দেয়ালের কাছে একটা গ্যাস-সিলিণ্ডার, মাটিতে রাখা হয়েছে। ঘুরিয়ে গড়িয়ে দেখলুম—কোনো লেবেল নেই। কি গ্যাস, জানবার উপায় নেই। কিন্তু এ তো হতে পারে না, কোনো কোনো গ্যাস যে বিপজ্জনক। লেবরেটরির জন্য যারা যন্ত্রপাতি পাঠাতো, সেখানে খবর করলুম। তারা জানালো, মৃত্যুর মাস খানেক আগে তারা কার্বন ডায়োক্সাইড-এর একটি সিলিণ্ডার পাঠায়। সেটা ফুরিয়ে গেলে ফেরত নেওয়া হয় এবং আবার কুড়ি-বাইশ দিন পরে আর একটি সিলিণ্ডার পাঠানো হয়। বাবার টেবিলের ড্রয়ারে পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে কয়েকটা বিল বার করলুম। দেখলুম, প্রত্যহ তিন থেকে চার সের করে বরফ সাপ্লাই করা হয়েছে···এই কার্বন ডায়োক্সাইড আর বরফ আসা—এ দুটো জিনিস একত্র করে দেখতে ও ভাবতে শুরু করলুম। কার্বন ডায়োক্সাইডের ফ্রিজিং পয়েন্ট খুব নীচু—আশী ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, শচীকান্তবাবুর কাছে জেনেছিলুম···

আদালত-ঘরে একটি পিন পড়ারও শব্দ নেই—সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনছে আর ভাবছে—তারপর ?

শিবানী একটু থেমেছিল। দম নিয়ে আবার শুরু করল—সিলিণ্ডার থেকে গ্যাস বেরিয়ে যখন বাইরের হাওয়ার সঙ্গে মেশে, তখন মিহি পাউডারের মতো তুষারে পরিণত হয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সেই ঝুর-ঝুরে বরফের গুঁড়ো যদি জোরে চেপে রাখা যায়, তাহলে শক্ত বরফ তৈরী হতে পারে। অর্থাৎ কমপ্রেস করলে, নরম ফুঁয়ে-ওড়া তুষার-কণা জমাট এবং অত্যন্ত কঠিন বরফ হয়ে দাঁড়ায়। তখন হঠাৎ আমার মনে একটা বড়

রকমের সন্দেহ চমক দিয়ে গেল। বাবা হয়তো লেবরেটরিতে শেষ দিকে এইরকম পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। হয়তো···ঐ গ্যাসের সাহায্যে গুঁড়ো বরফ সৃষ্টি করে তাকে একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে এমন কোনো অস্ত্র তৈরী করেছিলেন যা দিয়ে অনায়াসে ছুরির মতো মারাত্মক আঘাত করা চলে·······'

শিবানী একবার শীতলাচরণের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর গায়ের কাপড়টা একটু টেনে ঈষৎ মুখ নীচু করে ধীর সংযত কণ্ঠে বলে চলল :

'বাবা তাই-ই করেছিলেন। এ আমার নিশ্চিত ধারণা······'

জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, একটু ঝুঁকে, 'ও: আপনার ধারণা? কিন্তু তার সত্যতার কোনো প্রমাণ আছে কি?'

শিবানী মৃদু কিন্তু স্পষ্ট সুরে বলল—'আছে,—বলছি সে কথা। বাবা কার্বন ডায়োক্সাইড জমিয়ে ছোরা বা ছুরি জাতীয় অস্ত্র বানিয়ে নিয়ে সেটা বরফে ডুবিয়ে রাখতেন। কয়েকবার পরীক্ষার পর তিনি নিশ্চয়ই সফল হয়েছিলেন, কেননা পরপর কয়েকদিন বরফ আনিয়ে মৃত্যুর দু-এক দিন আগে বরফের অর্ডার বন্ধ করে দেন। পরীক্ষার আর দরকার ছিল না। যতটা লম্বা এবং শক্ত অস্ত্রের প্রয়োজন, তা তৈরী হয়ে গেলে থার্মোফ্লাস্কে সেটা রেখে দেন আগের রাত্তিরে। কারণ ফ্লাস্কে চা যেমন গরম থাকে, বরফও তেমনি ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া, অন্য অস্ত্র চলত না; বরফের ছুরি এমন জিনিস—যা ঝপ করে বুকে বসানো যায় এবং ক্লিনিকের স্টীম বাথরুমের উগ্র গরমে তখনই গলে গিয়ে উবে যায়। অস্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই ধরনের ছুরিই ব্যবহার করা হয়েছিল, নইলে চায়ের পাতার কোনো ব্যাখ্যা হয় না।'

জুরির দল নির্বাক হয়ে শুনছেন, একজন শুধু প্রশ্ন করলেন—'কেন হয় না?'

শিবানী জজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফ্লাস্কে চায়ের কিছু পুরাণো পাতা ছিল। তার একটা ছুরির ডগায় নিশ্চয় লেগেছিল, নইলে ক্ষতের মধ্যে গিয়ে দুটি ছোট টুকরো হয়ে গেল কি করে······?'

জজ এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু এ সবই তো আপনার নিজের অনুমান ও ব্যাখ্যা। স্বপক্ষে কোন প্রমাণ······?'

কথা শেষ হবার আগেই শিবানী ব্যাগ থেকে কি যেন একটা সবুজ-

কালো জিনিস বার করে সামনে ধরল। বলল, এই যা প্রমাণ। এটা হল ঐ ছাঁচের পয়েণ্টেড মুখ, এরই মধ্যে গুঁড়ো বরফ ঠাস করে জমিয়ে রাখলে ছুরির ছুঁচালো মুখ তৈরী করা যায়। অনেক খুঁজে শুধু শেষের এই অংশটুকু পেয়েছি। বাবার লেবরেটরিতে একটা পুরানো টেবিলের সাইড ড্রয়ারে ওটা পড়ে ছিল। এইরকম বাস্তব প্রমাণেরই সন্ধান করছিলুম এত দিন······ আর ছুরির বাকী অংশটা কি দিয়ে তৈরী হল, সেটা বলতে পারবেন শচীকান্তবাবু।'

কোর্ট জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে শচীকান্তবাবু পেছন থেকে এগিয়ে এলেন। কোর্টের অনুমতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন: 'শক্তিপদ আর আমি সতীর্থ ছিলুম। উভয়েই এককালে বিজ্ঞান-চর্চা করেছি। ঠিকমতো ছাঁচ পেলে অমনি কঠিন ও মারাত্মক ছুরি বানানো যেতে পারে। শিবানী তার সন্দেহের কথা আমাকেই প্রথম জানায়। ভেবে দেখলুম—সন্দেহ অমূলক নয়। খাপের ছুঁচালো মুখটা খুঁজে পেয়ে সে যখন আমার কাছে আসে, তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, বাকী টুকরোগুলো খুঁজলে পাওয়া যাবে। লেবরেটরিতে ভাঙ্গা টেস্টটিউব, পুরানো আর তার ফেলে-দেওয়া অকেজো জঞ্জালের মধ্যে গোল গোল কয়েকটা ভালকানাইট-খাপের অংশ পেয়ে গেলুম। শুধু ঐ মুখটা—যেটা সবচেয়ে দরকারী—শক্তিপদ বোধ হয় ড্রয়ারে আলাদা সরিয়ে রেখেছিল। শিবানীর কথাই ঠিক—কেননা আমাদের ধারণা শুধু ধারণাই থেকে যাবে, যতক্ষণ না শক্তিপদ যে অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, ঠিক সেই জিনিস বানিয়ে লোকের সামনে ধরা যায়। এ কয়দিন ধরে কার্বন ডায়োক্সাইড নিয়ে ভালকানাইট ছাঁচের মধ্যে যা-পরখ করে দেখেছি—তা এই······

তারপর সঙ্গে আনা সেই ব্রাউন মোড়ক খুলে একটা থার্মবার করলেন শচীকান্ত। কোর্ট এবং জুরীদের সম্বোধন করে বললেন—'এর মধ্যে বরফ-জমানো ছাঁচে ফেলা অস্ত্র রয়েছে। কুলপি বরফ যেভাবে টিনের খোলে তৈরী হয়, এও সেই রকম··· ··

ফ্লাস থেকে প্রায় সাত-আট ইঞ্চি ঝকেঝকে ঠাণ্ডা বরফের ছুরি বেরিয়ে আসতেই, জজ জুরি ও সমবেত সকলে নিঃশব্দে সেই হত্যার একদিন অদৃশ্য ও পলাতক সূত্রটি দেখে নিলেন। একটা নিশ্বাস······তারপর থমথমে কোর্টরুম স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল।

জজসাহেব ঈষৎ ভ্রূকুটি হেনে যা বললেন তার মর্মার্থ—আদালত ঠিক

রঙ্গমঞ্চ নয় এবং জনতার উৎসাহ শান্ত না হলে কেস মুলতুবী থাকবে। তারপর সরকারী উকিলের দিকে সপ্রশ্নভাবে তাকাতে তিনি উঠে বললেন, সরকার এ মামলা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত। প্রসিকিউশান-পক্ষ এ বিষয়ে একমত।......'

'এবং আমরাও......'

জুরির ফোরম্যান সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে কোর্টকে সম্বোধন করলেন, 'আসামী নির্দোষ—বর্তমান প্রমাণের পর আমরা এ কথা জানাতে চাই।'

শিবানী কোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ—দীর্ঘদিন মানসিক ও শারীরিক চাপের অবশ্যম্ভাবী ফল। সামনে শচীকান্তবাবু, পেছনে টুনু ও শিবানী। শীতলাচরণ পাশেই ছিলেন, একবার আমতা আমতা করে বললেন, 'শিবপদর খবরটা নিয়ে গেলে হত না......?'

'থাক্ এখন...পরে তো দেখা হবেই...' শিবানী ঈষৎ ম্লান হেসে বলে। সে তখন ভাবছে জজসাহেবের শেষ প্রশ্নের কথা—'আপনি কি মনে করেন, আপনার পিতার এই আত্মহত্যা ইচ্ছাকৃত—তিনি জেনে-শুনে এক নির্দোষ ব্যাক্তিকে এভাবে জড়িত করে তাকে চরম অপরাধী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন......?'

শিবানী চুপ করে ছিল—তারপর মৃদু কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল. সম্ভবতঃ তাই......' কি করে বোঝাবে সে—ন্যায় ও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষেরও অবচেতন মন কিভাবে কাজ করে—স্বাস্থ্য মেজাজ এবং ক্রোধের জেদ মানুষকে কতটা নির্মম করে তুলতে পারে......। মানুষের চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব, তার কার্য-কলাপ কি বিভিন্ন, এমন কি—বিরোধী সত্তার সমাবেশে তৈরী হতে পারে না......?

শিবানী গাড়ীতে উঠে বসল। সঙ্গে শুধু শচীকান্ত—রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারের দল ছেঁকে ধরবার আগেই আদালতের কম্পাউণ্ড থেকে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন।

এক সাংবাদিক তাঁর দুই তরুণ সাহিত্যিক-বন্ধুদের নিয়ে আজ শেষ শুনানীর দিনে কোর্টে এসেছিলেন। লাঞ্চের আগেই তো কেস খতম! গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভাবছেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়। হুস করে গাড়ীখানা বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় পাশ থেকে শিবানীর ক্লান্ত কঠিন মুখ তাঁর নজরে পড়ল।

বন্ধুদের বললেন—'ঐ যাচ্ছেন শিবানী—কি আশ্চর্য শক্ত মেয়ে...সত্যি মাথাটা সাংঘাতিক ঠাণ্ডা...নাঃ ?......আর কি একখানা ড্রামা...... !'

বন্ধুদের একজন বলে উঠলেন—'হ্যাঁ ড্রামাই বটে, তবে লিরিকের ছোঁয়াচ আছে ! শক্তিপদ কেটে পড়লেন শিবপদকে ফাঁসিয়ে......কিন্তু ফাঁস ফেঁসে গেল · শিবপদ তো এখন শিবানীরই পদে......!'

দ্বিতীয় বন্ধু অন্যমনস্ক ছিলেন, একটু থেমে বললেন—'না, ও সনেট।'

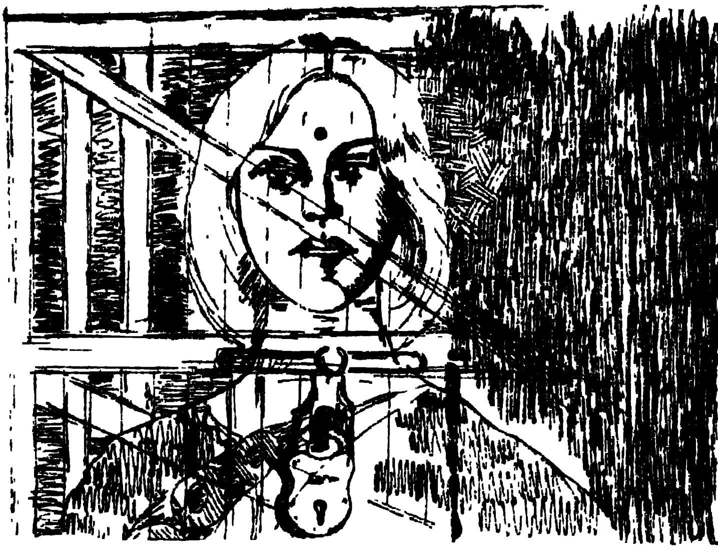
'চুলোয় যাক নাটক আর কাব্য !' বললেন নবীন সাংবাদিক। 'গলা শুকিয়ে কাঠ। ও দেশ হলে বলা যেত—এক পাত্তর হলে মন্দ হয় না। কিন্তু...কিন্তু অতঃপর ..কফি হাউস ছাড়া গতি নেই।'

দ্বিতীয় বন্ধুটি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—'না · এখন ফার্স্ট ক্লাস টী ইজ ইণ্ডিকেটেড ..'

সাংবাদিক বললেন—'তা হলে তাই......আমার ফেভারিট টী-শপে যাওয়া যাক। ওরা ফার্স্ট ক্লাস অরেঞ্জ পিকোটী সার্ভ করে।'

ভুরু কুঁচকে সাহিত্যিক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রোকন তো...... ?'

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়: জন্ম ফেব্রুয়ারী ১৯০৬, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ ও অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত। দীর্ঘকাল ইতিহাস অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। কবিরূপে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ তিরিশের দশকের শেষভাগে। তারপর গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে মননশীল লেখক হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব সমাদৃত হয়। প্রবন্ধ সাহিত্য, বিশেষ করে রস-নিবন্ধে ও রম্য রচনায়, তিনি অন্যতম পথিকৃতের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সাহিত্যে ও ইতিহাসে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। তাঁর কাব্য, গল্প, রস-প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। এ ছাড়া, গোয়েন্দা ও ভৌতিক কাহিনী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ সুগভীর।



আমার প্রিয় সখী

সন্তোষ কুমার ঘোষ

আমার প্রিয়সখীর কথা লিখছি।

সকালে খবরের কাগজটা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার হাত কাঁপছিল। আমার মুখও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে। আমি তো দেখতে পাইনি, রিফ্রেসমেন্ট রুমে আর যারা ছিল তারা বলতে পারবে। চায়ের পেয়ালা ফসকে পড়ছিল, কোনক্রমে সামলে নিলাম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ধরে। দাম দিয়েছিলাম কি দিইনি, এখন আর মনে নেই। অস্ফুট গলায় একবার বলেছিলাম, বনরেখা, বনরেখা আমার এখনই রেল-পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত এখনই, এখনই, এখনই।

আমি যে অতটা ভেঙ্গে পড়েছিলাম, তার অনেকটাই ভয়ে আর ক্লান্তিতে। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ওয়েটিং রুমে সমস্তক্ষণ আলো জ্বলছিল, কোথা থেকে ফিরে ফিরে আসছিল দু-তিনটে মশা, আমার কানে গোপন কোন কথা বলতে চাইল; কী সেকথা, আমি জানি না। ওদের

ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। হেলানো চেয়ারটাও আরামপ্রদ ছিল না। পিঠ আর কাঁধের কাছটা টন্‌টন্‌ করে উঠেছিল। ছারপোকার চোরা ছুরি তো ছিলই।

আরও একটা জিনিস দেখলাম, প্লাটফর্মটা কখনও ঘুমোয় নি।

মাঝে মাঝে দূর-পাল্লার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, হাঁপায়; মনে হয় রেগে আছে। ওরা রেগেই থাকে, নিশান পেয়ে চলে, সেও যেন রাগত ভাবে।

আমি চোখের পাতা খুলেছি আর দেখেছি। একবার প্লাটফর্মটায় পায়চারি করেও এলাম। তখন সব ঠাণ্ডা, নিথর। কয়েকজন কুলী-কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, দপ্‌দপ্‌ করছিল সিগন্যালের আলো। তারবাবু সোজা হয়ে বসে টরেটক্কা করছিলেন।

আবার এসে শুয়েছি হেলানো চেয়ারে। অস্বস্তি যায়নি। অস্থিরতা বোধ করছি। এ কী অনিদ্রা রোগ আমাকে পেয়ে বসল। কেন ঘুমোতে পারছি না, কেন এই ভয়? ওয়েটিং রুমে মাঝে মাঝে কারা আসছিল, খানিক বসে হাত-পা ছড়িয়ে, ঘুমিয়ে কিংবা না ঘুমিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল। খুব মৃদু স্বরে কথা বলছিল কেউ কেউ, কী বলছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রতিটি পায়ের শব্দে পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়েছি, আচ্ছন্ন চেতনা, আবিল দৃষ্টি, সব ছায়া-ছায়া দেখছি। ভয়ে আড়ষ্ট, আমি ভেবেছি, ওরা সরে যায়না কেন। আবার সরে গেলেও চমকে উঠেছি। একাকিত্ব নামে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস এই ঘরেরই কোথাও লুকিয়ে আছে, হয়তো ওই হ্যাট র‍্যাকটার পিছনে কিংবা মানুষ-প্রমাণ টেবিলটার তলায়, সে আমাকে এবার গ্রাস করবে। ভাগ্যিস্, কারা ভারি ভারি মেল ব্যাগ এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ঠেলে নিয়ে গেল, সেই ঘর্ঘর শব্দে আমি ভরসা পেলাম, নইলে বুঝি বা মূর্ছাই যেতাম! সকালে ওঠেই চোখে-মুখে ভাল করে জল ছিটিয়ে দিয়েছি। চেহারা দেখেছি আয়নায়। ছি, ছি, চোখের কোলে এত কালি! তারপর চায়ের ঘরে কী ঘটল আগেই বলেছি। আমার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল, চেয়ার থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম! চোখে সূচগ্র বিরক্তি আর বিস্ময় নিয়ে ওরা আমার দিকে চেয়েছিল। আমার মনের ভিতরে কী ঘটছিল বলতে পারব না, আমি এ ব্যাপারটা জানতাম, যেন জানতাম। কাল সারারাত জুড়ে আমার মনে কালো পিঁপড়ের মত ভয় ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে, ছেয়ে ফেলেছে, দংশন করেছে। সেই ভয়ের উৎসে আমি নিমেষে পৌঁছে গেলাম।

আচ্ছন্ন অভিভূতের মত আমি চায়ের ঘর থেকে উঠে এসেছি। খেয়াল হতে দেখি, বসে আছি রেলপুলিশের ঘরে। আমার স্যুটকেসটা আমারই সামনে রাখা, টেবিলের ওপরে।

মনে আছে, পুলিশ অফিসারটি মাথা নীচু করে কী লিখছিলেন, আমাকে দেখে মাথা তুললেন। একটু অবাক হয়ে থাকবেন, কিন্তু আমাকে বুঝতে দিলেন না, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে আবার লিখে চললেন।

আমি বসে আছি। মাথার উপর পাখা ঘুরছে, দেখছি ঘড়ির কাঁটা সরছে, ওঁর লেখা আর শেষ হয়না। একজন সেপাই এসে দাঁড়াল, সেলাম করল, ক্লিক করল গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে, শুনতে পেলাম। লেখা কাগজটা তার হাতে তুলে দিয়ে অফিসার আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ভারি-ভারি গলায় বললেন, বনরেখা রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে কী বলবেন, এবার বলুন।

এবার অবাক হবার পালা ছিল আমার। অফিসারটিও সেকথা বুঝে থাকবেন। হেসে বললেন, ভাবছেন, এ বিষয়ে আপনি কথা বলতে এসেছেন কী করে বুঝলাম, শুয়েল, আমরা সবাই শার্লক হোমস নই, কিন্তু হতে সাধ সবারই অল্প বিস্তর আছে। ছোটখাট চমক দেওয়া আমার অভ্যাস। অথচ আমরা সামান্য পুলিশ, আপনাদের ডিটেকটিভ বইয়ে যারা মূঢ় হাসি-ঠাট্টার পাত্র। গোয়েন্দা গল্প পড়ে নিশ্চয় আপনাদের ধারনা হয়েছে আমরা ইট-কাঠের মতই নিরেট, খুন-টুনের কিনারা এ দুনিয়ায় শুধু সখের গোয়েন্দারাই করে।

তা নয়, শ্রীলা দেবী, আমরাও করি। বেশি বড়াই করেছি বলে যদি মনে না করেন, তবে বলি আমরাই করি। সামান্য যা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাই খাটাই। আর মনে মনে মানবেতর জীব বলে গালাগাল দিতে চান দিন, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ পুলিশের, পশুর মত ইনট্যুইশন, মানে সহজাত বোধিও আছে। তা দিয়েই অনেক সময় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি, দু-চারটে লেগেও যায়।

অফিসারটি সিগারেট ধরিয়ে আবার বললেন, আপনার নাম জানতে অবিশ্যি বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় নি, আর ও বস্তুটি ইনট্যুইশন দিয়েও জানা যায় না।

সামুদ্রিক বিদ্যা দিয়েও হয় তো যায়, তবে আমি চোখ দিয়েই জেনেছি। নেহাত নিরক্ষর ত নই, আপনার স্যুটকেসের ওপরেই যে লেবেল লাগিয়েছেন

তাতে আপনার নাম লেখা আছে। এবার বলবেন, বনরেখা রায়ের সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান, ধরলুম কী করে? ফ্রাঙ্কলি বলব, ওটা আন্দাজ। খানিকটা, পুরোপুরি নয়। আপনার নামের নিচে লেখা আছে পাটনা। বনরেখাও ওখানে থাকতেন। দিলাম ঢিল ছুঁড়ে। লাগল: না লাগলে আপনি প্রতিবাদ করতেন; এখনত করেননি।

আমার কপালে ঘাম ফুটছিল। অফিসারটি বললেন, আর দেখুন, রেলপুলিশের ঘরে মেয়েরা সচরাচর আসে না।

আপনি এলেন। এই জংশনে আজ গোলমেলে কিছু ঘটে নি, ঘটলে হৈ-চৈ হত, আমরা এমনিতেই জানতাম। অতএব আপনি এমন কোন বিষয়ে কিছু বলতে চান, সেটা এখানে নয়, অন্য কোথাও ঘটেছে। যে ঘটনার কথা আপনি এইমাত্র জানতে পেরেছেন। সেটা কি হতে পারে? আপনাদের যাত্রীদের জানবার একটা উপায়, প্রায় একমাত্র উপায়, খবরের কাগজ। সেই কাগজেই শ্রীলা দেবী, আজ বনরেখা রায়ের মৃতদেহ আবিষ্কার ছাড়া চাঞ্চল্যকর খবর আর কিছু নেই। সিগারেট নিবিয়ে অফিসারটি পাখাটাকে আরও জোরে চালিয়ে দিলেন। বললেন, অবশ্য, আন্দাজ আমার ঠিক নাও হতে পারত। কিন্তু ঠিক যখন হয়েছে, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার আপনার কথা বলুন।

তখনকার মত আমি শুধু বলতে পারলাম, এক গ্লাস জল।

সমস্ত গ্লাসটা ঢক্ ঢক্ করে নিঃশেষ করে আমি অফিসারটির হাতেই তুলে দিলাম। আমার হাত তখনও থর থর করে কাঁপছিল।

শ্রীলা দেবী, আপনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। তবু আপনাকে স্থির হতে হবে। অফিসারটির গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি, একটু সাহসও যেন পেয়েছি।

বনরেখা রায়কে আপনি কতদিন থেকে জানতেন?

তিনি আমার ঘনিষ্টতম বন্ধু ছিলেন।

আর?

মনে আছে, গুছিয়ে বলতে পারি নি, আমার গলা বারে বারেই কেঁপে গিয়েছে কখনও অকারণে উঠেছে উচ্চগ্রামে, কখনও একেবারে নিচের পর্দায় নেমেছে। তবু জানতাম, আমাকে বলতে হবে। বলতে হবেই। যখনই খেই হারিয়ে গিয়েছে, মাথা তুলে চেয়েছি অফিসারটির দিকে।

ওঁর পেন্সিলটা অক্লান্ত চলছিল। মাথার ওপর পাখাটাও অক্লান্ত

চলছিল, আর গমগমে ষ্টেশন ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিং এর বিরাম ছিলনা।

বনরেখা আমার বাল্যসখী। কলকাতার একই পাড়ায় আমাদের বাসা ছিল, একই স্কুলে পড়েছি একই ক্লাশে।

সে ফার্স্ট হত, আমি হতাম সেকেণ্ড।

আপনি কোনবার ফার্স্ট হন নি।

না, একটু লজ্জা পেয়েছি যেন। আবার বলেছি, একবারও না। আমি সেকেণ্ড হতাম বটে, কিন্তু বনরেখা আমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে ছিল। একটু থেমে আমি আবার যোগ করলাম, শুধু লেখা পড়ায় নয়, সব বিষয়ে।

অফিসারকে বলতে শুনলাম, অর্থাৎ?

আমি এসেছি প্রাণের তাগিদে, অদৃশ্য কোন দৈবশক্তির প্রেরণায়। বলতেই তো এসেছি, তবু লোকটা জেরা করছে কেন? বিরক্ত গলায় বলছি, অর্থ আপনিই করে নিন। আভাসে বললে আপনি তো বোঝেন না। বেশ সোজাসুজি বলছি, লিখে নিন। বনরেখা রূপে শুধু আমাকে কেন, বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই হার মানাতে পারত।

ওদের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভাল। যে-মামার বাড়িতে আমি খেয়ে-পরে মানুষ, তিনি ওদেরই ভাড়াটে ছিলেন। ওই পাড়াতেই ওদের আরও দু-তিনটে বাড়ি ছিল বলে শুনেছি। আমার নিজের পড়ার বই প্রায়ই কেনা হত না, বনরেখার কাছ থেকে ধার করে এনে পড়তাম। বরাবরই ওর খুব উদার মন, কখনও কিছু মনে করত না। এমনকি আমাকে অনেকবার বলেছে, তোর নিজের বই নেই বলেই তুই ফার্স্ট হতে পারিস না। থাকলে আমাকে নিশ্চয় হারিয়ে দিতিস। টিফিনের সময় ওর জলখাবার আমরা দু'জনে ভাগ করে খেতাম। এছাড়া মাঝে মাঝে কত ছোটখাটো প্রেজেন্ট ও আমাকে দিয়েছে তার হিসেব নেই। বড় হয়েও আমাদের বন্ধুত্ব যায় নি। আমরা কলেজেও একই সঙ্গে পড়ি। সেখানেও আমাকে ও অনেক সাহায্য করেছে। তবে আমাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়েছিল তো, আমি সকালে-বিকেলে দুটো টিউশানি নিয়েছিলাম। তাই কোনক্রমে পাসকোর্সে বি-এ পাশ করলাম, ও উঁচু অনার্স পেল। পরেও এম-এ আর বি-টি ও পাশ করেছিল।

আর আপনি? বিয়ে করলেন?

অফিসারটির অশোভন প্রশ্নে বিব্রত, একটু বিরক্ত ও হয়ে উঠেছিলাম। আমি এসেছি বনরেখার শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলব বলে, অপ্রয়োজনীয় নানা প্রসঙ্গ তুলে ওর লাভ কী? সময় নষ্ট করতে পুলিশের জুড়ি নেই।

তবু মনের ভাব গোপন করতে হল। বিরক্তিটা যথাসাধ্য চেপে বললাম, না। বরং বনরেখাই বিয়ে করেছিল।

কবে শ্রীলা দেবী, কতদিন আগে?

পড়তে পড়তেই।

কাকে বিয়ে করলেন বনরেখা দেবী? কোন সহপাঠী কে?

লোকটার কিছু সহজাত বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। বললাম, হ্যাঁ। তার নাম প্রসাদ রায়।

আপনি তাকে চিনতেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললাম, চিনতাম।

ঠিক ঠিক বলতে গেলে, প্রসাদের সঙ্গে আমিই বনর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

ঘটকালি?

এ কথার উত্তর দিলাম না। নির্লজ্জ না-ছোড় লোকটা আবার বলল, এইবার, বলুন তো শ্রীলা দেবী, এই বিয়ে কি সুখের হয়েছিল?

এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। ঝোঁকের সঙ্গে বলে উঠেছি, মাপ করবেন, অন্যের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে খবর রাখা আমার বৃত্তি নয়।

লেখা থামিয়ে অফিসারটি টেবিলের উপর পেন্সিলটা বাজালেন। মনে হল, হয় তো একটু অপ্রতিভ হয়েছেন। একটু পরে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, সত্যিই আমার অপরাধ হয়েছে শ্রীলা দেবী। আপনি ক্লান্ত, শোকাতুর, সে কথাটা মনে ছিল না।

ভাবলাম, এবারে উনি বলবেন, আচ্ছা যেতে পারেন। ছুটি পেয়ে আমি নির্জন কোন একটি কোণ খুঁজে নিয়ে একটু কাঁদব, একটু ঘুমিয়ে নেব।

অতটা আশা করা ভুল হয়েছিল। অফিসারটি আমাকে ছুটি দিলেন বটে, কিন্তু সাময়িক ভাবে। বললেন, আপনি ওয়েটিংরুমেই ফিরে যান শ্রীলা দেবী। শুধু একটা অনুরোধ আছে। পরের গাড়ীতেই যেন পাটনায় চলে যাবেন না। আমাদের চীফ পূর্ণেন্দু মৌলিকের নাম শুনেছেন? তিনি খবর পেয়ে গিয়েছেন ধানবাদে। ওই সেকটরেই খুনটা হয়েছিল কিনা।

অকুস্থলের তদন্ত সেরে বোধ হয় শিগগিরই ফিরে আসবেন, এখানেই। তিনি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হলে হাতে স্বর্গ পাবেন।

চীফ মৌলিক সত্যিই ভদ্রলোক। অসাধারণ চেহারা, অনেকদিন বাড়ীতে রাখা পাকা আমের মত রঙ। বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রীলা দেবী। আপনি নিজে থেকে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন, কিভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না। আমাদের পক্ষে আপনিই হবেন মেটিরিয়াল উইটনেস।

বলতে বলতে পকেট থেকে কাগজ পত্র বের করলেন মৌলিক সাহেব। খাপ থেকে চশমা বার করে নাকের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে বললেন। বাড়ি সার্চ করে, মৃতের জিনিষপত্র ঘেঁটে, কলকাতায় আর পাটনায় তার করে আমরা সামান্য কিছু খবর সংগ্রহ করেছি, আপনাকে পেয়ে ভালই হ'ল। আমরা মোটামুটি যে তথ্য দাঁড় করিয়েছি, আপনাকে বলছি। আপনি কনফার্ম করবেন। যেখানে মনে হবে আমাদের ভুল হচ্ছে, শুধরে দেবেন। শুনুন।

মৃত বনরেখা রায়ের বয়স আঠাশ কি উনত্রিশ, এম, এ, বি-টি। পাটনার গার্লস ওন স্কুলের" প্রধানা শিক্ষয়িত্রী; পাটনাতেই স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন। স্বামী বিশেষ কিছু করে বলে মনে হয় না। শ্রীলা দেবী, ঠিক বলছি ?

আমি বললাম, ঠিক।

প্রসাদ আর বনরেখার বিয়ের পরের ঘটনা আমার মনে ছবির মত ভাসছিল। ওরা গোপনে বিয়ে করবার পরেও অনেকদিন ঘটনাটা জানাজানি হতে দেয় নি। যখন হল, তখন কী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল ওদের রক্ষণশীল পরিবারে। বাড়ীর সেরা মেয়ে বনরেখা, তার জন্যে ওঁরা রাজপুত্র গড়বার ফরমাস দেবেন ভাবছিলেন, সেই সময়ে এই বিপত্তি। মা কেঁদেছিলেন, বনরেখা টলেনি বাবা তর্জন করেছিলেন, ও ভাঙেনি! সেই সময় ওর অসামান্য মনের জোর দেখেছি! ওর দাদা নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, প্রসাদটা তো একটা লোফার। তোর বন্ধু শ্রীলার সঙ্গেই ঘুরতো বলে শুনেছি। ছি-ছি, বন, তুই একটা বাজে লোকের—

দাদা! বনরেখা শালীনতা ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

ওর দাদাও সমানে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, ঠিক বলছি। আমি জানি, ও কী চায়। তোকে নয়, আমাদের টাকা।

বনরেখার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। ও কাঁপছিল।

ওর বিষয়ী কাকা তখন বলেছিলেন, এখনও উপায় আছে। এ বিয়ের বিচ্ছেদ হতে পারে। তুই মনটা যদি শক্ত করিস, আমি উকিলের পরামর্শ নিতে পারি।

বনরেখা তার মন শক্তই করেছিল। যারা লোফার বলেছে প্রসাদকে, যারা তাকে সন্দেহ করেছে অর্থ-লোলুপ বলে, তার মনুষ্যত্বকে এক কড়ার মর্য্যাদাও দেয় নি। এক কাপড়ে সেদিনই তাদের আশ্রয় ছেড়ে এসেছে।

মনে মনে ওর মনের জোরকে সেদিন নমস্কার জানিয়েছি। বারবার কামনা করেছি ওরা যেন জয়ী হয়। প্রসাদ আমার প্রতি সুবিচার করেনি, তবুও।

কলকাতায় প্রথম দুবছর দেখেছি। কী কায়ক্লেশে কেটেছে ওদের সংসার। প্রসাদ অনেক ঘোরাঘুরি করেও একটা কাজ জোটাতে পারে নি। বনরেখা গোটাতিনেক টিউসানি নিয়েছিল, অবসর সময়টুকুতেও বিশ্রাম না নিয়ে পড়া তৈরি করেছিল এম, এ, পরীক্ষার। পরে বি-টিও ভালভাবে পাশ করল।

বাপের বাড়ী থেকে কতবার ওকে ফিরিয়ে নিতে লোক এসেছিল, যায় নি। গেল একেবারে শেষের দিন, পাটনার স্কুলটিতে হেড মিসট্রেসের পোষ্টটা পেয়ে মাকে এসে প্রণাম করে।

আমি নিজে তখনও অকূল পাথারে ভাসছি। সেই টিউসানিই করছি, একটা যায়, আর একটা ধরি। আমার বিদ্যের দৌড় তো বি-এ অবধি। শুধু ওইটুকু সম্বল করে এখানকার মেয়েরা আর ভাল কিছু জোটাতে পারে না। নির্ভর যোগ্য একটা বর পর্যন্ত না। মনে পড়ল, শেষ টিউসানিটাও যেদিন হাত ছাড়া হল, মামীমা বেশী রাত করে বাসায় ফেরার জন্য খোঁটা দিলেন, ঠাণ্ডা ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন, সেদিন আমিও ঠিক করে ফেললাম, আর নয়।

পাটনার একটা টিকিট কিনে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। বনরেখা বদলায় নি। একটু ভারিক্কী হয়েছে, পদোচিত গাম্ভীর্য এসেছে মুখে কিন্তু মনের প্রসন্নতা যায় নি। একটি সুস্থ-সুন্দর শরীরে মধ্য-যৌবনকে ধরে রেখেছে।

আমাকে দেখে খুশি হল। সব শুনে বলল, তাই তো, কী করি। যাক, দুচারদিন এখানে থাক তো। ব্যবস্থা একটা হবেই।

এবং ব্যবস্থা সে একটা করে দিলও। ওদেরই স্কুলে। কোন টিচারের পোষ্ট তখন খালি নেই, একটা কেরানীর কাজ ছিল। সেইটে আমাকে দিতে ওরকতো সঙ্কোচ! বারবার বলেছে, শ্রীলা, এ-কাজ তোর যোগ্য নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, সুবিধে পেলেই তোকে—

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত, উপকৃত আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, বন, তুই আমার জন্য যা করলি, সেই ঋণ আমি জীবনেও শোধ দিতে পারব না।

আজও কি পেরেছি?

ওর পাশাপাশি একটা বাসায় আমার থাকবার জায়গা ঠিক করে দেয় বন। পুরো কোয়ার্টার নয়, ছোট একখানা ঘর।

যদি সেই সময়ে আমার মনে কিছু ছায়া ফেলে থাকে, তবে সেটা ওদের দাম্পত্য জীবনের ছোট খাটো ছবি। গোয়েন্দাগিরি আমার স্বভাব নয়, তবু হঠাৎ মাঝে মাঝে যেটুকু চোখে পড়েছে, তা থেকে আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে, ওরা সুখী হয় নি। বন কিছু বলতে চাইত না। প্রসাদও আমাকে কিছু বলে নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে প্রসাদ যেন একটু এড়িয়েই চলত, মুখোমুখি পড়ে গেলে জরসর হয়ে যেত, ও বুঝি তখনও ভুলতে পারে নি: আমাকে অকস্মাৎ একদিন ছেড়ে দিয়ে ও বনরেখাকে অবলম্বন করেছিল।

সে সব তো কবেকার কথা কবেই চুকে গিয়েছে। আমিও কি সেই আঘাতের বেদনা একেবারে ভুলে থাকতে চাইনি?

ওদের ঝগড়া প্রায়ই হত। নিষ্ঠুর কুৎসিত বচসা। আমি টের পেতাম। কতদিনই তো দেখেছি, বনরেখার মুখ থমথমে, গম্ভীর। শক্ত মেয়ে, তাই। অন্য কেউ হলে কেঁদে-কেটে অনর্থ করত।

প্রসাদ পাটনায় এসেও সুবিধা করতে পারে নি। জুয়া খেলত, রাত কাটাত বাইরে। রেস খেলত। যেদিন জিতত, সেদিন হাত উপুড় করে খরচ করত, হারলে বনরেখার কাছেই সেই হাত চিত করত।

তখনই অনর্থ শুরু হতো।

কতদিন শুনতে পেয়েছি, বনরেখা দাঁতে দাঁতে চেপে বলেছে, দেবো না, আর এক পয়সা দেবো না আমি। প্রসাদ বলেছে, আলবাত দেবে, আরও বিশ্রী সব ইঙ্গিত করেছে, সেক্রেটারির ছেলে মহাবীরের সঙ্গে বনরেখার গূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত ক'রে, চটে গেলে, বিশেষত মদ খেলে, ওর হুঁস থাকত না, মুখের আগলও না।

বনরেখাকে বলতে শুনেছি, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি! প্রসাদ বেরিয়ে যেতও। ঠিক তখনই নয়। হয় তো কিছু পরে। কলকাতায় এসে দিনকতক গা-ঢাকা দিয়ে থাকত। পরে হয়তো আট-দশদিন পরে, কোন শনিবার রেসে কিছু টাকা রোজগার করে নির্লজ্জ লোকটা আবার পাটনায় আবির্ভূত হত।

বনরেখার জন্য গভীর মমতা বোধ করেছি।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের ফাঁকিটা শহরসুদ্ধ একরকম জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এসব বেশিদিন চাপা থাকে না। দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরামর্শ দিয়েছে। আমরণ একটা দুর্গ্রহের জের টেনে চলে লাভ কী। কিন্তু রহস্যময় কোন টানে, বা অন্য কী কারণে, জানি না, বনরেখা কোনদিন রাজি হয় নি। বলত, না না, ছিছি। আমরা শিক্ষা বিভাগের লোক। এসব স্ক্যাণ্ডাল হলে সব মান খোয়াব। লোকের কাছে কি মুখ দেখাতে পারব?

যুক্তিতে জোর ছিল। তবু, আমার বরাবর মনে হয়েছে, ওর অনিচ্ছার কারণ অন্য। যে আকর্ষণে একদিন সব ছেড়ে প্রসাদের সঙ্গে চলে এসেছিল, সেটা ক্ষয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ফুরোয় নি। মৌলিক সাহেবকে আভাসে এ-সব কথাই বলতে হল। উনি জেরা করে করে জেনে নিলেন। চেয়ারটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে অবশেষে বললেন আমরা কিছুকিছু জেনেছিলাম বাকীটাও নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের গোচরে আসত। শ্রীলা দেবী, আপনার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু খবর পেয়ে ভালই হল, থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্ এ লট্।

কিন্তু তখনও ওঁর জিজ্ঞাসা ফুরোয় নি একটু জিরিয়ে নিয়ে, আমাকেও একটু জিরোতে দিয়ে আবার একটি একটি করে অনেক কথা জানতে চাইলেন। আমাকে আবার যা জানি, বলতে হল।

এবার পূজার ছুটিতে আমরা একসঙ্গেই কলকাতা এসেছিলাম। বাপের বাড়ির সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া তো হয়েই গিয়েছিল, ওখানে বনরেখার উঠতে আর বাধা ছিল না। আমার মামার বাসাও কাছেই। রোজই আমাদের দেখা হত। এখানে মৌলিক সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, বনরেখার স্বামী? প্রসাদ রায়? সে আসে নি? একবার ইতস্তত করে বললাম না, শ্বশুরবাড়িতেই ওকে কেউ পছন্দ করে না, সে বোধটুকু ওর

ছিল। মৌলিক সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করে কথাটা শুনলেন,—আইসী। বেশ, বলে যান।

বললাম, ছুটি ফুরিয়ে এল। ঠিক ছিল এক সঙ্গেই আমরা পাটনা ফিরব। কিন্তু সাতদিন আগে আমাকে আগ্রা যেতে হল। বনরেখাকে বললাম, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে ভাই। তুই আলাদাই যা। সে বলল, তা কেন শ্রীলা। তুই শনিবার আসানসোল এসে থাকবি, আমি ওখান থেকে তোকে তুলে নেব।

বন্দোবস্ত ফাঁক ছিল না, আগ্রায় কাজ চুকিয়ে আমি কাল সকালেই ফিরতে পেরেছি—

আগ্রায় আপনার কী দরকার ছিল? অবশ্য গোপনীয় কিছু হলে জানতে চাইব না। একটুখানি চুপ করে থেকে বললাম, না, বলতে কোন বাধা নেই। চাকরির একটা ইন্টারভিউ ছিল। নিজের অজ্ঞাত সারেই কখন চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছে, হঠাৎ টের পেলাম। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠেছি, এ খেদ আমার মরলেও যাবে না। ইন্টারভিউ দিলাম, কিন্তু চাকরিটা আমার বোধ হয় হবে না। অথচ একসঙ্গে এলে, জানি না, হয়তো, হয় তো বনরেখা বাঁচত, অন্তত এভাবে তার মৃত্যু হত না। মৌলিক সাহেব মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, বললেন, সবই বিধিলিপি, বাকিটা বলুন, তাও বললাম।

বিকেলের দিকের এক্সপ্রেসটা বনরেখা এল। আমি প্লাটফর্মেই ছিলাম। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি বললাম, এ গাড়ি কেন রে, এটা মেন লাইনের নয়, গ্রাণ্ড কর্ড দিয়ে যাবে। বনরেখা হেসে বলল, জানি। আমি ওখানে নামছি না, বরাকরে যাচ্ছি, দাদার ওখানে। খালি দেখা করেই ফিরে আসব, সন্ধ্যারপরের যে কোন একটা গাড়িতে তুই এখানেই থাকিস্, আমরা রাত্রে পাঞ্জাব মেল ধরব। বললাম, আচ্ছা।

মৌলিক সাহেব, মনে হয়েছিল, ঝিমুচ্ছেন। কিন্তু পরে বুঝলাম, কান দুটি তাঁর সজাগই ছিল। থামতেই বললেন, তারপর? নিজেই হাসলেন। আপনাকে আর বলতে হবে না। আমিই বলছি মিলিয়ে নিন, বিকেল গেল, সন্ধ্যা হল, বনরেখা ফিরল না। রাত্রি হল। আপনি একের পর এক ডাউন ট্রেন দেখছেন, বনরেখা কোনটাতেই নেই। তারপর একের পর এক আপ মেল আর এক্সপ্রেসগুলোও এল, গেল। পাঞ্জাব মেলও যথা সময়ে

চলে গেল। আর আশা নেই দেখে আপনি—খুব সম্ভব ওয়েটিংরুমেই ফিরে এলেন। তাই না?

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম ঠিক তাই! তারপর আজ সকালের কাগজে দেখলেন, সীতারামপুর আর বরাকরের মাঝামাঝি জায়গায় ওই এক্সপ্রেস গাড়ির একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় কোন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। রেলেরই একজন বড় অফিসার ওই গাড়িতে সীতারামপুর থেকে উঠেছিলেন। এই এক্সপ্রেসটার ওখানে দাঁড়াবার কথা নয়, তবু কাল দাঁড়িয়েছিল।

অফিসারটির ধানবাদে জরুরী কাজ সুবিধা পেয়ে তিনি টপ করে ওই গাড়িতে উঠে পড়লেন। কামরার আলো নেবান, সুইচ টিপলেন। ট্রাঙ্কটাকে সিটের নীচে রাখবেন বলে ভিতরের দিকে ঠেললেন। ট্রাঙ্কটা ঢুকল না। আবার ঠেললেন এবার আরও জোরে। ট্রাঙ্কটা যেন স্প্রিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। এবার অফিসারটি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন, তাঁর কপালে এই শরতের শেষের দিকেও ঘাম জমে উঠল। তবু ট্রাঙ্ক সরে না। তখন হাঁটু ভেঙে নিচে বসলেন তিনি, যা দেখলেন, তাঁর রক্ত জমে জমে বরফ হয়ে যেতে পারত। সিটের নিচে একটি মহিলার মৃতদেহ। ওখানে বসেই তিনি নিজের বুকের রক্ত-চলাচলের ধ্বনি যেন শুনতে পেলেন। গাড়ি পূর্ণ বেগে চলছে। বরাকরের ব্রীজ সামনেই। সমস্ত সাহস, দৃঢ়তা, ইচ্ছা একত্রে গ্রথিত করে অফিসারটি চেন টানলেন, গাড়ি থামল। এল গার্ড, সামনের ছোট ষ্টেশনে খবর গেল। তারে তারে খবরটা রাষ্ট্র হল। ওখানেই লাশ নামান হল। তার টিকিট থেকে এবং ব্যাগ হাতড়ে নাম-ধাম, পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীলা দেবী, এ সমস্তই আপনি কাগজে পড়েছেন। তবু ভয় পাচ্ছেন কেন? নিন, এই কফিটা খেয়ে নিন। অনেকটা সুস্থ বোধ করবেন। যন্ত্রচালিতের মত গরম কফির কাপটা হাতে নিলাম। চুমুক দিলাম। অবসন্ন গলায় বললাম, এবার যাই?

মৌলিক সাহেবও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন সচকিত হয়ে উঠে বসে বললেন, আপনি আমাদের অনেক উপকার করলেন শ্রীলা দেবী, কাজ অনেক সহজ হল, আপনি এই তুফানেই ফিরছেন? ঠিকানাটা রেখে যান, কেস উঠলে আপনাকে হয়তো দরকার হবে। সাক্ষী দেবেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন মৌলিক সাহেব। নমস্কার করে বললেন, আবার দেখা হবে।

হঠাৎ কী হল, আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, বনরেখা এখন কোথায় ?

মৌলিক সাহেব খুব অবাক হয়েছেন, এমনভাবে বললেন, সে কী ! সব জেনে এই কথা বলছেন ? আঙ্গুল তুলে তিনি আকাশটা দেখিয়ে দিলেন।

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না-না, সে কথা বলি নি। ও, দেহটা ? ওঁর আত্মীয় স্বজনেরা খবর পেয়ে গেছেন, তাঁরা বোধহয় পরের গাড়িতেই সবাই আসছেন। শুধু ওঁর স্বামীর কোন খোঁজ পাইনি। শ্রীলা দেবী, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, প্রসাদ রায় এখন কোথায় ?

বললাম, না। তবে যতদুর জানি, সে হয়তো পাটনাতেই। কাল আপনার সঙ্গে যখন বনরেখা দেবী জানলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন ওঁর কামরায় আর কেউ ছিল ? আবার সেই জেরা। জেরার পর জেরা। ওঁর হাত থেকেই রেহাই পেতেই মুখে যা এল তাই যেন বলে দিলাম। —ছিল। যতদুর মনে পড়ছে, একজন ছিল। একেবারে ওধারের সিটে, একজন ভদ্রলোক। কেমন দেখতে তিনি, কি পোষাক পরেছিলেন? বললাম বলতে পারব না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। এইটুকু মনে আছে। আমি ভাল করে দেখতে পাই নি। ওর কামরায় তখনও আলো জ্বালান হয় নি। ভদ্রলোকের পরণে পা-জামা ছিল, যতটা মনে করতে পারছি, বেশ লম্বা, চওড়া, সুপুরুষ।

আচ্ছা শ্রীলা দেবী, প্রসাদ রায় দেখতে কেমন ?

কেন, বেশ লম্বা চওড়া সুপুরুষ—

মৌলিক সাহেব হেসে উঠলেন। সেই হাসির ধরণটা আমার একেবারে ভাল লাগল না। বিশেষ করে মৌলিক সাহেব হাসি থামিয়ে যখন বললেন, আপনি কি শপথ করে বলতে পারবেন, শ্রীলা দেবী যে যাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন সে প্রসাদ রায় নয় ? আমার মুখ শুকিয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে, অসতর্কভাবে আমি কি তবে প্রসাদকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেললুম। ছিঃ, তাই যদি হয়, তবে আমার অনুশোচনার যে অবধি থাকবে না। কম্পিত গলায় বললাম, মিস্টার মৌলিক, আমি তো শুধু লম্বা-চওড়া, আর সুপুরুষ বলেছি। ওরকম ভাসা-ভাসা বর্ণনা থেকে আপনি তো হাজার হাজার লোককে ভবে সনাক্ত করে বসবেন ? মৌলিক সাহেব হা-হা করে

হাসলেন। —ওইখানেই ভুল করলেন। সনাক্ত আমি কাউকে করছি না। তবে হ্যাঁ, সন্দেহের একটা দিক আছে, সেটা ভেবে দেখতে হয় বই কি। আমরা কিভাবে সন্দেহ করি জানেন?

ভয়ে ভয়ে বললাম, কী ভাবে? ডাক্তার যেভাবে রোগ নির্ণয় করেন, সেই ভাবে। অর্থাৎ লক্ষণ আর নজির মিলিয়ে। শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে ভুল হয় না। ধরুন, আমরা প্রথমে বিচার করি, মৃতের শত্রু কে বা কারা ছিল। কার সঙ্গে তার তুমুল কলহ হয়েছিল, বা হয়ে থাকে। মৃত্যুর ক'দিন আগে। তারপরে প্রশ্ন উঠে, মৃত্যুতে কার বা কাদের লাভ হল, কার পথের কাঁটা দূর হল, কে পাবে উইল বা ইন্সিওরেন্সের টাকা। শ্রীলা দেবী, এখানেই আসে আত্মীয়-কুটুম্বের কথা। এই 'হুডানিটে'র অর্থাৎ 'কে করেছে'র পদ্ধতির পরের প্রশ্ন, কার সুযোগ সবচেয়ে বেশী ছিল। কে বা কারা অকুস্থলে ঘটনার সময়ে ছিল, কে-কে ছিল না। যারা ছিল না, তারা বেকসুর খালাস। তবে এই অনুপস্থিতি বা আমরা যাকে বলি alibi, প্রমাণ করা শক্ত, এতটুকু সন্দেহের অবসর থাকলে চলবে না। আর একটা ছোট প্রশ্ন থাকে, সেটা জানলে তদন্তের সময় আমাদের সুবিধা হয়। মৃতকে সবচেয়ে শেষে কে জীবিত দেখেছে। আর, মৃতদেহটি প্রথমে কার চোখে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এ দু'জনকেই জানি। বনরেখাকে শেষবার জীবিত দেখেছেন আপনি, আসানসোলে মৃতদেহ প্রথম চোখে পড়ে রেলওয়ে অফিসারটির। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে জানা গেল, ঘটনাটা আসানসোল থেকে সীতারামপুরের মধ্যেই কোথাও ঘটেছে। শ্রীলা দেবী, আপনার সাক্ষ্য নির্ভুল হয়, তবে সময়টুকুর মধ্যে ওই কামরায় লম্বা, চওড়া বলে যাকে বর্ণনা করেছেন, সে ছাড়া কেউ ছিল না। সেই লোকটি যদি দেখতে প্রসাদের মত হয়, তবে অবশ্যই আমরা খোঁজ নেব, প্রসাদ সেই সময়ে পাটনায় ছিল, না কলকাতায়, না ওই গাড়িতেই!

স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম, প্রসাদকে ঘিরে একটি জাল ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। মরীয়ার মত বলে উঠলাম, কাজটা তো অপরিচিত লোকেরও হতে পারে। মৌলিক হাসলেন। পারে। তবে, সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বা লাভের কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মোটা। নগদ টাকার লোভে গুণ্ডা ধরণের লোকেরা এসব করে বটে, কিন্তু বনরেখা দেবীর সঙ্গে টাকা গহনা ইত্যাদি সামান্যই ছিল। আর, যতদূর বুঝেছি, আততায়ী একটি গহনাও স্পর্শ করেনি, সুতরাং লোভের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে ওঁর হাত ব্যাগ

থেকে দুশো টাকা উধাও হয়েছে। টাকাটা সামান্য, এর জন্যে কেউ মানুষ খুন করবে বলে মনে হয় না। আর একটা কথা আপনাকে বলি শ্রীলা দেবী, যার হাতে বনরেখার প্রাণ গিয়েছে, সে অপরিচিত ছিল না। কিসে বুঝলেন ? তাহলে ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। যে এ কাজ করেছে তাকে বনরেখা চিনতেন। পাশে বসতে দিয়েছিলেন, হয়তো মুখোমুখি বসে গল্প করেও থাকবেন। তারপর সুযোগ বুঝে আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং বনরেখাকে আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও না দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। কণ্ঠনালীতে গভীর দুটি দাগ আছে। থাক বলব না, আপনি আবার ভয় পেয়েছেন। আপনার মন এত দুর্বল ? যাক্, অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, আপনি একটা শুধু খবর বলুন। আপনার মনে আছে. বনরেখা কী রঙের জামাকাপড় পরেছিলেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আছে। সবুজ জর্জেটের শাড়ী, আর লাল ওভার-কোট। আশ্চর্য, মৌলিক বললেন, আশ্চর্য। ঠিকই মিলছে। মৃত দেহেও ওই পোশাকই ছিল। আপনি ছাড়া এই স্টেশনেই ওঁকে আর একজন দেখেছে। গাড়ির কণ্ডাক্টর গার্ড। তাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে বনরেখা বরাকর থেকে ফেরবার গাড়ী কখন কখন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এর মধ্যে আশ্চর্য কোনটা ? আশ্চর্য এই পোশাকটা। শ্রীলা দেবী, এই অক্টোবরের শেষে, দিনের বেলায় এই অঞ্চলে এখনও পাখা চালাতে হয়, কেউ কি ওভার কোট পরে ?

বনরেখা ভারি শীতকাতুরে ছিল। আমি বললাম। মৌলিক আমাকে নিজে গাড়িতে বসিয়ে দিলেন। ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, উনি আস্তে আস্তে বললেন, প্রসাদকে আমরা স্বভাবতই সন্দেহ করব, শ্রীলা দেবী ! কিছু মনে করবেন না। পুরনো কথা আপনি হয়তো একেবারে ভুলতে পারেন নি, প্রসাদকে এখনও স্নেহ করেন. বা প্রীতির চোখে দেখেন—

না—না, আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

সে কথায় কর্ণপাত না করে মৌলিক বলে গেলেন, তাই তাকে বাঁচাতে চাইছেন। আর, আপনি হয়তো জানেন, গোয়েন্দা কাহিনীতে প্রথমে এবং সহজেই যার ওপর সন্দেহ আসে, সে সাধারণত অপরাধী হয় না। আসল জীবনে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। অন্তত আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাই বলে। প্রথম অনুমানটাই খাঁটি হয়। অতএব, শ্রীলা দেবী, প্রসাদ রায়কে আমরা খুঁজে বার করবই। এইটুকু জানি, গতকাল সে পাটনায় ছিল না।

কলকতায় ছিল কিনা, তাও জানতে আমাদের দেরী হবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। উনি কয়েক পা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আবার দেখা হবে।

উনি বললেন, নিশ্চয়ই।

যত তাড়াতাড়ি দেখা হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়েও কিছু আগেই হল। বোধ হয় দু'তিনদিন পরে স্কুল থেকে ফিরে দেখি, মৌলিক সাহেব। সেই শালপ্রাংশু উন্নত দেহ, কিন্তু বিনয়াবনত ভঙ্গি। বললেন, নমস্কার। এই সন্ধ্যাবেলা পুলিশের লোক—আগন্তুক হিসাবে বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে হল না। তবু বসতে বললাম। কলঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে যেন সাহস ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। ফিরে এসে দেখলাম উনি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছেন। বললেন, এনকোয়ারিতে এসেছি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বললাম, বেশ তো, বসুন।

উনি বসলেন। দেখি, উত্তরদিকের জানলাটার দিকে বারবার চাইছেন। তাড়াতাড়ি বললাম ওদিকেই বনরেখার কোয়ার্টার। বললেন, জানি।

আমি আবার বললাম, আজকাল বন্ধ করে রাখি। মৌলিক সাহেব কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ আমিও না। শেষে নীরবতা ভাঙতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু কিনারা হল? উনি যেন অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন, কিনারা? হ্যাঁ কিনারা প্রায় করে এনেছি। এখন শুধু হাতকড়া পরাতে পারলেই—

কে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তীব্র চীৎকার আমার গলা চিরে বেরিয়ে এল। কে, মৌলিক সাহেব, প্রসাদই বা কি?

মৌলিক রহস্যময় ভঙ্গীতে হাসলেন, প্রসাদ? হ্যাঁ, প্রসাদ হতে পারে। আরও দু'-একটা খবর নিচ্ছি। আপনি কিন্তু একটা জিনিস আমাদের কাছে লুকিয়ে গেছেন, শ্রীলা দেবী, এই পূজার ছুটিটা প্রসাদ কলকাতাতেই ছিল।

ছিল?

মৌলিক ধীরে ধীরে বললেন, ছিল। এও জানি, বনরেখার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হত। বনরেখা দেখা করতে চাইত না, কিন্তু জুয়াড়া, লম্পট লোকটা নাছোড়। মাঝে মাঝে বনরেখার কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা কলকাতাতেও চেয়ে নিত।

আমি জানি।

জানেন, কিন্তু আমাদের বলেন নি। আপনি প্রসাদকে বাঁচাতে চেয়েছেন। গম্ভীর গলায় মৌলিক বলে উঠলেন, আপানাকে সেদিন বলি নি, শ্রীলা দেবী, প্রত্যক্ষ সন্দেহ যার ওপরে পড়ে অধিকাংশ বাস্তব ক্ষেত্রে অপরাধী সেই হয়? তবে শুনুন! প্রসাদের মোটিভেরও অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনি চেপে গিয়েছেন, কিন্তু জেনেছি, শেষের দিকে ওদের কোনরকম দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। ডিভোর্স ঘটিত স্কাণ্ডালের ভয়ও বনরেখা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ অবধি জয় করেছিলেন। এবার কলকাতায় আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতেই এসেছিলেন। উকিলের বাড়িতে গোপনে যখন যেতেন, তখন সঙ্গে কে থাকত জানেন?

কে?

আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারির ছেলে মহাবীর। হয়ত—হয়ত বিবাহটা বিচ্ছিন্ন হলে বনরেখাকে সেই বিয়ে করত। আপনি এদিকটা সম্পর্কে আমাকে বিশেষ কিছুই বলেন নি, শ্রীলা দেবী।

আমার রুচিতে বেঁধেছিল।

অর্থাৎ সত্য গোপন করেছেন। যাক, আমার মুখেই তবে শুনুন। মহাবীরও পুজার ছুটির বেশীর ভাগ সময়েই কলকাতায় কাটিয়েছে। ব্যাপারটা প্রসাদও অনুমান করে থাকবে। ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সেও কলকাতায় যায়।

তারপর?

মোটিভের কথা বলছিলাম। কলকাতায় গিয়ে বনরেখাকে অনেক বোঝায় প্রসাদ, অনেক কাকুতি মিনতি করে। কিন্তু বনরেখা অটল ছিল। প্রসাদকে সে দয়া করে দশ-বিশ টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু আমল দেয়নি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আমার ঘরের পর্দা কাঁপছে, জড়সড় হয়ে চৌকিতে বসলাম। কম্বলটা টেনে দিলাম পায়ের ওপর। বলালাম, অর্থাৎ বলতে চান, হিংসার বশেই প্রসাদ—

উঁহু। শুধু হিংসা নয়। শ্রীলা দেবী, জেনুইন মোটিভও ছিল। বনরেখা বায়ের দশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্সের কথাটা ভুলছেন কেন?

এই টাকাটার নমিনি প্রসাদ, বিবাহ ছিন্ন হলে নিশ্চয়ই নমিনি বদলাত, টাকাটাও বেহাত হত।

সেই মুহূর্তে টের পেলাম, প্রসাদের আর কোন আশা নেই, ফাঁসটা ওর।

গলায় ক্রমশঃ আঁট হয়ে বসেছে। দু'হাতে চোখ ঢেকে আস্তে আস্তে বললাম, ওকে—ওকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন? না, শ্রীলা দেবী। একটুখানি মুস্কিল আছে যে। লোকটার মোটিভ যেমন আছে, alibi-টাও তেমনি যে জোরালো। সেদিন ও যে ওই গাড়ীতে ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং শনিবার ওকে কলকাতায় রেসের মাঠে বিকেলবেলাতেও দেখা গিয়েছে—অন্তত ছ'সাতজন লোক তার সাক্ষী। ও একটা বড় পেমেণ্ট পেয়েছে।

ডবল টোটের দুটো লেগই মিলিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা প্রকাশ্যে একটা বারে বন্ধুদের নিয়ে হল্লা করেছে। একই সময়ে লোকটা দিব্য দেহধারী না হলে দুটো জায়গায় হাজির থাকতে পারে না। ক্রাইম ডিকটেশনে শ্রীলা দেবী, অলৌকিকের স্থান নেই।

সুতরাং?

সুতরাং, আপাতত যতদূর মনে হচ্ছে লোকটা নির্দোষ। তবে কলকাতার পুলিশ ওকে এখনও নজরে রেখেছে। আসলে কেসটার এখন তদন্ত করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, আমরা রেলপুলিশ, তদন্তে সহায়তা করছি মাত্র।

সম্মোহিতের মত শুনছিলাম। হাওয়া আরও জোরালো, আরও কনকনে হয়ে উঠেছিল। বাইরের রাস্তায় কয়েকটা কুকুর বিশ্রী সুরে ডাকছিল। বললাম, এখন আপনাদের তবে কাকে সন্দেহ, মহাবীরকে? মৌলিক বললেন, আপনি বুদ্ধিমতী, মহাবীরকেও সন্দেহ করা যায় বৈকি! বিশেষত, ওর একটা আচরণ তো রীতিমত রহস্যজনক। আপনি কি জানেন, বনরেখার মৃত্যুর দিন থেকে লোকটা উধাও হয়েছে। এখানে নেই, কলকাতায়ও নেই।

নেই?

না। আরও শুনুন, ওর নামে ওই গাড়িতেই একটা বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছিল। তবে ও যে স্টেশনে এসেছে, বা গাড়ীতে উঠেছে, তার কোন প্রমাণ নেই। প্ল্যাটফর্মে রিজার্ভ বার্থের যাত্রীদের নামের লিস্ট যার কাছে থাকে, সেও কিছু বলতে পারে না। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, কেন না, ওরা অনেক সময় ভুল করে।

তবে কি ওই অপরাধী?

হতে পারে। মৌলিক চুরুট ধরিয়ে বললেন, ঠাণ্ডার দিনে এই জিনিসটি আরামপ্রদ। হাঁ, মহাবীর অপরাধী হতে পারে। তবে কী জানেন, ওর

alibi অর্থাৎ অনুপস্থিতির জোরাল কোন প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু মোটিভও তো তেমন কিছু নেই। বনরেখার মৃত্যুতে ওর লাভ কিসে? হয়ত, হয়ত—মৌলিক ইতস্ততঃ করে বললেন, আরও এমন কিছু রহস্য আছে, যা আমরা জানতে পারি নি।

বলতে বলতে মৌলিক ওঁর চেয়ারটা আমার চৌকির কাছে নিয়ে এলেন, কানের কাছে মুখ এনে বললেন, শ্রীলা দেবী, আপনিও আমাদের সব কথা বলেন নি।

আমি দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সিলিঙের শিকারী টিকটিকিটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলেছি, কী কী বলে নি?

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, মৌলিক উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে স্থির কণ্ঠে বললেন, সবই বলব।

উনি এগিয়ে এসেছিলেন, আমি সরে গিয়েছিলাম। চৌকিটার একেবারে ওপাশে জানলায় ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। বন্ধ জানালা, ওপাশেই বনরেখার কোয়ার্টার ছিল।

মৌলিককে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, চোখ বন্ধ করে ছিলাম আমার ছোট্ট ঘরটা জুরে একটি গম্ভীর কণ্ঠ, নিষ্কম্প, অবিচলিত, অন্য কোন অস্তিত্ব নেই।

সবার আগে আপনাকে আমাদের ছোট একটা ভুলের খবর দিয়ে শুরু করি, শ্রীলা দেবী, বনরেখা আসানসোল আর সীতারামপুরের মধ্যে নিহত হন নি। হয়েছিলেন বর্ধমান আর আসানসোলের মাঝামাঝি কোনখানে।

অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে উঠলাম, সে কি!

মৌলিক হাত তুলে আমাকে ইঙ্গিতে থামতে বললেন। ব্যস্ত হবেন না। হ্যাঁ, বনরেখা সম্ভবত আণ্ডালের কাছাকাছি কোন জায়গায় খুন হয়েছিলেন। অন্তত আমাদের ডাক্তারি রিপোর্ট তাই বলে। আসানসোলের পরে যদি খুন হতেন, তবে সীতারামপুরেই তো ওঁর দেহ আবিষ্কৃত হয়, অত তাড়াতাড়ি রিগর মার্টিস আসত না, শরীরটা শক্ত, ঠাণ্ডা আর ভারি হয়ে যেত না। আরও গরম থাকত। কিন্তু, আমি বলে উঠলাম, আমি যে ওকে এখানে, এই ষ্টেশনেই দেখেছি মিস্টার মৌলিক। সে যে আমার সঙ্গে কথাও বলেছে। মৌলিক সাহেব আবার বললেন, আস্তে। আপনি দেখেছেন। ওখানেই তো যত খটকা শ্রীলা দেবী। আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন। পরে কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। আপনি

দেখেছেন। বনরেখা রায়কে এই স্টেশন একমাত্র আপনিই দেখেছেন শ্রীলা দেবী, আর কেউ দেখে নি। অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে উঠলাম, মিথ্যে কথা। আপনি নিজেই বলেছেন, অন্তত আর একজন দেখেছে। এক্সপ্রেসের কণ্ডাক্টার গার্ড। বনরেখার সঙ্গে সে কথা বলেছে, আপনি নিজেই বলেছেন।

চোখ দুটি অতিশয় ছোট করে মৌলিক সাহেব বললেন, সে যদি আপনাকেই দেখে থাকে, শ্রীলা দেবী? হেসে উঠলাম, সেই হাসি দেয়াল থেকে দেয়ালে ঘা খেয়ে আবার আমার কানেই ফিরে এল।

তখন বললাম, আপনি পাগল, মৌলিক সাহেব।

কণ্ডাক্টার কি লাল ওভারকোর্ট দেখে নি?

উচ্চহাসি দিয়ে মৌলিক সাহেব আমার হাসিটারই যেন জবাব দিলেন। শ্রীলা দেবী, বুদ্ধিমতী হয়েও আপনি একটা যুক্তিহীন কথা বললেন। পোশাকটা তো আসলে খোলস। এক রঙের খোলস কি দুটো মানুষের হয় না?

এবার আমার গলা কেঁপে গিয়েছে। তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠে দুর্বলতাটুকু চাপা দিতে চেয়েছি। কা, কী বলতে চান আপনি?

আমার চোখ দিয়ে ঘৃণা, আতঙ্ক ফুলঝুরির মত ঝরছিল। হিস হিস করে বললাম, অভদ্র কোথাকার।

মৌলিক সাহেব দরজার পাশে দাঁড়ালেন। নির্বিকার গলায় বললেন, কোয়াইট। কিন্তু হত্যাকারী নাই। শ্রীলা দেবী, আপনার প্রিয় সখী বনরেখা রায়কে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা করার অভিযোগে আমি আপনাকে গেপ্তার করলাম।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল মনে নেই। হয়ত জ্ঞান হারিয়ে থাকব। সম্বিত ফিরে এলে দেখি, ঘরে আরও অনেক লোক, তাদের আমি চিনি না। একজন ভদ্রলোক আমার নাকের কাছে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে আছেন।

মৌলিক সাহেবকেও দেখতে পেলাম। হেলান চেয়ারে কাত হয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে রেখেছেন। ইঙ্গিতে ওঁকে আমি কাছে ডাকলাম। উনি এলেন। তখন আমিও অবসন্ন। ক্ষীণ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বলুন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠ, পূর্ব উত্তাপের লেশমাত্র নেই। ওদের চলে যেতে বলুন। মনে আছে, সকলে চলে গিয়েছে, বালিশে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। মৌলিক সাহেব চেয়ার টেনে এনে

কাছে বসেছেন। কী বলবেন বলুন? বললাম। নির্বোধের মত শোনাল জানি, তবু বললাম—কী করে—কথাটাকে আমি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। উনিই সহায়তা করলেন। কী করে ধরলাম জানতে চাইছেন তো? সত্যি বলতে কি, প্রথমে আমার প্রসাদকেই অপরাধী মনে হয়েছিল। কিন্তু খটকা লেগেছিল পোশাকটায়। একে লাল রঙ, তাতে অকালে ওভার কোট, এমন অদ্ভুত বনরেখা কেন পরবেন? যেই পরে থাক, সে নিজের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, সন্দেহ রইল না। তখন ভাবলাম, কেন, কেন? কোন সদুত্তর পেলাম না, তখনও জানতাম না, ঘটনাটা আসানসোলের পশ্চিমে ঘটেনি। ডাক্তারি রিপোর্টে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল, বনরেখা আণ্ডালের কাছাকাছি কোথাও নিহত হয়েছেন, তখন খটকা আরও বাড়ল। লাল ওভারকোট পরা যে মহিলাকে আসানসোলে দেখা গিয়েছে, তিনি যদি বনরেখা নন, তবে কে? তখন জিজ্ঞাস্য হল, তাঁকে কে দেখেছে? দেখেছে কণ্ডাক্টার গার্ড, কিন্তু বনরেখাকে সে চেনে না, সে শুধু পোশাকটাকেই মনে করে রেখেছে। আর দেখেছেন আপনি। আপনি মৃত মহিলাটির আবাল্য বন্ধু, শুধু পোশাক দিয়ে আপনার চোখে ধুলো দেওয়া তো সহজ নয়। তবে, তবে কি—

আমার ভাবনা সেই প্রথম স্পষ্ট সন্দেহের রূপ নিল। যে বর্ধমানের পর বনরেখাকে হত্যা করেছে, সেই পরে লাল ওভারকোট পরে আসানসোলে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু আপনার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। সে যে স্ত্রীলোক, তাতে সন্দেহ নেই, কেন না পুরুষ মেয়ের কোট পরবে না, এবং অস্পষ্টভাবে যেন বুঝতে পারলাম, হয় আপনি তাকে বাঁচাতে চান, নয়ত সে-ই আপনি। কেননা আগেই বলেছি, আসানসোলেও বনরেখা যে জীবিত ছিলেন এ কথার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আপনি। তবে একটা খটকা তখনও ছিল।

হত্যাকারীকে বনরেখা চিনতেন। সে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসেছে। এ ব্যাপারটা যদিও আপনার দিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারছিলাম না একটা কারণে। যিনিই হত্যা করে থাকুন, তাঁর গায়ে তো অনেক জোর হবে। কেন না, বনরেখা সহজেই পরাভূত হয়েছিলেন। কোন ধস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখিনি। আপনি তো তেমন বলশালী নন। তবে?

এই তবেরও উত্তর পেলাম পোস্টমর্টেম রিপোর্টে। বনরেখার ফুসফুসে

ক্লোরোফর্মের গন্ধ ছিল। আততায়ী কৌশলে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে বনরেখাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বনরেখাকে কেউ কোনদিন লাল ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় দেখেনি। ওটা তবে হয়ত আপনার। লাল ওভার-কোটটা আপনি যে দর্জিকে দিয়ে করিয়েছিলেন তার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি শ্রীলা দেবী। কিন্তু ক্লোরোফর্ম পেলেন কোথা থেকে, জানাবেন?

উত্তর দিলাম না।

মৌলিক নিজেই বলে গেলেন, শেষ যে প্রশ্নটার মীমাংসা বাকি ছিল, এবার সেটাকে নিয়ে পড়লাম। আপনার alibi। হত্যা যদি আণ্ডালে ঘটে থাকে, আপনি সেখানে কি করে গেলেন। সকালেই তো আগ্রা থেকে আপনি আসানসোলে এসেছেন। আবার অনুসন্ধান। শ্রীলা দেবী, দেখলুম আপনার স্টেটমেন্টের এই অংশটকুও সত্য নয়। আপনি আগ্রা থেকে আসানসোলে তো ফেরেন নি, আগের রাত্রে বি, এন, আর লাইন দিয়ে ফিরেছিলেন হাওড়ায়। তারপর বনরেখার সঙ্গে একই এক্সপ্রেসে উঠেছেন, সম্ভবত বর্ধমান পর্যন্ত অন্য কামরায়। পরে, বর্ধমানে যখন বনরেখার গাড়ীতে এলেন, তিনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েই আপনাকে ডেকে নিয়েছিলেন। শ্রীলা দেবী, মহাবীরের নামে হাওড়া থেকে ভূয়ো বার্থ রিজারভেশন—সেও কি আপনিই করিয়েছিলেন? শুধু সন্দেহটাকে নানা পাত্রে ছড়িয়ে দেবার জন্যে?

এবারও কোন উত্তর দিলাম না।

আপশোষসূচক একটা অব্যয় উচ্চারণ করে মৌলিক বললেন, এত প্ল্যান, এত সতর্ক আয়োজন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না শ্রীলা দেবী। সেই ষ্টেশনে আপনাকে সকালে তো কেউ দেখেনি। অনুমান করছি, কণ্ডাক্টার গার্ডের সঙ্গে কথা বলে আপনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনি উলটো দিকের দরজা দিয়ে অলক্ষ্যে নেমে পড়েছিলেন। তার আগে আপনি নিজের লাল কোটটি খুলে মৃতদেহে জড়িয়ে দিয়েছেন, তাকে ঠেলে দিয়েছেন সিটের নিচে। নেমে এসে নিজের পোশাকে ঢুকেছেন ওয়েটিংরুমে। তখন থেকে সমস্ত রাত্রি অনেকেই আপনাকে ওখানে দেখেছে। হত্যা কাণ্ডটা আসানসোলের পশ্চিমে ঘটেছে, এটা যদি প্রমাণ হত, তা, হলে শ্রীলা দেবী আপনাকে ছোঁয়া যেত না। আপনার alibi পাকা হত।

আস্তে আস্তে বললাম, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওই কামরায় লম্বা চওড়া সুপুরুষ এক ভদ্রলোক ছিলেন।

শ্রীলা দেবী, সেও ভুয়ো। আর কেউ নাও থাকতে পারে। আপনার মুখের কথা ছাড়া তার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। তাকে আপনি সৃষ্টি করেছিলেন, বোধ হয় প্রসাদ রায় বা মহাবীরের পিছনে আমাদের ছুটিয়ে হয়রাণ করে দেবার জন্যে। না, শ্রীলা দেবী, আর মিথ্যে বাড়াবেন না।

আমরা ক্লান্ত, ক্লান্ত আপনিও।

আশ্চর্য, আমার ক্লান্তি কিন্তু দূর হয়েছিল। আমি সোজা হয়ে বসেছিলাম। হেসেছিলাম, হ্যাঁ তখনও হাসতে পেরেছিলাম। একটু ঠাট্টাও করেছিলাম মৌলিক সাহেবকে। ওঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেছি, আমার অপরাধ এখনও কিন্তু প্রমাণ হয় নি। এত দীর্ঘ বক্তৃতাতেও মোটিভ বা উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। অথচ, আপনিই বলেছেন, উদ্দেশ্যেরও একটা সন্তোষজনক প্রমাণ থাকা চাই। বনরেখা আমার বন্ধু, নানাভাবে তার কাছে উপকার পেয়েছি। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। আমিই তার মৃত্যু ঘটাব, অন্য যত প্রমাণই আপনার কাছে থাক, এ কথাটা ব্যাখ্যা করে আদালতকে বোঝানো আপনার পক্ষেও সহজ হবে না।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে যে হাসি ফোটে, সেই হাসি মৌলিক সাহেবের মুখে দেখলাম।

সে ব্যাখ্যাও আছে বৈকি শ্রীলা দেবী। ব্যাখ্যা আছে গূঢ় মনস্তত্ত্বে। আপনি নিজেই জানেন, বনরেখাকে আপনি ভালবাসতেন না।

না, ঘৃণা করতেন। নিজের মনের ভেতরটায় একবার চেয়ে দেখুন, শ্রীলা দেবী। আশৈশবকালের কি তীব্র হিংসা সেখানে তীব্রতর ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। তাকে আপনি ভালবাসার ভাল-মানুষি কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলেন মাত্র। আমাদের চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু ভালো কোনো দিনও বাসতে পারিনে।

একটা হিংসা অহরহ মনটাকে ছোবল মারে, ও কেন এত বড়, এত উদার, এত ভাল? কেন, কেন?

অপরাধতত্ত্ব বলে, পৃথিবীর বহু হীন কাজ এই হীনমন্যতা থেকে। যে ছোট, সে মুখে বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু তলে তলে প্রতিহিংসার আছিলা খোঁজে। শ্রীলা দেবী, আপনিও সেই নিয়মের বাইরে নন। নিতান্ত শিশুকাল থেকে দেখে আসছেন। আপনাদের পরিবারে নিত্য অনটন, ওদের খেয়ে স্বাচ্ছল্য। একটু বড় হয়ে জানলেন, বনরেখা আপনার চেয়ে

লেখাপড়ায় ভাল। ওকে হাটিয়ে আপনি একবারও পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলেন না। আরও বড় হয়ে আয়নায় দেখে আর নানা লোকের কথা শুনে টের পেলেন, বনরেখা আপনার চেয়েও রূপসীও। আগে শুধু ঈর্ষা ছিল, তখন থেকেই ঘৃণার শুরু, এই ঘৃণার বিষ হয়তো আপনার সচেতন মনেও অগোচরে একটু একটু করে জমতে থাকল। ভাবতেন, ও যেন কোথায় আপনাকে বঞ্চনা করে, আপনাকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিচ্ছে। সেই ঘৃণার পাত্র ছাপিয়ে পড়ল সেইদিন, যেদিন আপনারই বন্ধু প্রসাদ রায়কেও বনরেখা ছিনিয়ে নিল। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও বনরেখা? সেদিন ওর চেয়ে বড় শত্রু আপনার আর কেউ ছিল না শ্রীলা দেবী!

আপনার গ্লানি চরমে পৌঁছিল তখন, যখন বনরেখারই দয়ার দান একটা চাকরি আপনাকে হাত পেতে নিতে হল। সেখানেও সে হেড মিস্ট্রেস্, আপনি কেরানি মাত্র। সেখানে সে অনেক বড়, ঢের ওপরে। তার কাছে আপনার কৃতজ্ঞতা যত, তার প্রতি বিদ্বেষও তত। দেখুন, এই কৃতজ্ঞতার বোঝা যত বাড়ে, তত দুর্বহ হয়। যাকে ঘৃণা করি তার করুণা যেন ফাঁস হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। তখন—তখন শ্রীলা দেবী, মনে হয় চিরজীবন একজনের কাছে ছোট হয়ে থাকার মত গ্লানি আর নেই। যারা মুখ বুজে সয়ে যেতে পারে, তারা বেঁচে যায়। যারা তা পারে না, তারা মুক্তির উপায় খোঁজে যেমন আপনি খুঁজেছেন। ঘৃণায় অন্ধ আপনারই একটা সত্তা স্থির করেছে, আর নয়, ওকে যদি কোনক্রমে সরিয়ে দিতে পারি, তবে আবার মাথা তুলতে পারব। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব, নিশ্বাস নিতে পারব সহজে।

অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে উঠেছি, মৌলিক সাহেব, আমি একটা পশু। না। মৌলিক সহানুভূতি দিয়ে আমার মাথায় হাত রেখেছেন। বললেন, না। আপনিও মানুষ। মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার বাসনাই আপনাকে নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ করেছে। শুনে অঝোরে কাঁদছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি কথাও বলি নি। আমার অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে! তবু, জানিনা কেন, হয়তো আমি স্ত্রীলোক বলেই, আমার প্রতি আদালতের করুণা হল, হয়ত প্রথম অপরাধ বলেও; তিনি আমাকে প্রাণ দণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

সেও আজ কত বছর হয়ে গেছে। আজ আমার কারও প্রতি কোন

দ্বেষ নেই। মনে পড়ে পূর্ণেন্দু মৌলিককে, সেই ধীরোন্নত, বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। না, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। বনরেখাকেও মনে পড়ে, তাকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছি বটে, কিন্তু তারপর থেকে সত্যিই ভালবাসতে পেরেছি।

সেই ভালবাসার প্রেরণাতেই তো আজ নির্জন সেলে বসে, লুকিয়ে কাগজ-কলম আনিয়ে লিখে দিলাম এই কাহিনী। আমার প্রিয়সখীর মৃত্যুর কাহিনী।

সন্তোষ কুমার ঘোষ॥ জন্ম ফরিদপুরে ১৯২০ খৃঃ। সন্তোষ কুমার ঘোষ পাঠকদের লেখক যতখানি লেখকদের লেখক হয়ত তার চেয়েও বেশি। নাগরিক জীবনের দুঃখ বেদনা ও আশা নিরাশার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায়। তাঁর গল্পের বা প্রবন্ধের উপস্থাপনা পাঠক মনে এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বারনার্ডশয়ের নাটকের প্রিফেস বা মুখবন্ধ যদি আকর্ষণীয় হয় তবে সন্তোষ কুমার ঘোষের গল্প বা আলোচনার প্রস্তাবনা তার চেয়ে কম উপাদেয় নয়। তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মার্জিত ও ইঙ্গিতবহ বাক্‌-বৈদগ্ধ তাঁর লেখার এক বিশেষ গুণ। মনের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাবনাকেও তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করেন ভাষার নামান কারুকার্য ও শব্দ চয়নের স্বাভাবিক কুশলতায়। লেখক মূলতঃ জীবন প্রেমী তাই বেদনা ও নৈরাশ্যময় জীবনের প্রেম-প্রীতির নিষ্করুণ অভিষেক তাঁর প্রথম দিকের লেখায় স্পষ্ট। তবে তাঁর কলমের সোনালী আঁচরে আমাদের জগৎ ও জীবনের কোন দিকই অনালোকিত নয়।

সন্তোষ কুমার ঘোষ বোধ হয় এমন একজন সাহিত্যিক যিনি জানেন না এমন বিষয় নেই আর লিখতে পারেন না এমন বস্তু নেই। তাঁর সর্বাত্মক ও সর্ববিষয়ক জ্ঞান তাঁকে আজ বাংলা সাহিত্যে এক অভিভাবকের আসন দান করেছে। প্রবীন তিনি নিশ্চয় আবার এক অর্থে নবীনও। সাহিত্যের সকল বিভাগই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর পরিশীলনঋদ্ধ, শ্লেষ লাঞ্ছিত কাব্যের তাম্বুল-রাগে, অলক্ত তিলকে।

মংখিয়াজং

জরাসন্ধ

পূব দিকে বর্মা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, মাঝখানে যে পর্বতসঙ্কুল ভূখণ্ড, তার নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। সাহেবরা বলতেন চিটাগঙ্ হিল্‌ট্রাক্‌টস্। বাংলাদেশ কিন্তু বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক; দৈহিক নয়, আত্মিক ও নয়। বাংলার শ্যামলিমা আছে, নেই তার উন্মুক্ত বিস্তার। কোনো অবারিত মাঠের প্রান্তে নুইয়ে পড়ে না চুম্বনাকুল গগন ললাট। কোনো আদিগন্ত নদীর বুকে নেমে আসে না স্খলিতাঞ্চলা সন্ধ্যা। বুকভরা মধু বধূ হয়তো আছে। কিন্তু কোনো স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজলে পড়ে না তাদের অলক্ত রঞ্জিত চরণচিহ্ন।

এদেশেও জেল আছে। কিন্তু তার কৌলীন্য নেই। সে শুধু আকারে ছোট নয়, জাতেও ছোট। সুতরাং আমার চৌহদ্দির বাইরে। কর্মসূত্রের টান যখন নেই, তখন আর কোনো সূত্রধরে এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে কোনোদিন আমার পদধূলি পড়বে, এরকম সম্ভবনা ছিলনা। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বের কোন্ কোণে কখন যে কার জন্যে বিধাতা পুরুষ দুটি অন্নের ব্যবস্থা করে রেখে দেন, সে শুধু তিনিই বলতে পারেন। যা ছিল স্বপ্নের অগোচর; তাই একদিন বাস্তব ঘটনার রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেট্‌লমেণ্টের তাঁবু ঘাড়ে করে আমার এক আত্মীয় টোল ফেলে ফিরছিলেন এই দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হঠাৎ রোগ শয্যায় পড়ে আমাকে স্মরণ করলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হল তার স্ত্রীর সাশ্রু অনুনয়। অতএব আমিও একদিন বাক্‌স বিছানা ঘাড়ে করে মঘের মুলুকে পাড়ি দিলাম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম। গিয়ে দেখলাম, শুধু পার্বত্য নয়, আরণ্য চট্টগ্রাম। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, দুর্ভেদ্য পাহাড় আর দুর্গম জঙ্গল। তারই বুক চিরে চলে গেছে শীর্ণ জলরেখা। তার নাম নদী। একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির বুকের উপর থেকে কাঠ খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরি হয়েছে খোন্দল। তার নাম নৌকা। তারি মধ্যে বসে যেতে হল দিনের পর দিন। হঠাৎ একদিন

অসময়ে নৌকা থেমে গেল। সামনে এপার ওপার জোড়া বাঁধ। মাঝিদের কলরব শুনে কৌতূহল হল। লক্ষ্য করে দেখি, বাঁধ নয়, গজেন্দ্র গমনে নদী পার হচ্ছেন পাহাড়ী পাইথন। আর একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। গলুই এর উপর বসে নিশ্চিন্ত মনে বেসুরো গান ধরেছি। মাঝির চাপা ধমক শুনে থেমে গেলাম। দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জলপানরত চিতাবাঘ। শুধু আধি নয়, পথের বাঁকে লুকিয়ে আছে ব্যাধি এমন জ্বর, যার কবল থেকে কাকেরও নিস্তার নেই। তারপর আছে মাছির ঝাঁক। ভীমরুলের চেয়েও বিষাক্ত। একবার ধরলে শুধু যন্ত্রণা নয়, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেবে ক্ষত।

রাঙামাটি শহর থেকে দিন তিনেকের পথ। একখানি বসতিবিরল পাহাড়ী গ্রাম। বনের ফাঁকে ফাঁকে দু-একখানা চালাঘর। জঙ্গল মুক্ত ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ক্ষেত। সেখানে "ঝুম্" চাষ করে মেয়ে পুরুষের মিলিত দল। লাঙ্গল গরুর বালাই নেই। অদ্ভুত হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে কিংবা আঁচড় কেটে একই সঙ্গে পুঁতে বা ছড়িয়ে দিয়ে ধান মকাই আর নানারকম সব্জির বীজ। যেমন তৈরি হয়, কেটে ঘরে তোলে ফসলের বোঝা।

আমার আত্মীয়টির আস্তানা ছিল গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে। আধমরা হয়ে আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তিনি তখন মরে সবে বেঁচে উঠেছেন। করবার বিশেষ কিছুই ছিলনা। আমার এই সশরীরে উপস্থিতি এইটুকু দিয়েই যেন তাকে কৃতার্থ করে দিলাম। বললাম একটা কিছু টনিক ঠনিক খেয়ে চট্‌পট্ সেরে ওঠো।

উনি হেসে বললেন, তুমি কাছে বসে আছ, এইটাই আমার সবচেয়ে বড় টনিক। আর কিছু চাইনা।'

সারাদিন তার টনিক জুগিয়ে বিকেল বেলা রোদ যখন পড়ে আসে, পাহাড়ী পথ ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। সেদিন অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলাম। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল হয়নি। সঙ্গে ছিল সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসের এক চাপরাশি। অনুস্বার কণ্টকিত কি একটা নাম, আজ আর মনে নেই। যেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ওরই কাছাকাছি তার বাড়ি। দ্বিতীয়বার কোনো চিতাবাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, এরকম ইচ্ছা ছিলনা। তাই হাঁটার বেগটা বেশ একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি চৌদ্দ পনের বছরের পাহাড়ী মেয়ে নেমে আসছে সামনের ঐ পায়ে চলা ঢালু পথ বেয়ে। তার পিঠে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছে

একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধা, বোধ হয় তার দৃষ্টি ও নেই। আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে বনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। তারা অতি সন্তর্পনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। কিশোরী মেয়েটি একটিবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। দুটি কৌতূহল ভরা কালো হরিণ-চোখ। সুশ্রী মুখখানি ঘিরে কেমন একটা বিষণ্ণ মলিনিমা। আমারও কৌতূহল হল। আর একটু উঠে গিয়ে রাস্তার বাঁকে দাঁড়ালাম। ওরা নেমে গিয়ে যেখানে থামল, তার ঠিক সামনেই একটি পল্লব-ঘন বটের চারা। গোড়ায় বাঁধানো মাটির বেদি, যত্ন করে নিকানো। সঙ্গিনীকে ঘাসের উপর বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল কিশোরী। আঁচলের বাঁধন খুলে বের করল দুটি ছোট ছোট মোমবাতি আর একটি দেশলাই। বাতি দুটো জ্বেলে পাশাপাশি বসিয়ে দিল বেদির উপর। তারপর একটুখানি পিছনে সরে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল; জানিনা কার উদ্দেশ্যে। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে বৃদ্ধা কি বলে উঠল তার পাহাড়ী ভাষায়। বোধ হয় কোনো প্রশ্ন। কিন্তু কিশোরীর কাছ থেকে কোনো জবাব এলনা। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি, করে আবার ওরা ফিরে চলল সন্ধ্যার ছায়াঢাকা চড়াই পথ ধরে যাবার সময় আর একটা চকিত দৃষ্টি দিয়ে গেল আমার বিস্মিত মুখের উপর।

আমরাও চলতে শুরু করলাম। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নিঃশ্বাসের শব্দে পেছন ফিরে তাকালাম। ঠিক ওর মায়ের মত দেখতে হয়েছে মেয়েটা।'

—স্নিগ্ধ কণ্ঠে যেন আপন মনে বলে উঠল চাপরাশি।

—তুমি চেন নাকি ওদের ?

—চিনি বৈকি। ঐ তো ওদের ঘর। মংখিয়ার মা আর মেয়ে।

মংখিয়া! চমকে উঠলাম। নামটা যেন তড়িৎ শিখার মত জ্বলে উঠল আমার স্মৃতির অন্ধকারে। প্রশ্ন করলাম, 'কোন্ মংখিয়া ? মংখিয়া জং ?'

—হ্যাঁ, বাবু। আপনি জানলেন কি করে ?

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের কৃষ্ণাবরণ ভেদ করে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একখানা মাঙ্গোলিয়ন ধাঁচের মুখ। তার উপর দুটি ভাসাভাসা অসহায় চোখ। মংখিয়া জং।

মংখিয়ার সঙ্গে দেখা আমার চিটাগং জেলে। চৌদ্দ বছর! হ্যাঁ;

তাহ'ল বৈকি। এই গাঁয়ের কথাই সে বলেছিল। পাহাড় কেটে অতি যত্নে তৈরি ছোট ছোট ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে যে চড়াই পথ সেইখানে তার বাড়ি। ছোট্ট সংসার। বিধবা মা, সতের বছরের বৌ আর তার কোলে একটি বছর খানেকের মেয়ে। ভোর হতেই সে বেরিয়ে যেত "ঝুম" এ। দু-তিনখানা গ্রাম ছাড়িয়ে দূর পাহাড়ের কোলে। প্রায় এক-বেলার পথ। বেশীর ভাগ দিনই একা। ঘরের কাজ মেয়েকে শাশুড়ীর কাছে গছিয়ে কোনো কোনোদিন সিম্‌কিও তার সঙ্গ নেয়। সেদিনটা সে আসতে পারেনি। মংখিয়া একটা গোটা ভুট্টা ক্ষেতের জঙ্গল সাফ করে ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল খানিকক্ষণ। হাতে ছিল একটি নধর কচি ভুট্টার মোচা। ছাড়িয়ে মুখে তুলতে যাবে, পাহাড়ের বাঁকের আড়াল থেকে ভেসে এল সুরের ঝঙ্কার। এসুর তার চেনা। শুধু চেনা নয়, এর সঙ্গে ছিল তার প্রাণের টান। এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, সকাল থেকে সকল কাজের মধ্যে এরই পানে পড়েছিল তার কান, এরই জন্যে মন ছিল তার উন্মুখ। জনহীন বনভূমি। তার উপর লুটিয়ে পড়ছে গানের ঢেউ। কখনো কাছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, পাহাড়ের গায়। বেলা বেড়ে চলেছে। গাছের মাথায় ঝলমল করছে রোদ। ঘরে ফিরবার সময় হল। সে খেয়াল নেই মংখিয়ার। আবেশে বুজে আসছে চোখ দুটো। হঠাৎ মনে হল গানতো আর শোনা যাচ্ছেনা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মংখিয়া। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে এগিয়ে গেল। দু-তিনখানা ভুট্টা ক্ষেত পার হয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একটি ঝোপের আড়ালে।

'ওখানে লুকিয়ে কি হচ্ছে, শুনি?'

ধরা পড়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল মংখিয়া। তার সঙ্গে মিলিত হ'ল কলহাস্যের কোমল ঝঙ্কার।

—সিম্‌কি আসেনি কেন? প্রশ্ন করল নারী কণ্ঠ।

—এসেছে বৈকি। ঐ তো রয়েছে ওখানে—মংখিয়ার মুখে রহস্যের হাসি।

—ঈস্! তাহলে আর এত সাহস হতনা।

—কেন। ভয় কিসের?

—থাক্; আর বাহাদুরি দেখিয়ে কাজ নেই। এবার বাড়ি যাও। বেলা হয়েছে।

—বাড়িই তো যাচ্ছিলাম। এমন সময়—

—কী হ'ল এমন সময় ?—মাথাটা বাঁদিকে হেলিয়ে মোহিনী ভঙ্গীতে তাকাল মেয়েটি।

—কিছু না। এই নাও।

মংখিয়া হাত বাড়িয়ে ভুট্টাটা এগিয়ে ধরল। মেয়েটি হাত বাড়াল না, এগিয়েও গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই বলল, 'কী ওটা ?'

—বাঃ। গান শোনালে। বখ্‌শিশ নেবেনা ?

—চাই না অমন বখশিশ—সমস্ত দেহে একটা দোলা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

—না, সত্যি। তোমার জন্যে নিয়ে এলাম।

—ছুঁড়ে দাও ওখান থেকে।

—হাত থেকে নেবে না বুঝি ?

—বাঃ! কেউ দেখে ফেলে যদি ?

—কেউ নেই এখানে।

—ঐ ছাখ, দেখছে—বলে আঙুল তুলে ধরল গাছের দিকে। একটা কাঠবেড়ালী ল্যাজ নাড়ছিল, আর মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিল বিজ্ঞের মত।

দুজনেই হেসে উঠল। মংখিয়া আর একটু কাছে এসে ভুট্টার মোচা তুলে দিল মেয়েটির হাতে।

—দাঁড়াও; আমি একা খাব বুঝি ?—বলে মোচাটা ভেঙে আর্ধেকটা সে ফিরিয়ে দিল মংখিয়ার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মিলিত হাসির উচ্ছ্বাস। কিন্তু উঠতে না উঠতেই সে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। মেয়েটির হাত থেকে খসে পড়ে গেল ভুট্টার ভগ্নাংশ; দুজনের মিলিত ভীত দৃষ্টি ঝোপের আড়ালে গিয়ে স্থির হ'য়ে গেল। দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিম্‌কি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। দিদির একান্ত কাছটিতে এসে তার চোখের উপর চোখ রেখে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, 'ছুঁয়ে দিলি!' কণ্ঠে অপরিসীম বিস্ময়, তার সঙ্গে অভিমান—ক্ষুব্ধ অনুযোগ। দিদির কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না। মাথাটা শুধু নুয়ে পড়ল বুকের উপর। দাঁড়িয়ে রইল নিস্প্রাণ পুতুলের মত।

এবার স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল সিম্‌কি। নির্বাক চাহনি। কিন্তু তার ভিতর থেকে নির্গত হ'ল যে অগ্নিময়ী ভাষা মংখিয়ার কাছে সেটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট নয়। হঠাৎ দেহময় তরঙ্গ তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল।

দৃঢ় হস্তে কোমরে জড়িয়ে নিল আঁচলখানা। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।

'সিম্‌কি, শোন'—এতক্ষণে স্বর ফুটল দিদির কণ্ঠে। কিন্তু শোনবার জন্যে সিম্‌কি আর তখন দাঁড়িয়ে নেই। 'কী হবে?—শুষ্ককণ্ঠে বলল মংখিয়ার দিকে ফিরে। চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। মংখিয়া নিরুত্তর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর হাতে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে ধীরে ধীরে রওনা হ'ল বাড়ির পথে। প্রাচীনপন্থী হিন্দু :সমাজে যেমন ভাদ্রবৌ, মংখিয়াদের পাহাড়ী সমাজে তেমন বৌ-এর বড় বোন। স্পর্শ করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, মহাপাপ। হিন্দু সমাজে তার ক্ষমা আছে। কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান ও বোধ হয় আছে কোনো রকম। কিন্তু মংখিয়ার সমাজ এখানে ক্ষমা-লেশহীন নির্মম। এই জাতীয় অপরাধের প্রাথমিক বিচার করবেন গ্রামের মোড়ল। তিনি যদি তুষ্ট না হন, কিংবা তার বিচারের পরেও যদি গ্রাম্য-সমাজ রুষ্ট থেকে যায়, তখন অপরাধীর তলব পড়বে মহাপরাক্রান্ত মঙ্‌রাজার দরবারে। মঙ্‌রাজা! ইংরেজরা বলতেন বোহ্‌মঙ্‌ চীফ্‌। তিনিই ছিলেন চিটাগঙ্‌ হিল ট্রাকট্‌সের দালাই লামা। সমস্ত প্রজাকুলের দণ্ড মুণ্ডের মালিক। বিস্তৃত তাঁর এক্তিয়ার। ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত অপরাধ শুধু নয়, খুন জখম, চুরি ডাকাতি, ইত্যাদি গুরুতর ক্রাইম্‌ ও ছিল তার অলিখিত এলাকার অন্তর্গত। দুদিন তিনদিনের পথ থেকে ব্রিটিশ সরকারের থানা পুলিস এসব ঘটনার সন্ধান পেতনা, পেলেও অনেক সময় চুপ করে থাকত।

বাড়ির কাছে আসতেই মংখিয়ার কানে গেল তার শিশু কন্যার কান্না। ছুটে এসে দেখলে কেঁদে কেঁদে নীল হয়ে গেছে মেয়েটা। কেউ কোথাও নেই' মা তখনগত শিষ্যা। সংসারে থেকেও নেই। গ্রামোপ্রান্তের ক্যাণ্ড থেকে এখনো তার ফিরবার সময় হয়নি। কিন্তু সিম্‌কি? এতক্ষণে সে বোধ হয় মোড়লের বাড়ি গিয়ে দশখানা করে লাগাচ্ছে তার নামে। মেয়েটা বাঁচল কি মরল, সে প্রশ্ন আজ তার কাছে অতি তুচ্ছ। অস্নাত, অভুক্ত, পরিশ্রান্ত মংখিয়ার মাথার ভিতরটায় অগ্নি বৃষ্টি হতে লাগল।

তার অনুমান যে মিথ্যা নয়, জানা গেল একটু পরেই। বাড়ির বাইরে থেকে হাঁক দিল কর্কশ কণ্ঠে—'মংখিয়া আছিস?' মোড়লের চাকর। কিন্তু নিজেকে সে ছোটখাট মোড়ল বলেই জানে, জাহিরও করে সেইরকম। একটা কড়া জবাব এসে গিয়েছিল মংখিয়ার মুখে। সামলে নিয়ে বেরিয়ে

এল। খাড়া তলব। অমান্য করলে রক্ষা নেই। বিলম্ব করলেও বিপদ অনিবার্য। বারান্দায় বসে তামাক টানছিল মোড়ল। তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে সিম্‌কি। কোমর জড়িয়ে তেমনি শক্ত করে বাঁধা আঁচলের বেড়। ফুলো ফুলো চোখ দুটিতে সদ্য—ক্ষান্ত বর্ষণের চিহ্ন। উন্নত বুকে অদম্য উত্তেজনার স্পন্দন। মংখিয়া এসে যখন দাঁড়াল ও পাশটিতে, একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

—বৌ যা বলছে, সত্যি ?—প্রশ্ন করল মোড়ল।

—হ্যাঁ ; আমি ছুঁয়েছি ওর দিদিকে।

হুঁকা থেকে মুখ তুলে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মোড়ল। তারপর বলল, বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে, 'বলিস কি ! ও হল তোর বড় শালী, গুরুজন। ওর পেছনে ঘুরে মরছিস কেন ? ছুঁয়েই বা দিলি কোন্ আক্কেলে ? এত বড় পাপ তো আর নেই।'

মংখিয়া নিরুত্তর। কয়েক মিনিট থেমে আবার বলল মোড়ল, 'তাছাড়া ও মেয়েটা যে এক নম্বর নচ্ছার, সে তো আর কারো জানতে বাকি নেই। তা না হলে ওর মরদটাই বা ওকে ছেড়ে চলে যাবে কেন ?'

এবার উত্তর দিল মংখিয়া, 'ছেড়ে যায়নি ; রাঙামাটি গেছে চাকরি করতে।'

—চাকরি করতে, না আমার কপালে আগুন দিতে, অবরুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠল সিম্‌কি।

হাত দিয়ে তাকে থামাবার ইঙ্গিত করে মোড়ল বলল, 'যাক্', যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার শুদ্ধ হতে হলে মাথা মুড়োতে হবে, ক্যাঙে বাতি দিতে হবে বারো গণ্ডা, তারপর সমাজ-খাওয়ানো আছে। সেও অনেক টাকার ব্যাপার।'

সিম্‌কির দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ঘরে যাও, বৌ। মাগীটাকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা আমি করছি। মাথা মুড়ে, লোহা পুড়িয়ে ছ্যাকা দিয়ে—'

'না'—দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিল মংখিয়া। 'ওর কোনো দোষ নেই, দোষ আমার। ওর গায়ে যদি কেউ হাত তোলে, আমি তাকে ছেড়ে দেবো না।'

'বটে !'—বিস্মিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মোড়ল। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'বেশ। গায়ের জোরটা তাহলে মঙ্‌রাজার কাছে গিয়েই দেখিয়ো।'

পরদিন থেকে আবার যথারীতি কাজে লেগে গেল মংখিয়া। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ে কাস্তে নিয়ে। নিজের ক্ষেতে যেদিন কাজ থাকে না, জন খাটে অন্যের জমিতে। বেলা গড়িয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসে। নিঃশব্দে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার কোথায় চলে যায়। মার সঙ্গে যোগাযোগ কোনকালেই নেই। মেয়েটাকে আদর করত মাঝে মাঝে তাও ছেড়ে দিয়েছে। বৌএর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে অনেক রাতে যখন ঘরে ফেরে, তার আগেই মেয়ে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সিম্‌কি। ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভাত দুটো খেয়ে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে শুয়ে সেও কখন ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে, বৌ বিছানায় নেই।

এমনি একটা রৌদ্রদগ্ধ দিন। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে পড়েছে অপরাহ্নের কোলে। মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল মংখিয়া। ক্লান্ত এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত। বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে দুজন বিদেশী, কোমরে তকমা আঁটা। মানুষ নয়, যমদূত। মঙ্‌রাজার পাইক। এক নিমেষেই চেনা গেল তাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং সম্বর্ধনার বহর দেখে। কোনো রকমে দুটো ভাত মুখে দিয়ে নেবার সময় চেয়েছিল মংখিয়া, ওরা তো হেসেই খুন। সকাল থেকে বসে বসে এই যে এতখানি সময় নষ্ট হল তাদের, সেটা একবার ভাবল্ না লোকটা। তারপর আবার ভাত খাবার সময় চাইছে!

ঘরে ঢোকা হল না। দোরগোড়া থেকেই বেরিয়ে পড়তে হ'ল। কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোড়ল, আর তার খানিকটা পেছনে গাছের আড়ালে পাওয়া গেল সিম্‌কির শাড়ির আভাস। মংখিয়ার চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু সে জ্বালা সে লুকিয়ে রাখল নিজের কাছেই। একটিবার তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল চোখদুটো।

মহাপ্রতাপান্বিত মঙ্‌রাজার দরবার। তার চারদিক ঘিরে রয়েছে মধ্যযুগের নির্মম কঠোরতা। রাজকীয় জাঁকজমকের মাঝখানে বিচার-আসনে বসে এজলাস করছেন বোহ্‌মঙ চীফ। দুর্জ্ঞেয় তাঁর আইন-কানুন, দুর্লঙ্ঘ্য তাঁর বিধিনিষেধ। সে—সব যে ভঙ্গ করে, অমোঘ দণ্ডের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। দণ্ড মানেই দৈহিক নিপীড়ন। অপরাধ ভেদে

তার অমানুষিক বৈচিত্র্য। শুনেছি, কত হতভাগ্য আসামী ঘর থেকে দরবার এসেছে, আর ঘরে ফিরে যায়নি।

মংখিয়ার অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, আর দেহটাও ছিল পাথরের তৈরি। সেটাকে টেনে নিয়ে কোনোরকমে একদিন সে ঘরে গিয়ে পৌছল। কেমন করে আর কিসের জোরে, সে রহস্য সে নিজেও ভেদ করতে পারেনি। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ক্যাঙ্ থেকে ফিরে, বারান্দার উপর একটা অসাড় দেহ পড়ে থাকতে দেখে মা চমকে উঠেছিলেন। শুধু গোঙানি শুনে বুঝেছিলেন তার ছেলে ফিরে এসেছে মঙ্‌রাজার দরবার থেকে: খানিকটা সুস্থ হবার পর ছেলেকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বলেছিলেন, 'বৌ বাড়ি নেই। মোড়লের ওখানে গেছে বোধহয়। দাঁড়া, ডেকে নিয়ে আসি।'

'না'—শ্রান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল মংখিয়া। সে স্বর শুনে মা-ও আর যেতে সাহস করেন নি। পরদিন ছেলের পিঠে তেল মালিস করতে করতে অনেকটা যেন কৈফিয়তের সুরে বললেন মা, 'ছেলেমানুষ। ঝোঁকের মাথায় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এখন ভয়ে আসছে না। মংখিয়ার কাছ থেকে ভাল মন্দ কোনো জবাব পাওয়া গেল না। একটু থেমে সুর চড়িয়ে বললেন মা, 'তাই বলে ঘরের বৌ পরের বাড়ি পড়ে থাকবে নাকি? বাড়ি আনতে হবে না?' মংখিয়া এবারেও নিরুত্তর। তারপর দিন। রাত শেষ না হতেই মা চলে গেছেন মন্দিরে। মংখিয়াও কাটারি হাতে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল মাঠের পথে। খানিকদূর গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে এল। কিন্তু বাড়ি ঢুকল না তেমনি মন্থর পায়ে এগিয়ে চলল মোড়লের বাড়ির দিকে। মোড়ল নেই। পূরো ঝুমের সময়। সেই রাত থাকতে বেরিয়ে গেছে পাহাড়ে। তার বৌ আর ছুটো ছেলেও গেছে খানিক পর। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নেই। মংখিয়া এগিয়ে চলল। ভিতর দিকের উঠানে ঘরের কোলে ছায়ায় বসে মেয়েকে স্তন দিচ্ছিল সিমৃকি। নিঃশব্দ চরণে সামনে এসে দাঁড়াল মংখিয়া। সিমৃকির দৃষ্টি ছিল মেয়ের মুখে। প্রথমটা কিছু জানতে পারে নি। হঠাৎ ছায়া দেখে চমকে উঠল। চকিত চোখে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি দেখল সেই জানে। পালাতে গিয়ে ও পালাল না। যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। শুধু অনাবৃত বুকের উপর আলগোছে টেনে দিল স্খলিত আঁচলখানা। মংখিয়া দাঁড়িয়ে আছে ছবির মত। নিজের স্বল্পাবৃত দেহের উপর সেই একাগ্র দৃষ্টি অনুভব করে সিমৃকির ভীরু

চোখে ফুটে উঠল লাজরক্ত মৃদুহাসি। স্নিগ্ধ তিরস্কারের সুরে বলল, 'অসভ্য কোথাকার!' তারপর মেয়ের মুখ থেকে স্তনাগ্র সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আর খেতে হবে না। ঐ দ্যাখ্ কে এসেছে।' মেয়ে হাসল। দন্তহীন অন্তরঙ্গ হাসি। মংখিয়া নত হয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিল। একটিবার তার কোমল কচি গালদুটো ধরে আদর করল। তারপর তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, দুপা এগিয়ে এসে বৌ-এর গলায় বসিয়ে দিল কাটারির ঘা। মাথাটা যখন ছিটকে পড়ল মাটিতে, সেই শেষ স্নিগ্ধ হাসিটি বোধহয় তখনো তার চোখের কোনে মিলিয়ে যায় নি।

সংক্ষেপে এই হল মংখিয়া জং-এর খুনের ইতিহাস। শুনেছিলাম তার মুখ থেকেই চিটাগং জেলের বারো নম্বর সেল-এর সামনে বসে। গুছিয়ে সাজিয়ে বলা আত্ম-কাহিনী নয়। প্রশ্নের জাল ফেলে সংগ্রহ করা তথ্য। দোভাষী ছিল আমরা অফিস-রাইটার গুনধর চাক্‌মা। বক্তার ভাষাকে ভাষান্তরে পৌঁছে দেওয়াই হল দোভাষীর কাজ। সে শুধু কাঠামো; তার মধ্যে সমূর্ত প্রাণের স্পন্দন কেউ আশা করে না। গুনধরের মুখ থেকে যে-কাহিনী সেদিন শুনেছিলাম, সেটা ভাষান্তর নয়, রূপান্তর অন্তরের রং দিয়ে আঁকা। সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বাক্যের মধ্যে ব্যাকরণ নিষ্ঠার পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ছিল দরদী প্রাণের সনিষ্ঠ প্রকাশ। সে যেন অন্যের কথা নয়, দোভাষীর নিজেরই অনুতাপবিদ্ধ অন্তরের বেদনাময় রূপ।

বেশ মনে আছে, শুনতে শুনতে কখন তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বাধা দিল একটা অতি পরিচিত 'খটাস' শব্দ। অর্থাৎ বড় জমাদার সবুট-সেলাম ঠুকে নিবেদন করলেন, 'ফাঁসিকা খানা আয়া, হুজুর।' তার পেছনে কালিমাখা 'চৌকাওয়ালার' হাতে ঢাকা দেওয়া অ্যালুমিনিয়মের থালা। খানা উদ্‌ঘাটিত হ'ল। দেখলাম। শুধু খানা নয়, এই মৃত্যু পথযাত্রীর অন্নের থালার সঙ্গে জড়ানো জেলরক্ষীদের নীরব হৃদয় স্পর্শ।

ভাতের পরিমানটা বোধ হয় দু—'ডাবু', অর্থাৎ সাধারণ কয়েদির যে বরাদ্দ তার ডবল। সেই অনুপাতে ডাল তরকারি। সেদিনটা ছিল মৎসদিবস, অর্থাৎ সপ্তাহিক **fish day**। ভাতের স্তূপের উপর তার যে ভর্জিত খণ্ডটি লক্ষ্য করলাম তার আয়তন ও চারজনের বরাদ্দের চেয়ে ছোট নয়। ফাঁসি আসামীর জন্যে এই যে বিশেষ ব্যবস্থা, এর পেছনে জেল কোডের অনুশাসন নেই, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা অনুমোদন কিছুই নেই। এর মধ্যে

যদি কোনো কোড্ থাকে, তার রচয়িতা জেলখানায় বহু নিন্দিত সিপাই জমাদার।

খানা পরিবেশিত হল। সেই সঙ্গে জমাদারের পকেট থেকে বেরোল এক বাণ্ডিল বিড়ি। এ বস্তুটিও খানার অঙ্গ। **Condemned Prisoner** অর্থাৎ ফাঁসির জন্যে অপেক্ষমান বন্দীর সরকার প্রদত্ত **Special privilege**। অন্য কয়েদীরা এ দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত।

ত্রি-সন্ধ্যা এই ফাঁসি—যাত্রীর খাদ্য-পরীক্ষা ছিল আমার আইনবদ্ধ কার্য তালিকার অঙ্গ। ঠিক পরীক্ষা নয়, নিরীক্ষা। কি উদ্দেশ্যে এআইন রচিত হয়েছিল, আমি জানি না। বোধ হয়, যে হত্যাকাণ্ড সরকারের নিজস্ব অধিকার, তার উপর আর কেউ অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে, তারই জন্যে এই হুঁশিয়ারি।

মংথিয়ার কাহিনীর বাকী অংশটা সংক্ষিপ্ত। সরকারী নথিপত্র থেকেই পাওয়া গেল তার বিবরণ। মঙ্রাজাকে অগ্রাহ্য করে রক্তমাখা কাটারি হাতে সে সোজা গিয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারের থানায়। শান্ত সহজ কণ্ঠে জানাল, 'এই দা দিয়ে বৌকে খুন করে এলাম। তোমাদের যা করবার কর।'

বিচারের সময় নিম্ন বা উচ্চ আদালতে এর বেশি আর বিশেষ কিছুই সে বলেনি। আত্মপক্ষ—সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা তার ছিল না। সরকারী খরচে একজন তরুণ উকিল তার হয়ে লড়েছিলেন। তিনি বারংবার প্রশ্ন করেছিলেন মংথিয়াকে—'এ কথা কি সত্য নয় যে তোমার স্ত্রী ঐ মোড়লের উপপত্নী ছিল এবং ওর সঙ্গেই সে বসবাস করত?'

—না।

—এ কথা কি সত্য নয় যে ঐ মোড়লের উপপত্নী থাকা কালীন অবস্থায় পাশের বাড়ির আর একজন লোকের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ছিল?

—মিথ্যা কথা।

—এবং সেই কারণে ঐ মোড়লই তাকে খুন করে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে?

—না; খুন আমি করেছি।

খুনী মামলার বিচার-স্থল দায়রা আদালত এবং তার জন্যে রয়েছেন বিচার বিভাগের লোক, যাকে বলা হয় সেসন জজ। চিটাগং ছিল ট্রাক্ট্সের

ব্যবস্থা অন্যরকম। সেখানকার দায়রা বিচারের ভার ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের হাতে। তিনিও নিজে থেকে কতগুলো প্রশ্ন করেছিলেন খুনের রহস্য ভেদ করবার জন্যে। জানতে চেয়েছিলেন, 'কেন খুন করেছ? বৌ-এর বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ? কখন, কী অবস্থায়, কোন্ আক্রোশে নিজের বৌ-এর ঘাড়ে বসিয়ে দিলে দা'এর কোপ্?'

এসব কথার দুচারটা জবাব দিয়েছিল মংখিয়া। ঠিক কি বলেছিল, তার পরে আর তার মনে নেই।

আপীলের জন্যে মংখিয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। গুনধর চাক্‌মা একরকম জোর করেই তাকে রাজী করেছিল। তারপর আমার কাছে এসে বলল, 'আপীলটা, স্যাব, আপনাকে লিখতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো উকিল নই।' গুনধর বললে, 'সেই জন্যেই তো বলছি। এখানে উকিলের বুদ্ধি চলবে না।'

—তবে কার বুদ্ধি চলবে শুনি?

—বুদ্ধি নয়, স্যার, চাই শুধু একটুখানি হার্ট—

গুনধরের অনুরোধ কিনা জানি না, আপীল আমিই লিখেছিলাম। আপীল নয়, আবেদন। তার মধ্যে আইন ছিল না। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের কথায় কোথায় অসঙ্গতি, কোথায় অত্যুক্তি, সে সব দেখিয়ে যুক্তিজাল বিস্তারের চেষ্টাও ছিল না। ছিল শুধু খানিকটা উচ্ছ্বাস......স্ত্রীর কাছে কী পেয়েছিল মংখিয়া? প্রেম নয়, প্রীতি নয়, অনুমাত্র আনুগত্য নয়, শুধু লাঞ্ছনা, ঔদ্ধত্য আর অমানুষিক নির্যাতন। কোনো একটা মানুষের অন্তরের সমস্ত কোমলতা নিংড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে নির্মম কঠোর ক্ষীপ্ত করে তুলবার পক্ষে সেগুলো কি যথেষ্ট নয়? সে যদি সভ্য মানুষ হত, হয়তো ঐ স্ত্রীকে সে বর্জন করত, ভেঙে দিত বিবাহ বন্ধন, কিংবা হয়তো অন্তরে সঞ্চিত বিষাক্ত বিদ্বেষ লুকিয়ে রেখে তার সঙ্গেই অভিনয় করে যেত সারাজীবন। কিন্তু মংখিয়া সভ্য মানুষ নয়, পাহাড়ে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠা প্রকৃতির হাতের মানুষ। সভ্যতার কপটতা তাকে স্পর্শ করেনি। আত্ম-সংযমের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা সে শেখেনি। তাই তার বুকের ভেতরকার সমস্ত জিঘাংসা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে এল ধ্বংসের নগ্ন মূর্তি ধরে। শিক্ষা-সংস্কৃতির মুখোশ পরে আপনি যেখানে শানিয়ে শানিয়ে শুধু বাক্যবান প্রয়োগ করতাম, অরণ্যচারী মুক্ত মানুষ মংখিয়া সেখানে বসিয়ে দিল মৃত্যুর আঘাত।

তারপরে লিখেছিলাম, সভ্য মানুষের জন্যে তৈরি যে আইন সুবিজ্ঞ বিচারক তাই দিয়ে বিচার করেছেন বুনো মানুষের আচরন। মংখিয়া যে খুন করেছে, যে-মন দিয়ে খুন করেছে, তাকে দেখতে হবে মংখিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে, তারই দৃষ্টি দিয়ে; শিক্ষা-মার্জিত সামাজিক মানুষের দৃষ্টি দিয়ে নয়। অনুভব করতে হ'বে তার সেই দুর্জয় অভিমান, যার তাড়নায় সে নিজের হাতে বিসর্জন দিয়ে এল তার সদ্য-বিকশিত যৌবনা স্বর্ণ—প্রতিমা, তার একমাত্র শিশু সন্তানের জননী।

সিমকি মরল, কিন্তু শেষ হল না। তার মৃত্যু-দাহের সমস্ত দুঃসহ জ্বালা সে দিয়ে গেল এই নারীহন্তার দেহ মনে। তার কাছে কোথায় লাগে মৃত্যু দণ্ড! ফাঁসি তো তার শাস্তি নয়, শান্তি।

উপসংহারে লিখেছিলাম, মংখিয়ার নিজের জন্যে না হোক, যারা রয়ে গেল তার উপর একান্ত নির্ভর—একটি নিষ্পাপ বৃদ্ধা, আর একটি নিরপরাধ শিশু,—তাদের মুখ চেয়ে এই হতভাগ্য বন্দী শুধু বেঁচে থাকবার করুণাটুকু কামনা করে।

কদিনের মধ্যেই আপীলের ফল বেরিয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এই রকম আবেদনের যৌতা যথাযথ উত্তর। অর্থাৎ, **Appeal summarily dismissed**। সরাসরি না—মঞ্জুর। তার কয়েকদিন পরেই কমিশনার সাহেব এলেন জেল—পরিদর্শনে। এটা সেটা দেখবার পর ঢুকলেন ফাঁসি-ডিগ্রির চত্বরে। মংখিয়ার সেল-এর সামনে দাঁড়িয়ে জেলর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, **who wrote his appeal ?**

—ডেপুটি জেলর মলয় চৌধুরী।

—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

ছুটতে ছুটতে এলেন জেলর সাহেব। বললেন, যাও, তোমার ডাক পড়েছে। তখন বলিনি যে ঐ সব পাগলামো করো না? একি তোমার বাংলা মাসিকের প্রবন্ধ যে আবোল তাবোল যা খুশি লিখলেই হয়ে গেল?

এবার বোঝো।

সুপারের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন কমিশনার। প্রবীন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান। কাছে যেতেই সাগ্রহে বলে উঠলেন, আপনি লিখেছিলেন আপীল? **I congratulate you**—বলে, হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। স্ত্রীর আচরণ যতই উত্তেজক হোক, হঠাৎ রুখে গিয়ে ঝোঁকের

মাথায় খুন করেনি মংখিয়া। **It was a planned affair.** ভেবে চিন্তে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই সে গিয়েছিল মোড়লের বাড়ি।

আমি প্রতিবাদ করলাম না। সাহেব একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন, তার চেয়ে বড় কথা,—বাই দি বাই, আপনি ম্যাডোনার ছবি দেখেছেন?

বললাম দেখেছি।

ভাবগম্ভীর সুরে বললেন কমিশনার, আমার বিশ্বাস, ওর চেয়ে সুন্দর, ওর চেয়ে পবিত্র সৃষ্টি সংসারে আর কিছু নেই। আপনার কি মনে হয়?

বললাম, আমার ধারনাও তাই।

সাহেব বললেন, মংখিয়ার চোখের সামনে ছিল সেই জীবন্ত ম্যাডোনা—**A young mother suckling her little baby.** যে কোনো একটা নারীমূর্তি নয়, তারই সুন্দরী তরুণী স্ত্রী, আর তার কোলে শুয়ে স্তন-পান করছিল যে শিশু সেও তারই প্রথম সন্তান। **Can you imagine a purer sight! But it could not soften his mind.** এতটুকু দাগ পড়ল না তার মনের ওপর। **What a hardened criminal!** আপনি বলছেন সে করুনার পাত্র! **Absurd. He deserves no mercy.** মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড।

কমিশনার সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করবার মত কোনো তথ্য আমার হাতে ছিল না। তাই, শেষ পর্যন্ত চুপ করেই ছিলাম। হয়তো ওঁর কথাই ঠিক এই খুনী লোকটাকে আমি যা দেখাতে চেয়েছি, সেটা সে নয়। মানুষের অন্তরের কাছে তার কোনো দাবি নেই। তবু, পরদিন সকাল বেলা আবার যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তার সেল্-এর সামনে, আর সে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে,—তার বিশাল দেহের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান ভীরু, ভাবলেশ বর্জিত ছোট ছোট দুটি চোখ,—আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কোথায় যেন একটা ভুল রয়ে গেছে।

ফাঁসির দিন ধার্য হ'ল। তার কদিন আগে যথারীতি জিজ্ঞাসা করা হ'ল আসামীকে, কাউকে দেখতে চাও?

মংখিয়া বলল, অনেক দ্বিধা সঙ্কোচের পর, আমার মাকে যদি একবার—। সরকারী ব্যবস্থায় পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই তার মাকে নিয়ে আসা হল। সেই শীর্ণকায় পার্ব্বত্য রমণীর দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলাম বার্দ্ধক্য তার দেহকে নুইয়ে দিলেও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাকে দেখে একথা

মনে হলনা যে, তার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র এবং সংসারের একমাত্র অবলম্বন আজ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করেছে। জেল গেট থেকে দুর্বল কিন্তু অবিচল পদক্ষেপে সেল-চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ফাঁসি ডিগ্রির লৌহকপাট খুলে দেওয়া হ'ল। ফাঁসির আসামী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সেইদিকে। কাছে গিয়ে বললাম, বাইরে এস। তোমার মা এসেছেন।

অতি সন্তর্পনে সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নেমে এল মংখিয়া। নত হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরতে গেল তার মায়ের পা দুটো। চোখের নিমেষে দুহাত ছিটকে পিছিয়ে গেলেন মা। হাত নেড়ে নিষেধের সুরে কি যেন বলে উঠলেন ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ পাহাড়ী ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দোভাষী চাকমার গম্ভীর কণ্ঠ—**Don't touch me ; you are a sinner** পরমুহূর্তেই কেমন কোমল হয়ে গেল বৃদ্ধার জড়িত স্বর। ডান হাতখানা উপরে তুলে বিড়বিড় করে বললেন, তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

মংখিয়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল সদ্য তিরস্কৃত শিশুর মত। দুচোখের কোণ বেয়ে নেমে এল জলধারা। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কজন মানুষ জীবন্ত নয়, চিত্রার্পিত। তাদের সচকিত করে আবার শোনা গেল বৃদ্ধার সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ স্বর কী চাও তুমি আমার কাছে?

মংখিয়া চোখ তুলে তাকাল। ভগ্নকণ্ঠে বলল, চাইবার আমার কারো কাছেই কিছু নেই, মা। সেজন্য তোমায় ডাকিনি। একথা শুধু বলে যাবো। তাই তোমায় কষ্ট দিয়েছি।

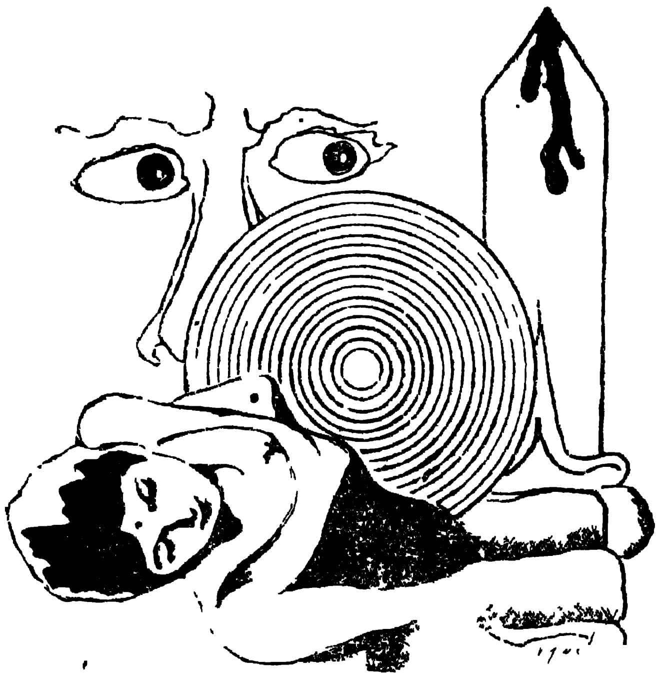
মা অপেক্ষা করে রইলেন। ক্ষণিক বিরতিবপর আবার শুরু করল মংখিয়া, আমি যখন আর থাকবো না, আমাদের বাড়ির সামনে যে জমিটুকু আছে, যেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকত, ঝুম থেকে ফিরতে যেদিন দেরি হ'ত আমার, সেইখানে, ঠিক সেই জায়গাটিতে একটা বটের চারা লাগিয়ে দিও। দেখো, জল দিতে যেন ভুল না হয়। তারপর গাছ যেদিন পাতা মেলতে শুরু করবে, একটু মাটি দিয়ে গোড়টা বাঁধিয়ে দিও। রোজ সন্ধ্যা বেলা তার নাম করে একটা করে বাতি জেলে দিও সেই বেদির ওপর। মেয়েটা যদি বাঁচে একটু বড় হ'লে, তারই হাতে ছেড়ে দিও এ কাজের ভার। বলো এটা তার বাবার শেষ ইচ্ছা। মা (চমকে উঠলাম তার সেই ডাক শুনে) এইটুকু ; শুধু এই কাজটুকু আমার জন্যে তোমরা পারবে না?

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মংখিয়ার। চোখ দুটো দুহাতে চেপে ধরে ছুটে চলে গেল তার নির্দিষ্ট সেল্-এর মধ্যে।

আরো কিছুক্ষণ তেমনি নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন তার মা। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়ালেন ফিরে যাবার পথে। হঠাৎ মনে হ'ল পা। পা দুটো তার কেঁপে উঠল। শুধু পা নয় সমস্ত শরীর। গুণধর চাকমা ছুটে এল। তার সঙ্গে একজন ওয়ার্ডার। তাদের প্রসারিত হাতের উপর লুটিয়ে পড়ল তপঃ ক্ষীণা বৃদ্ধার সংজ্ঞাহীন শীর্ণ দেহ।

জরাসন্ধ (চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী) জন্ম পাবনা জেলায়। অধুনা বাংলা দেশে। বাল্যে পিতৃহারা। দাদার তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে পাবনার গণ্ডগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আগমন। ম্যাট্রিক হতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও সরকারী কার্য নিযুক্তি তাঁকে নিয়মিত সাহিত্যানুশীলনে পরাঙ্মুখ করেছে। তবে কলেজ জীবনেই বিচিত্রায় একাধিক গল্প লিখেছেন ও বিচিত্রা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে অন্নদাশঙ্কর রায়ের পথেপ্রবাসের সমকালে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। যৌবনে রামধনু, শিশুসাথী প্রভৃতি শিশু মাসিকেও নানা স্বাদের গল্প নিয়মিত লিখেছেন। তবে সরকারী কাজের দায়-দায়িত্ব প্রাপ্তির ও বৃদ্ধির সাথে সাথে নিয়মিত লেখায় ছেদ পরে। পরবর্ত্তীকালে কারাজীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফসল "লৌহকপাট" গ্রন্থমালা তাঁকে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের মর্যাদায় ভূষিত করে। কারা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকেও তিনি সাধারণ কারাবাসীদের ব্যক্তি-জীবনের অসাধারণ সব কথা, ব্যথা ও বেদনা অপরিসীম সহানুভূতি ও মমত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বর্ণালী কলমের অবিশ্রান্ত আঁচড়ে।

বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অভিনব এক কাব্য সাহিত্যের প্রবর্তনা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় তিনি বাংলা "কারা সাহিত্যে" পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।



একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা

পঞ্চানন ঘোষাল

[এই রহস্য কাহিনীটি পুলিশের ডাইরি লেখার টেকনিকে লেখা। এটিকে ডাইরি সাহিত্য বলা হয়, লেখক প্রথম বাংলা সাহিত্যে ডাইরি সাহিত্যের উদ্‌ভাবক। উপরন্তু এই ঘটনাটি সত্যই ঘটেছিল। লেখক নিজে তদন্ত করে এই হতভাগিনী নিহতা নারীর মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।]

এই অখ্যাতা নারীটি ছিল এই কলিকাতা মহানগরীর জনৈকা বারবনিতা। এই সহায়-সম্বলহীনা রূপজীবিনী নারীর জীবনকে অমূল্য জীবন বলা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে রাজপথে গাড়ী-চাপা পড়া বেওয়ারিশ কুকুরের মৃত্যু ও আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে ঘৃণ্য পল্লীতে এই দেহ ব্যবসায়িনী নারীর মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ না থাকারই কথা।

এই জন্য তার অপমৃত্যুর করুণ কাহিনী এই শহরের নাগরিকদের মধ্যে কোনও আলোড়ন আনেনি। এক তদন্তকারী অফিসাররা ছাড়া এই মৃত্যু নিয়ে অন্য কারু মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু সমাজের এমন কয়টি মানুষ এই ঘটনায় সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে, পরবর্তীকালে এই মামলার জন্যে বহু লোকেরই মাথা ঘামাতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বিচারের সময় এই অখ্যাতা নিহতা নারী প্রখ্যাতা হয়ে উঠে। উপরন্তু এই ঘটনার সঙ্গে অপর একটি নারীর ভাগ্য জড়িত থাকায় শহরে এই খুনটি নিয়ে চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হয়।

১৯৩২ সালের উত্তর কোলকাতার কোনও এক বেশ্যাপল্লীতে এই নিদারুণ খুনটি সংঘটিত হয়। এই সময় অন্য একটি মামলার তদন্ত ব্যপদেশে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। হাওড়া ষ্টেশন হতে সোজা থানায় ফিরে শুনলাম যে, সহকারী অফিসাররা জনৈকা নারীর অপমৃত্যু সম্পর্কীয় ঘটনার তদন্তে বার হয়ে গিয়েছেন। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া উৎসব আগত প্রায়। এই সময় পয়সার প্রয়োজন মানুষের বেশি থাকে। এই জন্য বহু অত্যাচারী সুবিধে মত বেশ্যানারীদের বাড়ীতে প্রথম হানা দেয়। এজন্য আমি আমাদের এলাকাধীন বেশ্যাপল্লীগুলিতে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থাও করেছি। এতৎ সত্বেও সেখানে কেউ খুন হলে তা আমাদের লজ্জার বিষয়। আমি চিন্তিত মনে থানার জাবদা খাতা (জেনারেল ডাইরি) টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করলাম। তদন্তে বার হবার আগে সহকারীরা এতে একটা প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই প্রাথমিক সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো—

"অমুক রাস্তার ১২ নং কুঠির নিচের তলার সারদাসুন্দরী বাড়িওলীর ভৃত্য ফাগুয়া কাহার এসে সংবাদ দিলে যে, তাদের বাড়ির দ্বিতলের একটি ঘরে সুখুরাণী নামে এক নারী বাস করে। সাধারণত সে প্রতিদিন সকাল সাত ঘটিকার মধ্যে ঘর হতে বার হয়ে আসে। কিন্তু এইদিন বেলা এগারটাতেও সে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে নি। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা তাকে ডাকাডাকি করে, তারা দরজায় ধাকাধাক্কিও করে, কিন্তু তা সত্বেও ঘরের ভিতর থেকে সুখুরাণী ঘরের বাইরে আসেনি। এমন কি এতো ডাকাডাকিতেও সে কোন সাড়া-শব্দ পর্যন্ত দেয় না। এই ব্যাপার ঐ বাড়ীর বাড়িওয়ালী-মাকে জানানো হলে তার আদেশমত সংবাদদাতা এই ঘটনাটি পুলিশে জানাবার জন্যে থানায় এসেছে।"

থানার জাবেদা খাতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে আমি দেখলাম

যে, উহার প্রথম 'থাকে' উপরোক্ত সংবাদটি লিপিবদ্ধ করে উহার দ্বিতীয় 'থাকে' জনৈক সহকারী অফিসার লিখে রেখেছেন, "এই খাতার ১নং থাকে বর্ণিত সংবাদের তদন্তে আমরা বহির্গত হলাম।" এই সংবাদটি দ্রুতগতিতে পড়ে নিয়ে আমি ভাবছিলাম, কি রে বাবা। খুন নয় তো! ঠিক সেই সময় সহকারীরা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে থানায় ফিরে এলেন। এঁদের হাসিমুখে থানাতে ফিরতে দেখে আমি আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে মার্ডার, না সুসাইড ?'

'কখন ফিরলেন স্যার ?'—আমাকে দেখে জনৈক সহকারী খুশি মনে উত্তর করলেন, 'একে আপনি উপস্থিত নেই, তার ওপর এই ঝামেলা। আমরা একটু ভয় পেয়ে গিছলুম। যাক, এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা সামান্য ব্যপার—এ পিওর কেস অব সুইসাইড। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কেন আত্মহত্যা করলো তা জানা গেলো না।'

'যাক্ স্যার! মেয়েটা ভালোয় ভালোয় নিজেই সরে পড়লো', প্রথম সহকারীর কথাটা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় সহকারী বলে উঠলেন, 'তা' না হলে ও যে আরও কতো কচি কচি মাথা চিবিয়ে খেতো, তা কে জানে।'

'তাতো ভাই বুঝলাম।' আমি নারাজি ভাবে ঘাড় নেড়ে সহকারীর এই উক্তির প্রত্যুত্তরে বললাম, 'কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা নিজেদের কাঁচ মাথাগুলো ওদের বাড়ী পর্যন্ত ব'য়ে নিয়েই বা যায় কেন ?

এমনি হাস্য-পরিহাসের মধ্যে আমার সহকারী জেনারেল ডাইরিতে এই আত্মহত্যার তদন্ত সম্পর্কে রিপোর্টটি লেখা শেষ করেছে, এমন সময় আমাদের বড়সাহেব রায়বাহাদুর প্রভাতনাথ মুখার্জি টেলিফোনে আমাদের খোঁজ করে বসলেন। টেলিফোনে আমার গলা শুনে তিনি আশ্বস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আরে, তুমি কলকাতায় ফিরেছো। বেশ বেশ, তা'হলে ভালোই হলো। এই মাত্র খবর পেলাম যে অমুক পাড়ায় একটা মেয়েকে মরা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তোমার অফিসাররা শুনলাম ওটা আত্মহত্যা বলে রায় দিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওটা সুইসাইড না'ও হতে পারে। তুমি এখুনি নিজে সেখানে গিয়ে দেখো ওটা সত্যই সুইসাইড, না মার্ডার।'

টেলিফোনটির হ্যাণ্ডেল যথাস্থানে ন্যস্ত করে আমি একবার মাত্র ভাবলাম, আগের ট্রেনটা ফেইল করে পরের ট্রেনে এলেই হতো। অন্তত দু' ঘন্টা লেটে শহরে পৌঁছুলে এতো হাঙ্গামা আর পোয়াতে হতো না।

পুরা একদিন ট্রেনের ঝাঁকুনি খেতে খেতে কোলকাতায় পৌঁছিয়েছি। বিশ্রামের লালসায় সারা দেহটা এমনিতেই এলিয়ে পড়তে চায়। মনের জোরে দেহটা চাঙ্গা করে নিয়ে আমি সহকারীর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলাম। ততক্ষণে সহকারী তাঁর রিপোর্ট লেখালেখির কাজ শেষ করে ফেলেছেন। আমি তাঁর হাত থেকে ডাইরি বইটা টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করে দিলাম। তিনি তাঁর বিস্তৃত রিপোর্টে ঘটনাস্থলের কয়েক ব্যক্তির বিবৃতির সহিত নিজেরও একটা নাতিদীর্ঘ বিবৃতি সংযুক্ত করেছেন। এই সম্পর্কে তদন্তকারী সহকারীর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, ঐ নারীর ঘরটির দুয়ার ভিতর হতে বন্ধ করা রয়েছে। এই ঘর হতে বার হয়ে আসবার মাত্র ঐ একটাই দরজা ছিল। ঐ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আমি বুঝতে পারি যে, ভিতর হতে অর্গলবদ্ধ করা হয়েছে। অগত্যা জোর করে দরজা ভেঙে আমাদের ঐ ঘরে ঢুকতে হয়। দুইজন স্থানীয় সাক্ষী সঙ্গে ঐ ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম যে, এক নারী রক্তাপ্লুত অবস্থায় তার বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শায়িত। এই মেয়েটির বয়স অনুমানে বিশ বৎসর মনে হলো। তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, গড়ন বেশ গোলগাল, নিটোল। মৃত্যুর পরও তার মুখটা ঢলঢলে কচি কচি মনে হয়। তার গলার উপরাংশে একটা গভীর ক্ষত দেখলাম। এই ক্ষত হতে রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠে দেওয়ালে এসে পড়েছে। সারা বিছানাটা রক্তের ছোপ লেগে কালো হয়ে গেছে। অর্ধমুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে সে যেন ঘুমচ্ছে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে, তার চক্ষুর পাতা অর্ধনিমীলিত অবস্থায় রয়েছে। একটা ধারালো রক্তমাখা দোধারা ছুরি তার হাতের কাছে পড়ে আছে। কিন্তু উহা তার হাতের নাগালের বাইরে দেখা যায়। সম্ভবত প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ার কালে উহা তার হাত হতে ছিটকে পড়ে। এই ঘরের এই একমাত্র দরজা ছাড়া রাস্তার দিকে দুটা মাত্র জানালা আছে। এই জানালায় মোটা গরাদ লাগানো আছে। এই জানালা দু'টার পাল্লা খোলা ছিল। ঘরের মধ্যে কোনও বাক্স বা ড্রয়ার ভাঙা দেখা যায়নি,—" ইত্যাদি।

আমি বার দুই-চার সহকারীর বিবৃতিটির উপর ত্বরিত গতিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। এই সব প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—হুঁ, বুঝলাম। কিন্তু এটা সুইসাইড ছাড়া আর কিছু নয়. তা তুমি বুঝছো কি করে? হঠাৎ তুমি এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে এলে কেন? এটা একটা মার্ডার কেসও তো হতে পারে?

উঃ—না না স্যার! এ কিছুতেই মার্ডার কেস হতে পারে না। মেয়েটা প্রেমে-ট্রেমে পড়ে বা জ্বালাযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছে। ওর ঘরের দরজাটা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা সকলের সম্মুখে সেটা ভেঙে ওর ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ওদিকে ওই ঘরের জানালায় মোটা মোটা গরাদ রয়েছে। এদিকে একমাত্র এই মেয়েটা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী তার ঘরে ছিল না। সে সুরক্ষিত অবস্থায় তার ঘরে শুয়ে ছিল। বাইরে থেকে কারু পক্ষে রাত্রে তার ঘরে ঢুকা অসম্ভব। এই অবস্থায় কে আর তাকে খুন করতে আসবে?

প্রঃ—আরে থামো থমো। প্রেম-ট্রেম ওরা কেনা-বেচা করে। এজন্য ওসবের বালাই ওদের নেই। এখন বাকি রইলো জ্বালা-যন্ত্রণার প্রশ্ন। কিন্তু মানুষের নাম মহাশয়, যা সওয়ানো যায় তাই সয়। দুঃখকষ্ট ওদের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। এজন্য এসব তীব্র ভাবে তাদের অনুভূত না হওয়ারই কথা। তবে শেষের দিকে তুমি যা বললে তা ভেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তুমি ভালো করে জেনেছো তো, ঐ ঘর হতে কোনও অর্থ বা অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়নি?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। আমি ঐ ঘরের প্রতিটি বাক্স, তোরঙ্গ ও আলমারী, মায় ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, সেগুলোর একটাও ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়নি। এইসব দ্রব্যের বহির্দেশে কোনও যন্ত্রের আঘাত আমি দেখি নি। ওগুলো বাইরে থেকে খোলাও যায়নি। ওর প্রত্যেকটি বাক্স-আদি চাবি বন্ধ ছিল। আপনি স্যার এই অবস্থায় এটা খুন মনে করছেন কেন?

প্রঃ—তোমাদের সব কিছুই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। ওর আঁচলে একটা চাবির কথা কি তোমরা কেউ ভেবেছো? তার সেই চাবির গোছা কি যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে? প্রথমত এই সব মেয়ের ঘরে দোধারা ছুরি থাকার কথা নয়। এরপর তার চাবির গোছা না পাওয়া গেলে চিন্তার বিষয়। বদ লোকেরা কখনো কখনো এদের ঘরে এলেও তাদের হাতিয়ার তারা সেখানে ফেলে যাবে না। উঁহু, আমার যেন কি রকম সন্দেহ হয়। লাস কি তোমরা মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছো?

আমরা এইবার থানা হতে বার হয়ে দুর্ধর্ষ মল্লিকবাবুর গুণধর পৌত্রের শ্বশুরালয়ে এসে উপস্থিত হলাম। এঁদের বাটীর বর্তমান আবহাওয়া মল্লিক বাবুদের বাটীর মত সাবেকী নয়। অতি আধুনিকতার আবর্তনে এই বাড়ীর ছোট-বড় সকলে এরা হাবুডুবু। এখানে এসে প্রথমে আমরা ঐ মল্লিক বাবুর গুণধর পৌত্রটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তাঁর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আমার নাম বাবু অমুক মল্লিক, পিতার নাম ৺অমুক মল্লিক। পাঞ্জাবী বংশোদ্ভব হলেও ছয় পুরুষ আমরা বাংলা প্রবাসী। আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমাদের উত্তরাধিকারিত্ব এই প্রদেশে প্রচলিত দায়—ভাগের বদলে মিতাক্ষর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের সাথে সাথে আমরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হই। পিতা কর্তৃক ত্যাজ্য পুত্র হওয়ার ভয় না থাকার সহজে তাদের সাথে কলহে লিপ্ত হয়ে—এদেশে ভাই ভাই-এর মত পিতা ও তৎ পিতার সাথে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে আমরা সক্ষম। এই সুবিধা থাকায় দুষ্ট পিতা বা পিতামহ সম্পত্তি নষ্ট করলে আমরা বাধা দিতে পারি। এদেশের পিতাদের মত পৈতৃক সম্পত্তি খুইয়ে সন্তানদের এরা পথে বসাতে পাবে না। এই জন্য আমার পিতামহের সাথে দেওয়ানি মামলা করে সম্পত্তির জন্য পার্টিসন সুটে আমাকে লিপ্ত হতে হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের উভয়েরই অভিযোগ যে, আমরা পরস্পরে প্রপিতামহের আমলের পৈত্রিক সম্পত্তি উড়িয়ে দিচ্ছি। আজ্ঞে হাঁ,। আপনি এই বিষয়ে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পেরেছেন। আমরা ধনী বংশীয় হওয়ায় বাল্যকালে আমাদের বিবাহ হয়। ঠাকুরদার ষোলো বৎসর বয়সে আমার পিতার জন্ম হয়। আমার স্বর্গত পিতার আঠারো বৎসর বয়সে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামহ ও আমার বয়সের মধ্যে এজন্য ব্যবধান স্বভাবতঃই খুব বেশি নয়। আমাদের মত এইরূপ বহু ধনী পরিবার এইভাবে বহু পুরুষ একত্রে বসবাস করতে পেরেছে। এইবার আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা আপনি করতে চান তো বলুন।"

ভদ্রলোকের এই বিবৃতি হতে ভারতীয় ধনিক সমাজের এক নূতন দিকের আমি সন্ধান পেলাম। আমার এখন মনে হয় যে নরনারীর বিবাহের বয়স বেঁধে দিলেও বহু সামাজিক অপরাধের অবসান হতে পারে। অন্যথায় পিতাও পুত্রের মধ্যেও মমতার বদলে পিঠোপিঠি ভ্রাতৃসুলভ ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নয়। এই একটি কারণে পৌত্রের বর্তমানেও মল্লিকবাবু

পুনরায় দার পরিগ্রহ করে তাদের সোনার সংসারে মামলা ঢুকাতে পেরেছেন। এই মামলার সংশ্লিষ্ট ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অন্য কয়েকটি নর-নারীর জীবনের ব্যর্থতার পিছনে ও দেখা যায় এই বয়সের নীতিবিহীন তারতম্য। হায়। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র এই বিষয় আর ভাববে কবে? এই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারি যে বয়সের সন্নিকট্য হেতু এদের পরস্পরের দুর্বলতা পরস্পরে জ্ঞাত হতে পেরেছে। এজন্য এরা পরস্পরকে পরস্পরের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে নি। নিজেদের চরিত্র শুধরে নেবার বয়স অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই এদের পুত্র-পৌত্রেরা সাবালক হয়ে ওঠে। তাই এদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান না হয়ে উহা আরও জটিলতর হয়ে উঠে।

এইবার আমি এই ধনী ঘরের যুবকটিকে এই মামলার তদন্তের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর তিনি যথাযথ ভাবে দিয়ে যান। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই সকল প্রশ্নোত্তর হতে এই খুনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে বুঝা যায়।

প্রঃ—হুম্! আপনার স্বর্গত পিতার বিষয় আমি উত্থাপন করবো না। আমি শুধু আপনার ও আপনার ঠাকুরদার বিষয় জিজ্ঞাসা করবো। আপনার ঠাকুরদার মত আপনি এ-পাত্ত ও-পাত্ত না করে একনিষ্ঠতার পক্ষপাতী। এটা আপনার চেহারা দেখে ও কথাবার্তা শুনে ধারণা করেছি। আপনার স্ত্রী বড় বনেদী ঘর হতে আপনাদের ঘরে এসেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি সুন্দরী ও গুণবতী। আপনার ও আপনার ঠাকুরদার গাত্রবর্ণ দেখে বুঝা যায় যে, প্রেম করে বিবাহের রেওয়াজ আপনাদের পরিবারে নেই, এইজন্যে প্রতি পুরুষে ঘরে সুন্দরী বউ এসেছে। তা' না হলে আপনাদের গায়ের রঙ এত ফর্সা দেখা যেতো না। কিন্তু আপনি এক পর—নারীর প্রণয়াভিলাষী হলেন কেন? এই সংবাদ আমরা পূর্ব হতে সংগ্রহ করেছি, অতএব উহা গোপন করে লাভ নেই। এখন বলুন তার কবল হতে মুক্ত হয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কোন্ কারণে?

উঃ—মশাই, তাহলে আপনাদের নিকট সংসারের সকল বিষয় খুলে বলতে হয়। আমার স্ত্রীকে আমি যে ভালবাসি তা ঠিক। তার রূপে ও গুণে আমি মুগ্ধ। কিন্তু সে গান গাইতে পারে না, অথচ গান আমি বড়ো ভালবাসি। এই গান হচ্ছে আমাদের একটা বংশানুক্রমিক নেশা। এই চর্চা আমাদের অধিক অধঃপতন হতে রক্ষা করে। কিন্তু নারীর সুললিত

কণ্ঠে গান শোনার ঝামেলাই আমার কাল হলো। তা না হলে এতো ব্যথা আমাকে দেবার ঐ শয়তানীর ক্ষমতা হতো না। আমার স্ত্রী কিছুতেই গান শিখতে রাজি না হওয়ায় আমি ওর ঘরে গিয়ে পড়ি। পরে তারই দ্বারা বারে বারে অপমানিত হয়ে আমি বাড়ি ফিরি। আমার গুণবতী স্ত্রী আমার মন বুঝে গোপনে গান শিখতে থাকে। এখন তিনি সুগায়িকার মধ্যে গণ্য হয়েছেন। এখন আমি একান্ত রূপে আমার এই সাধ্বী স্ত্রীর অনুগত ভর্তা। আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর কোনও দুঃখ বা অভিযোগ আমার এখন নেই। পরিবর্তিত অবস্থাতে পিতামহের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত কন্টেস্ট করতে আমার মন চাইলো না। এইজন্য এই মামলা ইচ্ছা করে তাঁকে আমি জিতবার সুযোগ করে দিলাম।

প্রঃ—কয়েকটি বিষয়ে ঐ কুলটা নারীর প্রতি আপনার ভুল ধারণা আছে। আমরা তদন্তে জেনেছি যে আপনাকে সে অত্যেন্ত ভালবাসতো। তবু আপনার ও আপনার স্ত্রীর হিতার্থে আপনার মোহ দূর করার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আপনার সাথে অভদ্র ব্যবহার করছে। এ কথা যারা জানে না তারা ত. মানে না। কিন্তু আমরা তা জানি, তাই-ত। আমরা মানি।

উঃ—স্যার! এ সব কুলটা নারীদের ছলা—কলার অভাব নেই। সে যাই হোক্ এখন আমি আর ওকে ভালবাসি না। তাই বোধ হয় এতো স্পষ্ট করে আজ তা আমি বুঝতে পারছি। ঐ নারী আমাকে বহু আশা দিয়ে পরে অপমান করে ঘর হতে তাড়িয়ে দেয়। আমি মোহের ঝোঁকে আমাদের পূর্ব পুরুষের স্পর্শধন্য কয়েকটা পারিবারিক গহনা তাকে সাময়িক ভাবে পরতে দিই। কিন্তু ঐ গহনার চতুর্গুণ মূল্যের বিনিময়ে ও সে ওগুলো আমাকে ফিরত দেয় নি। স্বর্গত ঠাকুমা বলতেন যে, ঐ গহনা বংশের বাইরের কেউ ছোঁয়া মাত্র সে নিহত হবে। আমি জানি যে আমার সতী সাধ্বী ঠাকুমার ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হবে না। এখনও পর্যন্ত লজ্জায় এ' কথা আপন স্ত্রীকেও আমি জানাতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হয় ওকে খুন করে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তবু ভালো আমার এই কীর্তি-কলাপ্ আমার দুর্দান্ত ঠাকুরদা এখনও জানতে পারেন নি। এ সব গুহ্য তত্ত্ব তিনি জানলে এতো দিন গুণ্ডা নিয়োগ করে তিনি আমাকে নিহত করতেন। এগুলি দয়া করে ওর খপ্পর হতে আপনারা গোপনে উদ্ধার করতে পারেন কি? এজন্য আমি দশ-বিশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি আছি। দেখুন আপনারা তা যদি—

এই যুবকের কথাবার্তায় বুঝা যায় যে বংশ পরম্পরার খুনের নেশা এঁদের এখনও যায় নি। পূর্ব পুরুষরা হয়তো সাক্ষাৎ ভাবে বহু ব্যক্তিকে খুন করেছেন। এখন এঁরা তাতে ব্যক্তিগত ভাবে অপারক থাকায় অপরের দ্বারা এই কার্য করিয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে এঁর ধুরন্ধর পিতামহকে বাদ দিলে সন্দেহ করার মত অন্য কোনও মানুষ নেই। তবে এই যুবকের কথা—বার্তা শুনে বুঝা যায় যে, তিনি নিয়মিত সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন না। এইজন্য তিনি তখনও জানতে পারেন নি যে তাঁর স্বর্গত ঠাকুরমাতার এতৎসম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যে ফলে গিয়েছে এবং তাঁর পূর্ব প্রেমিকা ঐ হতভাগিনী নারী ইতিমধ্যেই নিহতা হয়েছে।

এই ভদ্রলোকের দিকটা যা জানবার তা জানা শেষ হয়েছে। এখন এঁর স্ত্রীর একটি বিবৃতি গ্রহণের প্রয়োজন। আমি এই সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র দাদাবাবু নামধেয় এই যুবকটি মুখ বাঁকালেন। এতো আধুনিক আবহাওয়ার মধ্যে এসেও সাবেকী প্রথা তাঁর মনকে আজও আহত করে। অথচ এঁর অবর্তমানে আমাকে তাঁর বিবৃতি নিতে হবে। অগত্যা এঁর স্ত্রীর ভ্রাতার উপস্থিতিতে এঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হলো। কিন্তু এই যুবকের স্ত্রীর রক্তে ইতিমধ্যে আধুনিকতা জেঁকে বসেছে। তা' না হলে গান শিখে রেডিও পর্যন্ত তিনি ধাওয়া করতে পারতেন না। ভদ্রমহিলা ধীর-স্থির চিত্তে এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়ে ছিলেন। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো: "আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই বিষয়ে ঠিক বলেছেন। সন্তান জন্মের সাথে সাথে তাদের প্রতি মা'য়ের অপত্য স্নেহ আসে। কিন্তু তাদের প্রতি ঐ জাতীয় স্নেহ বয়স্ক পিতার মধ্যে শুধু দেখা যায়। এই বয়স আমার তরুন বয়সে আমার স্বর্গত শ্বশুর ও এখনও পর্যন্ত জীবিত দা-শ্বশুরের আসে নি। তাই তাঁদের স্ব-স্ব সন্তানদের প্রতি তাঁদের স্বভাব সুলভ মমতা থাকে নি। কিন্তু তা বলে সন্তানদের প্রতি কর্তব্য কাজে তাঁদের কোন অবহেলা দেখিনি। কিন্তু হৃদয়হীন কর্তব্যের শেষ দশা বোধ করি ভালো হয় না। বর্তমান মামলা মকর্দমার মূলে আছে এই। এইবার আমি আমার নিজের বিষয় বলবো। আমি বি-এ ক্লাশ পর্যন্ত কলেজে পড়েছি। কিন্তু বিবাহের সময় এই বিষয় আমাদের গোপন করে যেতে হয়। আমি মাত্র মামুলি লেখাপড়া বাড়িতে করেছি—এইরূপ একটা মিথ্যা না বললে আমার এই সাবেকী ধনী পরিবারের বধূ হওয়া সম্ভব হতো না। আমাদের বিবাহের পর কিন্তু আমাদের সময়

ভালোই অতিবাহিত হয়। কিন্তু হঠাৎ এক সময় আমার স্বামীর সাবেকী পারিবারিক বার টান শুরু হয়। এতো সাবধানে থেকে এতো চেষ্টা করেও আমি তাঁকে ধরে রাখতে পারি না। ওঁর গায়ের বস্ত্রের ও চুলের গন্ধ হতে আমার সন্দেহ হতে থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে স্বামীকে জানালে তিনি বেপরোয়া হবেন। শিক্ষিতা হওয়ায় এই সত্যটুকু আমার জানা ছিল। আমি কৌশলে তাঁকে ঘরমুখো করবার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার মতো এক দরদী নারীর কবলে পড়েন। একদিন সহ্য করতে না পেরে আমি বিষ পানে অচৈতন্য হয়ে পড়ি। এই ঘটনা শ্বশুর কুলের বিরোধী ধনকুবেররা ঘটা করে এক সংবাদপত্রে তুলে দেয়। এর দ্বারা আমাদের পরিবারকে যে—বেইজ্জত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাদের এই শত্রুতা আমাকে একদিন পুনরুজ্জীবিত করে দিলে। ঐ দরদী নারী এই সংবাদপত্রটি পড়ার পর এক বালক মারফৎ গোপনে আমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্র পাঠায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় মামলা বাধায় আমাকে পিত্রালয়ে চলে আসতে হয়। এইখানে ঐ মহিমময়ী নারী আমার সাথে দেখা করে আমার ঐ স্বামীর দুর্বলতার কারণ জানায়। আমি এই মহিলার গান রেডিওতে বহুবার শুনেছি। তার প্রস্তাব মাত্র আমি তার কাছে গান শিখতে রাজি হই। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন অসীম ধৈর্যের সাথে সে আমাকে গান শিখিয়েছে। স্বামীর মন জয় করার জন্যে দুইটি গান সে আমাকে ভালো করে শেখায়। সুর—তানলয়ের নিগূঢ় অর্থ না বুঝেও শুধু অভ্যাস ও অনুকরন করে করে গান দুটো হুবহু ওরই মত আমি গাইতে শিখি। এরপর ওরই চেষ্টায় একদিন আমার ভাই ওর সাথে ওর একটি গান রেডিওতে গেয়ে আসি। এরপর হতে ধীরে ধীরে আমার স্বামীর বার টান কমে। আমি এতো ভালো গান জানি বুঝে তিনি অবাক হয়ে যান। কিন্তু আমি যে উচ্চশিক্ষিতা তা তিনি তখনও জানেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই বিষয় ঠিকই বুঝেছেন। আমি বি-এ পর্যন্ত পড়লেও আমার স্বামী ম্যাট্রিক পাশ। কিন্তু ঘর—সংসার ও রানাবান্নার কাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কোথায়? তবে স্বামীকে ঠিক পথে চালানোর জন্যে এর প্রয়োজন আছে সত্য। ঐ নারীকে আমাদের সাবেকী গহনা উপহারের বিষয় ঐ নারী আমাকে বলে। তার সাথে পরামর্শ করে গোপনে ওগুলো আমাদের পারিবারিক আলমারীতে রাখা আমরা স্থির করি। আমার অসুবিধে এই যে, আমার সাথে যে তার আলাপ আছে তা স্বামীকে জানাতে

পারি না। ঐ কুলটা নারীর সাথে ঘরের বৌ এর আলাপ আছে শুনলে আমাব স্বামী তা বরদাস্ত করতেন না। আজ্ঞে হ্যাঁ। সত্যি। আমার ঐ স্নেহময়ী দিদি আমাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর মত আমি এই উপকারী বান্ধবীকে ঘৃণা করি না। তাকে আমি বাংলার এক শ্রেষ্ঠা নারীরূপে ভক্তি করে থাকি। আজ্ঞে, আমার স্বামীর সংবাদপত্র পড়া অভ্যাস নেই। কিন্তু সংবাদপত্র পড়া আমার দৈনন্দিন কর্ম। তাই ঐ নিদারুণ নারী-হত্যার সংবাদটি আমি কাগজে পড়েছি। এর জন্য দুই রাত্রি আমি কেঁদে কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। হঠাৎ তার মৃত্যু না হলে ঐ গহনা এতোদিনে আমরা নিশ্চয়ই ফেরত পেতুম। ঐ গহনাগুলো না পেলে আমার স্বামী ও দাদাশ্বশুরের বিবাদ কোনও দিন মিটবে না। কিন্তু ওগুলো ফিরে পাওয়া মাত্র এই বিবাদ ক্ষণিকের মধ্যে মিটে যাবে। ওর সাথে আমাদের পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ মিশানো আছে। উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্বেও এই সংস্কার আমারও মনে বদ্ধমূল। আপন সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর আমার স্বামীরও মনে এজন্যে এতটুকুও শান্তি নেই। আমার ভয়, এতে তিনি আত্মহত্যা না করে বসেন। এখন আপনারা—"

এই ভদ্রমহিলা উচ্চশিক্ষিতা হলেও তিনি একজন ভারতীয় নারী। মূলতঃ তিনি তাঁদের পারিবারিক সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী। এই কারণে যে কোনও সংস্কারে বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে তিনি সগৌরবে স্থান করে নিতে পারেন। এই ভদ্রমহিলার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করার পর তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। এই সুশিক্ষিত ভদ্রমহিলা তার যথাযথ উত্তরও দিয়েছেন। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনি শুনেছেন যে আপনার দাদাশ্বশুর মল্লিক বাবু প্রৌঢ় বয়সে জনৈকা বালিকাকে বিবাহ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে কৌতূহল হয়। আপনারা কি তাঁর ঐ বালিকা বধূটিকে আপনাদের সাবেকী বাটীতে স্থান দেবেন ?

উঃ—বাংলা দেশে একটি বিখ্যাত সাধকের উক্তি আছে—'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়, তথাপি আমার তিনি প্রাণের গোঁসায়।' এই দিক হতে বিচার করলে তাঁর সমালোচনাতে আমাদের অধিকার নেই। ঠাকুর-বাবু তাঁর এই বয়সে সেবা-যত্নের জন্য কাঙ্গাল হয়ে উঠেন। এঁদের মধ্যে

কলহ না হওয়া পর্যন্ত আমি ওঁকে সেবা-যত্ন করতাম। এ কথা ঠিক যে এই বয়সে তাঁর যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা দরকার। ঐ বালিকা তাঁকে সেবা-যত্ন দ্বারা মুগ্ধ না করলে ঐ অঘটন ঘটতো না। ঠাকুরবাবু মোহ দূর হওয়ার পর ঐ অবলাবালাকে পরিহার করলে আমি অধিক দুঃখিত হবো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আমাদের ধনদৌলত আছে। এখন এর কিছুটা ভাগাভাগি হলে ক্ষতি কি? জন্মসূত্রে মুফত ধন-দৌলত পাওয়ার চেয়ে ওটা অর্জন করার গৌরব অধিক। পৈত্রিক সম্পত্তিভোগী মানুষদের আমি পরভুক পরগাছা মনে করি।

প্রঃ—আচ্ছা। রেডিও অফিসে ঐ মৃতা নারীর পরিচিত এক কর্তা ব্যক্তি আছেন। আপনি তো সম্প্রতি প্রোগ্রাম পেয়ে ওখানে যাতায়াত করতেন। ওঁর সম্বন্ধে মৃতা দিদির কাছে কোনও কিছু শুনেছিলেন? এটুকু মনে করে এ বিষয়ে আপনি জানালে আমাদের উপকার হয়।

উঃ—আজ্ঞে। রেডিও অফিসে ঐ কর্মকর্তাটিকে আমি বহুবার দিদির সাথে দেখেছি। এই ভদ্রলোককে বলে কয়ে আমার মৃতা দিদি রেডিওর প্রোগ্রাম আমার পক্ষে যোগাড় করে। তা' না হলে আমার মত কাঁচা নূতন আর্টিস্ট ওখানে এতো শীঘ্র পাত্তা পাবে কেন? আমি এইটকু শুধু জানি যে তিনি ঐ দিদিকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

প্রঃ—আমার আসল প্রশ্নের আপনি কোনও উত্তর দিলেন না। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঐ ভদ্রলোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ? আর তাঁর সাথে আপনার ঐ দিদির সম্পর্কটা কি ছিল? এইটুকু জানতে পারলে এই নারী খুন সম্পর্কিত তদন্তের পথে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের আশা এই যে এ সম্বন্ধে আপনি যথেষ্ট আলোকপাত করবেন।

উঃ—ঐ ভদ্রলোকের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর ও দিদির পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। এতে ঐ ভদ্রলোকের অন্যায় হলেও দিদির কোনও অন্যায় নেই। আমি এই উভয় ব্যক্তির এই দুর্বলতাকে ভগবানের নির্দেশ মনে করতাম। এর কারণ দিদির কাছে তার বিগত দিনের জীবনী আমি শুনেছি।

সাক্ষী পরম্পরের মুখে শুনা কাহিনী হতে আমি যা এতো দিন অনুমান করেছি, এক্ষনে এই ভদ্রমহিলার মুখে তা সত্যরূপে শুনে পুরাপুরী মেনে নিতে পারলাম। এই ব্যাপারে এই ভদ্রমহিলার একটি দ্বিতীয় বিবৃতি

আমাকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। ঐ বিবৃতির একটি সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আজ্ঞে! ঐ ভদ্রলোকের সহিত বাল্যকালে মৃতা দিদির বিবাহ হয়। কিন্তু জোর করে ছোট মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়াতে মন বিক্ষুব্ধ হয়। উনি বাসর ঘর হতে উঠে বাইরে যাওয়ার অছিলায় উধাও হয়ে যান। ভদ্রলোক লেখাপড়া বেশি শেখেন নি। কিন্তু এখনও এমন দুটি বিভাগ আছে যেখানে লেখাপড়া না করলেও উন্নতি করা যায়। এই দুইটি বিভাগ হচ্ছে যথাক্রমে পুলিশ ও রেডিও বিভাগ। ভদ্রলোক পালিয়ে দিল্লী চলে গিয়ে রেডিওতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাঁর মনোমত এক বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করেন। এরপর তাঁর এই বিভাগে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হতে থাকে। সম্প্রতি কালে দিল্লী হতে এই শহরের ষ্টেশনে তিনি বদলী হয়েছেন। মেয়েদের চোখ পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে সতর্ক। তাই শেষ পর্যন্ত উনি দিদিকে চেনেন নি, কিন্তু মৃতা দিদি ঠিক প্রথম দিনেই তাঁকে চিনতে পারেন।" এই শেষে বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে ক্ষুণ্ন মনে আমি এই হারানো মানুষ ক'টির জীবন সম্বন্ধে ভাবছিলাম। নূতন ধাঁচের গহনার প্রাবল্যে পুরানো গহনাগুলি গেঁইয়া পদবাচ্য হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গিয়েছে যে, সেই পুরানো গহনা আবার আপন গৌরবে ফিরেছে। এমন কি, তারা ঐ সময় এই নূতনদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলেছে। এক সময় দেখা যায় যে, মানুষ কমবয়েসী কনেকে পছন্দ না করে বয়স্থা কন্যার পানিগ্রহণে পক্ষপাতী হয়েছে। আবার কয়েক বছর পরে দেখি যে বয়স্কা বধূর জন্য খোঁজাখুঁজি করছে। ঐ মৃতা নারীর ভাগ্যে যে সময় তার বিবাহ হয় তখন যুবকদের বয়স্কা বধূদের [কন্যা] উপর ঝোঁকে পড়ে, কিন্তু আজ তাঁর এই পূর্ব মত হয়তো পরিত্যক্ত হয়েছে। তাঁর এই দ্বিতীয়া স্ত্রী হতে নিশ্চয়ই তিনি এখন শান্তি পান না। তা তিনি পেলে এমনভাবে বারমুখো হতেন না।

এই সকল সাক্ষী-সাক্ষিণীর বিবৃতির মূল্য এই মামলাতে বেশি নয়। কাল থেকে আমাদের পুরানো চোর ও পেশাদারী খুনেদের পিছনে ধাওয়া করতে হবে। তাই এদিকের আলতু-ফালতু কাজ আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। আমরা আর এখানে কালক্ষেপ না করে রেডিও অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। রেডিও অফিসে এসে ঐ কর্মকর্তাটিকে খুঁজে বার করি। আমরা তাঁর নিরালা ঘরে বসে তাঁর একটি বিবৃতি

গ্রহণ করি। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"সত্যি! আমার দু'দুবার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয় আপনারা জানেন কি করে? প্রথম বিবাহের বিষয় আমার ভাসা ভাসা মনে পড়ে। আমার প্রথমা স্ত্রী এখন কোথায় তা জানি না। তাঁর সাথে বিবাহ হলেও কুশণ্ডিকা হয় নি। আজ্ঞে। আমার পারিবারিক সম্পর্ক এখন মর্মান্তিক। কিন্তু এতো শতো আপনি জানেন কি করে। এক বয়স্কা শিক্ষয়িত্রীকে আমি বিবাহ করেছি। ছোট কন্যাকে বউ করে নিজেদের ভাবধারা দিয়ে নিজেদের মত করে মানুষ করে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বয়স্কা কন্যারা বাইরের বেনো জলের মত নিজস্ব চিত্ত প্রভৃতি সমেত পরের ঘরে ঢুকে সেখানকার শান্তি নষ্ট করে। এই ভুল শুধরাবার কোনও উপায় নেই। সত্যি! একটা গহনা ক'দিন আগে পার্শেল যোগে পেয়েছি। ওর ভিতর এইরূপ লেখা ছিল—'এটা আশীর্বাদের দিন তোমার মা আমাকে দেন।' কিন্তু উহাতে প্রেরকের কোনও নাম-ঠিকানা নেই। এই উপলক্ষ্য করে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজও কলহ হয়েছে! আজ্ঞে! এঁকি আশ্চর্য বিষয় আপনি অবতারনা করলেন। আপনারা পুলিশ হ'লেও দৈবজ্ঞ হন কি করে? ঐ লব্ধপ্রতিষ্ঠা সঙ্গীতজ্ঞ মহিলার উপর আমার দুর্বলতা দিল। কিন্তু এই দুর্বলতা কেন আমি সংগ্রহ করলাম তা জানি। তার সংযমশীলে হাসির প্রতিটি কণিকা যেন ফুল হয়ে ঝরে পড়ে। আমার মনে হতো সে-ই বুঝি কতোযুগের আমরা আপনার লোক। এই কয়দিন সে রেডিও অফিসে আসে নি। এটা একটা সামান্য ঘটনা হলেও এজন্যে আমার মন বারে বারে উতলা হয়। আমার মনে হয় তার কোনও শক্ত অসুখ বিসুখ হলো। তবে ঐ মহিলার সাথে আমার যা কিছু সম্পর্ক তা মানসিক। ঐ কঠিন চরিত্রা নারীর সাথে আমার দৈহিক সম্পর্ক ঘটে নি। আমার রেডিও-জীবনের অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে, এই কোন কিছু ঘটা বা না ঘটা নারীদের উপর একান্তরূপে নির্ভর করে। কিন্তু আমার বলতে বাধা নেই যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ বিষয়ে যে একটুকুও দায়ী ছিল না।"

রেডিও অফিসের এই কর্মকর্তার বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করার পর তাঁকে তাঁর সংসার সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করি। তিনি এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। তাঁর সাথে কথবার্তাতে আমি বুঝি যে তাঁর জীবনে একই সাথে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমি অবাক হয়ে

ভাবি যে এই দুইটি দুর্ঘটনা তাঁর মত একজন সৎলোককেও এক সাথে সইতে হলো। আমাদের এতদ্‌সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—আপনার বর্তমান পারিবারিক অশান্তির বিষয় শুনে আমরা সত্যই দুঃখিত। আপনার গৃহের শান্তি অটুট থাকলে আপনার প্রতিভার আরও বিকাশ ঘটতো। এখন আপনি আমাকে বলুন যে, এই শহরের এক ধনী মল্লিকবাবুর এক কর্মচারী আপনার বাটীতে এতো যাতায়াত করেন কেন? আমরা শুনেছি যে মল্লিকবাবু তাঁব এক ভগ্নীকে নামে মাত্র বিবাহ করেছেন। এই ধরণের ব্যক্তিদের সাথে আপনার স্ত্রীও বাইরে বেরোন। ওঁদের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা একটু খুলে বললে ভালো হয়।

উঃ—ওহো! এইবার আমি বুঝতে পারছি যে সেই সব বিষয় আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমার বান্ধবী রেডিওর লব্ধ প্রতিষ্ঠ গায়িকা অমুকার নিকট হতে আপনারা এ সব শুনেছেন। উনি ঐ লোকটি সম্বন্ধে কয়বার মৌখিকভাবে আমাকে সাবধানও করেছিলেন। ঐ লোকটা এমনিই এ বাড়িতে এসে এটা ওটা ফাই-ফরমাজ খাটে। আমাদের স্বামী স্ত্রীকে লোকটা খুব ভক্তি করে। আমাদের সাথে ওর কোনও স্বার্থের সম্পর্ক নেই। আজকে আমার স্ত্রী ওকে নিয়ে সকালে একটু মার্কেটে বেরিয়েছেন। কিন্তু এতো বেলা পর্যন্ত ওরা ফিরলো না! তাই একটু দুশ্চিন্তাতে আছি এই যা—

প্রঃ—আমাদের খবর এই যে, আপনাদের স্বার্থহীন ঐ সেবকটি এই কয়দিনে আপনার [illegible] পথে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন। আপনার সাথে আপনার ঐ বান্ধবীর মেলা-মেশার বিষয়। তা[illegible] নিয়মিত জানিয়ে থাকেন। এইভাবে আপনার স্ত্রীর বিষাক্ত মন আপনার প্রতি তিনি আরও বিষিয়ে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দু'জনে এ বাড়িতে আর নাও ফিরতে পারেন।

'আজ্ঞে! আপনারা ইতি মধ্যে দেখছি আমাদের সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন,' ভদ্রলোক অমুক বাবু একটু ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলেন, 'কিন্তু আপনার শেষোক্ত আশঙ্কাটি অমূলক। এতো শীঘ্র উনি আমার ঘাড় হতে নিশ্চয়ই নামবেন না। তবে আমাদের ঐ বশংবদ লোকটি ওঁর বাহন মাত্র। আরও বড় খুঁটিতে ওঁর ভাগ্য বাঁধা। ওঁর যা করবার তা উনি বাড়িতে থেকে করতে চান। অমুকা দেবীর নামের সাথে ওর নাম উঠাবেন

না। এতে অমুকা দেবীর মর্যদার হানি হতে পারে। যে করেই হোক আমাদের ঘরের সকল কথা যখন আপনারা জেনেছেন তখন লজ্জার খাতিরে এই বিষয়ে আপনাদের কাছে কোনও কিছু আর গোপন করলাম না। তবে আমার ঐ বান্ধবীর মতে এই সব যা কিছু তার দোষ তা সাময়িক। একটু সাবধানে এই সব সামান্য সামান্য দোষ তার সেরে যাবে। আমার ঐ বান্ধবী কিন্তু সত্য সত্যই আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষিনী বান্ধবী।'

'হুম! আমি বুঝতে পারি যে আপনি অন্তরের সাথে ঐ মহিলাকে ভালবেসেছিলেন.' আমি একটু ভেবে ভদ্রলোককে বললাম, 'তাহলে একটা দারুন দুঃসংবাদ আপনাকে দিতে হয়। আপনার বান্ধবী ঐ ভদ্রমহিলা আর এ জগতে বেঁচে নেই। তিনি কোনও এক শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এতদ্‌ব্যতিরেকে আরও একটি তদন্তলব্ধ সত্য সমাচার আপনাকে জানিয়ে দিই। ঐ মৃতা ভদ্রমহিলাই একদিন আপনার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন। এটুকু আপনি না জানলেও আপনার বান্ধবীমন্যা ঐ প্রথমা স্ত্রীর তা জানা ছিল।'

আমার মুখ হতে এই দুঃসংবাদটি নির্গত হওয়া মাত্র—'এ্যাঁ! এই বলে তিনি একবার মাত্র চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এরপর হঠাৎ একটা খট খট ধড়াম আওয়াজ শুনে অমারা চমকে উঠলাম। সম্মুখের চেয়ারে এই ভদ্রলোককে আর দেখা যায় না। ঐ চেয়ার সমেত ভদ্রলোক মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে এই শব্দ শুনে বাহিরের বহুলোক এই খাস কামরায় ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভদ্রলোক উঠে পড়ে ইশারায় সকলকে সরে ... মুখে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর প্রেসার ভালো আছে—এই কথা কটি তাঁর মুখে শুনে জনতা শান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। আমি স্তব্ধ হয়ে ভাবি, এই ভদ্রলোককে এবার আমি কি বলবো। কিন্তু আমাকে কোনও কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঐ ভদ্রলোকই আমার সাথে প্রথমে কথা কইলেন।

'স্যার! আশা করি তার মৃতদেহ আপনাদের পুলিশ-মর্গে এখনও রক্ষিত আছে', ভদ্রলোক এবার একটু শান্ত হয়ে আমাদের বললেন, 'আমার এই ধারণা সত্য হলে ঐ মৃতদেহ সৎকারের ভার যেন আমাকে দেওয়া হয়। আমার এই প্রথমা স্ত্রীর সৎকার ও শ্রাদ্ধের আমিই বোধ হয় একমাত্র অধিকারী। তার এই শেষ কার্য সমাধা করা আমার একটি পবিত্র কর্তব্য কর্ম। ভদ্রলোককে এই আকিঞ্চন মৃতা নারী জেনে যেতে পারে নি। সে

বেঁচে থাকলে এই ইচ্ছা এঁর থাকতো কি'না বলা শক্ত। ভদ্রমহিলা বেঁচে থেকে যা পান নি, মরে তা তিনি পেয়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে মৃতদেহ তখনও মর্গের বরফ-ঘরে রক্ষিত আছে।

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল। অপরাধ বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের নিকট এক অতি পরিচিত নাম। অপরাধ ও অপরাধীর গতি প্রকৃতি, কার্যকারণ বিশ্লেষণ ও অন্বেষনে লেখকের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আমাদের চমৎকৃত করে। পঞ্চানন ঘোষাল জীবনের অধিকাংশ সময় পুলিশ বিভাগের নানা দায়িত্বে বৃত থেকে এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ফলশ্রুতি তাঁর 'বহু খণ্ডে প্রকাশিত 'অপরাধ বিজ্ঞান' গ্রন্থমালা। উল্লিখিত "একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা" কাহিনীটি পুলিশের ডাইরি লেখার টেকনিকে লেখা। তাই এক অভিনব ডাইরি সাহিত্যের প্রবর্তনা ঘটে লেখকের অনবদ্য লেখনীতেই। লেখকের অধিকাংশ লেখাই সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সুবাসিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মৌলিক গবেষণার জন্য "ডক্টরেট" উপাধিতে ভূষিত করেছে। অবসর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে লেখক আজও অপরাধ বিজ্ঞানের নানা আলোচনায় সদা নিরত ও ব্যস্ত।



খুন—চুরি

সুধাংশু কুমার গুপ্ত

* '……ওরা খুন করবে, কিন্তু খুনের মধ্যে সততা নেই।' *

সেদিন শহরে হরতাল। উপলক্ষ্যটা মনে নেই। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবী বা ওইরকম একটা কিছু। সারা দুপুরটা তাস খেলে কাটিয়ে বিকেলের দিকে আমরা ক'জন বন্ধু হাজির হলাম চতুর্মুখ শর্মার বৈঠকখানায়। ছুটির দিনে ওখানেই আড্ডা বসে আমাদের। দিবা-নিদ্রা সেরে চতুর্মুখবাবু যথারীতি তক্তাপোষের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে

বসেছেন। হাতে গড়গড়ার নল, আগুনটা তখনও ভাল করে ধরেনি বলে হয়তো টানতে শুরু করেন নি। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। তক্তাপোষের ওপর পাতা ফরাসের ওপর আমরা বসে পড়লাম চতুর্মুখবাবুকে ঘিরে। পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা বের করে বড় এক টিপ নস্যি নাকের ভেতরে গুঁজে দিয়ে বিরিঞ্চি বললে, 'আজকের কাগজে তালতলার খুনের খবরটা পড়েছেন, চতুর্মুখবাবু? কী অদ্ভুত ব্যাপার বলুন তো! লোকটা খুন হল রাস্তার ওপর, পাড়ার লোক অনেকে দেখল, পুলিশের লোকও এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে, জীপে তুলে লোকটাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে, আর ওখানকার থানার দারোগা বলে কিনা, ওই খুনের খবর তারা পায়নি মোটেই, শহরের ছোট বড় সব হাসপাতালেই খোঁজ করা হয়েছে, লাশের পাত্তা নেই!' গড়গড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চতুর্মুখবাবু বললেন, 'এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এ ধরণের ঘটনা এই যে প্রথম ঘটল তা নয়। আগেও ঘটেছে কতবার কত জায়গায়, তবে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। আমার স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। তোমরা যদি শুনতে চাও তো বলি।'

'বলুন।' সোৎসাহে বললাম আমরা সবাই।

সোজা হয়ে বসে চতুর্মুখবাবু বলতে শুরু করলেন।

'অনেক দিনের কথা। আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে পুরোদমে। যুদ্ধের কল্যাণে অনেক হতভাগ্য বেকারের বরাত গেছে খুলে। বেশ কিছুকাল নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার পর আমিও হঠাৎ চাকরি পেয়ে গেলাম বোম্বাই শহরে এক বিদেশী সওদাগরি অফিসে। শহরের যে পাড়ায় বাসা নিলাম, সেখানে লোকের বসতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম। পাড়াটা ছিল বেশ শান্ত ও নিরুপদ্রব। রাত দশটার সময় সবাই শুয়ে পড়ত খাওয়া-দাওয়া সেরে। শুধু দু-চারটে বদ্ বেয়াড়া ছোকরা সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরত রাত দশটার পরে। পাড়ার বেশির ভাগ বাসিন্দাই ছিল মধ্যবিত্ত চাকুরে। সবাই বেশ ভদ্র ও সংযত, কোনরকম ঝামেলা সৃষ্টি হয় এমন কিছু পছন্দ করত না কেউ। যে যার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার সময় ছিল না কারো। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিল গীটার বাজিয়ে। শহরে একটু নামডাক তার ছিল হয়তো, কোথাও কোন আসরে ডাক পড়লে বাড়ি ফিরত একটু

রাত করে। দুজন ছিল স্কুলমাষ্টার, টিউশানি সেরে বাড়ি ফিরত রাত দশটা নাগাদ। তবে মাঝে মাঝে দেখতাম, রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোষ্টের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন বিশ্বসংসারের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে অনেক রাত পর্যন্ত। একজন ছিল শেয়ার মার্কেটের দালাল। প্রতি শনিবার দাদারে সে এক বন্ধুর বাড়ি যেত সিয়ান্স করতে। শেয়ার মার্কেটের হালচাল সম্পর্কে প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে নির্দেশ নেওয়া হয়তো বাতিক ছিল তার। সিয়ান্স করে সে বাড়ি ফিরত রাত বারোটার পর। পাড়ায় কোন অশান্তি ছিল না। বছর দুই আগে অবশ্য একদিন রাত্রে এক মাতাল হল্লা করেছিল পাড়ার মধ্যে। কিন্তু পরে প্রকাশ পায়, সে অন্য পাড়ার লোক, নেশার ঘোরে ভুল করে আমাদের পাড়ায় ঢুকে পড়েছিল।

পরস্পরকে আমরা জানতাম ভাল করেই। শুধু একজনের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না কেউই। এ লোকটি আমাদের পাড়ায় এসে বাস করতে শুরু করে মাস পাঁচ-ছয় আগে। নামটা সঠিক কেউ জানত না আবদুল গালিব কি আবদুল তালিব হবে। চেহারা আর পোশাক দেখে আমরা ধরে নিয়ে ছিলাম, ও ইরানী। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি ফিরত সওয়া এগারটায়। পাঁচ নম্বর বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে ও একা থাকত। ওর জীবিকা কী ছিল কেউই জানত না। সারাদিন ও থাকত বাড়ির মধ্যে, বিকেল পাঁচটার সময় ও বেরুত হাতে চামড়ার একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে। রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাসে চেপে যেত প্যারেলের দিকে। আবার ঠিক রাত সওয়া এগারোটায় বাস থেকে রাস্তার মোড়ে নেমে ঢুকত আমাদের পাড়ায়। পরে প্রকাশ পায়, প্যারেলে একটা কাফেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও নাকি মিলিত হত জনকয়েক ইরানীর সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে কি সব আলোচনা করত অনেক রাত পর্যন্ত। তবে পাড়ার একজন প্রবীন লোক বললেন, ও কখনোই ইরানী নয়, কারণ ইরানীরা নাকি রাতে অত সকাল সকাল বাড়ি ফেরে না।

তখন শীতের মাঝামাঝি, রাত সওয়া এগারোটা হবে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি একটু ঝিমোচ্ছি, এমন সময় পরপর পাঁচটা গুলির আওয়াজ কানে এল। তোমরা হয়তো শুনে হাসবে, প্রথমটা আমার মনে হল যেন আবার আমি বাল্য বয়সে ফিরে গিয়েছি। আবার যেন সেই ছোট্ট ছেলেটি হয়েছি আর আমার সমবয়সীদের সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ির উঠোনে মহোল্লাসে ফটকা ফাটাচ্ছি। সত্যি বলতে কি, আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগল কানে।

পরমুহূর্তেই আমার তন্দ্রা হঠাৎ ছুটে গেল—বুঝতে পারলাম, সামনের রাস্তায় পিস্তল ছুঁড়ছে কেউ। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পাঁচ নম্বর বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর কে একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ডানহাতে চামড়ার একটা ব্যাগ। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তায় পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং একজন কনস্টেবলকে দেখা গেল রাস্তার বাঁকে। পাঁচ নম্বর বাড়ীর সামনে সে ছুটে এল ব্যস্তভাবে, দু'হাতে আহত 'লোকটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে রেখে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলে হুইশিল বাজাল! চেখের পলকে আরেকজন কনস্টেবল ছুটে এল রাস্তার অপর দিক থেকে।

তাড়াতাড়ি চটিজোড়া পায়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে গিযে দেখি, ওখানে ইতিমধ্যেই পাড়ার কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে—গীটার বাজিয়ে, স্কুলমাষ্টারদের একজন, শেয়ার মার্কেটের দালাল আর আশপাশের বাড়ির দুজন দারোয়ান। ওরা সম্ভবত একটু রাত করে শুতে যায়, তাই গুলির আওয়াজ শুনেই ছুটে এসেছে। যারা শুয়ে পড়েছিল তারাও কেউ কেউ উঠে পড়েছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। ওরা হয়তো নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছিল না। খুনের ব্যাপারে কে কখন অহেতুক জড়িয়ে পড়ে বলা যায় না।

ইতিমধ্যে কনস্টেবল দুজন আহত লোকটিকে চিত করে দিয়েছে। লোকটির মুখের দিকে নজর পড়তেই আমি সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অ্যাঁ! এ যে দেখছি আমাদের সেই ইরানী ভদ্রলোকটি! ভদ্রলোক কি মৃত?'

'হাম নেহি জানতে, ডাক্তার বোলনে সাকেগা।' জবাব দিলে একজন কনস্টেবল, মনে হল যেন সে খুব ঘাবড়ে গেছে।

গীটারবাদক এগিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললে, 'তোমরা এখানে ওঁকে ফেলে রেখেছ কেন? তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?' তার গলার আওয়াজে রাগের চেয়ে ভয়টাই ফুটে উঠল বেশি।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এসে জড় হয়েছে ওখানে। শীতে আর ভয়ে আমাদের শরীরে রীতিমত কাঁপুনি ধরে গেছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে ভীষণ ভাবে। কনস্টেবল দুজন আহত ব্যক্তির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর এবং কিজানি কেন, তার কোটের বোতাম ক'টা

খুলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে রাস্তার বাঁকে একটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং ট্যাক্সিচালক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল ব্যাপার কী দেখবার জন্যে। সম্ভবত সে ভেবেছিল মদ খেয়ে কেউ বেসামাল হয়ে পড়েছে এবং ওকে গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলে বেশ কিছু টাকা ওর কাছ থেকে আদায় হতে পারে।

এখানে কী হয়েছে মশাই?' ট্যাক্সি চালক জিজ্ঞেস করল বিনয়ের সঙ্গে।

'একজন লোক গু-গু-গুলিতে আহত হয়েছে।' স্কুলমাষ্টার বললে ভীত সন্ত্রস্তভাবে, 'ওকে তোমার গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাও। এখনও হয়তো লোকটিকে বাঁচানো যেতে পারে।'

জানেন তো এসব ব্যাপারে ভাড়া খাটতে যাওয়ার ঝামেলা অনেক।' ট্যাক্সিচালক বললে ইতস্তত করে, 'তবে আপনারা যখন বলছেন, আপনাদের অনুরোধ ঠেলতে চাই না আমি। একটু অপেক্ষা করুন, গাড়ি নিয়ে আসছি।' তারপর সে মন্থরপদে গাড়ির কাছে গেল এবং গাড়িটা নিয়ে এল আহত লোকটির নিকটে।

'ওকে এবার তুলে দাও গাড়িতে।' ট্যাক্সিচালক বললে কনস্টেবল দুজনকে লক্ষ্য করে।

কনস্টেবল দুজন ইরানী ভদ্রলোককে তুলে ধরল এবং কোনরকমে শুইয়ে দিল ভেতরের সীটে। লোকটি তেমন হৃষ্টপুষ্ট নয়, তবে কিনা মরা মানুষকে নাড়াচাড়া করা বেশ শক্ত কাজ।

'দোস্ত, তুম চালা যাও উনকা সাথ। হম গবাহোঁক (সাক্ষীদের) নাম আউর পাতা লিখ লেঙ্গে।' প্রথম কনস্টেবল বললে দ্বিতীয়কে উদ্দেশ্য করে। তারপর ড্রাইভারের দিকে ফিরে বললে, 'তুম জলদি চলা যাও হাসপাতাল মে, দের মাৎ করনা।'

'জলদি!' মুখ বিকৃত করে বললে ড্রাইভার, 'তুমি তো বলেই খালাস। আমার গাড়ির ব্রেক গেছে বিগড়ে, জলদি যেতে গিয়ে বিপদে পড়ব নাকি?'

কনস্টেবল কোন মন্তব্য করল না। গাড়ি চলতে শুরু করল।

বুকপকেট থেকে একটা নোট বই বার করে প্রথম কনস্টেবলটি হিন্দিতে বললে, 'আপনাদের নাম আর ঠিকানা বলুন। সাক্ষী হিসেবে আপনাদের তলব করা হতে পারে।'

তারপর সে আমাদের নাম-ঠিকানা টুকে নিল নোটবইতে এক এক করে। নাম-ঠিকানা লিখতে বেশ কিছু সময় নিল সে। বাইরে জোর

হাওয়া বইছিল, কনস্টেবল চলে যেতেই বাড়ি ফিরলাম। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। মাত্র দশ মিনিট লেগেছে ব্যাপারটা চুকে যেতে।

তোমরা হয়তো ভাববে, ব্যাপারটা নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু আমাদের মত এ ভদ্র পল্লীতে এ ধরণের ঘটনা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। পাশের পল্লীর লোকেরা বেশ একটু গৌরব বোধ করছিল এর জন্য। সকলকে তারা সগর্বে বলছিল, ওই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটেছে তাদের পাড়ার কাছেই। ওখান থেকে আর একটু দূরে যারা থাকত তারাও এই গৌরবের ভাগ নিতে ছাড়ল না। তারা বললে, ঘটনাটা অবশ্য ঘটেছে ওপাশের এক রাস্তায়, তবে গুলির আওয়াজটা তারা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। আমি তোমাদের হলফ করে বলতে পারি, মনে মনে ওরা সবাই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিল ঘটনাটা তাদের এলাকায় ঘটেনি বলে। অবশ্য দু-চারটে রাস্তার ওধারে যাদের আস্তানা, তারা ব্যাপারটাকে আমল দিল না মোটেই, তারা বললে, কে একজন ওখানে খুন হয়েছে বটে, কিন্তু ওই ব্যাপারে এমন কিছু নেই যা নিয়ে মাথা ঘামানো যেতে পারে। এটা যে নিছক ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়, তা না বললেও চলে।

বুঝতেই পারছ, পরের দিন সকালে খবরের কাগজ দেখবার জন্য আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। পাড়ার ওই খুন সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য জানার আগ্রহ তো ছিলই, তাছাড়া আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে, খবরের কাগজে আমাদের পাড়ার উল্লেখ থাকবে নিশ্চয় এবং ওই প্রসঙ্গে পাড়ার লোকদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথাও বাদ পড়বে না। এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে খবরের কাগজে আমরা সেই ব্যাপারটাই সবচেয়ে পড়তে ভালবাসি যা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। ধরো, রাস্তার একটা ষাঁড় লরীতে চাপা পড়েছে আর সেই কারণে যানবাহন ব্যাহত হয়েছে পনের মিনিট। খবরের কাগজে এ ঘটনার যদি উল্লেখ না থাকে, তা হলে যারা ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, মনে মনে তারা রুষ্ট হবে এবং কাগজটা তাচ্ছিল্যভরে ঠেলে রেখে দেবে টেবিলের একপাশে। তাদের অভিযোগ, খবরের কাগজ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সঙ্গে। তারা কতকটা অপমানিত বোধ করে এই ভেবে যে, যে-দুর্ঘটনার তারা প্রত্যক্ষদর্শী, যা তারা নিজস্ব সম্পদ বলে দাবী করতে পারে, খবরের কাগজ সেটার উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করে নি। তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো,

খবরের কাগজ কেন স্থানীয় সংবাদ ছাপে, তাহলে আমি বলব, স্থানীয় সংবাদ ছাপা না হলে ওই সব প্রত্যক্ষদর্শী খবরের কাগজ বয়কট করত নিশ্চয়ই।

বিশ্বাস করো, একখানা খবরের কাগজও আমাদের পাড়ার ওই হত্যা কাণ্ডের উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। রীতিমত ভড়কে গেলাম আমরা। খবরের কাগজের পাতাগুলো যতসব সামাজিক দুর্নীতি আর রাজনৈতিক দলাদলির খবরে ভর্তি। মনে মনে ভারি চটে গেলাম খবরের কাগজের ওপর! এমন কি, একখানা ট্রামগাড়ির সঙ্গে ঠেলাগাড়ির সংঘর্ষ ঘটেছে, সে খবরও ছাপা হয়েছে বড় বড় হরফে শিরোনাম দিয়ে। খবরের কাগজ যে নিতান্ত বাজে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না।

ক্ষোভ ও বিরক্তি যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ চমকের মত গীটার বাদকের মনে হঠাৎ নতুন একটা চিন্তার উদয় হল। সে বললে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ হয়তো ওই খুনের ব্যাপারটা আপাতত চেপে রাখবার জন্য খবরের কাগজওয়ালাদের অনুরোধ করে থাকবে, যাতে তাদের তদন্তে কোন রকম বিঘ্ন না ঘটে এবং তার ওই কথায় আমাদের ক্ষুব্ধ মন আশ্বস্ত হল অনেকটা। খুনের ব্যাপারে আমাদের অনুসন্ধিৎসা গেল বেড়ে এবং ওই জটিল রহস্যের সমাধানে আমাদের সাক্ষী হিসেবে তলব করা হতে পারে এই কথা ভেবে গর্ব অনুভব করলাম আমরা।

কিন্তু পরের দিনও খবরের কাগজে ওই খুনের কোন উল্লেখ দেখতে পেলাম না এবং পুলিশের তরফ থেকে কেউ এল না আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হল যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে, একটা দিন কেটে যাবার পরও পুলিশ এসে পাঁচ নম্বর বাড়ীতে ইরানী ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট সার্চ করল না বা সীল করে দিয়ে গেল না। ব্যাপারটা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল আমাদের মনে। গীটার বাদক বললে, 'পুলিশ হয়তো ওই খুনের ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়। এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে ভগবানই জানেন।

তৃতীয় দিনেও যখন খুনের ব্যাপারটা খবরের কাগজে বেরুল না, তখন আমাদের পাড়ায় রীতিমত ক্ষোভের সঞ্চার হল। সবাই বদ্ধ পরিকর হল, এ সম্পর্কে একটা কিছু করবার জন্য। সকলেই একবাক্যে বললে, 'ইরানী ভদ্রলোক ছিল আমাদেরই একজন, তার এ শোচনীয় মৃত্যুর প্রতি পুলিশের উপেক্ষা অসহনীয়। এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

আমাদের পাড়ায় যদি কোন এম. পি. বা খবরের কাগজের লোক থাকত, তাহলে পুলিশ নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারতো না।'

পাড়ার বৈঠকে ঠিক হল, থানায় গিয়ে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং দারোগাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন এমন গাফিলতি করা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীর খুনের ব্যাপারে। আর এই কাজের ভার পড়ল আমার ওপর। আমাকে ওরা মনোনীত করল কেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হয়তো আমার এই জাঁদরেল চেহারাখানাকে দেখে ওদের ধারণা হয়েছিল আমি ছাড়া আর কেউ ঘায়েল করতে পারবে না দারোগাকে।

পরের দিনই সকালবেলা থানায় গিয়ে দেখা করলাম দারোগা জব্বর সিং-এর সঙ্গে। দারোগাকে আমি জানতাম অল্পস্বল্প। লোকটা বেজায় গম্ভীর ও তিরিক্ষে। লোকে বলত, ও নাকি প্রেমের ব্যাপারে হতাশ হয়েছিল যৌবনে এবং সেই কারণেই চাকরি নেয় পুলিশে। দারোগাকে বললাম, 'দেখুন স্যার, লালবাগে যে খুনটা হল, সেটার সম্পর্কে আপনারা কী করছেন জানতে এসেছি আমি। পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারছে না, এ ব্যাপারটা গোপন করা হচ্ছে কেন?'

দারোগা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'খুন? কই, আমাদের কাছে কোন খুনের খবর আসেনি তো।'

'বা! মাত্র তিনদিন আগে রাস্তায় খুন হল আমাদের পাড়ার এক ইরানী ভদ্রলোক। নামটা কি যেন আবদুল গালিব না আবদুল তালিব। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল দু'জন কনস্টেবল, একজন আমাদের নাম আর ঠিকানা লিখে নিল সাক্ষী হিসেবে দরকার হবে বলে, অপরজন আহত ভদ্রলোককে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে গেল হাসপাতালে।

'কী সব বলছেন, আপনি?' দারোগা বললে একটু ঝাঁজের সঙ্গে, 'ও সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট আসেনি এ পর্য্যন্ত। আপনাদের ভুল হয়েছে।'

'ভুল? অন্তত বিশ-পঁচিশজন ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছে—আমরা সবাই এ সম্বন্ধে এজাহার দিতে পারি।' মনে মনে রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

'দেখুন স্যার, আমরা সবাই রেসপেক্টেবল সিটিজন। এই খুনের ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের মুখ বুজে থাকতে বলেন, আমরা তা পারব

না। বিনা প্ররোচনায় একজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারা—এটা কোন ভদ্রলোকই বরদাস্ত করতে পারে না। খবরের কাগজে আমরা লিখব এ নিয়ে।'

'শুনুন।' ধমক দিয়ে বললে দারোগা। চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল তার। রীতিমত ভড়কে গেলাম আমি। 'যা ঘটেছে ঠিক ঠিক বলুন।'

আমি তখন আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা যথাযত বর্ণনা করতে লাগলাম। শুনতে শুনতে রাগে দারোগার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন বলতে শুরু করেছি, ট্যাক্সিতে মৃত ব্যক্তিকে তুলে দিয়ে প্রথম কনস্টেবল তার সঙ্গীকে বললে, 'দোস্ত, তুম চলা যাও উনকো সাথ।

'হুম.......'

কথাটা আমাকে শেষ করতে না দিয়েই অমনি দারোগা নাকটা ফুলিয়ে গর্জন করে উঠল, "যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ওরা আমাদের লোক কিছুতেই নয়। আপনারা তখন পুলিশ ডেকে ওই লোকগুলোকে ধরিয়ে দিলেন না কেন? সাধারণ জ্ঞান যাদের আছে, তারা সবাই জানে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক 'দোস্ত' বলে সম্ভাষণ করে না পরস্পরকে। সাদা পোশাকে যেসব পুলিশ ঘোরাফেরা করে তারা ওটা করতে পারে, তবে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ করবে না কোনদিন। আপনার মত বুদ্ধু আমি দেখি নি আজ পর্যন্ত। ওই লোকগুলোকে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।

ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বললাম, "কেন বলুন তো?' 'ওরাই তো গুলি করেছিল আপনাদের পাড়ার ওই ইরানীকে,' হুঙ্কার দিয়ে উঠল দারোগা, আর যদি গুলি না-ই করে থাকে, এ ব্যাপারে ওদের হাতছিল নিশ্চয়ই। কতদিন আপনি ও-পাড়ায় আছেন?

'বছর দুই।' জবাব দিলাম আমি।

'তাহলে আপনার জানা উচিত, রাত সওয়া এগারোটায় একজন কনস্টেবল ডিউটিতে থাকে লালবাগের মোড়ে, এরপর খানিকটা তফাতে আরেকজন থাকে খোদাদাদ সার্কেলের কাছাকাছি, আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে ফের আরেকজন কনস্টেবলকে দেখতে পাবেন কিংস সার্কেলের মোড়ে —যার বীটের নম্বর হল ৩৯৯। আপনাদের রাস্তার মোড়ে—যেখান থেকে আপনাদের ওই কনস্টেবলকে ছুটে আসতে দেখেছিলেন, সেখানে

আমাদের কনস্টেবলকে দেখা যাবে রাত বারোটার পর, যখন সে ওই পথে কোয়ার্টারে ফেরে ডিউটির শেষে। আশ্চর্য, শহরের প্রত্যেকটা চোর—বদমায়েস এ খবরটা জানে ; আর আপনারা ওখানে এতকাল রয়েছেন অথচ জানেন না এটা। আমার মনে হয়. আপনার ধারণা প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই পুলিশ থাকে, তাই না ? ওই মুহূর্তে আমাদের কনস্টেবল যদি আপনাদের রাস্তায় এসে হাজির হত, তাহলে মস্ত একটা ফ্যাসাদে পড়ত সে। নিয়ম অনুযায়ী ওই সময়ে তার থাকবার কথা লালবাগের মোড়ে। তাছাড়া ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেও আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠায় নি সে। বুঝতেই পারছেন, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াত অন্যরকম।'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু খুনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না তো ?'

ততক্ষনে দারোগার মেজাজ অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। সে বললে, 'ওটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমার কি মনে হয় জানেন, মিস্টার শর্মা ? ওটার মধ্যে একটা ঘৃন্য চক্রান্ত রয়েছে—বাইরে থেকে যা বোঝবার উপায় নেই। ওরা ওদের মতলব হাঁসিল করবার জন্যে প্ল্যান করেছিল নিখুঁতভাবে। প্রথমতঃ ইরানী রাত্রে কখন বাড়ি ফেরে, তা ওরা জেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ও অঞ্চলে পুলিশের গতিবিধি সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিল ওরা। তৃতীয়তঃ পুলিশের কাছে খুনের খবর পৌঁছবার আগে পুরো দুটো দিন সময় পেয়ে যায় ওরা। আমার মনে হয়, ওরা সময় থাকতে পালাতে চেয়েছিল অথবা খুনের প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করার মতলব করেছিল। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আপনার কাছে ?'

না, ভালরকম হয় নি।' মাথা চুলকে বললাম আমি।

টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে একঢোঁক খেয়ে দারোগা আবার বলতে শুরু করল : ওরা নিজেদের দুজন লোককে পুলিশ সাজাল, তারপর ওই দুজন এসে দাঁড়িয়ে রইল আপনাদের রাস্তার একটা কোণে ইরানীকে গুলি করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য এমনও হতে পারে, ওরা ওখানে অপেক্ষা করতে লাগল ওদের দলেরই আরেকজন এসে ইরানীকে গুলি না করা পর্যন্ত। সে যাই হোক, আপনারা খুবই খুশি হয়েছিলেন পুলিশকে অত তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হতে দেখে। ওরা যে নকল পুলিশ, তা বুঝতে পারেন নি মোটেই। ...হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস

করতে ভুলে গেছিলাম, প্রথম কনস্টেবল যখন হুইশিল বাজাল, তখন তার আওয়াজটা হয়েছিল কেমন ?'

আওয়াজটা ছিল একটু ক্ষীণ। তবে আমার মনে হয়েছিল, ও বোধ হয় শীতের দরুন একটু কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই জোরে হুইশিল বাজাতে পারে নি।'

প্রসন্নতার হাসি হেসে দারোগা বললে, 'ক্ষীণ তো হবেই। এক্ষেত্রে জোরে বাজানোর কোন সার্থকতা ছিল না। আপনারা পুলিশকে ব্যাপারটা না জানান—এটাই ছিল ওদের লক্ষ্য। সময় পাওয়া গেলে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ হবে ওদের পক্ষে। আর আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ট্যাক্সিচালকও ছিল ওদেরই একজন। ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার মনে নেই হয়তো ?

'নম্বরটা লক্ষ্য করি নি আমরা।' জবাব দিলাম কুণ্ঠিতভাবে।

'তাতে কিছু এসে যায় না।' মন্তব্য করল দারোগা: 'নম্বরটা যে খাঁটি ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ওই ট্যাক্সির সাহায্যে ওরা ইরানীর মৃতদেহটা গায়েব করে ফেলেছিল। তবে আপনার জেনে রাখা ভাল, ও লোকটি ইরানী নয়, তুর্কী—আর ওর নাম আবদুল গালিব বা আবদুল তালিব নয়, ওর নাম আসলে আবদুল খালিব। আমার কাছে এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। তবে এ সম্পর্কে আপনারা যদি একেবারে চুপ করে যান, তাহলে উপকার করবেন। কারণ এ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করলে আমাদের তদন্তের অসুবিধা ঘটবে। অবশ্য এটা খুব সম্ভব একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং এর পেছনে একজন ভয়ঙ্কর ধড়িবাজ লোক রয়েছে নিশ্চয়। রাজনীতি—বুঝেছেন কিনা, অত্যন্ত নোংরা—জঘন্য। ওরা খুন করবে, কিন্তু খুনের মধ্যে সততা নেই।'

এর পরে ওই ব্যাপার নিয়ে তদন্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য ধরা পড়েনি। তবে যারা খুন করেছিল, তাদের নাম জোগাড় করেছিল পুলিশ; কিন্তু অপরাধীরা তার অনেক আগেই সরে পড়েছিল শহর থেকে। কাজেই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের পাড়ার হঠাৎ যে মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছিল, তা যেন উবে গেল কর্পূরের মত। কেউ যেন পাড়ার ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল নির্মম হাতে।

সুধাংশুকুমার গুপ্ত। কলকাতায় পাঠ্যাবস্থাকালে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। বাংলার অধিকাংশ নামী ও দামী পত্রপত্রিকায় লিখে এসেছেন। রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। অনুবাদেও সুদক্ষ। এঁর লেখা অনুবাদ-গ্রন্থ 'বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প' সুধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। শিশুসাহিত্যেও এঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭ সালে মৌচাক-প্রদত্ত সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার পান। পেশায় শিক্ষাব্রতী। কলকাতায় সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের সাধনা করেছেন। বর্ত্তমানে অবসর জীবনেও সাহিত্য অনুরাগ অক্ষুন্ন।



জন্মদাতা

সমরেশ বসু

অশোক ঠাকুর, ওর এই বয়সে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হত্যাপরাধের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। কলকাতা থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূরে, মফস্বল শহরে থাকলেও, অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে, অশোক একটি বিশিষ্ট নাম। চব্বিশ পরগনার প্রশাসনের অনেক হোমরাচোমরা ওর নাম জানে। যদিও স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ শ্যামাপদ কিছুতেই ওকে যেন প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। বরং তার ধারণা, অশোক একটি রকবাজ ফচকে-ছেলে। পোশাকে আচরণে মাস্তান বিশেষ মনে করে। তথাপি, একথাও সত্যি, বড় রকমের জটিল কোনো অপরাধ ঘটিলেই, শ্যামাপদ ওর কাছেই ছুটে আসে। অশোককে সে কোনো রকমেই অস্বীকার করতে পারে না। বোধহয়, তার বাহ্যিক আচরণ বাদ দিলে, সে মনে মনে অশোককে তারিফ করে এবং একটু ভালোবাসে।

অশোক এ পর্যন্ত বিবিধ ধরনের অপরাধের সত্য উদ্ঘাটন করেছে। কিন্তু গতকাল যে ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের অনুরোধ ওর কাছে এসেছে, তাকে ঠিক অপরাধ বলা যায় কী না, ওর ধারণা নেই। এরকম একটা ঘটনা যে কেউ ওর কাছে ব্যক্ত করবে, কোনোদিন ভাবতে পারে নি। এত

অবাক ও কখনো হয় নি। এবং মানুষের জীবন বা চরিত্র যে এত বিচিত্র আর জটিল হতে পারে, আগে কখনো মনে হয় নি।

অশোকের নিজের একটা থিওরি আছে। সেটা কতখানি ওর নিজস্ব, তা ও নিজেও বলতে পারে না। হয়তো অনেক অপরাধতত্ত্ববিদেরা এই থিওরিতে কাজ করেন। অশোক কোনো অপরাধের কথা শুনলে, আগে নিজেকে অপরাধী চিন্তা করে নেয়, তারপরে নিজের মধ্যেই, মোটিভের সন্ধান করে নেয়। মোটিভের সন্ধান পেলে, তারপরে অ্যাকশনের ফরমুলা, নিজের কাছ থেকে বের করে নেয়। অতি নিপুণভাবে, সকলের চোখে ধুলা দিয়ে, কীভাবে অপরাধটা করা যায়, ও নিজেকে দিয়ে আগে সেটা ভাবে। অপরাধতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগে, এ ক্ষেত্রে ওর নিজের মানসিকতার কী বিচার হতে পারে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু গতকাল যে ঘটনার সত্য উদ্ধারের অনুরোধ ওর কাছে এসেছে, সেই ঘটনার মধ্যে, ও নিজেকে দিয়ে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না।

গতকাল বিকালে, সুবিমলদা এসেছিলেন। সুবিমল দাশগুপ্ত। সুবিমল এ শহরে আদি বাসিন্দা নন। এক পুরুষের বাস। আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, বরিশালে। এখন এ শহরে বাড়ি করেছেন। অবস্থাও বেশ ভালো। কলকাতা আর এ শহরে দুটো বাস-সার্ভিস আছে। একটি পেট্রোল-পাম্প আছে। ওঁর এক দাদা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন। তিনিও ব্যবসায়ী, সুবিমলের ব্যবসার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। বাসের ব্যবসা সুবিমলের বাবার ছিল। তিনিই ছোট ছেলেকে দিয়ে গিয়েছেন। পেট্রোল-পাম্পটা সুবিমল নিজে করেছেন। বাবা, মা, দুজনেই মারা গিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর সচ্ছল সংসার সুখী দম্পতি বলেই, শহরের লোকে ওঁদের জানে। সুবিমলের একটি ছোট গাড়ি আছে, নিজেই চালান। ড্রাইভার রাখেন নি।

সুবিমলের স্ত্রীকে ঠিক আধুনিকা বলা যায় না। বাইরে তাঁকে বিশেষ দেখা যায় না। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে বা নিমন্ত্রণের বাড়িতে বা সিনেমায় দেখা গেলেও, একলা কখনো দেখা যায় না, সুবিমল সঙ্গে থাকেন। বিভা, সুবিমলের স্ত্রীকে অশোক কয়েকবার দেখেছে। কথাবার্তা হয় নি, কারণ সুবিমল কখনো ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে, মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দেন নি। আজকাল সামাজিকতা বলতে যা বোঝায়, সেদিক থেকে, সুবিমল হয়তো কিছুটা রক্ষণশীল। অথবা ওঁর স্ত্রী বিভাই হয়তো, বাইরের লোকজনদের সঙ্গে, তেমন কথাবার্তা বলতে, বা মেলামেশা করতে পারেন না। অথচ অশোক শুনেছে, বিভা দাশগুপ্তা শিক্ষিতা। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে নাকি পাস করেছেন।

বয়স অনুমান তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে।

সুবিমল নিজে স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। বয়স চল্লিশ প্রায়। ওঁর পাশে, বিভা আরো সুন্দর। রূপসী তাঁকে বলতেই হবে, এবং স্বাস্থ্যবতীও বটে। অশোক কয়েকবার যা দেখেছে, মনে হয়েছে, মহিলা বেশ বুদ্ধিমতী এবং অমায়িক হাসি-খুশি। প্রায় আট বছর বিয়ে হয়েছে। অভাব একটি মাত্র, কোনো সন্তানাদি হয় নি। অনেকেই অনুমান করে, আর বোধহয় হবে না। যার দোষেই হোক।

সুবিমল এক সময়ে, শহরের অ্যাথলেটিক ক্লাব, থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে খুব মাতামাতি করতেন। পারলে এখনো করেন। সেজন্য, অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের কাছেই, তিনি সুবিমলদা। তিনিও বেশ হাসিখুশি লোক, সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করেন, কথাবার্তা বলেন। কিন্তু গতকাল সুবিমল অশোককে অবাক করে দিয়েছেন। গতকাল বিকালে অশোক সবেমাত্র দোতালা থেকে নেমে, ওদের মন্দিরের রকে গিয়ে বসেছে। সুবিমল ওঁর ছোট গাড়িটা নিয়ে তখন এলেন। মুখখানি শুকনো, একটু গম্ভীর, যদিও অশোকের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'গোয়েন্দা ঠাকুর, তোমার কাছে একটু এলাম।'

অশোক তাড়াতাড়ি রক থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী ব্যাপার সুবিমলদা? একটা খবর দিলে, আমি নিজেই যেতাম।'

সুবিমল গাড়ি থেকে নেমে বলেছিলেন, 'তাতে সুবিধা হত না। তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে। খুবই গোপন, তুমি আমি ছাড়া, কেউ জানবে না আমার বাড়িতে বসে বলার অসুবিধা আছে বলেই তোমার কাছে চলে এলাম।'

অশোক অবাক অনুসন্ধিৎসু চোখে সুবিমলের দিকে তাকিয়েছিল। দেখেছিল, ওঁর মুখে সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি নেই। চোখের কোল বসা, কিন্তু দৃষ্টিতে কেমন একটা চঞ্চলতা। মুখ গম্ভীর। অশোক বলেছিল, 'তাই নাকি? আসুন, ঘরে গিয়ে বসি।'

অশোক ওর বসবার ঘরে সুবিমলকে নিয়ে বসিয়েছিল। ওর বসবার ঘর-জোড়া তক্তপোশ, তার ওপরে শতরঞ্চি পাতা। গুটি কয়েক তাকিয়া। তাস দাবা ইত্যাদি খেলা, বা নিছক আড্ডা ছাড়া, ওর ঘরে আর কিছু হয় না। সুবিমল কোঁচা তুলে বসে, অন্যমনস্ক মুখে একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলেন নি। অশোক ওঁর কাছেই বসেছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরে, সুবিমল যেন নিজের থেকেই চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ওহ্, হ্যাঁ, কথাটা বলি। তোমার কাছে একটা অনুরোধ,

কথাটা পাঁচ-কান ক'রো না।'

অশোক বলেছিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

সুবিমল বলেছিলেন, 'সেই ভরসাতেই, তোমার কাছে আগে এসেছি।'

অশোক তখনো কিছুই বুঝতে পারছিল না, কোনো অনুমানই না। সুবিমল আবার একটু চুপ করে থেকে, বলেছিলেন, 'তুমি তো জানই, আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সেজন্য তোমার বৌদির আর আমার মনে একটা কষ্ট বরাবরই খচ্‌খচ্‌ করে। কিন্তু মন তো মানে না, আশাও যায় না। তাই বহু জায়গায় বহু পূজা দিয়েছি, নানান থানে গিয়ে হত্যে দিয়েছি। তোমার বৌদি, এমন কি আমিও, বহু তাবিজ মাদুলি ধারণ করেছি। সবই বিফলে গেছে, কিছুই হয় নি। মন দুর্বল হলে, মানুষ কী না করে। এসব বিষয়ে, আগে কখনো বিশ্বাস ছিল না, তবু করেছি, বিশ্বাস করেই করেছি, যদি কিছু হয়ে যায়। হয় নি।'

সুবিমল একটি নিশ্বাস ফেলে নতুন আর একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক লক্ষ্য করেছিল ওঁর আঙুল কাঁপছে। মনে হয়েছিল, নার্ভ টেনশনের ব্যাপার। সুবিমল আবার বলেছিলেন, 'প্রায় বছর দেড়েক আগে, এসব পূজা হত্যে মাদুলি তাবিজ নেওয়া, আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। তার কারণও আছে। আমি কলকাতায় বিশেষজ্ঞকে দিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছি। তাতে জানা গেছে, আমার বীর্য থাকলেও, স্পার্মোটা—মানে, শুক্রকীট মৃত। মৃতও বলা যায় না। আমার কোনো স্পার্মোটা সৃষ্টি হয় না। তার জন্য নরম্যাল সেক্স্‌ লাইফের কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু মানুষের জন্মের যা মূল, সেই শুক্রকীট না থাকার দরুন, আমার ঔরসে কখনোই কোনো সন্তান হবে না। কথাটা দুঃখের হলেও, নির্মম সত্য। বিশেষজ্ঞ একবার পরীক্ষায় এ রায় দেন নি, দুবার পরীক্ষা করেছিলেন। জানিয়েছেন, আমার ভেতরে, স্পার্মোটা সৃষ্টি করাও সম্ভব না। সাধারণত অল্প বয়সে কোনো ভারি রোগ হলে, অনেক সময় এরকম ঘটে। আমার কোনো ভারি অসুখ কখনো করে নি। আমার জন্মই শুক্রকীটহীন জীবন নিয়ে।'

অশোক অবাক হয়ে, সুবিমলের দুঃখের কাহিনী শুনেছিল। মানুষের শরীরের বিষয়ে, এ ধরনের কোনো ব্যাপার ওর জানা ছিল না। সুবিমলের চোখ-মুখ যেন আরো শুকিয়ে উঠছিল, অথচ একটা উত্তেজনাও লক্ষণীয় ছিল। দ্বিতীয় সিগারেট শেষ না হতেই, কম্পিত হাতে তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন, 'এর পরে, আর তোমার বৌদিকে পরীক্ষা করবার কোনো প্রশ্নই ছিল না। গলদ কোথায়, তা আমার জানা হয়ে গেছিল।

কিন্তু তোমার বৌদির কাছে, কথাটা আমি বলতে পারি নি। পারি নি তার কারণ, সেটাও একটা ইটারনাল কারণ বলতে পারো। পুরুষের রক্তের মধ্যেই বোধহয় এ দুর্বলতা মিশে থাকে। স্ত্রীর কাছে স্বামী তার পৌরুষের গর্বের কথা বলতে পারে। কিন্তু সামান্য দুর্বলতার কথাও বলতে পারে না।'

এই পর্যন্ত বলে সুবিমল থেমেছিলেন। অশোক দেখেছিল, সুবিমল সিগারেটটা আঙুলের চাপে, দুমড়ে ফেলছিলেন। যা বলতে চাইছিলেন, তা উচ্চারণ করতে যেন কষ্ট হচ্ছিল। অশোক তখনো ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছিল না, সুবিমলের একটি আত্মিক কষ্ট ছাড়া। ও ওঁর মুখের দিকে অপলক তাকিয়েছিল।

সুবিমল সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে, হঠাৎ একটু যেন হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, 'দিন সাতেক আগে তোমার বৌদি বললেন, তিনি সন্তান-সম্ভবা।'

বলেই তিনি আর একটি সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক সহসা যেন কথাটার সূত্র ধরতে পারছিল না। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ-ঝলিকের মতো, কথাটা ওর মস্তিষ্কে বিঁধেছিল। বুঝতে পেরেছিল। সুবিমল কেন এত বিচলিত হয়েছেন। কিন্তু এমন একটা দাম্পত্য বা পারিবারিক বিষয়, সুবিমল ওকে কেন বলতে এসেছেন, বুঝতে পারে নি। তবুও একটু দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেটা কি নিতান্তই অসম্ভব?'

সুবিমল শক্ত মুখে বলেছিলেন, 'যদি অসম্ভব বলে না মনে করি, তা হলে, পৌরাণিক কাহিনীর বা রূপকথার দেবতার বরকে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব না। নিজের বিষয়ে, আমার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। যে বিশেষজ্ঞ আমার সিমেন্স পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁর পরীক্ষাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। আমি নিশ্চিত, বিভার পেটে যে সন্তান এসেছে, তার জন্মদাতা আমি নই।'

সুবিমলের দৃঢ়তা দেখে, অশোক কয়েক মিনিট কথা বলতে পারে নি। তারপরে বলেছিল, 'তবু আপনি বৌদিকে একবার পরীক্ষা করিয়ে দেখতে পারেন। অনেক সময় স্যুডো প্রেগনেন্সি—।'

সুবিমল বলে উঠেছিলেন, 'করিয়েছি। একথা প্রথমে আমার মনে হয়েছিল। হয়তো এটা ফলস্ প্রেগনেন্সি। আমাদের রীতা মিত্রের মাদার্স হোমে নিয়ে গেছলাম। পরীক্ষায় জানা গেছে, বিভার প্রেগনেন্সি জেনুইন্। এখন সে তিন মাসের গর্ভবতী।'

অশোক আবার চুপ করে গিয়েছিল। কী বলা উচিত, বুঝতে

পারছিল না। তারপরে, হঠাৎ মনে হতেই জিজ্ঞেস করেছিল, বৌদির সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছে ?'

'কোন্ বিষয়ে ?'

'আপনার বিষয়ে। বৌদিকে সব ভেঙে বলেছেন ?'

'না। তা কেমন করে বলব ? তা হলেই যে প্রশ্ন উঠে পড়বে, তার মুখোমুখি দাঁড়াব কেমন করে, সেটাই সমস্যা। আর দাঁড়ানো মানেই তুমি বুঝতে পারছ, হয় এদিক, না হয় ওদিক।'

সুবিমলের কথা শুনে, অশোক বুঝছিল, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত। নিজেকে অপমানিত ভাবছেন তো বটেই, একটা তীব্র যন্ত্রণাও ভোগ করেছেন। হয়তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে করণীয় বা কী থাকতে পারে ? বিশেষ করে, অশোকের ? ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা এখন কী করবেন ভাবছেন ?'

সুবিমল বলেছিলেন, 'সাত দিন ধরে, দিন-রাত্র সেই কথাই ভাবছি। ভেতরে ভেতরে এ যন্ত্রণা পুষে রাখা কঠিন, তবু আমি কিছুই বলতে পারছি না। সর্বাগ্রে আমার জানা দরকার, কে সে ? বিভা কার সঙ্গে যুক্ত ?'

অশোক বলেছিল, 'সে কথা তো আপনি বাড়ির অন্য লোকদের কাছেই জানতে পারেন।'

সুবিমল বলেছিলেন, 'অন্য লোক বলতে দীপালি, যে মেয়েটি আমার বাড়িতে সর্বক্ষণ থাকে। ঠিকা ঝি দুবেলা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। বিভা রান্নাটা নিজেই করে। বাদবাকী সংসারের যা কিছু, সবই দীপালি দেখাশোনা করে। দীপালিকে আমি নানান ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। এমন কি প্রচুর টাকার লোভও দেখিয়েছি। অবিশ্যি বিভাকে লুকিয়েই এসব করেছি। আমি জানি, দীপালি কিছুই জানে না। সে গরীবের ঘরের স্বামী পরিত্যক্তা, তিন কুলে কেউ নেই। এক হাজার টাকা তার কাছে অনেকখানি। তা ছাড়া, আমি ওর চোখ-মুখ দেখেই বুঝেছি, ওর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। জীবনে এত অবাক ও কখনো হয় নি। ছলনা করলে আমি বুঝতে পারতাম।'

অশোক বলেছিল, 'দীপালিকে ফাঁকি দিয়ে, বাড়ির মধ্যে কারুর সঙ্গে মেলামেশা করা কি সম্ভব ?'

সুবিমল বলেছিল, 'সেটা আমারও প্রশ্ন, কিন্তু কোনো জবাব পাচ্ছি না।'

'বৌদি কি এর মধ্যে বাপের বাড়ি বা অন্য কোথাও গেছলেন ?'

'কোথাও না। ছ' মাস আগে, আমার সঙ্গে সাউথ ইণ্ডিয়াতে বেড়াতে গেছল, তা ছাড়া আর কোথাও যায় নি।'

'এ শহরে, কারোর বাড়িতে বৌদির নিয়মিত যাতায়াত আছে?

'কোনো বাড়িতেই না। বিভাকে সেজন্য অনেকে দেমাকী ভাবে। আমার সঙ্গে ছাড়া, বাড়ি থেকেও কোথাও বেরোয় না।'

অশোক আবার চুপ করেছিল খানিকক্ষণ। তারপরে বলেছিল, 'কিন্তু সুবিমলদা, এ বিষয়ে আমি কী করতে পারি?'

সুবিমল বলেছিলেন, তুমি শুধু সেই লোকটিকে খুঁজে বের করে দাও। কে সে, যে বিভার সন্তানের জন্মদাতা?'

অশোক বলেছিল, 'তা জেনেই বা আপনার কী হবে? আমার তো মনে হয়, এ বিষয়ে বৌদির সঙ্গে কথা বলে, যা হোক একটা ফয়সালা করে নেওয়াই ভালো।'

সুবিমল হতাশভাবে হাত মেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বিভার সঙ্গে কী ফয়সালা আমি করব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে পারছি না। এ এমন একটা ব্যাপার—আমি জানি না, তুমি ফীল করতে পারছ কী না। এত ডেলিকেট, অথচ—অথচ—।'

সুবিমল কথা শেষ করতে পারেন নি, একটা অসহায় যন্ত্রণা আর উত্তেজনায়, কথা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অশোক বুঝতে পারছিল, সুবিমলদার এ অবস্থাটা ভালো না। এর পরিণতি, ওঁর শরীর বা স্নায়ুর পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। ওঁর অবস্থা দেখে, অনুমান করা যাচ্ছিল, বঞ্চনা এবং অপমানটাই সব না, সম্ভবত উনি স্ত্রীকে ভালোবাসেন। তা না হলে, রাগে এবং ঘৃণায়, সরাসরি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। রীতিমতো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ওঁর হাতে আছে। তাতে, ওঁর স্ত্রী দ্বিচারিণী, এটা প্রমাণ করা কিছুমাত্র অসুবিধার বিষয় না। বিচ্ছেদ অনায়াসেই হতে পারে। কিন্তু সেরকম কোনো ফয়সালার কথাও সুবিমল ভাবতে পারছিলেন না।

সুবিমল আবার নিজেই বলে উঠেছিলেন, 'এমন কি, আমার এ কথাও মনে হয়েছিল, সাময়িকভাবে হয়তো আমার স্পার্মোটা জন্ম নিতে পারে। মনে হতেই, আমি কলকাতায় সেই বিশেষজ্ঞকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এরকম কিছু ঘটতে পারে কী না? জবাবে তিনি বলেছেন, অসম্ভব। আমার সবকিছু তিনি যে ভাবে পরীক্ষা করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তা কখনো সম্ভব না। এর পরে—এর পরে—'

বলতে বলতে সুবিমল যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, ওঁর চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছিল, বলেছিলেন, 'এর পরে, আমি কী ব্যবস্থা করব জানি না, কিন্তু আমাকে জানতেই হবে, সে কে? কার সঙ্গে বিভার, কী ব্যাপার

আছে? কী ভাবে সেই যোগাযোগ ঘটাচ্ছে? বিভাকে আমি সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারছি না, পারব না, কিন্তু না জানলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

অশোক সুবিমলের মনের অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিল। আট বছরের বিবাহিত জীবনে, যাকে উনি কখনো কোনো কারণে অবিশ্বাস করতে পারেন নি, দাম্পত্য জীবনের একটি চরম বিপর্যয়ে, একদিকে যেমন সমস্ত বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, তেমনি পৌরুষেও প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। মনের ভারসাম্য এখনো আছে, ভেঙে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র না। অশোকের মনে হয়েছিল, এ থেকে আর একটি ভয়ঙ্কর-বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে, তা হল হত্যা। হয় বিভা হত্যা, অথবা, ইতিমধ্যেই যে অপরিচিতকে সুবিমল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে আরম্ভ করেছেন, তার নিধন। প্রবাদ, যুদ্ধ আর প্রেমে, মানুষ কোনো নীতি আর আদর্শকেই মানতে চায় না। মহাভারতও সেই সাক্ষী দেয়।

অশোক আরো ভেবেছিল, সুবিমল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে, তথাকথিত ভদ্রলোকের মতো কোনো ফয়সালা করতে পারবেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মানুষের মনে ঘৃণা যত তীব্র কৌতূহলও ততখানিই তীব্র। মেঘনাদের মতো কেউ মেঘের আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে যাবে, এটা অসহনীয়। তাকে দেখতে এবং জানতে হবে।

সুবিমল আবার সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশোক জিজ্ঞেস করেছিল, 'গত সাত দিন ধরে বৌদির আচরণে নতুন কিছু লক্ষ্য করেছেন?'

সুবিমল একটু ভেবে বলেছিলেন, 'তেমন একটা কিছু মনে করতে পারছি না।'

'মা হতে যাচ্ছেন বলে একটা খুশি খুশি ভাব?'

'না, সেরকম কিছু দেখি নি। শরীরটাও বিশেষ ভালো নেই। প্রেগনেন্সির নানান উপসর্গগুলো দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। আমি ইচ্ছা করেই কয়েকদিন একটু বেশি রাত্রে শুতে যাই যাতে বিভার সঙ্গে আমাকে বেশি কথা বলতে না হয়। কথা বলতে গেলে, কী বলতে কী বলে ফেলব, সেই ভয়ে দেরি করি। বিভা ঘুমিয়ে পড়ে। সেটাই যা রক্ষে।'

অশোক বুঝতে পেরেছিল, বিভার ঘুমিয়ে পড়া মানেই, সে নিশ্চিন্ত আছে! তবুও সুবিমলকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু আপনার মধ্যে তো বেশ পরিবর্তন হয়েছে, সেটা কি বৌদির চোখে পড়ছে না?'

সুবিমল বলেছিল, 'অন্তত বিভার আচরণ কথাবার্তা থেকে তা বোঝা যায় না। অবিশ্যি, আমি ওর সামনে বিশেষ যাচ্ছি না।'

অশোক তথাপি, এ বিষয়ে ওর করণীয় স্থির করতে পারে নি। খুনের রহস্য উদ্ঘাটনের থেকেও, ব্যাপারটা ওর কাছে বেশি জটিল মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, এ-রকম বিষয়ের মধ্যে, ওর যেতে ইচ্ছা করছিল না। একটু সংকোচ করে বলেছিল, 'সুবিমলদা, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পক্ষে এটা ঠিক হয়ে উঠবে না।'

সুবিমল অশোকের হাত চেপে ধরে, ব্যগ্রভাবে বলেছিলেন, 'অশোক, এ বিষয় নিয়ে, আমি কারোর কাছে যেতে পারব না। এটা তো দশ জনের কাছে খোলাখুলি বলে বেড়াবার কথা না। তোমার ওপরে আমার আস্থা আছে, তুমিই একমাত্র পারো এটা বের করতে। এটুকুন করে, তুমি আমাকে বাঁচাও।'

সুবিমলের ব্যাকুলতা দেখে, অশোক হঠাৎ কিছু বলতে পারে নি। সুবিমল আবার বলেছিলেন, 'টাকা-পয়সার কথা তোমাকে আর কী বলব। তুমি যা বলবে —'

অশোক বাধা দিয়ে বলেছিল, 'আরে ছি ছি সুবিমলদা, টাকা-পয়সার কথা কী বলছেন!'

সুবিমল বলেছিলেন, 'জানি ভাই, খাওয়া-পরার অভাব তোমাদের বাপ-পিতামহ রেখে যান নি। কিন্তু তুমি আমাকে রিফিউজ করতে পারবে না। আমি জানি, তুমি এটা পারো, তোমাকে আমার জন্য করতেই হবে।'

অশোক একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'বেশ, আমি চেষ্টা করছি। তবে আপনাকে কিন্তু মনে রাখতেই হবে সুবিমলদা, যে লোকের সঙ্গে বৌদি তাঁর নিজের ইচ্ছায় কিছু করেছেন, তার কোন ক্ষতি করা আপনার উচিত হবে না। আর মনে যত কষ্টই পান, কিন্তু উত্তেজনার মাথায় বৌদিকে হঠাৎ কিছু করে বসবেন না।'

'হঠাৎ কিছু করে বসা বলতে কী বলছ?'

'অনেক কিছুই হতে পারে। হয়তো মারধোর করবেন?'

সুবিমল একটু ভেবে বলেছিলেন, 'এখনও পর্যন্ত সেরকম কিছু মনে হয় নি।'

অশোক বলেছিল, 'আর একটা কাজও আপনি করতে পারেন। ইমিডিয়েটলি কোনো ক্লিনিকে গিয়ে, অ্যাবরশন করিয়ে নিতে পারেন। অবিশ্যি যদি বৌদির ইচ্ছা থাকে!'

সুবিমল বলেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও, তোমার বৌদির ইচ্ছাই সব? আমার মেনে নেবার কোনো প্রশ্ন নেই?'

অশোক তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। আপনি মেনে

না নিলে কিছুই হতে পারে না।'

'কিন্তু আমি সে-সব কথা এখনো কিছু ভাবিই নি। আগে আমি কেবল জানতে চাই, সে কে ?'

অশোক মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে। আমি পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। হয়তো আপনার বাড়িতে আমাকে যেতে হতে পারে। আর চেষ্টা করবেন, বৌদির সামনে স্বাভাবিক থাকতে, ওঁর মনে যেন কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়।'

সুবিমল বলেছিলেন, 'সে চেষ্টা আমি করে যাচ্ছি।'

সুবিমল চলে যাবার পরে, অশোক অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে ভেবেছিল। অবাস্তব না, কিন্তু এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে ওর কাছে কেউ কখনো আসে নি। সুবিমলের কথা থেকে, এটা নিশ্চিত বোঝা গিয়েছিল, ঘটনাটি নিশ্ছিদ্র সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা, এটা প্রমাণিত, বিভা গর্ভবতী, এবং সুবিমলের দ্বারা তা সঞ্চারিত না। সন্তানের জন্ম কোনো অলৌকিক ঘটনাও হতে পারে না, অতএব জন্মদাতাও নিশ্চিতই কেউ আছে। কে সে ? যোগাযোগ কী করে সম্ভব ? দীপালি নামে ঝিকে সুবিমল অবিশ্বাস করেন না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বাড়িতে সর্বক্ষণ একজন থাকা সত্ত্বেও, সে কিছুই জানতে পারে নি ? বিভা একলা বাইরে বেরোন না। একলা কোনো বাড়িতে যাতায়াত নেই। বাড়িতে কোনো আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে নি। কোনো পুরুষের পক্ষে বাড়ির অন্দর-মহলে যাওয়া সম্ভব না।

সুবিমল প্রায়ই কলকাতা যান। সকালে যান, বিকালে আসেন, অন্যান্য দিন দুপুরেও বাড়িতেই থাকেন। রাত্রে তাঁর বাইরে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। অতএব, প্রশ্ন জাগে, বিভা দীপালিকে নিয়ে, সুবিমলের অবর্তমানে যখন দুপুরে বাড়িতে থাকেন, তখন দীপালি কোথায় থাকে, বিভা কোথায় থাকেন ? সম্ভবত এর জবাব, বিভা ওপরে শোবার ঘরে শুতে যান। দীপালি নিচে বা ওপরেই বারান্দায় কোথাও থাকে। দীপালির যদি দিনে ঘুমানো অভ্যাস থাকে, তবে সে সময়টা বিভা কাজে লাগাতে পারেন। আবার এ কথাও ভাবতে হয়, বিভা স্বভাব-দ্বিচারিণী নন। তা যদি হতেন, তা হলে, সুবিমলের অভিজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষার আগেই, তিনি মা হতে পারতেন। সুবিমল কোনোদিন কিছুই বুঝতে পারতেন না। দেড় বছর আগে পরীক্ষা করিয়েছিলেন বলেই, এখন বুঝতে পারছেন। গত দেড় বছরের, এক বছরের মধ্যেও, বিভা নিশ্চয়ই কিছু করেন নি। গর্ভধারণে তিনি সক্ষম, কিছু করলে, আরো আগেই গর্ভবতী

হতেন। এখন তিনি তিন মাসের গর্ভবতী। ধরা যেতে পারে, গত চার মাস থেকে ছ'মাসের মধ্যে, তাঁর সঙ্গে কোনো পুরুষের যোগাযোগ হয়েছে।

ছ'মাস আগে, বিভাকে নিয়ে সুবিমল দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সম্ভবত মাসখানেক বেড়িয়েছেন। সেই সময়ের মধ্যে যদি কিছু ঘটে থাকত, তাহলে গর্ভকাল আরো বেশি হত। প্রায় চার পাঁচ মাস। অতএব বাইরে কিছু ঘটে নি। তা হলে? অশোকের চোখের সামনে, সুবিমলের দোতলা বাড়িটার ছবি ভেসে উঠেছিল। রাস্তার ওপরে, ছোট দোতলা বাড়ি, পুব-মুখো। পিছনে পশ্চিম দিকে একটি ছোট বাগান আছে। পাঁচিল-ঘেরা বাগানের আশেপাশে আরো বাড়ি আছে। প্রতিবেশী কোনো পুরুষের ব্যাপার যদি হয়, দিনের বেলা পাঁচিল টপকে, সুবিমলের বাগানে ঢোকা কঠিন। লোকের চোখে পড়বেই। তাহলে?

গতকাল বিকালে তখনো অশোকের সান্ধ্য আড্ডার বন্ধুরা এসে জোটে নি। ও বাড়ির ভিতরে গিয়ে, খিড়কি দরজা খুলে, ছোট গলির অন্যদিকের মুখে, কাঞ্চন বৌদির বাড়ি গিয়েছিল। বিকলাঙ্গ জ্ঞাতি দাদা গোবিন্দর স্ত্রী কাঞ্চন বৌদি, নিঃসন্তান যুবতী, অশোকের বন্ধু। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখেছিল, গা ধুয়ে চুল বেঁধে, ধোয়া শাড়ি পরে, কাঞ্চন উঠোনের ধারে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে, পাথরবাটি থেকে তুলে কিছু খাচ্ছিল। অশোককে দেখতে পায় নি। ও পা টিপে টিপে, কাছে গিয়ে দেখেছিল, কাঞ্চন তেঁতুলের আচারে একেবারে মজে আছে। বিকালে অশোককে কাঞ্চন চা খাইয়ে এসেছিল। তারপরে আচার নিয়ে একলা বসেছিল নিশ্চয়। ও ঠোঁট টিপে হেসে বলে উঠেছিল, এ সুখবরটা ঘণ্টাখানেক আগেও তো দাও নি?'

কাঞ্চন চমকে উঠে বলেছিল, 'কে রে?'

মুখ ফিরিয়ে অশোককে দেখেই, ভেজা ঠোঁট ফুলিয়ে, ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'অসভ্য। এমন চমকে দিয়েছে, বাব্বা!'

অশোক বলেছিল, তা না হয় হল, কিন্তু সুখবরটা চেপে গেছ কেন?'

কাঞ্চন অবাক মুখে বলেছিল, 'কিসের সুখবর?'

'এই যে রসিয়ে রসিয়ে তেঁতুলের আচার গিলছ, তার তো একটাই কারণ।'

'সেটা কী?'

অশোক ভুরু তুলে, গম্ভীর মুখে বলেছিল, শুনেছি বিবাহিতা মেয়েরা এক সময়ে খুব আচার টাচার খায়, মুখের রুচি নাকি নষ্ট হয়ে যায়।'

কাঞ্চন লাফ দিয়ে উঠে, অশোককে কিল মারতে উদ্যত হয়েছিল।

অশোক ছিটকে সরে গিয়েছিল। কাঞ্চন ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'পাজী কোথাকার! মুখে কিছু আটকায় না, না?'

বলেই কাঞ্চন অভিমানে মুখ ভার করে, আবার বলেছিল, 'এ জন্মে কোনোদিন মা হতে পারব না জেনেই, এরকম ঠাট্টা করতে পারলে।'

অশোক তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হয়ে, হাতজোড় করে বলেছিল, 'দোহাই কাঞ্চন বৌদি, সিরিয়াসলি নিও না। একটু তোমার পেছনে লাগছিলাম।'

কাঞ্চন যতক্ষণ না হেসেছে, ততক্ষণ অশোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'ক্ষমা তো?'

কাঞ্চন বলেছিল, 'ফাজিল কোথাকার! তা এ সময়ে আড্ডা ছেড়ে বাড়ির ভেতর কেন?' 'এক কাণ্ড ঘটেছে, তোমাকে বলতে এলাম।'

বলে অশোক সুবিমলের আর বিভার ঘটনা বলেছিল। অশোকের যা কিছু গোপন কথা সবই কাঞ্চন জানে। ওর সব আলোচনাই কাঞ্চনের সঙ্গে হয়। কাঞ্চনের স্বাভাবিক সাংসারিক বুদ্ধি, অনেক সময়, আশ্চর্য রকমের সূত্র ধরে দেয়। কাঞ্চণ সব ঘটনা শুনে, হেসে উঠে বলেছিল, 'এ যে তোমার সেই, চিট্‌ঠি মে লেড়কা হওয়ার মতো। সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, এ সব কথা কখনো মিথ্যা করে বলা যায়?'

কাঞ্চন নিরিষ্টভাবে খানিকক্ষণ ভেবে বলেছিল, 'দেখ বাপু, আমার মনে হয়, ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে গেছে। এটা কোনো নিয়মিত মেলামেশার ব্যাপার নয়।'

অশোক বলেছিল, 'সেটা আমার মনে হয়েছে। বিভা দাশগুপ্ত দুশ্চরিত্রা নয়, অ্যাকসিডেন্টাল কিছু ঘটে গেছে, যা মানুষ সব সময়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু সেই অ্যাকসিডেন্টটা ঘটতে পারে কার সঙ্গে?'

কাঞ্চন বলেছিল, 'এমন কারোর সঙ্গে, যাকে কিছুতেই সন্দেহের মধ্যে আনা যায় না।' 'সেরকম কারোকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।'

কাঞ্চন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, 'নিশ্চই যাবে, যেতেই হবে। সে হয়তো সামনেই রয়েছে, কিন্তু তাকে চেনা যাচ্ছে না। ভালো করে খোঁজ, ঠিক পাবে।' অশোক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটে। অশোক এসে দাঁড়াল, সুবিমলের বাড়ির বিপরীত দিকে। নিচের দরজা-জানালা সবই বন্ধ। ওপরের ব্যালকনি ফাঁকা, সেখানে কেউ নেই। গ্যারেজের কোলাপসিবল গেট তালা-বন্ধ, গাড়ি নেই। সুবিমল কোথাও গিয়েছেন। অশোক ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ, জানালাগুলো খোলা। বিভা হয়তো এখন উপরেই আছেন। দীপালি কি নিচে কাজ করছে? সম্ভবত।

সুবিমলের বাড়ির পাশ দিয়ে, পশ্চিম দিকে একটা রাস্তা গিয়েছে সেদিক থেকে একটা কোলাহল ভেসে আসছে। অশোক সেদিকে গেল। সুবিমলের বাগানে পাঁচিলের পাশ দিয়ে গেল। পাঁচিল শেষ হতেই, বাঁদিকে বেশ খানিকটা পোড়ো জায়গা, মাঠ বলা যায়। সেখানে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে। কোলাহলটা ওদেরই চিৎকার-চেঁচামেচি। মাঠের গায়েই সুবিমলের বাগানের পাঁচিলের সীমানা। অশোক ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির পশ্চিম দিকেও দোতলায় রেলিং ঘেরা বারান্দা রয়েছে। এদিকটায় দরজা-জানালা সবই খোলা, কিন্তু কারোকে দেখা যাচ্ছে না।

অশোক ছেলেদের খেলা দেখতে দেখতে খানিকটা এগিয়ে গেল। এ পাড়ায় ওর জানাশোনা দু তিনজন বন্ধু আছে। সকলেই চাকরি করে, এখনো ফেরে নি। অশোক আবার ফিরল, আর তখনই একজনের শট লেগে-বলটা সুবিমলের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে গিয়ে পড়ল। পাঁচিল তেমন উঁচু না। সঙ্গে সঙ্গে দু তিনটে ছেলে, লাফিয়ে পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করল। বিভাকে দেখা গেল, রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ালেন। মাথায় ঘোমটা নেই, আলুলায়িত কেশ। সত্যি রূপসী। বলে উঠলেন, 'তোদের আসতে হবে না, নিমু যাচ্ছে।'

অশোক দাঁড়াল না, কিন্তু খুব মন্থরভাবে এগোল। পাঁচিলের ওপর ছেলেরা বাগানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই নিমু, ওই যে, আমগাছের-গোড়ায় বলটা পড়েছে।'

অর্থাৎ নিমু নামে কেউ বাগানে এসেছে, অশোক দেখতে পাচ্ছে না। দু তিন সেকেণ্ড পরেই, শট করার আওয়াজ হল, বলটা মাঠে এসে পড়ল। ছেলেরা পাঁচিল থেকে নেমে মাঠে দৌড়ল। আবার দু সেকেণ্ডের মধ্যেই, বাগানের ভিতর থেকে, পাঁচিলের ওপর একটি ছেলে লাফিয়ে উঠল। তেরো-চৌদ্দ বছরের ফরসা ছেলে, হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে, পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে, প্যান্টের পকেট থেকে সে একটি ডাঁসা পেয়ারা বের করে, কামড় বসিয়ে, বিভার দিকে তাকাল। বিভা হাসলেন, বললেন, 'পড়ে যাবে নিমু, নেমে পড়ো।'

নিমু লাফ দিয়ে পাঁচিল থেকে নামল, নেমেই মাঠের দিকে দৌড় দিল। বিভা একটু হেসে, ভিতরে চলে গেলেন। অশোক মাঠের দিকে তাকাল। সবাই প্রায় একই বয়সের কিশোর, পাড়ার ছেলে। অশোক না দাঁড়িয়ে চলতে লাগল। সুবিমলের বাড়ির সামনের দিকে এসে, আশেপাশের দিকে তাকাল। কয়েকটা ছোটখাটো দোকান। মুদীখানা, মিষ্টির দোকান, চায়ের

দোকান, নিতান্ত পাড়ার মধ্যে যা থাকে। অশোক আবার বাড়িটার দিকে দেখল। দক্ষিণে লাগোয়া একটি একতলা বাড়ি, শ্রীশ মোক্তারের বাড়ি। অশোক যত দূর জানে, শ্রীশ মোক্তারের কোনো যুবক পুত্র নেই, একাধিক যুবতী কন্যা আছে। মোক্তার-কন্যাদের শহরে একটু দুর্নামও আছে। কারোর বিয়ে হয় নি, ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু অশোকের কোনো কাজ হবে না তাতে। মোক্তারের মেয়েরা জন্মদাতা হতে পারে না। ও চিন্তিত মুখে, এগিয়ে চলল। বড়রাস্তায় গিয়ে, একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে, মাইল খানেক দূরে, সুবিমলের পেট্রোল-পাম্পে গেল। সুবিমল ছিলেন, অশোককে ডেকে ভিতরে নিয়ে বসালেন। অশোক বলল, 'আপনার বাড়ির আশেপাশে একটু ঘুরে এলাম।'

সুবিমল কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু জানতে পারলে?'

অশোক বলল, 'না। আশপাশটা একটু দেখে এলাম। আপনার বাগানের পিছন দিকে গেছলাম, যেখানে পাড়ার ছেলেরা খেলা করে।'

সুবিমল বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে বাচ্চা ছেলেরা খেলা করে।'

'বৌদিকেও দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। বলটা বাগানে গিয়ে পড়েছিল, নিমু বলে একটি ছেলে বোধহয় বাড়ির মধ্যেই ছিল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সুকুমারদার ছেলে, সুকুমার ব্যানার্জী, ডানলপে চাকরি করেন বল-টল পড়লে, বা এমনিও নিমু কখনো যায়। বাগানের দিকটায় কি তোমার সন্দেহজনক কিছু মনে হল?

অশোক মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি আজ যাই, দু একদিন পরে দেখা করব।' সন্ধ্যাবেলা। অশোক ওর নিজের দোতলার ঘরে, খাটে বসে আছে।

কাঞ্চন আর ও দুজনেই চোখে চোখে তাকিয়ে আছে। অশোকের চোখে নিবিড় জিজ্ঞাসা। কাঞ্চনের চোখে একটি অর্থপূর্ণ সংকেত অশোক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

কাঞ্চন বলল, 'নিজের চোখে। তা বলে, ইচ্ছা করে কি দেখেছি? চোখে পড়ে গেছিল, তাই দেখেছি। কেন, তোমার নিজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই?'

বলতে বলতেই কাঞ্চনের মুখ লাল হয়ে উঠল, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। অশোক যেন গভীর চিন্তা থেকে জেগে উঠে বলল, 'আছে, তবে অভিজ্ঞতাটা একটু ভিন্ন রকম। কিন্তু পাখিটাকে ধরব কেমন করে বলো তো?'

কাঞ্চন হেসে বলল, ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাও কোনো ফাঁকা জায়গায়, তারপরে—'

কাঞ্চন কথা শেষ করল না, অশোকের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। অশোক ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ। পাখিটা বেশি সজাগ হলেই মুশকিল?'

কাঞ্চন বলল, 'তাহলে আর তুমি কেমন উপকারী?'

'তা বটে। আচ্ছা, তুমিও তো এভাবে মা হতে পারো।'

কাঞ্চন ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তারপরে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, 'সে আমি যখন খুশি হতে পারি, নিজেই ভালো জানো!'

বলেই সে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পরের দিন অশোককে দেখা গেল, বিকালবেলা গঙ্গার ধারের মুণ্ডেশ্বরীর নিরালা ঘাটে বসে থাকতে। এদিকে কেউ বেড়াতে আসে না। ও রাস্তার দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়েছিল। প্রায় মিনিট দশেক পরে, ও রবিকে দেখতে পেল। রবির সঙ্গে নিমু, একই বয়সী দুজনে। দুজনেই কথা বলতে বলতে ঘাটের কাছে এল। রবি অশোকের দিকে তাকাল। বাড়ির ছেলে, রবিকেই অশোক পাঠিয়েছিল, নিমুকে ভুলিয়ে নিয়ে আসতে। অশোক এগিয়ে, খপ্ করে নিমুর হাত কঠিন মুঠিতে চেপে ধরে, রবিকে বলল, 'তুই দৌড়ে চলে যা।'

রবি দৌড় দিল। নিমু হঠাৎ অবাক চোখে তাকিয়ে, প্রতিবাদ করে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'বারে, আপনি আমাকে ধরলেন কেন?'

অশোক কঠিন মুখে, জ্বলন্ত চোখে নিমুর দিকে তাকাল। এক ঝটকায় নিমুকে আরো কাছে টেনে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'চুপ! এক থাপ্পড়ে তোমার বদন বিগড়ে দেব, অসভ্য বদমায়েস নোংরা ছেলে! আমি জানি না, তুমি কী করেছ?'

নিমুর চোখে ভয় ফুটল, বলল, 'কী করেছি?'

'কী করেছ? মায়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে—'

অশোক পুরো বাক্য শেষ না করে, বলে উঠল, 'ক্লাস এইটে পড়তেই এসব বিদ্যে? নাক টিপলে দুধ বেরোয়, তোমার গলা টিপে আজ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব। বলো, সুবিমলদার বৌয়ের সঙ্গে কী হয়েছে?'

নিমু মুহূর্তের মধ্যে কেবল চুপসে গেল না, ওর দুচোখে অন্ধকার দেখা দিল। প্রায় কাঁদতে লাগল, বলল, 'আমার—আমার কী দোষ? কাকীমা নিজেই তো—'

নিমু চুপ করে গেল। অশোক ধমকে উঠল, 'কী, কাকীমা কী

করেছেন? কাকীমা কি তোমাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলেন?

নিমু মাথা নেড়ে বলল, 'না, জোর করেন নি। প্রথম দিন দুপুরবেলা কাকীমা আমাকে তাঁর গা হাত পা টিপে দিতে বলেছিলেন, তারপর—'

নিমুর কথা আটকে গেল। অশোক জিজ্ঞেস করল, 'দুপুরে কেন গেছলে?'

'পাঁচিল টপকে বাগানে কাঁচা আম পাড়তে। তখন কাকীমা দেখতে পেয়ে ওপরে ডেকেছিলেন।'

'দীপালি তখন কোথায় ছিল।'

'নিচে ঘুমোচ্ছিল।'

'দুপুরে আর ক'দিন ওরকম গেছ?

'তিন দিন।'

অশোক দেখল, স্বাস্থ্যবান সুন্দর কিশোর, এখনো গোঁফের রেখাও স্পষ্ট হয় নি। বয়স তেরো-চৌদ্দর বেশি না, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বিভা নিজের সর্বনাশ করেছেন, না এই কিশোরের? সে বিচারে অশোক যেতে চায় না, জীবন রহস্যই ওকে অবাক করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কাকীমা তোমাকে দুপুরে আর যেতে বলেন না?'

'না।'

'অন্য সময়?'

'অন্য সময় যাই।'

'তখন কাকীমা কী বলেন?'

'এমনি আদর করে কিছু খেতে দেন।'

অশোক নিমুর ভীরু চোখের দিকে কয়েক মুহূর্তে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বুঝেছ তো, আমি সবই জানতে পেরেছি! খবরদার, একথা বা আমার কথা যদি কারোকে বল, তাহলে তোমার বাবা-মাকে আমি সব কথা বলে দেব।'

নিমু মাথা নেড়ে বলল, 'কারোকে বলব না।'

'তোমার কাকীমাকেও না।'

'কারোকে না।'

অশোক নিমুকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাও, ভালো ছেলের মতো লেখাপড়া

কর, খেলাধুলো কর, ওসবে আর যেও না।'

নিমু ঘাড় কাত করে, চলে গেল। অশোক এখনো অবাক চোখে নিমুকে দেখতে লাগল। সত্যিই, বিচিত্র মানুষের জীবন! কিন্তু সুবিমল তাঁর স্ত্রীর গর্ভের সন্তানের জন্মদাতাকে কী চোখে দেখবেন, বা বিভার সঙ্গে কী ফয়সালা করবেন, অশোকের আর তা জানার দরকার নেই।

সমরেশ বসু ॥ জন্ম ১৯২১ খৃঃ। সমরেশ বসুর সাহিত্যের অঙ্গনে অনুপ্রবেশ ঘটে তথাকথিত সমাজবাদী প্রগতিশীলতার কঠিন আবরণের কঠোর মোড়কের আচ্ছাদনে। তবে অনতিকাল পরেই তাঁর লেখায় জগৎ ও জীবনের ব্যাপক বিস্তৃতির বিস্ময়াভূত অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফলে গোষ্ঠী সাহিত্যের কূপমণ্ডুকতামুক্ত লেখক তাঁর লেখনীকে সৃজনশীলতার মুক্তাঙ্গণে বিহঙ্গ বিচরণের স্বচ্ছন্দতায় নন্দিত করেন। তাই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙ্গালী জীবনের অবক্ষয় ও অবসাদের এক বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায় স্পষ্ট। আর যুদ্ধোত্তর কালের রাজনৈতিক মালাবদলের ও সামাজিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা উত্তর বাঙ্গালী জীবনের বিপর্যয় ও হতাশার এক বাস্তবঘন চরিত্র চিত্রণ তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। আমাদের নষ্ট দুষ্ট জীবনের বাস্তবতার অন্বেষণ তাঁর লেখায় বিমূর্ত বিস্ময়ে স্পষ্ট, উদ্ঘাটিত, হয়ত উদ্ভাসিতও।

সমরেশ বাবু **"কালকূট"** নামে তাঁর বহু ভ্রমণমূলক উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। কালকূট তাঁর বিবাগী মনের বিরহী নিঃসঙ্গতায় খুঁজে ফেরেন মনের মানুষকে। ঘরকে করেছেন বাহির, বাহিরকে করেছেন ঘর। তাইত তাঁকে পথ খুলে দিয়েছে বন্ধনহীন গ্রন্থী। আর বাধা বন্ধহীন পথপাগল বিবাগীমনের নির্জনতার সাগর সৈকতে ভেসে উঠেছে নিত্য নতুন ছবি, ছবি হয়ত শুধু ছবিই। কিন্তু লেখকমনের দুঃখানুভূতির চিত্রপটে আঁকা হয়েছে অনন্তকালের সেই মানুষ, যে মানুষ খুঁজে ফিরেছে, ফিরছে ও ফিরবে। যে মানুষ খুঁজতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়া সব হারাদের বাউল বাতুলতায়।



মাশুল

বাণী রায়

রাণী সাহেবার ঘরে বসলাম।

আমরা দু'জন। সরকার পক্ষ থেকে এসেছি। সাক্ষাৎকার সুখের নয়, মানে সৌজন্যমূলক নয়, উদ্দেশ্যমূলক। একটি সূত্র অন্বেষণের ভার পড়েছে আমাদের উপরে। বিজন মণ্ডল দ্বিতীয় ব্যক্তিটি। প্রথম পুরুষ উত্তম ব্যানার্জি আমি।

লাল টকটকে পারসিক গালিচা রাণী সাহেবার বসবার ঘরের মেঝের ওপর আস্তৃত। লাল-লাল গোলাপ লালের ওপর আরও গভীর লালে বোনা। বাঁকানো পায়া ও পিঠ পুডল্ কুকুরের মত ছোট ছোট সোনালী আঁজিকাটা সোফা-সেটী। মধ্যের টেবিলে ফুলের তোড়া।

আমরা অপেক্ষায়।

কি কারণে এঁকে রাণী বলা হয় আমরা কেউ এখনও জানি না। কোন জমিদারী বা জায়গীর এর নামে নেই। অবাঙালী মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলাকে

রাণীসাহেবা বলে উল্লেখ করা হয় সর্বত্র। কাগজে ছবি দেখেছি, এখনও চোখে দেখা বাকী।

পায়ের গালিচার দিকে চেয়ে আছি। পাশে ত্রিপদীতে পিতলের আশট্রে কিন্তু ধুম পান উচিত হবে না বিবেচনায় বিরত আছি। আপাততঃ গালিচার বাহার দেখা ছাড়া দ্বিতীয় কাজ নেই।

চেয়ে থাকতে থাকতে আর একখানা গালিচার স্মৃতি মনে ভেসে এল। সেখানিও লাল, কিন্তু লাল গোলাপে সবুজ পাতার বেড়। ঝক্‌ঝকে সবুজ লালে যেন মীনার কাজ বুনে দিয়েছে কেবলমাত্র লাল রং হ'লে তো অন্ত লালের ছোপ সহজে ধরত না। কিন্তু সবুজ বোনা থাকায় নটখটে ব্যাপার বেধেছে।

খস্‌খস্ শব্দ চেয়ে দেখি ঘরের থেকে অন্দরের দিকে যাবার লাল ভেল্‌ভেটের পর্দা হাতে সরিয়ে ধরে এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব লাবণ্য তার।

রাণী সাহেবা ?

আমরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতে যেয়ে থেমে গেলাম। এই নারী পূর্ণযৌবনা, কিন্তু প্রায় কিশোরী, তবু মুখচোখে যৌবনের ছলচাতুরীর চটুলতা।

রাণীসাহেবা এত অল্পবয়স্কা নয়।

পোষাক এর কাঁচুলী, ঘাঘরা, ওড়না। উজ্জ্বল রেশমের হ'লেও মহার্ঘ নয়। কানে লম্বা সবুজ পাথরের ঝোলানো ভূষণ ভিন্ন দেহভাগে ভূষণ যৎসামান্য। রাণী সাহেবার এই পরিজনটি কিন্তু মনোহারিনী।

পরিষ্কার বাংলায় নারী বলল, "আপনারা বসুন রাণী সাহেবা এখনি দর্শন দেবেন।"

দর্শন ? তা তো বটেই।

বিজন মণ্ডলের কণ্ঠার উঁচু হাড় ঢক্‌ঢক্ করে ওঠানামা করছিল মেয়েটির দিকে আদেখলের মত চেয়ে চেয়ে।

ভাঙাগলায় সে প্রশ্ন পাঠাল, "আপনি তবে ?"

মাথা নামিয়ে সুললিত ভঙ্গিতে সে বলল, "আপনি রাণী সাহেবার খাস দাসী।"

"তুমি—আপনি কি বাঙালী ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। বস্তুত জিজ্ঞাসা বাদের জন্যই এখানে এসেছি আমরা। একজন তো দাসীকে দেখেই চঞ্চল হত। কাজেই দেখছি দু'জনের কাজই একাই চালাতে হবে।

"আমি ভিন দেশী। কিন্তু রাণী সাহেবা বাংলাদেশে থাকতে ভালবাসেন তাই আমিও এদেশে থেকে বাঙালী বনে গেছি।"

মেয়েটি আলাপ চালাতে জানে, কথাবলার ভঙ্গিও ভালো। একটু টান আছে কথায় অবশ্য, দু'চারটি বিদেশী ভাষার শব্দ প্রত্যেক কথার ছকে আছে ঠিক, পোষাকেও ভিন্ দেশী, তবু মন অবাঙালীর পার্থক্য খুঁজে পায় কম।

আমি সতর্ক প্রশ্নজাল রচনা শুরু করলাম, "রাণী সাহেবা প্রায়ই বাইরে যান, বাংলায় শুধু থাকেন না তো—এমন বাংলা বলা শিখলেন কোথা থেকে?

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, "শিখতে হয়েছে।"

কথার ভাবে যেন সে আমাদেরি সমকক্ষ, দাসী নয়।

রাণী সাহেবার খাসদাসীর অবশ্য কিছু প্রাধান্য থাকবেই। মনে হয় লোকজন এলে প্রাথমিক অভ্যর্থনার ভার এরি ওপরে।

আমাকে চুপ করে থাকলে চলবে না, আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "রানী সাহেবা অন্যান্য প্রদেশে প্রায়ই যান শুনেছি বিহারে যেয়েও বেশ অনেকদিন থাকেন জানি।"

বিদ্যুৎচমকের মত হাস্যমুখী তরুণী সহসা সজাগ হয়ে উঠল।

"আপনাদের চা নিয়ে আসি, বসুন।"

অদৃশ্য হয়ে গেল সে পলকে।

আমি হতভম্ব বিজনের পাঁজরায় সজোরে খোঁচা দিয়ে বললাম, "একেবারে যে বুদ্ধু বনে গেছ দাসীটি দেখে? বলি, রাণী সাহেবা এলে করবে কি?

বিজন পকেট থেকে ময়ূরপুচ্ছের মত একখানা রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগল, "লক্ষ্য করে সমস্ত কিছুই দেখতে হয় তাই দেখছিলাম।"

"কি দেখলে, বল?"

"রাণী সাহেবার খাসদাসী হিসাবে বয়স বড় বেশী কম।"

আর শ্যামলা রং হলেও বড় বেশী সুন্দরী, না?

"কি যে বলেন, উত্তমদা? রাণীর চারপাশের সঙ্গিনীরা সুন্দরী হ'বেই। তবে এটি যতটা না সুন্দরী মনোহারিকা তার চেয়ে বেশী।"

আমি বললাম, "থাকগে, একটা ঝি-কে আপনি-আজ্ঞা বলা কথা বলছি তাই কি তাকে নিয়ে এত আলোচনা করা চলে? আসল কথাটা বুঝলে কিছু?"

"বুঝলাম। রাণী সাহেবার আয়ের উৎস সন্ধানে আমরা হয়রাণ হচ্ছি

ঘুরছি। কিন্তু যে ভাবেই হোক না টাকা আছে ওঁর।"

বিজনের কথায় আমি বল্লাম, "সে তো জানাই যাচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি সম্পূর্ণ অন্য কথা।

খাসদাসী মণিবের মন্ত্র দীক্ষিত। বিহারের নাম ওঠা মাত্র কেমন হয়ে গেল দেখলে? একটা অজুহাত নিয়ে চলে গেল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে নিশ্চয় ঘটনা সত্যিই আছে কিছু। রাণী সাহেবার খাসদাসীর সেটা জানা সম্ভব।"

এতক্ষণে বিজন একটি বুদ্ধির কথা তুলল, "উত্তমদা, এ সমস্ত কথা এখানে না হওয়াই ভালো। দেওয়ালেরও কান আছে।"

"ঠিক আছে। গোয়েন্দা পুলিশের যোগ্য কথা।" অতঃপর নিস্তব্ধতা ও ঘড়ি দেখা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ইম্‌লি (খাসদাসীর নাম পরে জানলাম) চায়ের আয়োজন সহ উপস্থিত।

দুটি কিশোরী চায়েব খুঞ্চি বয়ে আনছে। একটিতে রূপোর দুধ চিনি চা দানি ও পেয়ালা। অন্যটিতে শুকনো মেওয়া ও বরফি সন্দেশ।

আমরা চা ভিন্ন কিছু নিলাম না।

চা-পর্ব মিটলে মেয়ে দুইটি বিদায় হল। আমি ইম্‌লিকে বললাম, "আমরা তো রাণী সাহেবার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে এসেছি। আমাদের কাজ আছে। আর বসা চলবে না। একটু ওকে বলুন গিয়ে।"

ইমলি বলল, "রাণী সাহেবা বাদামের সরবৎ খাচ্ছেন। এক্ষুনি এসে পড়বেন।"

আমি তাগিদ দিলাম, "একবার বলে আসুন যে আমাদের তাড়াতাড়ি আছে।"

ইম্‌লি চলে গেল।

বিজন বলে উঠল, ঝি-দুটি একেবারে ছোট, বালিকা বল্লেই হয়। এত অল্প বয়সের দাসী রাখে কেউ? সকলেই তাই। তবে কি রাণী সাহেবার ঐশ্বর্যের মূল উৎস এরাই? এদের দিয়ে ঘৃণ্য একটা ব্যবসা চালান উনি?

বিজন বলে উঠল, "ঝি-দুটি একেবারে ছোট, বালিকা বল্লেই হয়। এত অল্প বয়সের দাসী রাখে কেউ? সকলেই তাই। তবে কি রাণী সাহেবার ঐশ্বর্যের মূল উৎস এরাই? এদের দিয়ে ঘৃণ্য একটা ব্যবসা চালান উনি?"

"না, হে না, রাণী সাহেবার সুদীর্ঘ জীবন যে প্রেম সঙ্কুল। প্রেমে পড়া

ভিন্ন উনি থাকতে পারতেন না। বিহারের বাঙালী জমিদারটির সঙ্গে ওঁর প্রেম ছিল বলেই তো আমরা এখানে এসেছি। এদের পাশে পাশে রাখার অন্য কারণ আছে।"

"কি সেটা?"

"বলেছিলে না দেওয়ালেরও কান আছে। এখানে আলোচনা করা উচিত নয়।"

বিজন ব্যাকুল হয়ে বলল, "না না নিরিবিলি বাড়িটা। দারোয়ান ছাড়া বাইরে কেউ নেই এখন। অন্দর তো বহুদূর। চট করে বলে ফেলুন।"

আমি উত্তর দিলাম, "শাস্ত্রে আছে না, "বালা স্ত্রী, ক্ষীরভোজনম। অল্প বয়স্কা স্ত্রী ও ক্ষীরভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। প্রকারান্তরে, বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনের সমতুল্য। রাণী সাহেবার বয়স হচ্ছে। তরুণী ও কিশোরীর সেবা ও সাহচর্য তাঁর যৌবনকে ধরে রাখবে।"

বিজন অবাক হয়, "বাবাঃ, আপনি এতও জানেন।"

"এই যে—"

আমরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালাম।

ইমৃলি দু'হাতে,পরদা তুলে ধরেছে, ছবির মত লাল ভারী পরদা ঠেলে লাল গালিচার গোলাপে পা রেখে তিনি এসেছেন।

রাণী সাহেবা!

উজ্জ্বল গৌরবর্ণে মুক্তার দীপ্তি, কালো চুলের একপাশে বাঁ দিকে হীরের ঝাপটা দুলছে। হাতে হীরা-পান্নার বৃহৎ পাথরের আংটি। গলায় একছড়া মুক্তার মালা। কানে হীরাপান্নার কানফুল।

হাল্কা ঘিয়ে রঙের রেশমের শাড়ী ফিরোজা রেশমের ফুলতোলা।

বাঙালী প্রথায় শাড়ীপরা।

"বসুন।" গলার স্বরটিও মধুর সাহেবার।

অপরূপ সুন্দরী নিজে বসলেন। কিন্তু গোলাপের রং ফিকে হয়ে গেছে। রাণী সাহেবার রূপ ও তাঁর বয়সকে ঢেকে রাখতে পারছে না।

আসল গল্পটি এখানে বলে দেওয়া উচিত। বিহারের কোন স্বাস্থ্যকর শহরে একজন বাঙালী ধনীব্যক্তি বাস করিতেন। কলিয়ারি, ব্যবসা, জমিদারি কি না ছিল।

ভদ্রলোক লেখাপড়া করেছিলেন। রুচিসম্পন্ন বলে খ্যাতি ছিল। একদা সিনেমা প্রযোজক হ'বার মোহে নিজের প্রাসাদোপম বাড়ী ছেড়ে, রূপসী

স্ত্রীকে ছেড়ে কলিকাতায় এলেন নামকরা হোটেলের দীর্ঘদিন বাসিন্দা হয়ে। বলা বাহুল্য মধুমক্ষিকার মত গল্প লেখক, পরিচালক, নায়ক নায়িকা ধরল তাঁকে ঘিরে। কিন্তু একটা পার্টিতে আলাপ হয়ে তিনি খপ্পরে পড়ে গেলেন রাণী সাহেবার।

অতঃপর রাণী সাহেবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হ'ল রাজাবাবুর। রাণী সাহেবার অট্টালিকায় তিনি বাসও করলেন দু' একদিন। নিজের বাসস্থানে নিমন্ত্রণ দিলেন রাণী সাহেবাকে। চলল এইভাবে দু'চার বছর।

তারপর একদিন রাজাবাবু তাঁর নিভৃত মনে ভ্রমণ করেছিলেন গভীর রাত্রে। মসৃণ আয়নার মত ছোট একটি কৃত্রিম হ্রদ ছিল ঘাসের বুকে। সেটির পাড় উঁচু করে বাঁধানো ছিল না, প্রায় মিশে থাকত ঘাসের সমতলে। রাজাবাবুকে বহুবার বলা হয়েছিল এমন জলাশয়টি রাখা বিপদজনক। কিন্তু চিরদিনের তিনি বেপরোয়া লোক, গ্রাহ্য করেননি। দেখতে ভাল লাগে, পদ্মগুলো দূর থেকে মনে হয় ঘাসে ফুটে আছে। তাতেই কাল হল।

রাজাবাবুর অতি বৃদ্ধ বাবা বিপত্নীক। রাজাবাবুর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আছেন। তাঁরা ঠাকুর দাদার সঙ্গে বাস করেন। কারণ রাজাবাবুর বেশীর ভাগ সময় কাটে অন্যত্র। তাঁর নিজস্ব মহলের সঙ্গে লাগাও অতিথিশালা। তিনি একটা সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে বাস করেন। অতি ব্যয়, ধনবত্তার জন্য আসল নামটি লুপ্ত হয়ে 'রাজাবাবু' নামটিই চলতি সর্বত্র।

তারপর সেই রাত্রে তিনি ওই ছোট হ্রদের জলে পড়ে যান। পরদিন মৃত দেহ উদ্ধার করা হয়। সারারাত কেউ জানেনি। একা একা ঘুরে বেড়ানো, যেখানে সেখানে চলে যাওয়া হঠাৎ, রাজাবাবুর চিরদিনের অভ্যাস। অতএব তাঁর মহলের দাসদাসী তিনি ফিরে আসছেন না দেখে সন্দিগ্ধ হয়নি বলা বাহুল্য। তবে আটচল্লিশ বৎসর বয়স্ক রাজাবাবুর দেহ ভস্মসাৎ হয়ে যাবার পরে নানা গুজব স্বাভাবিকভাবেই আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল।

রাজাবাবু অসতর্ক অবস্থায় পা পিছলে জলে ডুবেছেন। অন্যমনস্ক ছিলেন তিনি। ভরা ভাদরের গুমটে ঘুম আসছিল না, তাই রাত্রে একটু হাওয়া খেতে বাইরে এসেছিলেন।

কিম্বা রাজাবাবু মদ খেয়ে মদের ঝোঁকে চোখে—কানে না দেখায় হ্রদের জল দেখতে পান নি। অতরাত্রে অধিক মাত্রায় পানের ফলে গরমে বাইরে খেয়ালী লোকের চলে আসা বিচিত্র নয়।

কিম্বা, রাজাবাবুকে কেউ হত্যা করেছে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে

জলে। বেকায়দায় পড়ে গিয়ে আর তিনি উঠতে পারেন নি। কিম্বা আত্ম-হত্যা।

কিম্বা, তাঁকে অন্যভাবে হত্যা করে বা অন্যত্র হত্যাকরে দেহ এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

এখন কি কারণে তাঁর মৃত্যু কে বলবে? একমাত্র পুত্রের দেহ স্নেহান্ধ পিতা পোষ্টমর্টেম করতে দেননি। খর রৌদ্রের দিনে পচন ধরবার ভয়ে আগেই দাহকার্য রাজকীয় মর্যাদায় শেষ করেছেন। তাঁরা 'রাজা' খেতাবধারী না হলেও বড় জমিদার। সে বংশের সন্তানকে কাটা ছেঁড়া চলবে না মৃত্যুর পরে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ডাক পড়ল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যে পৈতৃক অর্থ বহুগুণ বর্ধিত করলেও ইদানিং তাঁর ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছিল। মেমসাহেবও ইয়ারের দল তাকে আকাশ স্পর্শী অর্থ অর্জনের লোভ দেখিয়ে সিনেমা-লাইনে নামাবার চেষ্টা করেছে। নানাবিধ দোষও জন্মেছিল। কয়েক পুরুষে বিহারে বাসের ফলে বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বেহারী ভাবাপন্ন হয়ে গেছেন। কটাশে চুল, ঝুলো গোঁফ সিংহটাইপের মুখ খানা।

"আপনি দেহ দাহ করেছেন বিনা দ্বিধায়, এখন আমাদের এ ব্যাপারে তদন্ত করতে বলছেন, এ কি রকম?"

আমি অবাক হয়ে বললাম।

চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল তাঁর—"আমি বিনা দ্বিধায় সংকার করিনি কিন্তু আমার একমাত্র ছেলেকে। —এ বংশে এমনটি ঘটেনি। তবে আমার মাথায় এতটা সন্দেহ ছিল না তখন, একথাও ঠিক। আমার বিধবা পুত্রবধূই আমাকে অহোরাত্র বুঝিয়ে চলেছে যে খোকাকে কেউ খুন করেছে।"

"কাকে সন্দেহ করেন?"

"কি করে বলি? গেষ্ট হাউসে কতলোক আসত যেত, আমি খবর পেতাম না। তবে ওই রাত্রে রাণী সাহেবা অতিথি ছিলেন। কয়েক বছর যাবৎ ওই মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল খুবই। আমার সঙ্গে আপনারা খোকার মহলে একটু আসুন, একটা জিনিষ দেখাই।"

টকটকে লাল গালিচায় ঢাকা সে ঘরটিরও মেজে, রাজাবাবুর বসবার ঘর। বিরাট চেষ্টার ফিল্ড, ডিভান ইতস্তত সাজানো, নরমগদীদার কেদারা, মেহগিনি পালিশ ত্রিপদী। পিয়ানোর ওপরে জমকালো ফুলদানী।

"এই দেখুন"—

দেখলাম আমরা দুজন, বিজন মণ্ডল ও আমি উত্তম ব্যানার্জি। লাল গোলাপের সবুজ পাতার ওপর দিয়ে একটা গভীর লালের ছোপ। রক্ত বলেই মনে হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে গেলেন, "আমার পুত্রবধূ এটা আমাকে দেখায় দু'দিন পরে। সে এসেছিল স্বামীর স্মৃতি জড়ানো মহলটা দেখতে। ওর মনে হয়েছে, কেউ এখানে খুন করে নির্জন রাত্রে হ্রদে ফেলে দিয়েছে। লেকটা বেশী দূরেও নয়।

"কিন্তু কেন?" টাকা কড়ি এখানে তো নেই কিছু। ঘরের মধ্যেও লুট পাট হয়নি।"

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বললেন, হয়তো লোভের খুন নয়, আক্রোশের খুন। অথবা কেউ কিছু লিখিয়ে নিয়ে গেছে। এখনও আমরা জানিনা।"

"ও:! আপনি ভাবছেন মোটা দাগের কিছু। আপনার ছেলে বেঁচে থাকলে হয়তো মন পাল্টে যেতে পারত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা তো সমস্ত বোঝেন। আমার পুত্রবধূ আর আমার অনুনয়, দোষীকে খুঁজে দিন আপনারা।"

আমি বললাম, "গালিচাটার রাসায়নিক পরীক্ষা করা দরকার। আঙুলের ছাপ ইত্যাদি কিছু নেই বোধ হয়?

"না, আপনার পুত্রবধূ রোজ ঘর নিজের হাতে ঝেড়ে সাজিয়ে রাখে। স্বামী বেঁচে থাকতে কিছুই করতে পারত না কিনা।"

অন্তরীক্ষে অবস্থিতা কোন সুন্দরী তরুণী বধূর বঞ্চিত প্রেমের প্রতি মাথা নীচু হয়ে গেল।

"চলুন, এবারে লেক্‌টা দেখি।"

তারপর অনেক কাঠ খড় পোড়ালাম। অনেক ঘুরলাম। অবশেষে রাণী সাহেবার বসবার ঘরে যবনিকা উঠল।

পাথরের মত মুখ করে রাণী সাহেবা কথার উত্তর দিচ্ছেন।

"হ্যাঁ, আমি ছিলাম, ইমৃলি ছিল, আমার চাকর ছিল। দিন চারেক আগে নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম।· ····হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যেতাম। ······হ্যাঁ, রাজাবাবুও এখানে অতিথি হ'তেন।

'······না, আমি পরের দিন সৎকারের পরেই চলে এলাম।'

"শ্রাদ্ধ পর্যন্ত রইলেন না কেন?"

"বন্ধুর শ্রাদ্ধে থাকা যায়? আপনাদের সব কথার উত্তর দিয়েছি। এখন আমার দুধ খাবার সময়। আমাকে উঠতে হ'বে।......হ্যাঁ চাকর ও ইমলিকে আপনারা ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।"

হীরামুক্তার, জরীর ঝলক তুলে রাণী সাহেবা অদৃশ্য হ'লেন অন্দরে।

চাকরকে জেরা করা হ'ল। নিরীহ মানুষ রাত্রে বাইরে সার্ভেন্টস্ কোয়াটারে থাকত। সেদিন ও ছিল। তার দ্বারা হত্যা করানো সম্ভব নয়।

এবারে ইমলির পালা।

"বসুন, একটু সময় লাগবে।" আমরা নির্দেশ দিলাম। বিজন ততক্ষণে সামলে নিয়েছে।

"এঘরে বসবার আমার হুকুম নেই। দাঁড়িয়েই থাকব। বলুন কি জানতে চান? এক্ষুনি রাণীসাহেবার চুল বাঁধবার জন্যে যেতে হবে। এক মিনিট দেরী হ'লে উনি সহ্য করেন না।"

"উনি কি খুব কড়া লোক? খুবই শক্ত?'

"তেমন নয় তবে সময় মাফিক কাজ না হ'লে চটে যান দারুণ। হ্যাঁ... উনি লোককে বিশ্বাস করেন খুব"।

"আচ্ছা, তুমি—মানে আপনি কতদিন হ'ল আছেন?

এবার বিজয় জিজ্ঞাসা করে।

"পাঁচ বছর। .....হ্যাঁ, এর আগের দাসী বুড়ো হয়ে গেছিল, তার ছুটি হয়ে গেল। তারপরে আমি। ..... হ্যাঁ, সকলেই অল্পবয়সী। রাণী সাহেবা বলেন অল্পবয়সের মেয়েদের মধ্যে থাকলে উনি নিজের বয়স হয়ে যাচ্ছে ভুলে থাকতে পারেন।"

ঠিকই ধরেছিলাম, দেখা যাচ্ছে।

"রাজাবাবুর সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব কতদিনের?"

চোখে মুখে ঝিলিক খেলে ইমলির, "প্রায় চার বছর।"

"খুবই বন্ধু ছিলেন উনি, না?"

"হুঁ।"

"এ রকম বন্ধু আরো ছিল আগে?"

'শুনেছি ছিল অনেক। দু'এক জনকে দেখেছি মাত্র।"

আমি চরম গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বললাম, "রাজাবাবুকে খুনের রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

ইমলি চমকে উঠল, "খুন ? না তো !"

"রাণী সাহেবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল রাত্রে ?"

"না, না। রাজাবাবু বলে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর মাথাটা ধরেছে। তিনি একা ঘরে শুয়ে থাকবেন। তাই রাণীসাহেবা রাজাবাবুর এক বন্ধুর সঙ্গে বাজী ধরে তাস খেলতে তাঁর ক্লাবে গিয়েছিলেন।"

ইমলির কর্ণভূষণ দ্রুত দুলছে। সে মণিবের জন্য বিচলিত বুঝলাম।

এবার সোজাসুজি প্রশ্ন পাঠাই, "রাজাবাবুর কার্পেটে রক্তের দাগ কেমন করে এল ? রাণী সাহেবা ওঁকে বিষ দিয়েছিলেন, না সাইলেন্সার লাগিয়ে পিস্তল চালিয়েছিলেন সত্যি বল তো ?"

ইমলি চীৎকার করে ওঠে, "এ কি বলছেন আপনারা ? রাণীসাহেবাকে অপমান করছেন ? তিনি ভালো লোক।"

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, "ইমলি চেঁচামেচি করো না। আমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরতে পারি। তুমি সহজভাবে উত্তর দাও। তুমি তোমার মনিবকে খুবই ভালবাস, না ?"

"হ্যাঁ।" ইমলি সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ লাল হয়ে গেলেও সে বাইরে স্থির।"

"আর তিনি ভালবাসতেন রাজাবাবুকে ?"

"হ্যাঁ।"

"আর রাজাবাবু রাণীসাহেবাকে ভালবাসতেন "

"জানি না।"

"ইমলি, রাজাবাবু আত্মহত্যা করলেন কেন ?"

ইমলি আবার পূর্বের মত অবাক হয়ে হঠাৎ বলে ফেলে, "না তো। আত্মহত্যা করবেন কেন ? তিনি সুখী মানুষ।"

"কার্পেটে রক্ত কেন ?"

"রক্ত, না মদ পড়েছিল।"

"তুমি জানলে কি করে ?"

ইমলির ঝোঁকের মাথায় প্রশ্ন করলাম তৎক্ষণাৎ।

"বারে আমি ঢেলে দিলাম, রাজাবাবুর হাত কাঁপছিল, তাই পড়ে গেল।"

রাণীসাহেবা তখন ক্লাবে তাস খেলছেন, না ?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই যে রাণী সাহেবার ঘণ্টা বাজছে। এক্ষুনি আমাকে যেতে হবে ওঁর চুল আঁচড়াতে। আপনি আর কি জিজ্ঞাসা করবেন চট করে বলুন।

ঘণ্টার শব্দ থামলেই ছুটব।"

"রাণী সাহেবার রাজাবাবুর সঙ্গে প্রেম ছিল? ওঁদের মন কষাকষির ফলে এমনটা—"

"না, না। রাণীসাহেবার সঙ্গে প্রেম ছিল না। আলাপের দু'এক মাস পরেই রাজাবাবুর মন ঘুরে গিয়েছিল। রাণীসাহেবা বিশ্বাস করতেন আছে তবু। তাই ওখানে যেতেন এবার যাই?

ইমলি ছুটে চলে যায় আর কি লাল বিংখাব ঠেলে। আমি তার পথরোধ করলাম, বিজনও উঠে দাঁড়াল।

"মনিবকে ঢাকবার চেষ্টা কোর না, ইমলি। প্রেম ছিল না তুমি দাসী হয়ে জানলে কি করে?"

ইমলির চোখে আগুন, "দাসী হয়ে জানলাম কি করে?" একটা চটুল ভাবে দুচোখে অর্থ ঘন কুটিল ভঙ্গি এনে ইমলি বলে দিল, "কারণ, আমার সঙ্গেই রাজাবাবুর প্রেম ছিল।"

পরমুহূর্তে সে অন্তর্ধান করল।

"কী ভয়ানক মেয়ে, উত্তমদা!" বিজন আবার রুমালে ঘর্ম মোচন করে, "আপনি কি বুঝলেন?"

"বুঝলাম? গালিচার দাগ মদের দাগ, রক্তের নয়, এতো আমরা আগেই জেনেছিলাম রাসায়নিক পরীক্ষার পর। আত্মহত্যাও নয়। খুন নয়। সাধ্বী স্ত্রী বৃথা ব্যাকুল হয়েছেন। রাজাবাবু শুধু মাশুল দিয়েছেন।"

"কিসের মাশুল?"

"চরিত্রহীনতার ও অতিরিক্ত পানদোষের। গভীর রাত্রে ইমলি চলে গেলে তিনি উত্তেজিত দেহমন ঠাণ্ডা করতে বাইরে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদের ঝোঁকে চোখ দেখতে পাননি। চল, এবার যাওয়া যাক। বাইরে দারোয়ান অপেক্ষা করছে, গলাধাক্কা দেবে কিনা ভাবছে হয়তো।"

গাড়ীতে বসে সিগারেট ধরালাম।

"বিজন, আর ও একজনও কিন্তু মাশুল দিয়েছেন।

রাণীসাহেবা।"

বিজন সচকিত, "তিনি আবার কি দিলেন মাশুল?"

"নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাসের মাশুল। বিগত যৌবনার প্রেম খেলার মাশুল। এ ছাড়া তরুণীর সাহচর্যে নবীনতা বজায় রাখবার চেষ্টার মাশুল। ইমলি দাসী, কিন্তু পূর্ণযৌবনা। সমবয়স্কা নারীর প্রেম কতদিন রাজাবাবুর মত

পুরুষের ভাল লাগে, বল ? ইমলিকে রাণীসাহেবা চোখের সামনে ধরলেন কেন প্রেমিকের ?

আমি আস্তে আস্তে বলে চুপ করলাম ।

বাণী রায় ॥ জন্ম ১৯২১ সালে। আজ হতে কয়েক দশক পূর্বে লেখিকা এক অভিনব শিল্পকৌশলে বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে যে সাহাসিকতার পরিচয় দেন তা তাঁকে আজও বিদ্বৎ সমাজে স্মরণীয় করে রেখেছে। চারের দশকে ছাত্রীজীবনে পুনরাবৃত্তি লিখে যাঁর সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ ঘটে পরবর্তী কালে "জুপিটার" এবং 'প্রেম' নিঃসঙ্গ-বিহঙ্গ চোখে আমার তৃষ্ণা, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি প্রভৃতি কথা গ্রন্থের ভিতর দিয়ে তাঁর অগ্রগমন নিশ্চয় সাহিত্যের দরবারে এক উল্লেখ্য সংযোজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন সংস্থার সাথে যুক্ত থেকে বহু সৃজন মূলক কাজ করেছেন। মৌলিক রচনার সাথে সাথে সুঅনুবাদেও তাঁর সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ। মাশুল এই গোয়েন্দা গল্পেও তাঁর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র সুস্পষ্ট। নরসিংহ দাস পুরস্কার, লীলা পুরস্কার প্রভৃতি নানা পুরস্কারে তিনি ভূষিতা হয়েছেন।

স্বখাত সলিলে

বীরু চট্টোপাধ্যায়

একটি চাঞ্চল্যকর মামলায় উপস্থাপিত কিছু এক্সিবিট এখানে তুলে ধরা হল ঃ নতুন টেক্‌নিকে লেখা।

(১নং এক্সিবিট)

শ্রীচন্দন রায়—

সবিনয় নিবেদন,

আমার স্বামীর হয়ে এ পত্র লিখছি আপনাকে। কাল অফিস যাবার সময় দমদমের বাগানবাড়ি বিক্রির কাগজপত্র নিয়ে একবার আমাদের বাড়ি আসতে বলেছেন তিনি। ওঁর হাতটা এখনো গাড়ি চালাবার মত হয়নি। ডাক্তাররা অবশ্য বলেছেন শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবে। তবে আরও কিছু-দিন পরিপূর্ণ রেস্ট প্রয়োজন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়—

মিসেস গুপ্ত।

(২নং এক্সিবিট)

শ্রীচন্দন রায়—

সবিনয় নিবেদন,

আমার স্বামী কাল সকালে আপনাকে আরেকবার আসতে বলেছেন। কাল বিকেলের নীলেমের ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিতে চান তিনি। অবশ্য বিকেলে নীলেম পরিচালনা করতে তিনি নিজেই যাবেন (একথা আপনাকে তিনি সেদিনই জানিয়েছেন) তবে সকালে ওর বাইরে বের হওয়ার কিছু অসুবিধা আছে বলেই আপনাকে আসতে বলা। নমস্কারান্তে-

ভবদীয়—

মিসেস গুপ্ত

(৩নং এক্সিবিট)

চন্দন রায়—

সবিনয় নিবেদন,

এটা স্বামীর হয়ে ব্যবসায়িক পত্র নয়। এটা আমার ব্যক্তিগত পত্র।

গতকাল আমাদের বাড়িতে যে লজ্জাকর কাণ্ডটা হল তার জন্য ওর হয়ে আমি মার্জনা চাইছি। আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উনি রেগে গেলেন, তাতে আপনার নাক গলানো ঠিক হয়নি। আপনি ওর অধীনে ৪/৫ বছর চাকরি করছেন, জানেন তো ও হুট করে কি রকম রেগে যায়। আমার ভয় হল আপনার চাকরি না চলে যায়। যা দিনকাল, তাতে চাকরি গেলে চাকরি জুওয়া কত কঠিন জানেন তো। হাত ভেঙে বাড়ি বসে থেকে ওর মেজাজ আরও খিটখিটে হয়ে গেছে। আবার অফিস বের হলেই মন চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আমার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওর ব্যবহারে চিরকালই অভ্যস্ত। অবশ্য আমি কিন্তু আপনার ব্যাপারে চিন্তিত হতে পারি অনায়াসে। কেননা, আপনার চেয়ে আমি বয়সে বড়। আমায় কথা দিন, আর কখনো এই ধরণের অপরিণামদর্শীর মত কাজ করবেন না, কেমন ?

আপনাদের বিশ্বস্ত
শ্রীললিতা গুপ্ত

(৪নং এক্সিবিট

চন্দনবাবু,

আপনার সুন্দর পত্রখানি পেয়ে কি যে আনন্দ হল তা কি বলব। তবে ভয়ও হল। না, আপনার পক্ষে ফের আর এ ধরনের চিঠি আমায় লেখা উচিত হবে না। আরেকটুকু হলেই আমার স্বামী মানে আপনার 'বস' মিঃ গুপ্তেরই হাতে পড়ে গিয়েছিল চিঠিটা। প্রশ্ন করলেও বলিনি কার চিঠি, এড়িয়ে গেছি। অবশ্য চিঠিটায় এমন কোনকিছু আপত্তিকর কথা ছিল না যে ওকে তা দেখানো যেত না। তবু আমি দেখাইনি। এ নিয়ে একটু বাদ-বিতণ্ডাও যে না হয়েছে এমন নয়। রাগারাগিই তাকে বলবো। ও রাগ হলেই একটা পাগলের মত কাজ করে, আমাদের নয়নমনি পিনটু সোনাকে ইচ্ছে করে কাঁদিয়ে ছাড়ে। যাক সে কথা। অফিসেও আপনার সঙ্গে রাগারাগি করে না তো ? করলেও কিছু মনে রাখবেন না, ওর স্বভাবই ওরকম। মন দিয়ে কাজ করবেন তাহলেই ও আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। অবশ্য শুনলে আপনি খুশি হবেন, আমার কাছে ও একদিন কথাচ্ছলে আপনার প্রশংসা করছিল। আপনি কর্মঠ, চালাক চতুর, আপনার নাকি প্রস্পেক্ট ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর মত লোকের মুখ থেকে অধীনস্থ কোন কর্মচারী সম্বন্ধে এ ধরণের কথা বের হওয়া খুবই

আশ্চর্যের নয় কি? যাই হোক, আমি আশা করব, আপনি শিগগিরই সব কাজ শিখে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে নিজেই এ ধরনের ছোট্ট একটি অফিসের মালিক হতে পারবেন।

হ্যাঁ, একটি কথা বলি। আপনাকে চিঠি লিখতে বারণ করতে আমিও কম মনোকষ্ট পাচ্ছি না জানবেন। তবে পরিস্থিতিটা অনুধাবন করবেন আশা করি। আপনার চিঠিটাকে আমি ভয়ে ভয়েই পুড়িয়ে ফেললাম, পাছে অপর কেউ দেখে ফেলে। আজ এখানেই শেষ করি। কিছু মনে করলেন না-তো? ইতি—

আপনার
শ্রীললিতা গুপ্ত

(৫নং এক্সিবিট)

প্রিয় চন্দন,

তুমি চলে যাবার পরেই কাগজ কলম নিয়ে বসেছি লিখতে। ভীষণ ভয় ভয় করছিল। তোমার এখানে আসার কথা যদি মিষ্টার গুপ্ত টের পেয়ে যায় তাহলে কি সর্বনাশ হবে বলতো? তুমি কিন্তু লক্ষ্মীটি আর কক্ষনো—কক্ষনো এখানে এভাবে এসো না। যদি ও টের পায় তাহলে তোমার পক্ষে কী ভয়ঙ্কর হবে বোঝ তো? আজকের ঘটনাটা ভাবতে খুব ভাল লাগছে কিন্তু। আমি পিনটু সোনাকে সবে ঘুম পাড়াচ্ছি, দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভাবলাম, আবার কোন হতচ্ছারা ফেরিওয়ালা বুঝি এল। কিন্তু দরজা খুলে কী আনন্দ, এ যে তুমি। আনন্দও যেমন হল ভয়ও হল তেমনি। বাইরের কাজে অফিস থেকে বেড়িয়ে, লুকিয়ে চলে এসেছ আমার এখানে। কি দুষ্টু বুদ্ধি তোমার। না-না এ ভাল নয়। এভাবে আর এসো না কিন্তু। তুমি আমার জন্যে এত ভাবো? বাব্বা। যাক, আমার জন্যে এত ভাবতে হবে না। আজ পাঁচ বছর হল তোমাদের বস্ মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি মানিয়ে নিয়েছি সব। জানো তো মেয়েদের সহ্য করতে হয়, সব মানিয়ে নিতে হয়, নয়ত অশান্তি বাড়ে। তুমি আমার হয়ে কিছু বলতে গিয়ে চাকরিটি খুইও না বুঝলে? আমি রেগে থাকলে ও আবার নিজের কাজ গুছোতে রাগ ভাঙিয়ে নেয়। নয়ত পিনটু সোনাকে অযথা কাঁদিয়ে ওর কথা শুনতে আমায় বাধ্য করে। যাকগে বাজে কথা। এখন থেকে আমার আরেক চিন্তা। সবসময় আশঙ্কা

হবে কখনো না জানি তোমার বদরাগী বস তোমার উপর খড়্গ হস্ত হন। সাবধানে থেকো বাপু। আজ আসি, কেমন? ইতি—

তোমারই
ললিতা

(৬নং এক্সিবিট)

প্রিয়তম চন্দন,

এর আগেও বলেছি, এবারও বলছি লক্ষ্মীটি, আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে এভাবে। মিঃ গুপ্ত যদি টের পায় তো সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। তাছাড়া আরেকটা দিকও আছে, সেটা নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে। এভাবে গোপনে ঘনিষ্ঠতার ফলে যদি কিছু ঘটে যায়—(যাও, সবকিছু খুলে বলতে আমি পারব না) তাহলে কেলেঙ্কারীর আর কিছু বাকি থাকবে না। আমি তোমার চেয়ে দু'বছরের বড়। সুতরাং লক্ষ্মীটি এ মেলামেশা ভাল নয়। তুমি আমায় ভুলে যাও। তুমি সুপুরুষ, তাজা তরুণ, তোমার উপ-যুক্ত একটি মেয়ে খুঁজে নিয়ে বিয়ে করে সুখী হও। আমায় ভুলে যাও এই কামনা। আমি তোমার একটি ফটো রেখে দিয়েছি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।

হ্যাঁ একটা কথা বলছি, তোমাদের বস মিঃ গুপ্ত কাল সকালে মেদিনী-পুর যাচ্ছেন কি একটা সম্পত্তী দেখবার ব্যাপারে, সন্ধ্যেয় ফিরবেন। তুমি যদি দুপুরবেলা সময় করে একবার আসো, আমরা পরস্পরের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিতে পারি। আর দুপুরে এখানেই কিন্তু খাবে। তোমাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবার আমার এই শেষ সুযোগ তুমি নষ্ট করে দিও না। তোমার মেস-এর হিন্দুস্থানী ঠাকুরের চেয়ে আমি ভালই রাঁধি মাথা খাও, এসো কিন্তু।

তোমার আশায় বসে রইল,
তোমার ললিতা।

(৭নং এক্সিবিট)

চন্দন প্রিয়তম,

প্রথমেই আমার ভালবাসা নাও। তোমাদের 'বস' মিষ্টার গুপ্ত মেদিনী-পুর থেকে ফিরে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ওখানে যার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাদের বাড়ির প্রাচীন একটি ইস্পাতের বর্শা। ওটি নাকি নবাবী আমলের স্মৃতিচিহ্ন। সেটাকে ডাইনিং রুমের দেয়ালে সযত্নে সাজিয়ে

রেখেছেন। ও এখন বাইরে গেছে, সেই ফাঁকে পত্র লিখছি। বহুবার বলেছি, আবার বলি তুমি আমায় কি প্রবল আকর্ষণে না বেঁধেছ। স্বপ্নে, জাগরণে কেবল তোমারই চিন্তা। উঃ, এত ভালবাসাও আমার মনে জমা ছিল তোমার জন্যে! আজ কিন্তু আমরা দুজন বড্ডো বেশী পাগলামি করে ফেলেছি, এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আর কিন্তু এ রকম করা উচিত হবে না দু' ঘণ্টা যেন নিমেষে কেটে গেল। তোমায় ফের ঐ পোড়া অফিসে কাজে যেতে হবে। প্রিয়তম চন্দন, তুমি আমার অসংখ্য ভালবাসা নিও। —ইতি—সবসময়ে তোমার জলি।

(৮নং এক্সিবিট)

প্রিয়তম,

এ চিঠি পড়েই ছিঁড়ে ফেলো। সামনে এলে সব ভুলে যাই, অন্য কথায়, অন্য ব্যাপারে মত্ত থাকি। তাই এ চিঠি লিখছি। তোমায় মুখেও বলেছি, চিঠিতে, জানাচ্ছি আমি আমার স্বামীকে মানে তোমাদের 'বস' মিস্টার গুপ্তকে ত্যাগ করে যেতে পারব না। তুমি আমায় ভালবাস তাই তুমি চেয়েছ ওকে ছেড়ে যাই। পরিণাম ভেবেছ কি? আমি ওকে ছাড়লে, ও তোমায় চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন এ বাজারে তুমি কোথায় চাকরী পাবে জানি না ভাবছি বা ব্যবসা করবে। ভীষণ আর্থিক অনটনে পড়ে যাবে। আমরা উপোষ করে মরব, আর আমাদের ভালবাসাও মরে যাবে দারিদ্র্যে। আমি ভিক্ষে করে কি ঝিগিরি করে তোমাকে খাওয়াতে রাজি কিন্তু তুমি বেকার হয়ে যাবে এ চিন্তা আমার অসহ্য! ওকে তো জানো, আমি গেলে পিনটুসোনাকে ও ছাড়বে না—রেখে দেবে জোর করে। আমি দু' বছরের দুধের বাচ্চা পিনটুসোনাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। পিনটুসোনাও আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না। কাজে কাজেই স্বামীকেও আমায় ছাড়া হবে না আর ওই যে বর্শাটা এনেছে, ওটা দিয়ে পিনটুসোনা না কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে। এসব কথা ভাবলে আমার মাথা ঘুরে যায়। জানো, প্রেমিক-প্রেমিকার পক্ষে এ দুনিয়া বড়ই নিষ্ঠুর। এখন আমাদের এভাবেই থাকতে হবে। আর আশায় থাকবো যে একটা কিছু ঘটবেই। তুমি এ নিয়ে বেশী ভেব না। আমি আমার তাজা তরুণ প্রেমিককে সুখী দেখতে চাই; সুখী করাতে চাই।

শোন আরেকটা কথা। আমার লেখা এই সমস্ত চিঠি কিন্তু অতি

অবশ্য পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে। এসব কিন্তু খুব বিপজ্জনক বস্তু। দুর্ভাগ্য, তোমার মেস-এ টেলিফোন নেই, নয়ত ফোনেই কথা বলা যেত। লেখার দরকার ছিল না। রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে তোমার কথা মনে হয়, রাতে কত কি যে স্বপ্ন দেখি তোমায় নিয়ে তা আর কি বলবো। উঃ, তুমি আমায় পাগল করেছ প্রিয়তম। শোন আমার লেখা চিঠিগুলি নষ্ট করে ফেলতে ভুলো না যেন। তোমার লেখা এক মাত্র পত্রটা আমি পুরিয়ে ফেলেছি।

জানি না কবে আবার আমাদের দেখা হবে। মিস্টার গুপ্ত জানি না কিছু সন্দেহ করেছে কিনা। ইদানিং সাংঘাতিক খারাপ ব্যবহার শুরু করেছে, আমার সঙ্গে। আমি তোমার চিন্তায় মশগুল থাকি। কেন আমি এতটা উৎফুল্লিত এই প্রশ্নে আমার প্রতি আমার স্বামী প্রায় যাচ্ছেতাই ব্যবহার আরম্ভ করেছে; পিনটু-সোনাকে মারধোর করে কাঁদাচ্ছে। প্রায়ই বেশী বেশী মদ খেয়ে মত্ত হয়ে আসছে। তুমি যে মদ খাও না এ জন্যে আমি খুব খুশী। এখানেই শেষ করি।

একান্ত তোমারই
ললি

আমার চন্দনরে

(৯নং এক্সিবিট)

কালকের ঘটনা রোমন্থন করতেও রোমাঞ্চ লাগে। কাল আবার মেদিনীপুর গেল মিস্টার গুপ্ত। পিনটুসোনাকে আমার মা এসে নিয়ে গেছে। কি অপূর্ব সুযোগ। তুমি এলে। আঃ, তারপরের ঘটনা স্বর্গীয়। তুমিও জানো আমিও জানি। সন্ধ্যেয় তোমাদের 'বস' ফিরে এসে সন্দিগ্ধ-ভাবে প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার, আনন্দে যে একেবারে ডগমগ? ভ্রুকুটি-কুটিল হল তার ভ্রূযুগল। রাত্রে শুয়ে সারাদিনের কথা ভেবেছি আর পুলকে মন ভরে উঠেছে। কি সুন্দর তুমি, কি সুন্দর তোমার দেহাবয়ব। আর—আর তুমি একটি আস্ত ডাকাত। তোমার চোখদুটি দেখে যে কোন মেয়ে পাগল হয়ে যাবে। তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশদাম কি অপূর্ব যে লাগে। মনে পড়ে সেই দ্বিতীয় দিন যখন তোমার সামনে আমার স্বামী আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করায় রাগে তোমার চোখ লাল হয়ে উঠেছিল। জানো, রাগলেও তোমায় বড় সুন্দর দেখায়। তাহলে আমার ওপর যেন ওরকম রেগে যেও না লক্ষ্মীটি। তাহলে আমি মরে যাব।

তোমার বয়স পঁচিশ, আর আমার সাতাশ। মাঝে মাঝে যখনই তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরেছি তখনই কেন জানি না প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহধারাও বয়ে গেছে তোমার প্রতি। সেটা বোধহয় আমি বয়সে বড় বলে, তাই না? তোমার কথা চিন্তা করে করে মিস্টার গুপ্তের পাশে শুয়ে থাকি। তুলনাই হয় না তোমাদের দুজনের, তুমি স্বর্গ আর ও নরক।

আমি তোমাদের 'বস' মিস্টার গুপ্তকে ঘৃণা করি। ভীষণভাবে ঘৃণা করি লোকটাকে। আশায় আছি শিগগীরই কিছু একটা ঘটে যাবে। আমি তোমায় ভালবাসি প্রিয়তম। তোমায় আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে চাই, কিন্তু তা পাচ্ছি না, এ আপশোস আমি রাখি কোথায়। সমস্ত দুনিয়া বুঝি আমাদের বিপক্ষে যাই হোক, প্রিয়তম, তুমি আজ সারারাত আমার কথা ভাববে, আমিও রাতভর তোমার চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকব। তোমার জন্যে রইল আমার একটি গভীর .....

তোমারই—তোমারই—তোমারই

ললু

(১০নং এক্সিবিট)

তুমি বলেছ প্রিয়তম যে এভাবে আমাদের আর চলে না। আমিও তাই বলি, কিন্তু আমরা কি করতে পারি। তোমায় আগেও বলেছি যে আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যেতে পারি না। আর পিনটুসোনাকে ছেড়ে যাওয়াও অসম্ভব, সে এখনো দুগ্ধপোষ্য শিশু। মিস্টার গুপ্তকে ছাড়লে ক'দিনের মধ্যেই আমরা উপোষ করে মরব। একটা ঘৃণিত লোকের সঙ্গে বসবাস করাও এদিকে অসহ্য হয়ে উঠেছে। গতকাল আবার ও আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে, পশুর মত দুর্ব্যবহার করেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে ঐ মোগল আমলের বর্শা দিয়ে ওকে প্রচণ্ড আঘাত করি। কিন্তু তোমার মত আমি অতো সাহসী নই, বীরপুরুষ নই। আর হঠাৎ রেগে উঠতেই পারি না তোমার মতো। নাহলে......

প্রিয়তম, এস একবার, এসে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে আমার এইসব অসহনীয় জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে যাও। আমি শুধু আশায় আছি কিছু একটা ঘটবেই, এবং আমাদের অনুকূলেই তা ঘটবে। তুমি একবার এস। তবে এও বলে রাখছি ও যদি ফের আমার গায়ে হাত তোলে, তো ঈশ্বর যেন ওকে রক্ষা করেন; আমি কিন্তু তাহলে ছেড়ে কথা কইব না। ঐ চকচকে বর্শা সমূলে ঢুকিয়ে দেব ওর বুকের মধ্যে। এসব চিন্তা অবশ্য আমি করতে

চাই না, ভাল লাগে না। ভাল কথা, আমার লেখা চিঠিগুলি কিন্তু পুড়িয়ে ফেল লক্ষ্মীটী।

অজস্র ভালবাসান্তে

তোমারই

ললু

(১১নং এক্সিবিট)

প্রিয়তম,

আমি যা যা বলেছি হুবহু ঠিক সেইমত করবে। এত তাড়াতাড়ি তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হল যে সবকিছু তুমি বুঝলে কিনা, বুঝতে পারলাম না। অবশ্য তুমি এর কিছুই যেন জান না, বুঝলে? তুমি মিস্টার গুপ্ত যখন ব্যবসায়িক ব্যাপারে আসতে বলেছে এসেছ, তাছাড়া তুমি কখনো এ বাড়িতে ঢোকনি, একথা যেন মনে থাকে, কেমন? আমি বলব, এ কাজ আমি করেছি। আমি বলব, আমি দেওয়ালের বর্শাটা ঠিক করে রাখছিলাম, অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে মিস্টার গুপ্তের দেহ বিদ্ধ হয়। এ চিঠি শেষ করে ডাকে ফেলে এসে বাড়ি ঢুকব এবং তখনই, "কী সর্বনাশ হলোগো, কে আছ কোথায় বাঁচাও" বলে আর্তনাদ করে উঠব। কেউ কিছু সন্দেহ বা জিজ্ঞাসা করবার আগেই এ চিঠি সন্ধ্যার মধ্যে তুমি পেয়ে যাবে। অপরাপর চিঠিসহ এ চিঠিও অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলবে। আমি এখন আদৌ ভীত নই, প্রিয়তম। এমনকি, ঐ তোমাদের 'বস', ঐ যে ডাইনিংরুমে রক্তাক্ত দেহে চোখ চেয়ে থাকা অবস্থায়, মরে পড়ে আছেন, তা দেখেও আমি একবারও ভয় পাচ্ছি না। যখন এসব ঝামেলা মিটে যাবে, তখনই প্রিয়তম আমরা দুজনে শুভ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হব, অবশ্য তুমি যদি ভালবাস এবং আমাকে চাও তবেই। এখানেই শেষ করি প্রিয়তম আমার, বেলা এখুনি পিন্টুসোনার ঘুম থেকে ওঠবার সময় হয়েছে। ও ওঠবার আগেই সবকিছু আমি সুব্যবস্থা করে ফেলতে চাই। বিদায় প্রিয়তম। আমি এর জন্যে আদৌ তোমায় দোষারোপ করছি না, করবোও না। আমি খুব খুশী, তুমি ও কাজ করেছো বলে। মিস্টার গুপ্তের মতো মানুষের এটাই পাওনা ছিল। ভবিষ্যতে আমরা দুজন মিলিত হয়ে পরম সুখে বসবাস করব এই চিন্তায়ই আমি বিভোর। —ইতি

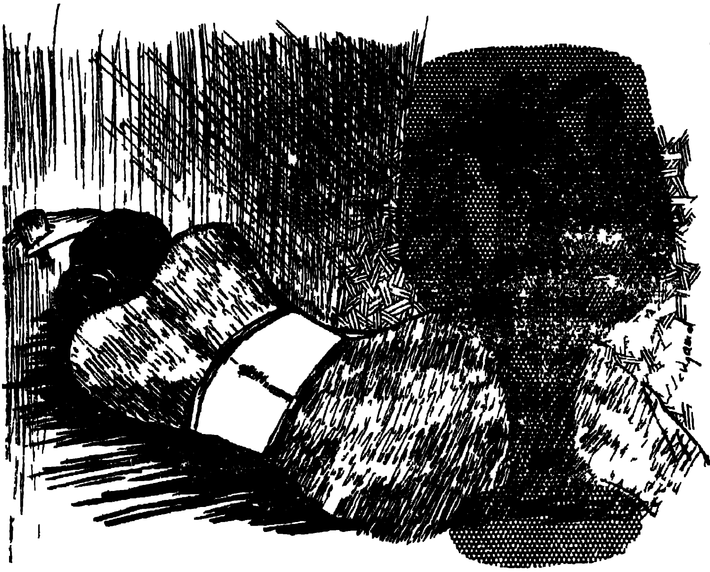
তোমার চির-প্রেমিকা

ললু *

---

* বিদেশী গল্পের অনুপ্রেরণায়।

॥ **বীরু চট্টোপাধ্যায়** ॥ আদি নিবাস, ঢাকা-বিক্রমপুর। জন্ম নোয়াখালি শহরে ১৯১৭-তে। শিশুকাল থেকে কলকাতায়। বিদ্যাসাগর কলেজে আই-এ পড়াকালিন 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশ। সেই শুরু। তারপর ক্রমান্বয়ে সেই যুগের এবং এ যুগের হেন পত্রিকা বিরল যাতে তিনি লেখেন নি, বা লিখছেন না। গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক প্রবন্ধ-অনুবাদ, ছোটদের এবং বড়দের উভয় বিভাগেই লেখনী সচল। লেখার মত বচনেও সমান দক্ষ। রেডিওতে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং অননুকরনীয় বলার ভঙ্গিতে কর্তৃপক্ষ ও শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এককালে সাহিত্যিকদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে সাবলীল অভিনয়ে সুনাম কিনেছেন। নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের চার মূর্তির সফল নাট্য-রূপ দিয়েছেন। ছোটদের বড়দের প্রত্যেকের জন্য ইতি মধ্যেই প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। বীরু চট্টোপাধ্যায় গোয়েন্দা, গুপ্তচর, ভৌতিক ও রহস্য রচনায় বাংলাসাহিত্যের একজন সিদ্ধকাম জনপ্রিয় লেখক।



একটি লক্ষ্য তিনটি খুন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

নামকরা অপরাধ-তত্ত্বজ্ঞের এ রকম সদামাঠা হাব-ভাব আর নিষ্প্রভ বিশ্লেষণ আই. বি. অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার আদৌ আশা করেননি। বুদ্ধির চমক না হোক, অনুসন্ধানী চোখের তেমন ধারাও কিছু দেখলেন না। অথচ ভদ্রলোকটির এ জায়গায় অবস্থানকালে দুর্ঘটনার খবরটা পেয়ে এ. সি. বেশ একটু উৎসাহ নিয়ে একেবারে তাঁকে সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। কিন্তু বিদেশের নামকরা ক্রিমিনোলজির প্রোফেসরের বৈশিষ্ট্য বা চটক কিছু চোখে পড়ল না। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এ-সব নিয়ে আর হয়ত মাথায় ঘামাতে চান না ডক্টর বাবুলাল। কিন্তু জাতের বাঘা রক্তের গন্ধ পেলেও একটু চনমনিয়ে উঠবে না—এই বা কেমন!

এ-ধরনের হত্যা শুধু গোরকপুরে নয়, এই দেশের নতুন। খবরের কাগজেও তাই লিখেছে। পাখির ঘাড় মটকানো বা ঠাকুমার ঝুলিতে রাক্ষস-খোক্কসদের ঘাড় মটকানোর কথাই-শোনা ছিল। কিন্তু শুধু হাতে মানুষও

অবলীলাক্রমে মানুষের ঘাড় মটকাতে পারে, সে নজির এই প্রথম। এটা অবশ্য মানুষের ঘাড় মটকানো নয় মেয়েমানুষের। ঘাড়ের দিক থেকে তাতে কতই বা তফাত!

গোরখপুর থানা থেকে মাইল চারেক দূরের এক আবাসিক হোটেলের ঘটনাটা। অনেক মাসকাবারী বাসিন্দা থাকেন সেখানে। দোতলার কোণের দিকের একটা ঘরে মেয়েটি থাকত। কোন এক হাসপাতালের নার্স। এক মাসের ছুটিতে ছিল এবং সেই এক মাসের জন্য এখানে ঘর ভাড়া করে ছিল। এমনি সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও নাকি সে হাসপাতালের নার্স-কোয়ার্টারে থাকত না—কোথাও না কোথাও বেড়িয়ে পড়ত। প্রাথমিক তদন্তে এইটুকুই প্রকাশ।

ডক্টর বাবুলালকে সঙ্গে করে এ. সি সেই হোটেলের সেই ঘরেই এসেছিলেন। মেয়েটি তখনো দরজার কাছেই মেঝেতে পড়েছিল। তদন্তগত প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর সরকারী ডাক্তার নেড়েচেড়ে দেখেছেন, ঘাড়-মটকানো পাখীর মতই মাথাটা ঝুলে পড়েছে। মেয়েটিকে পোস্ট-মর্টেমের জন্য সরিয়ে নেওয়ার পর ডক্টর বাবুলাল বারকতক শুধু ঘরটাকে দেখেছেন, কাউকে একটি প্রশ্নও করেন নি। সেদিক থেকে স্থানীয় থানা অফিসার বরং এ-দেশী তদন্তের ঠাট কিছু দেখিয়েছেন। হোটেলের ম্যানেজার থেকে শুরু করে খানসামা পর্যন্ত সকলকে জেরায় জেরায় জীর্ণ করে ছেড়েছেন।

ফেরার পথে এ. সি. জিজ্ঞাসা করেছেন—কি বুঝলেন?

জবাবে সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়েছেন বেঁটেখাট ভদ্রলোকটি।—ইয়েস, বড় বেরসিক লোকের হাতে প্রাণ গেছে মেয়েটার। কিলিং শুড বি মোর সোবার—অ্যাট্‌ লিস্ট ফর এ ফিমেল্স ভিক্‌টিম!

এ সি. হেসেই ফেলেছিলেন। ভদ্রলোকের কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের সুযোগ হয়নি এখনো, কিন্তু তাঁর সরস বাকপটুতা উপভোগ করার মতই। রোজ সন্ধ্যায় কথা শোনার জন্যেই তাঁর বাড়িতে যান তিনি।

এরপর উনি পরামর্শ দিয়েছেন, মেয়েটির মৃত্যুতে সব থেকে বেশী লাভ কার খোঁজ করুন, আর তার সঙ্গে যত লোকের চেনা-পরিচয় আছে তার একটা লিস্ট করুন।

এবারে এ. সি. মনে মনে হেসেছেন। এই পরামর্শটুকু দেবার জন্য বিদেশের ছাপ-মার অপরাধ তত্ত্বজ্ঞের প্রয়োজন ছিল না। এ কাজটুকু

এদেশে রুটিন মাফিকই করা হয়। বিদায়ের আগে কথায় কথায় ডক্টর বাবুলাল অনুরোধ করলেন—বিকেলে পোস্ট-মর্টেমের রিপোর্ট আর ওই ডাক্তারকেও সঙ্গে করে একবার নিয়ে আসুন না, আলাপ-সালাপ করি।

এ. সি. তাও এনেছিলেন। মৃত্যু নেক-বোন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে—মৃত্যুক্ষণ আগের দিন সন্ধ্যারাতের কোন সময়।

—হোটেলে সেই সময়েই সুবিধে। নিস্পৃহ মন্তব্যের পর ডক্টর বাবুলাল জিজ্ঞাসা করেছেন—ও কাজটা করতে হাতের জোর চাই কতটা ?

ডাক্তার বুঝিয়েছেন—জোর মন্দ লাগে না, তবে তার থেকেও বেশি দরকার ঠিক জায়গাটিতে ঠিকমত ধাক্কা দেওয়া —অ্যাকুরেশি অ্যাণ্ড অ্যাকশন—ফাঁসিতে যেমন হয়। কিন্তু শুধু হাতে সেটা যে সম্ভব, ভাবা যায় না। আশ্চর্য কাণ্ড বলতে হবে।

এ. সি. জানালেন, মেয়েটির মৃত্যুতে একমাত্র লাভ দেখা যাচ্ছে পেসেণ্টদের—নার্সের গুণাবলী তার কমই ছিল, দশবার ডেকেও দর্শন মিলত না। রোগী আর সহকর্মিনী সকলের সঙ্গেই খিটিরমিটির লেগেই থাকত। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও তার ওপর খুব খুশি ছিলেন না।

এই কেস নিয়ে ডক্টর বাবুলাল হয়ত আর মাথায় ঘামাতেন না। কিন্তু ঠিক সাত দিনের মাথায় গোরখপুরে দ্বিতীয় চমক লাগল। এবারের দুর্ঘটনা শহরের উল্টো মাথায় এক পার্কের মধ্যে। পার্কের বেঞ্চিতে একটি তিরিশ বছরের পুরুষকে মৃত অবস্থায় দেখা গেছে। সেই একই ঘাড়-মটকানো ব্যাপার—কোনরকম ব্যতিক্রম নেই।

শুনে বাবুলাল লাফিয়ে উঠেছিলেন-- এ ড্যাম ডার্টি প্লেস, আর বেড়ানোর সখ নেই। আমার মাথার ওপর মায়া আছে, আমি পালাব এবার।

এ. সি. ঠাট্টাই করলেন— এবারের ভিকটিম তো ফিমেল নয়, মেল-তত নৃশংস লাগছে না বোধ হয় ?

বাবুলাল তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করেছেন—রাইট, দিস টাইম ইট লুকস ম্যানলি, কিন্তু লোকটার চোখে—আই থিঙ্ক নো ওম্যান ক্যান ডু দিস—তার চোখে পুরুষ-রমণী ভেদাভেদ নেই। বাট হি হ্যাজ প্রাকটিস্‌ড এ গুড ডিল—অনুশীলন করেছে খুনের মৌলিকতা আছে।

এ. সি-র মাথায় দুশ্চিন্তা, মাস্টারী মন্তব্য ভালো লাগল না। সেই জন্যে একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা

করলেন—ওদেশের থেকেও বেশী মৌলিকতা?

মজার কথা যেন, আধবুড়ো ভদ্রলোকটি জোরেই হেসে উঠলেন।—না, তা কি করে হবে, ওদেশগুলো আর্টিস্টিক কিলিংএ স্পেশ্যালাইজ করছে—দে আর লেস্ লাউড—সো ডিটেক্‌শান ইজ মোর থ্রিলিং দেয়ার। ও-সব কেসএ মাথা ঘামিয়েও সুখ।

এবারে এ. সি-র স্পষ্ট টিপ্পনী—এখানকার এই সব স্থূল হত্যায় ওই থ্রিল আর সুখ নেই বলেই হদিস পাচ্ছেন না বোধহয়। এরা বোকার মত খুন করে বলেই যত মুশকিল—

—আপনি ঠাট্টা করছেন—তেমনি খোস-মেজাজে আছেন ডক্টর বাবুলাল,—আমি তো মাথা ঘামাইনি, কিন্তু খুব কঠিন হবে বলে আমার মনে হয় না। এ-রকম হত্যার যদি কোন উদ্দেশ্য বা অর্থ খুঁজে না-ই পান, তাহলে সেটাই 'ক্লু' বলে ধরে নিন। দেন্ ওয়েট অ্যাণ্ড সী।

পরে টেলিফোনে ডক্টর বাবুলাল এ. সি-কে কথায় কথায় শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ-লোকটার মৃত্যুতে সমূহ লাভ কার? বিদেশের অপরাধ-বিজ্ঞানীর প্রতি এ. সি-র আর বোধহয় তেমন আস্থা ছিল না। জবাব দিয়েছেন—ওর নিজেরই। লোকটা বেকার ছিল, দিনরাত চাকরির খোঁজে খোঁজে ঘুরে বেড়াতো, শহর ছাড়িয়ে একটা ভাঙা বাড়িতে বুড়ি দিদিমা আর গুটিকয়েক নাবালক পোষ্য নিয়ে থাকত। অতএব দেহ-পিঞ্জর থেকে এ-ভাবে খালাস পেয়ে লাভ ওর নিজের থেকে বেশী আর কার?

বাবুলাল হেসে রসিকতার তারিখ করেছেন, আর সেই এক কথাই বলেছেন,—ওয়েট অ্যাণ্ড সী।

আলোচনা যত হালকা রকমেরই হোক, পর পর এ ধরনের ছুঁচোটো হত্যাকাণ্ডে শহরে চাঞ্চল্য বড় কম দেখা গেল না। এই বিচিত্র হত্যা-পদ্ধতি নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হল। অনেক অনেকভাবে মাথা ঘামাতে লাগলেন। কারো কারো ধারণা, কোন ক্ষিপ্ত উন্মাদ নিজস্ব পদ্ধতিতে হত্যার মহড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে—আর তাই যদি হয়, সেটা গুরুতর ভয়ের কারণ।

॥ দুই ॥

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। মালপত্র সহ যশোবন্তকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরে চলল কৃষ্ণকুমার। মুখখানা তেমন প্রসন্ন নয়, ক্লান্তও লাগছে। বাড়ির কাছে এসে দেখে পাশের একতলা

বাংলো বাড়ির উৎসব তখনও শেষ হয়নি। বাড়ির দরজায় তখনো দশ-বারোখানা ঝকঝকে মোটর দাঁড়িয়ে। আলোয় আলোয় সামনের বড় হলঘরটা দিনের বেলার থেকেও সাদা দেখাচ্ছে। পিছনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে দোতলার একটা ঘরে থাকে কৃষ্ণকুমার। দোতলার তিনখানা ঘরই তার দখলে। একতলাটা বছরের মধ্যে এগারো মাসই তালাবন্ধ থাকে। বাড়িওলা কখনো-সখনো সপরিবারে এসে থাকেন। নীচের একটা কোণের ঘরে যশোবন্ত থাকে। বাড়িওলার সঙ্গে বকাবকি করে বছরখানেক হল তার জন্য একটা ঘর আদায় করা গেছে।

কৃষ্ণকুমারের ঘরের জানালায় দাঁড়ালে পাশে জগদীশ ভাটের প্রাসাদের অন্দরমহলের অনেকটাই দেখা যায়। ঘরে ঢুকে কি ভেবে আলো জ্বালল না। জানালা থেকে উৎসব মুখর হলঘরটা জোরাল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হলের মাঝখানের একটা মখমল কুসনে গৌরী ভাট বসে—তার চারদিকে স্তূপীকৃত ফুল আর উপহার। মেয়ে-পুরুষের হাসাহাসি দাপা-দাপিতে ঘরটাই যেন হাসছে। কিন্তু ওই মহিলাটির দিক থেকেই সহজে চোখ ফেরাতে পারল না কৃষ্ণকুমার। সর্বাঙ্গের ফুল-সাজে এমন সুন্দরও দেখায় কাউকে জানত না। সুন্দরী বটে, কিন্তু এমন কিছু সুন্দরী নয়—তবু আজ যেন গৌরী ভাট উর্বশীরও ঈর্ষার পাত্রী।

প্রৌঢ় জগদীশ ভাট এক একজনকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন, আর হাসি খুশিতে ডগমগিয়ে উঠছেন। স্ত্রীর জন্মদিনের গোটা আনন্দটা যেন তাঁরই। প্রতিবারই সাতদিন আগে থেকেই বোঝা যায় বাড়িতে বিশেষ উৎসবটি আসছে। মশলার ব্যবসায় ভদ্রলোকের অঢেল টাকা। গৌরী ভাট তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী তার ভাগ্য দেখে অনেক বিত্তবানের ঘরণী গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন হয়ত, তৃতীয় না হলে স্ত্রী হয়ে সুখ নেই।

কৃষ্ণকুমার মাঝে মাঝে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে, মাঝে মাঝে বিছানায় এসে বসে। ভিতরে কিরকম অস্বস্তি একটা। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল একসময়। কানদুটো সজাগ। গাড়ি আসছে, যাচ্ছে। শেষে যাচ্ছেই বেশী, আসছেও দুই একটা। ··এটা যাচ্ছে, এটাও যাচ্ছে···এটা,না, এটা এলো ··এটা···

বাইরের কি একটা চাপা কলরবে চোখ মেলে দেখে খরখরে সকাল। কিন্তু জানালা দিয়ে ও-বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই চক্ষু স্থির। রাস্তা

লোকে লোকারণ্য, বাড়ির ভিতরে পুলিস গিসগিস করছে। রাস্তার লোক হটাবার তাড়নায় পুলিস হিমসিম খাচ্ছে। কৃষ্ণকুমার জামাটা টেনে নিয়ে নীচে ছুটল।

॥ তিন ॥

সাত সকালে ঘুম ভাঙানোর বিরক্তি ভুলে ডক্টর বাবুলাল লাফিয়ে উঠলেন। —হুর্‌রে! এবারে কুকুর? হাউ স্ট্রেঞ্জ—চলুন চলুন!

এ. সি-র আগেই জিপে উঠে বসলেন তিনি। তারপর সমাচার শুনলেন, সকালে মিল্ক-ম্যান দুধ দিতে এসে দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে যায়, ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল শুধু। তারপর ভিতরে ঢুকেই দেখে জগদীশ ভাটের আদরের কুকুরটা মরে পড়ে আছে—ঘাড়টা উল্টো দিকে মটকানো। কারো সাড়া না পেয়ে শেষে ভাটের ঘরে উঁকি দিয়েই চিৎকার চেঁচামেচি। বাইরের লোক তক্ষুনি টেলিফোনে খবরটা দিয়েছে। হাত-পা বাঁধা মুখে কাপড়গোঁজা অবস্থায় জগদীশ ভাট মেঝেতে অজ্ঞানের মত পড়ে আছে।

ডক্টর বাবুলাল চকিত প্রশ্ন করলেন—বাঁধন খুলে ফেলা হয়েছে?

—না। আমি টেলিফোনে বারণ করেই ছুটছি, ভাবলাম আপনাকেও তুলে নিয়ে যাই।

—ওয়াণ্ডারফুল!

এ. সি. ড্রাইভারকে তাড়া দিলেন আরো জোরে চালাতে, কারণ টেলিফোনে শুনেছেন গৃহস্বামীর শোচনীয় অবস্থা—এর মধ্যে যদি খতম হয়ে যায়, সময় মত বাঁধন না খোলার দায়টা তাঁদের ঘাড়ে পড়তে পারে।

রাস্তায় তখন দু'জন চারজন করে লোক জমতে শুরু করেছে। দুই এক মুহূর্তের মধ্যে বাঁধন পরীক্ষা করে নিয়ে এ. সি. কর্মচারীদের বাঁধন কাটতে নির্দেশ দিলেন। স্থূল দেহের চামড়া আর মাংস যেন হাড় থেকে সরে সরে গেছে। গলার নীল শিরা ফেটে বেরিয়ে আসছে, চোখের দু'কোণ বেয়ে জল পড়ছে টস টস করে। এ. সি. চোখ টেনে দেখলেন, ভিতরে আলগা রক্ত ছড়ানো যেন। জ্ঞান নেই। ধরাধরি করে তাঁকে শয্যায় শুইয়ে ডাক্তার পাল্‌স্ ধরে বসে রইলেন। ইঙ্গিতে সহকর্মীকে প্রাথমিক ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন তিনি।

ডক্টর বাবুলাল বেখাপ্পা মন্তব্য করে বসলেন—এমন সুখের শরীরে এতটা দরকার ছিল না, ভদ্রলোককে মিছিমিছি বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

চারদিকে একবার দেখে নিয়ে আবার বললেন—এখানে বাড়ির লোক কারা হোয়ার আর দে ? এঁর স্ত্রী কোথায় ? ইজ সি এ ব্যাচেলার ?

পুলিস কর্মচারী ছাড়া আর যে দু'চার জন ঢুকে পড়েছিলেন সকলেই বাইরের লোক। প্রশ্নটা শুনে সকলেরই খেয়াল হল, তাই তো জগদীশ ভাটের স্ত্রী কোথায় ? গৌরী ভাট কোথায় ? এত গোলোযোগেও তাঁর ঘুম ভাঙেনি ? এ. সি-র কি যেন মনে পড়ল।...শুনেছিলেন বটে মহিলাটি একটু-আধটু পানাসক্ত, উৎসবের রাতে হয়ত মাত্রাধিক্য ঘটেছে—তাই তেমন হুঁশ নেই। কানে কানে বাবুলালকে জানালেন তিনি। বাবুলাল বাইরে এসে দাঁড়ালেন, কুকুরটা ঘাড় উল্টে মরে পড়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটাকে দেখলেন খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ চেঁচিয়েই উঠলেন তিনি—বাট উই মাস্ট সী—মে বি সি ডেড ! শুধু কুকুর মারার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ না আসতেও পারে !

শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ সি-ই সর্বাগ্রে হলঘরের ওপাশের ঘরটাতে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লেন। তারপরেই অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

নারীর সেই মৃত্যুর দৃশ্য মর্মান্তিক।

ফুলের আভরণ বেশির ভাগই গায়েই আছে তখনো। কিছু মাটিতে ছড়ানো। শিয়রের দিকের জানালার কাছে নারীদেহ কার্পেট-বিছানো মেঝেয় লুটিয়ে আছে।

জগদীশ ভাটকে নার্সিং-হোমে পাঠানো আর গৌরী ভাট ও কুকুরের দেহ ময়না-তদন্তের জন্য পাঠানোর ফাঁকে কোথা দিয়ে ঘণ্টা দুই চলে গেল। খবরটা ততক্ষণে শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন হটানো এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিরস্ত করার পর এ. সি. বাইরের হলঘরে বসে পড়ে হাঁপ ছাড়লেন। বাড়ির পরিচারকরাও একে একে এসে গেছে। গৌরী ভাটের খাস পরিচারিকাও আছে। আর আছে দু'জন লোক। একজন পাশের বাড়ির কৃষ্ণকুমার, অন্যজন জগদীশ ভাটের ভাগ্নে চন্দ্রমোহন।

পরিচারক বা পরিচারিকাকে জেরা করে একটাই তথ্য জানা গেল। প্রতি বছরই উৎসবের দিন গৃহকর্ত্রী সকলকে একমাসের মাইনে এবং পরদিন সম্পূর্ণ ছুটি দিয়ে থাকেন। রাতের উৎসব শেষে সেই একটা দিন সকলেই যে যার বাড়ি যায়। পরের দিনটা কর্তা এবং কর্ত্রী বাইরেই খানাপিনা করে থাকেন। কর্ত্রী আগের দিন বিকেলে সকলকে টাকা দিয়েছেন, আর রাত

ঠিক দশটা পনেরয় সকলকে ছুটি দিয়েছেন।

তাদের বিদায় দিয়ে এ. সি. ভাগ্নেকে জেরা করতে বসলেন। বছর তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, শক্ত সমর্থ উঁচু লম্বা চেহারা। লোকটা খুব বুদ্ধিমান কি খুব বোকা—বোঝা শক্ত।

—আপনি কাল রাতে কোথায় ছিলেন ?

—থিয়েটারে।

—বাড়িতে উৎসব, আপনি থিয়েটারে ছিলেন কেন ?

—বাড়িতে উৎসব বলেই। তাছাড়া আমার পার্ট ছিল…।

—বাড়িতে এ ধরনের উৎসব আপনি পছন্দ করেন না ?

ভাগ্নে চন্দ্রমোহন সাফ জবাব দিল- মামাকে আর মামার উৎসব পছন্দ করি না।

কেন পছন্দ করেন না ?

—ভালো লাগে না বলে।

ডক্টর বাবুলাল সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছিলেন তাকে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মামাকে ভালো লাগে, আই মিন, লাগত ?

চন্দ্রমোহন থমকালো একটু, তারপর বলল—লাগত।

এ. সি. প্রশ্ন করলেন- থিয়েটার ক'টায় ভেঙেছে ?

—রাত দশটা নাগাদ।

—রাতে আপনি কোথায় ছিলেন ?

- বন্ধুর বাড়ি। অনেক রাত্রিতেই বন্ধুর বাড়িতে থাকি।

ডক্টর বাবুলাল এ. সি-র কানে কানে কি বলতে এ সি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মামা ব্যবসার কাজে বাইরে যান ?

—মাসের মধ্যে দশ পনের দিন বাইরেই থাকেন।

সেই সময় বন্ধুর বাড়িতে রাত্রিতে থেকেছেন কোনদিন ?

—থেকেছি, আরো বেশি থেকেছি।

এ. সি. এবারে একটু কর্কশ স্বরেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ড্রিঙ্ক করেন ?

—করি। নির্বিকার জবাব। তারপর নিজে থেকেই বলল—মশায়, আমি খুনটুন কাউকে করতে পারিনে, একটা আরশোলাও মারতে পারিনে, একটা—

এ. সি. রূঢ়কণ্ঠেই কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ডক্টর বাবুলাল

আলতো করে জিজ্ঞাসা করে বসলেন—কেন পারেন না, আপনারই তো লাভ বেশি—মামী না থাকলে মামার অবর্তমানে তো আপনিই সব পাবেন ?

জবাবে চোখ বড় বড় করে চন্দ্রমোহন খানিক চেয়ে রইল তাঁর দিকে, তারপর হতাশার সুরেই বলল—মামী থাকলেও পেতাম, মামীর দরাজ হাত—কিন্তু বেছে বেছে তাঁকেই খুন করা হল কেন বুঝলাম না।

ক্ষোভের স্পষ্ট অর্থ, খুনটা বরং মামা হলে তার আপত্তি ছিল না। ডক্টর বাবুলাল মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দ্বিতীয় লোকটিকে দেখছেন তিনি। কৃষ্ণকুমারকে। হল-এর ওধারে বিষণ্নমূর্তিতে বসে আছে চুপচাপ। জেরার কাজ চলছিল হল-এর এ-মাথায় বসে। চন্দ্রমোহনকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ডাকা হল।

নাম জেনে নিয়ে এ. সি. জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি পাশের বাড়িতে থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—কতকাল আছেন ?

—অনেক কাল, চার পাঁচ বছর।

—এঁদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল ?

—ছিল।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন—কাল এ-বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন ছিল ?

একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল—ছিল।

—এসেছিলেন ?

—না।

—কেন ?

জবাবে জানালো, নিমন্ত্রণে সে কোথাও বড় যোগ দেয় না। তাছাড়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিল। স্টেশনে যশোবন্তকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দিনের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করল সে। প্রশ্নের জবাবে নিজের পেশারও ফিরিস্তি দিতে হল। ফোটোগ্রাফের ব্যবসা, এখানকার ফোটো স্টুডিওর মালিক সে। খুব ছোট থেকে আরম্ভ করেছিল, দু'তিন বছর হল ব্যবসা ভালোই চলছে।

গোরখপুরের পরের স্টেশনে স্টুডিওর ব্রাঞ্চ আছে, মুভি ক্যামেরা দিয়ে যশোবন্তকে সেখানে পাঠিয়েছে—খুব সকালে সেখানকার একটা লোকাল ফাংশন কভার করার অর্ডার আছে, তাই—।

—যশোবন্ত আপনার ফোটোগ্রাফার ?

—না, কর্মচারী। রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে আজ খুব ভোরে দোকানে ক্যামেরা পৌঁছে দেবে—বিকেলের মধ্যে তার ফিরে আসার কথা।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন- মুভি ক্যামেরার দাম তো অনেক, তাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন, বিশ্বাসী লোক খুব ?

—হ্যাঁ।

এ. সি. প্রশ্ন করলেন—কতকাল আছে আপনার কাছে ?

—বছর দেড়েক। বিশ্বস্ত লোক খুঁজছি জেনে মিঃ ভাট ওকে রেকমেণ্ড করেছিলেন। তাঁর বাইরের কোথাকার আড়তে একসময় কাজ করত, এখানে এসে চাকরির জন্য তাঁকে ধরে পড়েছিল।

বাজে কথায় আর সময় নষ্ট না করে এ. সি. উঠে পড়লেন। এক্ষুনি অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে তাঁকে। পথে ডক্টর বাবুলালকে চুপচাপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাগ্নের কথা ভাবছেন ?

তিনি অন্যমনস্কের মত জবাব দিলেন—না, কৃষ্ণকুমারের কথা। রঙ কালো, কিন্তু অদ্ভুত মিষ্টি দেখতে, তাই না ? আই এনভি হিম।

এ. সি. এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও না হেসে পারলেন না। পঞ্চাশ উত্তীর্ণপ্রায় বৃদ্ধের নাদুস-নুদুস খর্বকায় মূর্তিটি কোনদিক থেকেই রমণীয় নয়। তাঁকে হাসতে দেখে হাসলেন বাবুলালও, একটু যেন উচ্ছ্বাসই জ্ঞাপন করলেন, —কৃষ্ণকুমার—ওই চেহারায় আর কোন নাম হয় না—হি মাস্ট বি অ্যান্ আর্টিস্ট, এ রিয়েল আর্টিস্ট—ওর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে করছে; যশোবন্ত এলে একবারে নিয়ে আসুন না ?

যশোবন্তকে এ. সি. বিকেলেই নিয়ে এসেছিলেন। এদিকেই দেশ তার। একেবারে নিম্নশ্রেণীর নয়, আবার ভদ্রলোকও ঠিক বলা যায় না। হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান চেহারা। স্বল্পভাষী। জবাব দিতে পারলে দুই এক কথায় জবাব দেয়, নয়তো চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন না বুঝলেও ফিরে জিজ্ঞাসা করে না কি বলা হচ্ছে। এ. সি-র উল্টোপাল্টা জেরার মুখেই বাবুলাল ঈষৎ আগ্রহে প্রশ্নর ধারা বদলে দিলেন একেবারে। জিজ্ঞাসা করলেন—কৃষ্ণকুমারবাবু তোমাকে এখন কত মাইনে দেন যশোবন্ত ?

—দেড়শ।

—বাঃ! আচ্ছা, বছরখানেক আগে কত পেতে ?

—একশ।

—তাহলে বাবু তোমার ওপর খুব খুশি আছেন বলো ?

যশোবন্ত নিরুত্তর

বাবুলাল কোন উত্তর আশাও করেননি যেন। জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা যশোবন্ত, জগদীশ ভাট যখন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন, তোমার বাবুকে ওই মিসেস ভাটের সঙ্গে রাতেও গল্পসল্প করতে দেখতে তো ?

যশোবন্ত নিরুত্তর।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন এ. সি পর্যন্ত—বাবুলালের এ কণ্ঠস্বর যেন ছুরির ফলার মত।—কত রাত পর্যন্ত তোমার বাবু ও বাড়িতে কাটাতেন ?

যশোবন্ত নিরুত্তর। বাবুলাল নিজেও বিস্মিত একটু, ছুরির ফলাটা যেন একটা নিষ্প্রাণ কিছুতে গিয়ে বিঁধল। যশোবন্ত নির্বাক, নিরাসক্ত।

তখুনি গলার স্বর একেবারে কোমল খাদে নামিয়ে বাবুলাল আবার বললেন—জবাব না দিলে তোমার বাবুর তুমি ক্ষতিই করবে যশোবন্ত। আচ্ছা, ও-কথা থাক, তোমার বাবুকে দেখলে ও বাড়ির কুকুরটা ডাকাডাকি করত কি না বলো তো ?

এবারে যশোবন্ত সামান্য ঘাড় নাড়ল।

—ডাকত না ? রাত্রিতে দেখলে ?

এ. সি. দেখলেন কণ্ঠস্বর নয়, এবারে বাবুলালের চোখদুটি যেন ছুরির ফলা।

যশোবন্ত নীরব।

এ. সি. ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করতে চেষ্টা করলেন—জবাব না দিলে তোমাকে আমি থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব যশোবন্ত।

বাবুলাল তক্ষুনি ছদ্মরাগে বলে উঠলেন—একে থানায় নিয়ে গেলে আমি আপনার বিরুদ্ধে কেস করব। বাবু তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন যশোবন্ত, তুমি কিছু ভেব না। আচ্ছা তুমি যাও এখন—তোমাকে কষ্ট দিলুম।

যশোবন্ত চলে গেলে এ. সি. ঠাট্টা করলেন—আপনি রোমান্সটাই বড় করে তুলতে চাইছেন দেখি।

বাবুলাল হাসতে লাগলেন। তারপর মন্তব্য করলেন—মিসেস ভাটের উৎসবের সাজসজ্জা দেখে মনে হল, পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা তিনি খুব অপছন্দ করতেন না—অ্যাণ্ড কৃষ্ণকুমার ইজ পারফেক্টলি এ লেডিস ম্যান।

এ. সি. টিপ্পনী কাটলেন—ভাগ্নে চন্দ্রমোহনকেও একটু-আধটু লেডিস ম্যান ভেবেছিলেন।

জব্দ হয়েই যেন মুখখানা গোবেচারীর মত করে ফেললেন বাবুলাল।

॥ চার ॥

গত দিনের সমস্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে এ. সি. বাবুলালের বাড়ি এলেন পরদিন সন্ধ্যার পর। রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম, গৌরী ভাটের মৃত্যুর সময় সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে—কুকুরেরও তাই। একই ভাবে মৃত্যু-এর আগে দু'জন যেভাবে মরেছে, ঠিক সেইভাবে। তবে এবারে যে বা যারা মেরেছে, শুধু হাতে ফেরেনি—দেরাজের গয়নাপত্র আর টাকাও নিয়েছে। জগদীশ ভাট নার্সিং-হোমেই আছেন, এখনো অসুস্থ খুব। দশটা পনের নাগাদ শোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—ঘরের আলোও তিনি নেভাননি, খুব সম্ভব স্ত্রী বা চাকর-বাকর কেউ নিভিয়েছে। এ. সি. খোঁজ নিয়েছেন সন্ধ্যা থেকেই ভদ্রলোক এক নাগাড়ে ড্রিঙ্ক করেছেন, কাজেই আলো নেভাবার ফুরসৎ পাননি।...ক'জন তাঁকে আক্রমণ করেছিল, ভদ্রলোক বলতে পারলেন না, শুধু গলা টিপে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ করা হচ্ছিল এটুকুই মনে আছে। সমস্ত রাত ভাল করে জ্ঞান হয়নি, কিন্তু তারই মধ্যে একটা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। ডাক্তারদের রিপোর্ট, ঠিকমত সুস্থ হয়ে উঠতে পাঁচ-সাতদিন লাগবে—ব্লাড-প্রেসারও হাই। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর শোনার পর আর একটা কথাও বলেন নি। বারকতক শুধু বাড়ি যেতে চেয়েছেন, আর কিছু না। ওই অবস্থায় তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়েছে বলে ডাক্তাররা অনুযোগ করেছেন।

ডক্টর বাবুলাল ঈষৎ ব্যস্ততায় ঘরের মধ্যে বার দুই চক্কর দিয়ে শেষে বললেন—নো, হি মাস্ট নট কাম, তাঁকে বাড়ি আসতে দেবেন না। ডাক্তার দের বলে রাখুন, তাঁকে যেন অসুখের ভয় দেখিয়েই কিছুদিন আটকে রাখেন। হি মাস্ট নট কাম ব্যাক নাউ। আর একটা কথা—ভাগ্নে, কৃষ্ণকুমার, বন্ধু-বান্ধব, চাকর-বাকর কাউকে নার্সিং-হোমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না—একটা চেনা মাছিও যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারে।

এ. সি. একটু অবাকই হলেন—কেন? ভয়ের কারণ আছে?

—ইয়েস, ইয়েস। হঠাৎ সুর পালটে ফেললেন বাবুলাল, বেশ খুশি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—লেডিস ম্যান কি বলে, অ্যাণ্ড ছাট থিয়েটার ভাগ্নে?

—খবর নিইনি। কোথাও যেতে বারণ করে দিয়েছি, এই পর্যন্ত

আই উড ফিল ফর দেম···রিয়েলি আই ডু, আপনাকে আগেই বলে ছিলাম, লেডি কিলিং স্যুড বি মোর সোবার—অমন একটি মহিলাকে ও-ভাবে যেতে হল বলে এই বয়সেও আমারই বুকটা শুকনো লাগছে—সি ওয়জ্ নট মেড ফর ছাট।

এ. সি. কুল-কিনারা না পেয়েই এসেছেন, নইলে এই ঝামেলার সময় হয়ত আসতেনও না।· রসিকতা বরদাস্ত করতে পারলেন না। —বললেন এবারের কেস্‌টাও আপনার মাথা না-ঘামানোর মতই স্থূল মনে হচ্ছে বোধ হয়?

—ও ইয়েস, একটুও না ভেবেই জবাব দিলেন—ভেরি লাউড। তবে, মাথা ঘামাতে রাজী আছি—লাইক অস্ট্রেলিয়া প্লেইং ক্রিকেট এগেনস্ট আমেরিকা। কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে অফিসিয়ালি ইনভেস্টি-গেশনের ভার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আই মাস্ট নট বি রিফিউজড এনি-হোয়্যার।

এ. সি. অবাক—হত্যাকারী কে আপনি অনুমান করেছেন?

—অনুমান কেন, আমি তো জানি কে।

এ. সি. লাফিয়ে উঠেছিলেন প্রায়—যাদের দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেউ?

—ও ইয়েস। কিন্তু আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

যেন কোন সংশয় নেই। এ. সি. শ্লেষের সুরেই বললেন—কিন্তু এর আগেও দুটো খুন হয়েছে যাদের এই পরিবারের কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই—আপনি ভোলেননি তো?

বাবুলাল হাসতেই লাগলেন—আপনি খুব বিচলিত দেখছি। যা বললাম তাই করুন, আর ভালো কথা মনে করিয়েছেন—যে হাসপাতালে সেই নার্স কাজ করত, থিয়াটার ভাগ্নে, আই মিন, চন্দ্রমোহন সেই হাসপাতালের পেসেন্ট ছিল কি না কখনো, বা ওই নার্সের তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, খবরটা নিন্। আর তারপর যে লোকটা খুন হয়েছে, সে-ও চন্দ্রমোহনের কাছে চাকরির তদ্বির করত কি না জানতে চেষ্টা করুন—টু-ডে দিস ফার।

মরুভূমিতে ওয়েসিস দেখলেন যেন এ. সি.। পরদিন টেলিফোনে তাঁর উত্তেজিত গলা শোনা গেল। ডক্টর বাবুলালের ধারণা সবই ঠিক—এখুনি গ্রেপ্তার করা হবে কি না চন্দ্রমোহনকে সেটাই জানতে চান তিনি।

বাবুলাল সহাস্যে বাধা দিলেন—নো, মায় ডিয়ার নো। ইউ উইল হ্যাভ

ইয়োর গেম, ডোণ্ট ওয়রি।

কিন্তু ওয়রি না করেও পারেন না এ. সি.। এরপর এক নাগাড়ে দু' দিন আর বাবুলালের দেখাই নেই। সকালে এসে শোনেন বেরিয়েছেন, বিকেলে এসে শোনেন বাড়ি নেই। টেলিফোনেরও জবাব পান না—এ. সি. হতভম্ব। এদিকে কুকুর আর গৌরি ভাটের মৃত্যুর পর শহরে একটা ত্রাস পড়ে গেছে। একলা ঘরে শুতেও লোকে যেন আর নিরাপদ বোধ করে না। আর সব কিছুর জের এই তদন্ত-বিভাগকেই সামলাতে হয়।

তৃতীয় দিনে রাতের দিকে দেখা মিলল। এ. সি. কিছু বলার আগেই ডক্টর বাবুলাল প্রস্তাব করলেন—চলুন, কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে গল্প করে আসি।

অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের ওপরে শোবার ঘরেই বসালো কৃষ্ণকুমার। অন্য উপায়ও ছিল না, কারণ বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ভিতরে এসেই পড়েছেন ভদ্রলোকেরা। কোণের ঘর থেকে যশোবন্ত বেরিয়ে এসেছিল, এঁদের দেখে চুপচাপ আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাবুলাল সহাস্যে বললেন—এলাম জালাতন করতে—আপনার মন খারাপ নিশ্চয়—বাট আই অ্যাম নট এ ব্যাড টকার।

মন খারাপ বলাতেই যেন কৃষ্ণকুমার হাসতে চেষ্টা করল। বাবুলাল পরম আগ্রহে ফোটোগ্রাফিরই পাঠ নিতে শুরু করলেন তার কাছ থেকে। শেষে তার তোলা ভালো ফোটো কিছু দেখতে চাইলেন। কৃষ্ণকুমার ড্রয়ার খুলে একগোছা ছবি বার করলে। সেই সঙ্গে হাতীর দাঁতের পাতের ওপর আঁকা সুন্দর একটা নক্সা বেরিয়ে পড়ল। নীচে নীল জল, ওপরে নীল আকাশ—মাঝে দুটি বলাকা ভারী অন্তরঙ্গভাবে উড়ে চলেছে। প্লেটের নীচে শুধু তারিখ লেখা।

হাতীর দাঁতের প্লেটটাই সাগ্রহে তুলে নিলেন ডক্টর বাবুলাল, সপ্রশংস নেত্রে দেখলেন একটু। —ওয়াণ্ডারফুল! হাতীর দাঁতের প্লেটে এ তুললেন কি করে?

কৃষ্ণকুমার জানালো, ছবি তুলে পরে আর্টিস্ট দিয়ে আঁকিয়ে নেওয়া হয়েছে।

—হাউ নাইস! এ. সি-র দিকে তাকালেন বাবুলাল—আমি আপনাকে বলেছিলাম না, হি ইজ এ রিয়েল আর্টিস্ট।

কিন্তু স্তুতি সত্বেও কৃষ্ণকুমারের মুখখানা শুকনোই দেখাতে লাগল। বাবুলালের এবার হঠাৎই তারিখটার দিকে চোখ গেল যেন, বলে উঠলেন—

কবে করিয়েছেন এটা—এতে তো দেখছি মিসেস ভাটের জন্মদিন—মৃত্যুদিনও বলতে পারেন—সেই তারিখ! চট করে উঠে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে জগদীশ ভাটের বাড়িটা ভালো করে একবার দেখে নিয়ে আবার এসে বসলেন। প্লেটের দিকে চোখ রেখে হাসছেন মৃদু মৃদু—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে'—পড়েছেন? রবীন্দ্রনাথ· ·আমার নামটা বিদঘুটে হলেও আমি বাঙালী, জানেন তো?

হাসতে লাগলেন, যেন এটাই একটা খবর। তারপর কোমল গলায় সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন--এটা মিসেস ভাটকে উপহার দেবার ইচ্ছে ছিল বোধহয়?

পাংশুমুখে কৃষ্ণকুমার মাথা নাড়ল শুধু। তার দিকে চেয়ে বাবুলাল তেমনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। —ছিল না? হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! একটু ভেবে বলুন, সামটাইমস্ লাইইং প্রুভস ভেরি কস্টলি—ভেরি, ভেরি! তাকে অবকাশ না দিয়েই আবার প্রশ্ন করলেন--আচ্ছা, আপনার এই ফোটোগ্রাফির ব্যবসা কত দিনের?

—চার পাঁচ বছর।

—দু'বছর আছে আগে ব্যবসার অবস্থা কেমন ছিল?

—খুব ভালো নয়।

—কিন্তু এখন তো খুব ভালো চলছে, জায়গায় জায়গায় ব্রাঞ্চ করেছেন——কম করে লাখ টাকার অ্যাসেট তো হবেই, কি বলেন? কৃষ্ণকুমারের জবাব দেবার শক্তি নেই যেন, জবাবের প্রতীক্ষাও করলেন না বাবুলাল। আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন—হঠাৎ এত মূলধন আপনি কোথায় পেলেন?

শুকনো মুখে কৃষ্ণকুমার তাকালো তাঁর দিকে। —ধার করেছি।

—ডকুমেন্ট আছে?

—না।

--ভেরি লাইকলি। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম গত দেড় বছরের মধ্যে মিসেস গৌরী ভাট সব মিলিয়ে আপনাকে প্রায় ষাট হাজার টাকার চেক দিয়েছেন—আপনার ধারটা তাঁর কাছেই বোধ হয়?

এবারে এ. সি-ও হতভম্ব। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে কৃষ্ণকুমারের, কাঁপছেও একটু একটু। এর ওপর ডক্টর বাবুলালের আর একটা নির্মম প্রশ্ন—জগদীশ ভাটের কুকুর রাতে আপনাকে দেখলে ডাকত? প্লীজ—প্লীজ টেল মি ইয়েস অর নো!

কৃষ্ণকুমার মাথা নাড়ল—ডাকত না।

—থ্যাঙ্ক ইউ! ডক্টর বাবুলাল এ. সি. কে উঠতে ইশারা করে সরাসরি নীচে নেমে এলেন। গাড়িতে উঠে এ. সি. বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন প্রায়—কি ব্যাপার? আপনার ধারণা তো সবই ঠিক দেখছি—

মৃদু হেসে বাবুলাল বললেন—ওখানেই শেষ নয়। ···আমার ধারণা সেই রাতে কৃষ্ণকুমার গৌরী ভাটের ঘরে এসেছিল।

—কিন্তু—

—হোয়াই কিন্তু? সকলেই জানে কর্ত্রী চাকর-বাকরদের সকলকে নিজে বিদায় করেছেন, আর জগদীশ ভাটেরও মদে বেহুঁশ হয়ে থাকার কথা—কৃষ্ণকুমার আসবে না কেন।

এ. সি. অবাক—তাহলে ওকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন?

—ওয়েট। আমার আরো ধারণা—সেই রাতে চন্দ্রমোহনও মামীর কাছে এসেছিল—মে বি, টাকা নিতে—কিন্তু এসেছিল। রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে সে তার বন্ধুর কাছে ছিল না, অ্যাটর্নিষ্ট বন্ধু তার কাছে ছিল না—এগারটার পর বন্ধু বাড়ি এসে দেখে সে তার জন্য অপেক্ষা করছে—চন্দ্রমোহন তাকে বলেছে সে আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করছে।

এ. সি. অথৈ জলে পড়লেন। শেষে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন—তাহলে আমি কি করব এখন?

—সিম্পলি ওয়েট। খানিক চুপ করে থেকে হাসলেন হঠাৎ—হোয়াট এ সিলি মার্ডার! এ. সি.-র দিকে তাকালেন ওই কুকুর মারা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

এ সি. জবাব দিলেন—চেনা লোক ভিন্ন ওভাবে কুকুর কেউ মারতে পারে না।

—রাইট। কিন্তু মারল কেন?

একটু ভেবে এ. সি, জবাব দিলেন—বোধহয় আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্য, যাতে কুকুরটাকে আমরা বাধা ভেবে হত্যাকারীকে অপরিচিত লোক মনে করি।

—ইউ আর এ জেম, পারফেক্টলি রাইট!

কিন্তু জেম এবং রাইট হয়েও হতভম্বের মতই বসে রইলেন এ. সি.।

পাঁচ

ছুটির দিন। দুপুরে কৃষ্ণকুমারের বাড়ির দোতলায় উঠে যশোবন্তকে দেখে

বিরক্ত মুখেই চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করল—বাবু আছেন ?

জবাবে যশোবন্ত কৃষ্ণকুমারের ঘরটা দেখিয়ে দিল শুধু। চন্দ্রমোহন ঘরে ঢুকেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল—আর কাঁহাতক সহ্য হয় বলুন তো ? এটা অত্যাচার নয়।

কৃষ্ণকুমার শুয়ে ছিল, উঠে বসে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালে শুধু। চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে চন্দ্রমোহন বলল—মামা হাসপাতালে, একবার দেখা পর্যন্ত করতে দেবে না। কিন্তু এদিকে বাড়ি চলে কি করে, হাতে তো একপয়সাও নেই।

কৃষ্ণকুমার নিস্পৃহ জবাব দিল—সেকথা ওঁদের বলেন না কেন ?

—বলিনি! ওই গোয়েন্দার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম আজ। সেখান থেকেই তো আসছি। শুনে বলে—হাওয়া খান। বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে অথচ রসিকতা দেখুন! সিঁড়িতে পা পিছলে আলুর দম, গিয়ে দেখি যন্ত্রণায় ডাক্তারকে হাত ধরে অনুরোধ করছে, রাতে একসঙ্গে তিনটে ঘুমের ওষুধ দেবার জন্যে—অথচ আমায় দেখেই যেন রোগশোক সব ভুলে গেল। আবার আশা দিল, মামীকে যে খুন করেছে, দু'তিন দিনের মধ্যেই ধরা পড়বে—তখন যেন পোলাও-কালিয়া খাই। সহ্য হয় ? ইচ্ছে করছিল, একসঙ্গে তিরিশটা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে জন্মের মত ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কৃষ্ণকুমার চিন্তিত মুখে বলল—আপনার মামী ছাড়া আরো দু'জন বাইরের লোকও তো খুন হয়েছে—তিনি এদিকের কাউকে সন্দেহ করছেন কেন ?

গোয়েন্দার অভাবে কৃষ্ণকুমারকেই খেঁকিয়ে উঠল চন্দ্রমোহন কেন আবার বুদ্ধির ঢেঁকি না ওঁরা ? আমি বলেছিলাম—বলে কি জানেন ? আসল খুন নাকি মামীর খুনটাই—ও দুটো খুন পুলিসকে আর অন্য সব লোককে ভাওতা দেবার জন্য। জাহান্নমে যাক, গোটা পঁচিশ টাকা দেবেন এখন ? হাতে এক কানাকড়ি নেই।

চুপচাপ উঠে কৃষ্ণকুমার টাকা বার করে দিল। প্রাপ্তির ফলে একটু খুশি দেখা গেল চন্দ্রমোহনকে। বলল—যাক বাঁচালেন, মামা না আসা পর্যন্ত কি যে করি—এদিকে তো মামার এমন অসুখ যে, আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করারও হুকুম নেই, অথচ আমার সামনেই বাবুলাল পুলিসের টাইটাকে বলল,—মামাকে কাল একবার তার ওখানে নিয়ে আসতে—ঠ্যাং ভালো থাকলে সে নিজেই যেত। মামার সঙ্গে কথাবার্তা বলা হলে কালকের মধ্যেই

সে খুনীকে ধরে দিতে পারবে আশা করছে। ওর মাথা আর মুণ্ড কালকের মধ্যে মামার সঙ্গে দেখা না করতে দিলে হাসপাতালের বিরুদ্ধে আমিই কেস করব, মামাকে জোর করে আটকে রেখেছে ওরা—তাও না হয় রাখল, চেক সই করে টাকা পাঠাতে দিচ্ছে না কেন? না খেয়ে চাকর-বাকরগুলো শুদ্ধ, যখন পালাবে—। এমন একটা অসহ্য অবিবেচনার ক্ষোভে গরগর করতে করতে চন্দ্রমোহন প্রস্থান করল। কৃষ্ণকুমার স্থানুর মত বসে।

* * *

রাত্রি। অন্ধকারে লোক চলাচল থেমে গেছে। দু'দিকে গাছ আর ডাল পালায় বাবুলালের বাসাটা আরো নিঝুম মনে হচ্ছে। বাইরের বারান্দায় সামান্য শব্দ হল একটু। দড়ির ফাঁস লাগিয়ে সন্তর্পনে কেউ দোতলায় বারান্দায় নামল। পা টিপে ঘরের দরজার কাছে কান পাতল। ভেতরে ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। পকেট থেকে দুটো দস্তানা বার করে হাতে পরে নিল, তারপর আস্তে ঘরে ঢুকল। দু'হাত বাড়িয়ে শয্যার দিকে এগোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো ঝকমকিয়ে উঠল। আড়াল থেকে রিভলভার হাতে এগিয়ে এলো এ. সি. এবং আরো চার পাঁচ জন। ডক্টর বাবুলাল উঠে বসলেন, নিস্পন্দ মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন—এমন বোকা তুমি যশোবন্ত! অ্যাঁ? ওষুধের বড়ির ঘুমটা আর যাতে না ভাঙে সেই ব্যবস্থা করতে এসে গেলে।

পুলিস তৎক্ষণে কর্তব্য সমাধান করেছে। বাবুলাল বললেন—ওর দস্তানা দুটো দেখুন তো ভালো করে।

দেখা গেল দু'দিকে দুটো লোহার থাবার মত আটকানো।

যশোবন্ত চিত্রার্পিত।

বাবুলাল এ. সি-কে বললেন—আপনাকে আরো একটা অ্যারেস্ট করতে হচ্ছে, এক্ষুনি যান।

এ. সি. সানন্দে জবাব দিলেন—সে এতক্ষণে করা হয়ে গেছে, এই মূর্তিটি বাড়ি থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমারকে অ্যারেস্ট করার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

—মাই গড! দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন বাবুলাল—বলেন কি মশাই!

সে কি করল? স্বর্ণপ্রসূ হাঁসকে বইয়ের মূর্খ'ই মেরে থাকে, সত্যি সত্যি কি কেউ মারে? গৌরী ভাটের মৃত্যুতে কৃষ্ণকুমারেরই তো ক্ষতি সব থেকে

বেশি! নো নো, ইউ আর জোকিং—এক্ষুনি হাসপাতালে গিয়ে যশোবন্তের আসল মনিবটিকে অ্যারেস্ট করুন—গো অ্যাণ্ড অ্যারেস্ট জগদীশ ভাট! ...কৃষ্ণকুমার ওকে সত্যিই রাত আটটায় স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ও ফিরে এসে সব কাজ সেরে আবার সাড়ে এগারোটার গাড়ীতে ক্যামেরা নিয়ে গেছে। কি বলো যশোবন্ত?

সকলের নির্ব্বাক মূর্তির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হৃষ্টকণ্ঠে বাবুলাল এ. সি-র উদ্দেশেই বললেন আবার—যাবার পথে ওই থিয়েটার-ভাগ্নে চন্দ্রমোহনকে আমার হয়ে একটা কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে যাবেন—কৃষ্ণকুমারের বাড়িতে তার দুপুরের অভিনয় ভালই হয়েছিল বলতে হবে। আচ্ছা, গুডনাইট অল অফ ইউ—গুডনাইট যশোবন্ত! আই অ্যাম রিয়েলি সরি, তোমার হাত মজবুত, কিন্তু মাথা বড় কাঁচা মিঃ ভাটেরও! ইউ স্পয়েল্ড এভরিথিং বাই কিলিং দি ডগ। অ্যাণ্ড মোরওভার, বাইরের পেশাদার হত্যাকারী ঘরের পুরুষকে বেঁধে স্ত্রী হত্যা করে না, প্রথমেই পুরুষকে হত্যা করে, তারপর দরকার হলে স্ত্রীলোকের কথা ভাবে।

———

॥ **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** ॥ জন্ম ১৯২১ সালে কলকাতায়। আবাল্য শহর আশ্রিত লেখক জাত শিল্পীর কুশলতায় ও কারুকার্যে গল্প লেখেন। তাঁর মিষ্টি হাতের "সৃষ্টি"গুলি জনপ্রিয়তায় সদাসর্বদা তুঙ্গে।

লেখক তাঁর চিন্তা ও ভাবনাগুলিকে তাঁর অনবদ্য ভাষার যাদুমন্ত্রে মন্ত্রিত করে পরিবেশন করেন। তিনি মূলতঃ জীবন প্রেমিক ও মানব প্রেমী। তাই আশা নিরাশায় ভরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দলিল দস্তাবেজ তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠলেও বিষাদ চেতনায় মগ্ন মানব মানবীর অন্তিম উত্তরণ তাঁর লেখায় স্পষ্ট। তাই তিনি নিঃসন্দেহে আশাবাদী ও মানবতাবাদী।

আশুতোষবাবু মানব মানবীর হৃদয়ের অন্তর্লীন সংঘাত ও দ্বন্দ্বের কোষ্ঠীবিচারে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন তা তাঁর একমাত্র সার্থক গোয়েন্দা এই সংকলিত গল্পেও সুস্পষ্ট।

গল্পটি আজ হতে প্রায় এক দশক পূর্বে লেখা।



আহত প্রকাশক

হিমানীশ গোস্বামী

প্রকাশক মশাই মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে বসে ছিলেন গোয়েন্দা দাঁ-এর বৈঠকখানায়, তাঁর চোখ মুখে যা দেখা যাচ্ছিল তা কেবল ভয়। তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন আর ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন।

গোয়েন্দা দাঁ সেটা বুঝে বললেন, ভয় পাবেন না, এখানে কেউ আপনাকে আক্রমন করতে আসবে না। আপনার যা বলবার বলে যান। আপনি কোনরকম সঙ্কোচ করবেন না। আমার পাশে যিনি বসে রয়েছেন তিনি হলেন গোয়েন্দা দে। উনিও একজন নামকরা লোক, হয়ত নাম শুনে থাকবেন। আমার সঙ্গে বহুদিনের বন্ধুত্ব, প্রায় অভিন্ন-আত্মা বলতে পারেন। এঁর সামনে আপনি বিনা দ্বিধায় সমস্ত কথা বলতে পারেন, আর যদি চান তাহলে ইনি পাশের ঘরে চলে যেতে পারেন। অথবা আর এক কাজ করা যেতে পারে। আমি এবং আপনি দুজনেই পাশের ঘরে চলে যেতে পারি গোয়েন্দা দে মশাই যেমন আছেন তেমনি থাকুন বসে। আপনার যা ইচ্ছে।

প্রকাশক মশাই বললেন, না না উনি যদি এখানে থাকতে চান থাকবেন, কোনো আপত্তি নেই। তবে কি জানেন···এই মানে ফী কিন্তু তার জন্য ডবল করবেন না। আমি গরীব প্রকাশক, বুঝতেই পারছেন। দিন আনি দিন খাই। গরীব প্রকাশক! গোয়েন্দা দাঁ ভাবলেন—নিউ আলিপুরে ওঁর এগারোখানা বাড়ী—একটাতে তিনি থাকেন, বাকিগুলো ভাড়া দিয়ে থাকেন। তিনখানা গাড়ি—তা ছাড়া আরো কত রকম ঐশ্বর্য। ইনি গরীব! সত্যি, গোয়েন্দা দাঁ ভাবলেন, বিনয় একেই বলে। তিনি কেবল বললেন, আপনি গরীব—আপনার অতগুলো বাড়ি, গাড়ি··· ।

প্রকাশক মশাই বললেন, ওসব শুনতেই ঐরকম। আজকাল বাড়ি গাড়ি যাই বলুন, থেকে সুখ নেই। হাজার রকম খুঁত, হাজার রকম মেরামত। খরচ লেগেই আছে। আর টাকা? লোকে বলে আমার টাকা অগুণতি। কথাটা একদম বিশ্বাস করবেন না। আমার টাকার হিসেব ঠিকই রয়েছে—ছেষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো আটত্রিশ টাকা। কালই স্টেটমেণ্ট পেয়েছি। তবে কি জানেন দাদা, টাকার কোনো মূল্য নেই—কোনো মূল্য নেই মশাই। গত বছরে যে মাছ চার টাকা কেজিতে পেয়েছি সেই মাছই এ বছরে চার টাকা পঞ্চাশ। বুঝুন ঠেলাখানা—এক ধাক্কায় পঞ্চাশ পয়সা বেড়ে গেল। মাছ অবশ্য দুবেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। এক বেলাই ভাল, তা ছাড়া উপর থেকে ডাকও আসছে। ডাক্তার বলেছেন, আর বেশিদিন নয়—মেরে কেটে আর বড়জোর ত্রিশ বছর। বাস—তারপরই খেল খতম। কিংবা হয়ত তার আগেই খেল খতম হয়ে যাবে। জীবনটা তো একটা অদ্ভুত খেল। তা ছাড়া আমার বন্ধুরাও যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন। কালই হয়েছে ব্যাপারটা—কাল রাত্রে। আপনাকে তো টেলিফোনে অনেকটা বলেছি। বুঝে দেখুন, আমারই বাড়িতে, আমারই জন্মদিনে, আমরই প্রাণনাশের চেষ্টা। ভাগ্যিস আঘাতটা তেমন লাগেনি, নইলে এখানে বসে আপনার সঙ্গে গপ্পো করতে পারতাম না।

প্রকাশক মশাই কেঁপে উঠলেন আর একবার, বোধ হয় গত রাত্রের কথা স্মরণ করেই।

গোয়েন্দা দাঁ আড়চোখে দেখলেন গোয়েন্দা দে আপন মনে ইংরিজী কাগজের ক্রসওয়ার্ডের উপর চোখ রাখলেও কান দুটো বোধ হয় সমস্ত কথাই শুনে নিচ্ছে। গোয়েন্দা দাঁ তাঁর চশমাটা ঠিক করে পরে নিলেন, তারপর বললেন, গোড়া থেকেই সবটা বলুন না!

প্রকাশক মশাই বললেন, গোড়া থেকেই বলছি, শুনুন তাহলে। কাল আমাদের বাড়িতে ছিল একটা ছোটখাট প্রীতিভোজের আয়োজন। প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজোর পরদিন আমাদের বাড়িতে এটা হয়ে আসছে—প্রায় বছর বারো ধরে। এই দিনে আমি দেশের কবি শিল্পি সাহিত্যক ঔপন্যাসিক ছোট গল্প লেখক প্রবন্ধকার ইত্যাদি ব্যক্তিকে একটু জলযোগে আপ্যায়ন করি। প্রত্যেকেই বলতে নেই, আমাকে ভালবাসেন—নইলে আমার আর কি গুণ আছে বলুন। এইসব লেখকদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত ভদ্রলোক। কেউ কেউ একটু অন্যরকমও আছেন, বলা বাহুল্য।

—অন্যরকমও কেউ কেউ আছেন? গোয়েন্দা দাঁ প্রশ্ন করলেন!

প্রকাশক মশাই বললেন,' আছেন বই কি! আছেন ধরুন একজন লেখক আমাকে একটা বই দিলেন ছাপ্‌তে। আমি ছাপতে রাজি হলাম, এক শর্তে, তার তা হল বইটা যদি পছন্দ হয় তবেই! এটা এমন কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু বইটা তো পড়তে হবে—তার জন্য সময় লাগে! আর একটি তো বই নয়—কত বই-এর পাণ্ডুলিপি আমার গুদাম ঘরে রয়েছে কত লেখকের। পড়তে, ঠিক করতে দেরি হয়ে যায়! ধরুন পাঁচ ছ বছর! তা এসব লেখকের ধৈর্য একেবারে নেই। তাঁরা যেন দমকলে চড়ে আসেন আর খবরের কাগজের ছাপার মত তাড়াতাড়ি সব ছাপিয়ে ফেলতে চান! অপেক্ষা না করে, ধৈর্য না ধরে কে কবে উন্নতি করতে পেরেছে বলুন?

—ঠিক বলেছেন! গোয়েন্দা দাঁ বললেন। —আরো সব আছেন লেখক, তাঁদের আবার কত বায়নাক্কা। বই ছাপব আমি, কিন্তু তাঁকে বলতে হবে কবে ছাপা হবে! তাগাদার পর তাগাদা দিয়েই চলেন! এক একজন লেখক আছেন যাঁরা দশ বছর ধরে তাগাদা দিয়ে চলেছেন। বললেন প্রকাশক মশাই।

—দশ বছর? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন গোয়েন্দা দাঁ!

—তবে আর বলছি কি। এক বছর নয়, দু বছর নয় দশ বছর ধরে তাগাদা দেওয়া। এক সব বাতিকগ্রস্ত লেখক। সাধারণত প্রবন্ধ লেখকেরাই এত বছর ধরে তাগাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু ঔপন্যাসিক একটা দেখতে পারেন না যাঁরা আমাকে তাগাদা দিয়েছেন! আসলে কি জানেন, ঔপন্যাসিকেরা অসাধারণ ভদ্রলোক।

তারপর একটু থামলেন। মাথাটা একটু টিপে টিপে দেখলেন। একটু আস্তে করে বললেন, বাংলাদেশের সত্যিকারের সাহিত্য ওঁরাই সৃষ্টি

করছেন। এক একজন ঔপন্যাসিকের এমন সব সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে যা লোকেরা লুফে নেয়। আর যাঁর লেখা যত লোফা হয় তাঁরা তত ভদ্রলোক। প্রকাশের বেলায় কখনো তাঁরা তাগাদা দেন না। তবে হ্যাঁ তাঁদেরও দোষ অনেক আছে। তাঁরা আবার সব সময়েই হয় গাড়ি কিনছেন, নয় জমি কিনছেন, নয় মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, নয়তো ফার্নিচার কিনছেন। সাহিত্য তো সাধনা, তা তাঁরা তাই নিয়ে থাকলেই পারেন এইসব জিনিসে কি কাজ? যাই হক আসল কথা অধিকাংশ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকই দেখি টাকার বেলায় একটু মায়া দয়াও করেন না! পাই পয়সাটি পর্যন্ত হিসেব কষে নিয়ে নেন। তা এঁদের সহ্য করতেই হয়···আচ্ছা, এবারে বলি কাল কি হয়েছিল। এসব কথা বোধ হয় আপনাদের···।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সব কথাই ভাল লাগে আমাদের, বলে যান বেশ ভাল লাগছে। সাহিত্য জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাচ্ছে। কবিতা লেখকদের কি রকম মনোভাব?

প্রকাশক মশাই বললেন, ঠিক জানি না। একটা কবিতার বইও আমি এ যাবৎ প্রকাশ করিনি।

তবে যে—গোয়েন্দা দাঁ বললেন আপনার বাড়ীতে কবিদের নিমন্ত্রন করেছিলেন কাল; এবং প্রতি বছরই করে থাকেন।

প্রকাশক মশাই বললেন, তাঁরা, কেবল যে কবিতা নয়। তাঁরা উপন্যাস লেখেন গোয়েন্দা কাহিনী লেখেন তাই তাঁদের ডাকি। কেবল কবি যাঁরা কিছু মনে করবেন না, তাঁরা আমার নিমন্ত্রণের তালিকায় নেই, এবং তাঁরা ঠিক এ পৃথিবীর লোক বলে মনে হয় না। তাঁরা কি বলেন তাঁরাই জানেন। পাঠকেরা মোটেই তাঁদের লেখা লোফে না। —আর যাঁরা গল্প লেখেন? —গল্প আমি ছাপি। তবে সত্যি কথা বলতে কি বাংলা সাহিত্যে গল্প আর চলবে না। বিশেষ করে ছোট গল্প। এখন উপন্যাসের যুগ আর যুগের ধর্ম আচরণ করাই আমার লক্ষ্য।

—কার গল্প ছাপেন?

—যাঁর উপন্যাস দশখানা অন্তত আমার ঘরে আছে আমি কখনো তাঁর একটা গল্পের বই প্রকাশ করে থাকি।

—প্রবন্ধ?

—প্রবন্ধের বই আরো কম ছাপি। তবে প্রথমে লেখককে উপন্যাসিক হতেই হবে।

—আই সী। বললেন গোয়েন্দা দা। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। এক মুহূর্ত গোয়েন্দা দে-কে দেখলেন। গোয়েন্দা দে সজাগই আছেন দেখলেন। তারপর বললেন, এবার বলুন কাল রাত্রির ঘটনা।

কাল রাত্তির—হ্যাঁ, কাল রাত্তিরের ঘটনা বলি। তাই বলতেই এসেছি। তবে আমি আপনাকে একটা কথা আগেই বলে রাখি অন্তত তিনশো জন সাহিত্যিক ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত দুশো জন লোক আমার কাছে নিয়মিত টাকার জন্য তাগাদা করে থাকেন। এর মধ্যে অনেকেই ভদ্র। কেউ কেউ পাঁচ ছ বছর আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও বার করতে পারেননি। প্রকাশক মহলে এ নিয়ে আমার প্রতি অন্য অনেক প্রকাশকের দারুণ ঈর্ষা। কিছু ঘৃণাও আছে—মিথ্যে বলব না। কোনো কোনো লেখককে দশ বছর কিছু দেননি এরকম কথা আমি জানি—কিন্তু সে দু একটা মাত্র কেস। আমার মত এমন ব্যাপকভাবে টাকা না দেওয়া খুব কম লোকেই করতে পারেন। যাঁরা টাকা দেন তাঁরা প্রকাশ করা তুলে দেন, বা কোনোমতে টিকে থাকেন আর যাঁরা দেন না তাঁরাই বড় হতে থাকেন। আমি টিঁকে আছি—অতএব আমি প্রকাশক হিসেবে অনেক—অনেক বড়। সেই হিসেবে মিথ্যে বলব না, আমার বন্ধু যেমন কম শত্রু তেমনি বেশি। কাল রাত্তির আটটা বত্রিশ মিনিটের সময় হঠাৎ আমার বাড়ির সমস্ত আলো নিবে যায়। আর একজন লোক চুপচাপ আমার দিকে প্রায় পেছন ফিরে একটা বই পড়ছিল—সে যে কে আমি খেয়ালই করিনি, হঠাৎ অন্ধকার হওয়ায় একটা বিরাট আধলা ইট আমার দিকে ছুঁড়ে মারে। সে যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার গায়ে আলোয়ান ছিল। কাল শীতে অবশ্য প্রচুর লোকেই আলোয়ান পরে ছিলেন। প্রায় সব সাহিত্যিক একই ধরনের আলোয়ান গায়ে দিয়ে থাকেন এটা একটা অত্যন্ত বদ অভ্যেস তাদের। যাই হোক, তার টিপ দারুণ। দুম করে আমার মাথায় ইঁটটি এসে লাগে। আমি অন্ধকার দেখি। তারপর রক্ত বেরতে থাকে মাথা দিয়ে। তবে ভাগ্যের কথা, জ্ঞান আমি সম্পূর্ণ হারাই নি। চিৎকার করে উঠি। দু' মিনিটের মধ্যেই কিংবা তার একটু আগেই আলো জ্বলে ওঠে। তখন অবশ্য বোঝা গেল না কে আমাকে মেরেছে। সকলেই আহা—উহু করছে। এখন আমি জানতে চাই কে আমাকে মেরেছে?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, ব্যাপারটা একটু শক্ত বলেই মনে হচ্ছে। অত লোক, তার মধ্যে সন্দেহ করা, সন্দেহ করে কি লোক বার করা, এবং কেবল তাই নয় প্রমাণ করা দুরূহ।

প্রকাশক মশাই বললেন, দুরূহ তো বটেই। দুরূহ বলেই তো আপনার কাছে আসা। দুরূহ না হলে আমি নিজেই বার করে ফেলতাম। আচ্ছা, এ ধরনের কেস-এ আপনার ফী কীরকম?

গোয়েন্দা দাঁ ভাবলেন একটু। এ ধরনের কেস্‌-এ তিনি ফী যা নিয়ে থাকেন তা বলা তাঁর পক্ষে কঠিনই হয়ে পড়ল কেননা এই প্রথম তিনি এ ধরনের কেস হাতে পেলেন। যদিও লেখক কর্তৃক প্রকাশককে হত্যার চেষ্টা এই প্রথম কলকাতায় ঘটেনি। তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, দু হাজার।

—দু হাজার?

—হাজার। গম্ভীর গলায় বললেন গোয়েন্দা দাঁ। গলার আওয়াজ শুনে গোয়েন্দা দেও চমকে উঠলেন। গোয়েন্দা দাঁর সাহস দেখে তিনি একটু অভিভূত হলেন। তিনি গোয়েন্দা দাঁকে শ' তিনেক টাকার বেশি পেতে সম্প্রতিকালে দেখেন নি।

প্রকাশক মশাই বললেন, বলেন কি মশাই, দু···দু···দু···হাজার?

গোয়েন্দা দাঁ বললেন দু হাজার প্রথমে। একমাস সময় নেব। যা খরচ হবে আপনার। যদি কাউকে ধরতে পারি, প্রমাণ করতে পারি তাহলে আরো দু হাজার।

প্রকাশক মশাই ইতস্তত করতে লাগলেন।

—ভেবে দেখুন। বললেন গোয়েন্দা দাঁ। আর একটা কথা, আমার কনসালটেশন ফী আড়াইশো টাকা।

প্রকাশক মশাই-এর চোখ দুটি কপালে উঠলো। বললেন, একটু কম টম করতে পারেন না।

না। আমার ফী মোটামুটি বাঁধাধরা।

আজকাল মোটেই কাজ নিতে চাইনে। বয়স হয়ে গেছে তো।

প্রকাশক মশাই বললেন, প্রথমে আপনি কি করবেন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, প্রথম তিনদিন একটু আধটু পড়াশুনা করতে হবে ক্রিমিনোলজির ব্যাপার নিয়ে। তারপর তিনদিন···। বলছেন, হঠাৎ বাধা পেলেন। গোয়েন্দা দে খস্‌ খস্‌ করে কাগজে কি লিখে তাঁর হাতে দিলেন।

গোয়েন্দা দাঁ এক মুহূর্তে সেটা পড়ে নিয়ে বললেন, একটা কথা, যে লোকটা আপনার দিকে পেছন ফিরে ছিল যিনি একটা বই পড়ছিলেন বলছেন, সেই বইটির নাম কি ?

বইটির নাম জগাখিচুরী। সবুজ মলাটের বই। একবার বইটি পাশে রেখেছিল লোকটা। আমি চট করে বুঝতে পেরেছি। আর তা ছাড়া আমারই প্রকাশিত বই। ছ বছর আগে বেরিয়েছিল। লেখকেব নাম জগদীশ খিচুড়িয়া। কিছু প্রবন্ধ হালকা গোছের নিয়ে বইটি, অতি রদ্দি বই। ছ বছরে মাত্র তিন সংস্করণ হয়েছে।

——থ্যাঙ্ক ইউ। এবারে আপনি যাঁদের নেমন্তন্ন করেছিলেন এবং যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের তালিকাটি একবার পাঠিয়ে দেবেন, নমস্কার। আর ভুলবেন না আমার ফীটাও…।

বিরস কণ্ঠে প্রকাশক মশাই বললেন, আচ্ছা। তারপর আস্তে আস্তে দরজা খুলে নিচে নেমে গেলেন।

প্রকাশক মশাই চলে গেলে গোয়েন্দা দাঁ হেঁসে উঠলেন বেশ জোরেই। বললেন, বাপরে বাপ কি অসাধারণ লোক ইনি। দারুণ শক্ত মাথা এর। আধলা ইটেও তেমন কিছু হয়নি। বলেন কিনা ছ বছরে তিনটে মাত্র সংস্করণ হয়েছে একটা প্রবন্ধ বই-এর। বইটা নাকি রদ্দি! যাই হক কিছু দিন ওঁর টাকায় ফুর্তি করা যাবে। কি বলেন মিষ্টার দে ?

গোয়েন্দা দে বললেন, আমি সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছি আপনার নার্ভ দেখে। কেমন ঠাণ্ডা মাথায় বললেন দু হাজার টাকা ফী-এর কথা! কেমন ঠাণ্ডা মাথায় বললেন আড়াইশ টাকা কনসালটেশন ফী এর কথা। কেমন অবিচলিতভাবে বললেন আপনার খরচের কথা এবং সফল হবার পরের দু হাজার টাকার কথা! আমি কল্পনাও করতে পারিনি মশাই আপনি এটা করতে পারবেন।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, এক একটা পারসোনালিটি থাকেন যাকে দেখেই মনে হয় এই সেই স্বর্ণ খনি। প্রকাশক মশাইকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল প্রথম থেকেই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম অতগুলো লেখকের ভেতর থেকে ইঁট মারা লোকটিকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই ভাবলাম একটা অসম্ভব ফী-এর কথা বলি। এমন ফী যা দিয়ে আমার গাড়ীটাকে সারানো যাবে সফল যদি নাও হই তাহলেও! এদেরই বলা হয় শাঁসালো মক্কেল, বুঝেছেন ? এবার বেশ কিছুদিন কিছু

অনুসন্ধানের ভান করে দিব্যি গাড়িতে করে রাঁচীতে যাওয়া যাবে যতীশের কাছে। বহুদিন ধরেই লিখছে ওখানে গিয়ে কয়েক দিন কাটিয়ে আসতে।

গোয়েন্দা দে বললেন অনুসন্ধান আর করতে হবে না। ইঁটকে ছুঁড়ছে আমি বোধ হয় জানি।

অবাক হলেন গোয়েন্দা দাঁ—জানেন?

গোয়েন্দা দে বললেন, বোধ হয় জানি। নিশ্চিত নয়। নিমন্ত্রিতদের তালিকা পেলে আরো নিশ্চিত হতে পারি।

—নামটা বলবেন?

—একটিই তো নাম এতক্ষণে হয়েছে। জগদীশ খিচুড়িয়া।

—জগদীশ খিচুড়িয়া? কিন্তু সে তো একটা বই—কি যেন সেটার নাম ···হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জগাখিচুড়ি, তারই লেখকের নাম।

গোয়েন্দা দে বললেন, হ্যাঁ তাই। তবে উনি একা নন সঙ্গে আরো কেউ ছিলেন। ইঁট হাতে তিনি প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। এমন সময় তাঁরই লেখক আলো নিবিয়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইঁট ছুঁড়ে মারেন। প্রবন্ধ লেখকেরা ইঁট ছুঁড়ে মারবেন এটাই স্বাভাবিক।

গোয়েন্দা দাঁ বললেন, সেখানে তো প্রবন্ধ লেখক আরো বেশ কয়েক ডজন থাকবার কথা।

গোয়েন্দা দে বললেন আপনি দুদিন কেবল অপেক্ষা করুন তারপরই দেখবেন আমার কথা মেলে কি মেলে না! ইতিমধ্যে আপনি ভাবুন। তবে আপনি বোধ হয় এর আসল ব্যাপারটা ধরতে পারবেন না। আমার শালা হরিশ গল্প টল্প লিখে থাকে। তার কাছে অনেক কথা সব শুনেছি। আমি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কতকগুলো ব্যাপার জেনে ফেলেছি। গোয়েন্দা দাঁ বললেন ব্যাপারটা কি খুলে বলবেন? গোয়েন্দা দে বললেন বলব বই কি। কোন সাহিত্যিক অন্য কোন সাহিত্যিকের লেখা পড়েন না। গোয়েন্দা দাঁ একথা শুনে চেয়ার থেকে হঠাৎ পড়ে যাচ্ছিলেন। কোন রকমে সামলে নিলেন। বললেন সে কি কথা গোয়েন্দা দে বললেন তবে আর বলছি কি! এখন আমার শালার কথা যদি মেনে নিই তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি—সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন বই পড়ছিলেন। এখনকার লেখা সে বই বার করলেই বোঝা যাবে কে সেই বই পড়ছিলেন। বইটির লেখকের নাম জগদীশ খিচুড়িয়া যখন তখন পাঠকের নামও তাই! সোজা হিসেব। গোয়েন্দা দাঁ বললেন তবে আপনি তখন বললেননি কেন? গোয়েন্দা দাঁ

বললেন পাগল নাকি? তাহলেই সব মাটি হতো। একটি পয়সা পেতেন না ঐ প্রকাশকের কাছ থেকে। তাছাড়া আপনি একজন সদয় হৃদয়বান লোক। আপনি কি জগদীশ খিচুড়িয়াকে ধরে জেলে দিতে চান, এই সামান্য অপরাধে? গোয়েন্দা দাঁ বললেন, না সত্যি জেলে দিতে চাই না। কিন্তু করি কি? গোয়েন্দা দে বললেন ফুর্তি। প্রকাশকের টাকায়।

———

॥ **হিমানীশ গোস্বামী** ॥ জন্ম ১৯২৭ সাল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও শিল্পের সাথে পৈত্রিক সহবাস পরিমল গোস্বামীর পুত্র হিমানিশ বাবুকে এক শৈল্পিক মানস দান করেছে। লেখকের সরসরচনা শৈলী হাসির গল্পের প্রস্রবনেই শেষ না হয়ে গোয়েন্দা কাহিনীতে সিক্ত করেছে। হিমানিশ গোস্বামীর আহত প্রকাশক গল্পটি আজ হতে প্রায় এক দশক পূর্বে লেখা। গোয়েন্দা কাহিনীর অবতারণায় হাসি ও সরস ব্যঙ্গের ইঙ্গিত বহু শৈল্পিক কৌশল হিমানীশ বাবুর গোয়েন্দা গল্পকে সাহিত্যের জারকরসে রসপুক্ত করেছে। আর খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সন্তান হওয়া সত্বেও হিমানিশ বাবু লেখক হিসাবে স্বাতন্ত্র, স্বকীয়তা ও শক্তিমত্তার পরিচয় রেখেছেন তাঁর লেখায় ও রেখায়। আর তাঁর গল্পে লেখনীর সাথে তুলির সঙ্গতের মণিকাঞ্চন যোগ এক অপূর্ব শিল্পব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।



ফরেনসিক

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শহরের বিখ্যাত এক রাস্তার ওপর মনিলালের মনিহারী দোকান। সে দিন সে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই দোকানে তালাবন্ধ করে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে একটা বড় থলে ঝুলিয়ে সাইকেল চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলল। তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িতে ছেলের অসুখ। ডাক্তার আনতে হবে। কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ আনমনা ভাবেই একটা ছোট্ট গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। আশেপাশে কোথাও লোকজন নেই। গলিটা দিয়ে গেলে একটু তাড়াতাড়ি হয়। বড় রাস্তা দিয়ে ঘরে গেলে অনেক পথ ভাঙতে হয়। কিন্তু তবুও গলি দিয়ে যায় না সে। কারণ পথটা নির্জন। এছাড়াও গুণ্ডার উৎপাত আছে। ছেলের অসুখ বলে সেদিন মনটা বড় অস্থির চিন্তাগ্রস্থ ছিল তার। তাই কোন ভয় ভাবনা না করেই সে জোরে সাইকেল চালিয়ে গলির পথটুকু পেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু বিধাতা বিমুখ।...গলির মাঝামাঝি আসতেই হঠাৎ একটা লাঠি মাথায় এসে পড়ল। মনিলাল সামলে নেবার আগেই আবার তিনজন গুণ্ডা তিন দিক থেকে মারতে লাগল। সাইকেল ফেলে রেখে মনিলাল পালাবার

চেষ্টা করল। কিন্তু একজন ছুটে এসে জামাটা চেপে ধরল তারপর বুক পকেট থেকে যে একশ তেইশ টাকা ছিল, জোর করে তা ছিনিয়ে নিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি, মারামারি, জাপটাজাপটি।

মনিলাল একটা লোকের মুখে সজোরে একটা ঘুসি মেরে প্রাণ ভয়ে দৌড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ভারী আর বিরাট লাঠির ঘায়ে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। এবার বিকট চিৎকার করে উঠল। —কে আছ—বাঁচাও—বাঁচাও। মেরে ফেললো—বাঁচাও। সারা গলিতে হৈ হৈ পড়ে গেল। আর্তনাদ শুনে আসপাশের বাড়ীর লোকজন দরজা খুলে ছুটে এল। অনেকের হাতে লোহার ডাণ্ডা, লাঠি। কিন্তু তাদের কিছু বলবার আগেই যন্ত্রনায় ছটপট করতে করতে মনিলাল অজ্ঞান হয়ে গেল। গুণ্ডারা অতর্কিতে এত লোকের সমাগম ঠিক আশা করেনি। হাজার হলেও ভয়ে তাদের মনটা স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল ছিল। তাই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একজন ক্ষিপ্র বেগে সাইকেলে চড়ে পালাল। তার দেখাদেখি আর একজনও দৌড়ল। আর শেষ লোকটি সামনে যে সাইকেলটা পেল তাতে চড়েই পালাল। তার নিজের সাইকেলটা পড়ে রইল মাটিতে। নিয়ে গেল মনিলালের সাইকেল। অল্প অন্ধকার আর লোকজনের মারমুখী চিৎকারে তারা এই মারাত্মক ভুলটা করে গেল। নিজের মূল্যবান গচ্ছিত রেখে গেল রাস্তায়। এদিকে টেলিফোনে খবর চলে গেল থানায়। কালো পুলিশ ভ্যান উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স। মণিলালকে হাসপাতালে পাঠালেন পুলিস অফিসার। তারপর নিয়ম মাফিক রস্তার ওপর পড়ে থাকা চাপ চাপ রক্ত সংগ্রহ করলেন তিনি। পড়ে থাকা সাইকেলটা তুলে একজন কনস্টেবল বড় কালো ভ্যানের মধ্যে রাখল। জল-কাদা আর রক্ত মাখা সাইকেল। সব কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যেই ওঁরা চলে গেলেন। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেল, যাঁরা ভিড় করেছিলেন রাস্তায়, তাঁরা সবাই রাস্তার রক্ত যাতে কারো পায়ের চাপে নষ্ট না হয় তার দিকে নজর রেখেছিলেন। এ সত্যি, এ বিষয়ে জন সাধারণের বেশ খানিকটা সজাগ থাকা উচিত। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বা পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগে পর্যন্ত তাঁরা যেন ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা চিহ্নগুলো সযত্নে রক্ষা করেন। কারণ তাতে তদন্তের সুবিধে হয়। আসামীরা নিজেদের কোন না কোন চিহ্ন ফেলে রেখে যাবে এটায় সাধারণ নিয়ম, অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছি না। কর্মব্যস্ত ফরেন্সিক লেবরেটারীতে তখন ছুটি হয় হয়।

পুলিশ অফিসারের কাছে সব শুনে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ তখনই সাইকেলটা পরীক্ষার নির্দেশ দিলেন। নানাভাবে পরীক্ষা চলল। কাদা ধুয়ে, নানান পদ্ধতিতে চেষ্টা চলতে থাকল একটা কিছু বের করার। হয় কোন নম্বর না হয় দোকানের নাম। বা যাহোক কিছু একটা যেটাকে কেন্দ্র করে তদন্তের ছক, তৈরী করা যাবে। বড় বড় আলো নিয়ে পরীক্ষকরা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে—কর্তব্য কর্মে ব্যস্ত হলেন। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা চলল। এদিকে হাতে সময় অল্প। কারণ আমরা জানি যে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী তদন্ত আরম্ভ করতে না পারলে অপরাধীকে ধরা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পনেরো মিনিট পরিশ্রমের পর, পিছনের চাকার মাড গার্ডের নীচে এক কোনে তিনটি ইংরাজী অক্ষর পাওয়া গেল। কষ্ট করে পড়া যায়—সি. সি. সি.। কিন্তু এটা কি হতে পারে? —দোকানের নাম? —না ব্যক্তির নাম? অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার চিন্তা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে একজন অ্যানালিস্ট হঠাৎ বললেন,—এখানে একটা নম্বর পাওয়া যাচ্ছে—'বাইশ'। অর্থাৎ 'সি সি সি—২২'। —এটা ভাড়া দেওয়া সাইকেল। আর ওটা দোকানের নামই হবে। বাইশ নম্বর সাইকেল। কিন্তু কি নাম দোকানের? খানিক্ষণ কী যেন চিন্তা করে ইন্সপেক্টর বললেন, —যে সব দোকান সাইকেল ভাড়া দেয় না বা সাইকেল সারায় তার মধ্যে বড় দোকান হচ্ছে —সেন্ট্রাল সাইকেল কর্ণার। সেটা শহরের দক্ষিণ দিকে আর ঘটনাটা ও ঘটেছে শহরের দক্ষিনে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বললেন,—তাহলে ওখানেই চলে যান। দেখে আসুন, খোঁজ খবর নিন। হ্যাঁ স্যার। ওখানেই খোঁজ করে দেখি। তার আগে হাসপাতাল হয়ে যাব। ভদ্রলোক বেঁচে আছেন কিনা কে জানে? আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ অফিসার হাসপাতালে এলেন। ভদ্রলোকের স্টেটমেণ্ট নিলেন। ভদ্রলোকের নাম—মনিলাল শীল। যা যা ঘটেছিল সবই বলল মনিলাল। কতকগুলো দামী কথাও সে জানাল, —তিনজন গুণ্ডার মধ্যে একজন দেখতে খুব লম্বা। একজনের ডান ভ্রূ কেটে গেছে ওর ঘুঁসিতে। অপর একজনের হাল্‌কা নীল শার্ট। তার ডান কানটা কেমন যেন বড় মনে হয়েছে মনিলালের এ ছাড়া, টাকা চুরি যাওয়ার কথা, বড় থলিতে চারটে সাবান, দোকানের হিসাবের খাতা—ছেলের জন্য ছ'খানা বিস্কুট ইত্যাদি যা যা ছিল,—সবই বলল মনিলাল। আরো জানালো, তারা ওর যে সাইকেলটা নিয়ে গেছে তার হাতলটা সবুজ প্লাস্টিকে মোড়া। সিট্‌টাও তাই, ডাক্তার বললেন,

মনিলালের আঘাত খুবই গুরুতর, তবে জীবন হানির সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। বড় রাস্তাটা পিছনে ফেলে পুলিশ জীপ পূব মুখো একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকে গেল।

বর্ষার জল বিরল রাস্তার পেছনে ফেলে চিন্তা মগ্ন পুলিশ অফিসার জীপের স্পীড্ বাড়াতে লাগলেন। বৃষ্টিটা যে কোন মুহূর্তে'ই আসতে পারে ঘন ঘন মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। পুলিশ জীপ থামল। ট্রাফিক সিগন্যাল। রাস্তার দু-ধারের ছোট ছোট দোকান পাট সবই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোলো হাওয়া বইছে। হাত ঘড়িটায় সময় দেখে নিলেন অফিসার। মনে মনে হতাশ হলেন।

রাস্তার লাল আলো সবুজ হল। পুলিশ অফিসার চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে উত্তর দিকে চিৎপুর এলাকায় ঢুকে পড়লেন।···মিনিট দশ পরে জীপ গাড়ী ঢুকল কাশী মিত্র ঘাট রোড। কিন্তু কোথায় দোকান? তবে কি সাইকেল ওয়ালা মিথ্যে বলল? জীপের গতি থামিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলেন অফিসার। হঠাৎ একটা ছোট দোকানের ওপর দৃষ্টি পড়লো তাঁর। সাইকেলের দোকান। পুরানো সাইকেল দরজার গায়ে ঠেসান দেওয়া রয়েছে। গাড়ি ঘুরিয়ে দোকানটার সামনে এসে দাড়ালেন অফিসার। নোংরা সাইনবোর্ড। নাম ভাল পড়া যায় না। অত্যন্ত অল্প পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। তবে সইনবোর্ডের সব জায়গাটাতে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য নেই তার।

অনেক কষ্ট করে পুলিশ অফিসার দোকানের নামটা পড়লেন—সেণ্ট্রাল সাইকেল সেণ্টার। সাইকেল সারানো হয়, ভাড়াও দেওয়া হয়।

পুলিশ অফিসার ভেতরে এসে প্রশ্ন করলেন,—বাইশ নম্বর সাইকেল কে ভাড়া নিয়েছে? —কবে? প্রশ্নটা বিনা ভূমিকাতেই করলেন পুলিশ অফিসার। গলার আওয়াজ গুরু গম্ভীর। একে পুলিশ, তায় ঐ গলা! আঁতকে ওঠারই কথা দোকানের মালিকের—'বাঘে ছুলে আঠারো ঘা'—কথায় আছে। তাড়াতাড়ি বড় একটা খাতা বের করে দেখে ভয়ে ভয়ে বলল,—স্যার, বাইশ নম্বরটা গেছে—এই তো গত কাল—। নিয়েছে ঐ লম্বোদর মিস্তির। ঐ তো মিস্তির বাড়ির লম্বা ছেলেটা। ঐ-ঐ তো স্যার, বারো নম্বর বাড়িটা। যান-যান না, —ধরুন, শালা গুণ্ডা—। এখানে সাইকেল ভাড়া নেয় স্যার, পয়সা দেয় না—। গায়ের জোর দেখায়। বরেঃ মিস্তিরের ছেলে।

যেন নিজেকে বাঁচাতে অনেক কিছুই বলে চলল সাইকেল দোকানের মালিক। —আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কিন্তু ইন্সপেক্টর আর দেরী করতে পারেন না। হাতে সময় নেই। একুনি খুঁজে বের করতে হবে লম্বোদর মিত্রকে।

দ্রুতপদে পুলিশ অফিসার এলেন বারো নম্বর বরেন মিত্রের বাড়ি। বরেন মিত্রকে পাড়ার সবাই চেনে। বৃদ্ধ ভদ্র লোক রাসভারী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথাগুলো শুনে পুলিশ অফিসারের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন,—অন্য কেউ এ কথা বললে বিশ্বাস করা দূরে থাক, তাকে চাবকে ঠাণ্ডা করে দিতুম। কিন্তু ইন্সপেক্টর, আপনি যখন বলছেন তখন মনে হচ্ছে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। আমার ছেলে গুণ্ডা? না—না, অসম্ভব। ভুল শুনেছেন আপনি। সে বেকার হতে পারে—চোর নয়। ইন্সপেক্টর চোয়াল দুটো শক্ত করে বললেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—কিন্তু আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলুম না বরেনবাবু। কোথায় সে? বাড়ীতে আছে কি নেই—সে কথাটা কি জানেন? জানি। এ সময়ে ওর বয়েসি ছেলেরা কেউ কি বাড়ি থাকে? এটা বৃষ্টি বাদলের দিন। সৎ প্রকৃতির ছেলেরা নিশ্চয়ই বাড়ীতে থাকে—।

—আমার ছেলে অসৎ গুণ্ডা, এ কথাই বলতে চান তো? জানেন, সে এম কম, পাশ? অনেক কষ্ট করে তাকে পড়িয়েছি। সে গুণ্ডা বদমাইশ হলে পড়াশুনা কী করতে করেছে? ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে বললেন,—এম, কম, পাশ—! কিন্তু তার এমন বদনাম কেন? সে তো পাড়ায় গুণ্ডা বলে পরিচিত। তার বন্ধুবান্ধব কাউকে চেনেন? কি রকম ধরণের ছেলে তারা?

—চিনি—। ঐ হালদার বাড়ির পদা আর সরকার—বাড়ির ডান কানটা বড় ঐ হেমন্ত, তাকে পাড়ার সবাই বলে—'কান বড়ো হেমা'। —দু'জনেই গ্রাজুয়েট। কিন্তু ঐ একই অবস্থা—বেকার। বাপের অন্ন ধ্বংস করছে। আপনারা এক আধটা চাকরি ওদের করে দিতে পারেন না মশাই? ইয়ং ম্যান ওরা, এখন করেই বা কি? সারাদিন কাজ নেই, কম্মো নেই—শুধু বসে থাকা। কেন? ভাল ভাল কাজই তো ওরা করে বরেন বাবু। দল বেঁধে চুরি করে, ডাকাতি করে। নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় লাঠি মারে। সারাদিন ধরে কত কাজ ওদের আর আপনি বলছেন কিনা ওরা বেকার বসে আছে। ইন্সপেক্টরের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ মর্মে

মর্মে অনুভব করলেন বরেনবাবু। তবুও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—আমার ছেলে ও রকম নয়। হতে পারে না—ইম্‌পসিব্‌ল।

অন্তত আমার জানা নেই অফিসার। আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন। যদি অন্যায় করে থাকে তবে শাস্তি সে পাবেই। আমার কি? —ও—। আর কিছু না বলে বাড়ির বাইরে চলে এলেন ইন্সপেক্টার। কিন্তু কোথায় থাকে পদা আর হেমা? বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। রাস্তার অপর ফুটপাতে একটি বাড়ির ঢাকা দেওয়া রকে দুটি ছেলে বসে ছিল। পুলিশ দেখে একজন উঠে দাঁড়ল। ইন্সপেক্টর দৌড়ে এ পারে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—সরকার—বাড়ির হেমন্ত কোথায় কোন বাড়ীতে থাকে ভাই? —ঐ তো, মোড়ের বাড়ীটাই তো ওদের। কেন বলুন তো স্যার?

—এমনি খুঁজছি।—ঐ বাড়ি?

—হ্যাঁ—একটু দাঁড়ান। কিন্তু ওরা তো নেই।

—ওরা-? মানে। ওরা—কারা?

—ঐ তো—লম্বুদা, হেমাদা আর পদাদা—ওরা কেউ নেই। সাইকেল করে চন্দননগর গেছে—কাল ফিরবে।

—তাহলেও যাই একবার। দেখি—যদি ফিরে থাকে—। মোড়ের বাড়ি হলেও ঢোকার দরজাটা পাশের গলির মধ্যে। দরজা খোলাই ছিল। সামনে উঠোন। দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে ভেতরে দেখলেন ইন্সপেক্টর এ কি! সবুজ প্লাষ্টিক মোড়া হাত—ওয়ালা সাইকেল দেওয়ালের কোণে ঠেস দেওয়া রয়েছে। সিপাইদের ইঙ্গিতে কাছে ডেকে ইন্সপেক্টর এবার সজোরে কড়া নাড়লেন। দ্রুতপদে একটি ছেলে বেরিয়ে এসে হঠাৎ পুলিশ দেখে আঁতকে উঠে ভেতরে পালাতে গেল। কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎ বেগে অফিসার ছুটে গিয়ে ঝাপটে ধরলেন তাকে। এ যে সেই কানা বড়ো হেমা। হেমন্ত সরকার,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। —পরণে গামছা, এলো গা। কোথায় গেল তার গায়ের জামা, গেঞ্জি, প্যান্ট? চিন্তা করলেন অফিসার। সেগুলো নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। দেখতে দেখতে পুলিশ সরকার বাড়ি ঘিরে ফেলল। পাড়ার লোক প্রায় সকলেই ভেঙ্গে এল। বাড়ি সার্চ করে প্যান্ট, রক্তমাখা হালকা নীল রঙের শার্ট আর তার সঙ্গে সাদা গেঞ্জিটাও পাওয়া গেল। একটা রক্তমাখা বড় থলি ভাড়ার ঘরের একটা কোণে লুকানো ছিল। —মনিলালের থলি। ভেতরের

কোন জিনিস তখনো সরানো হয়নি। হয়তো সময় পায়নি হেমন্ত। সন্ধ্যের সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই পাড়ার সহস্র লোককে হত—চকিত করে পুলিশ অফিসার ভদ্র ঘরের সুশিক্ষিত গ্রাজুয়েট ছেলেটিকে জামার কলার ধরে কালো ভ্যানে তুলে নিলেন। এরপর অঝোর ধারে বৃষ্টির মধ্যে ভোর রাত্রিতে অতর্কিতে মিত্তির—বাড়ি ঘেরাও করে কৌশলে গ্রেপ্তার করা হল ঘুমন্ত লম্বোদরকেও। কিন্তু পাওয়া গেল না। পদ্মরাম হালদারকে। সে অ্যাবস্‌কণ্ডার—পলাতক।

পরের দিন পাড়ার বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক এদের দু'জনের বিরুদ্ধে স্টেটমেণ্ট্‌ দিলেন। কেউ বললেন, গুণ্ডা কেউ বললেন, 'টেরার'।—শয়তান। —লম্পট। আবার দু-চারজন বললেন,—এরা স্যার অদ্ভুত। এরা লোকের মাথায় লাঠি মারে, আবার কাঁধে তুলে হাসপাতালেও ভর্ত্তি করে দিয়েআসে। এরা ঠিক গুণ্ডা নয় ইন্সপেক্টরবাবু এরা সব মিস্‌ গাইডেড্‌'—মানে জীবনে চলার পথে বিভ্রান্ত। কিছুটা হয়তো অক্রোশেই করে এই সব।

পুলিশ অফিসার যথা রীতি ৩২৫/৩২৭ ধারাতে কেস লিখলেন। এ ছাড়া আলাদা আলাদা একজিবিট্‌' করে সীজ্‌' করা মালগুলো পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিকে পাঠালেন। মনি লালের রক্তও শিশিতে করে লেবরেটারীতে পাঠানো হল। দু'জন আসামীর শার্ট, গেঞ্জি, প্যান্টের রক্ত, আহত মনিলালের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিলল। দু'জনের পায়ের তলায়, নখের কোণে আর হাতের আঙুলেও রক্ত পাওয়া গেল। তবে পরীক্ষাতে সেগুলো শুধু হিউম্যান ব্লাড্‌ অর্থাৎ মানুষের রক্ত বলেই বোঝা গেল। 'গ্রুপ' করা গেল না। রাস্তার রক্ত ও সেই লাঠি তিনটের রক্ত মনিলালের রক্তের গ্রুপের সঙ্গেও এক প্রমাণিত হল। ঐ লাঠি দিয়েই মনিলালকে মারা হয়েছিল।

লম্বোদরের প্যান্টের গোপন পকেট থেকে একটা চিঠি পাওয়া গেল। আর রক্ত মাখা চল্লিশটা টাকা! মনিলাল ঠিক যতগুলো বিস্কুট আর সাবান তার ব্যাগে ছিল বলে জানিয়ে ছিল, সবই পাওয়া গেল। কেবল তিরাশি টাকার হিসেব মিলল না, কারণ পদ্ম হালদারের সন্ধান কেউ বলতে পারল না। আদালত তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,—সে কি! পদ্মের খোঁজ পেলে না? এই সব গুণ্ডাদের যদি ধরতে না পারো তাহলে সমাজ-সংসারে বাস করা যাবে কি করে? আচ্ছা, তারপর কোর্টে কি হল? জেল হল তো? —হ্যাঁ, বিচারে লম্বোদর মিত্র ও হেমন্ত সরকারের শাস্তি হয়ে গেল। কিন্তু—

বন্ধুবর আমায় থামতে দেখে অবাক হয়ে বলল,—কিন্তু কি আবার? বেশ হয়েছে। ও সব গুণ্ডাদের চাবকে ছাল তোলা উচিত। এরাই সমাজের কলঙ্ক! লেখাপড়া শিখলে কি হবে আসলে এর গুণ্ডা এরাই—। উত্তেজনায় কথাটা শেষ হল না তার। সে ভাবটুকু লক্ষ্য করে বললাম;—তুমি আমি এদের গুণ্ডা বলব ঠিকই—এরা গুণ্ডা, চোর খুনে,—শুনলে অবাক হবে—আদালত সেদিন কিন্তু সে কথা বলতে পারেননি। সেদিনকার কোর্টের সেই মর্মান্তিক অনুভূতি আমার সমস্ত চিন্তাধারার মূলে একটা বিষম ধাক্কা দিয়েছিল। 'অপরাধ' কথাটার নতুন একটা অর্থ শিখলুম। বন্ধুবর পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করল,—কি রকম! সামান্য একটু থেমে ম্লান হেসে বললাম,—এ কথা তো তুমি মানবে যে, কোন মানুষই জন্ম থেকেই ক্রিমিন্যাল্ হয় না। তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে অপরাধি করে তোলে। জীবনের সহজ, স্বাভাবিক চলার পথ যখন কোন এক কারণে বন্ধ হয়ে যায়, জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্খা, আনন্দ যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ে তখনই সেই জীবনটাতে দুর্নীতির, অপরাধের শ্যাওলা জমে ওঠে। লম্বোদর মিত্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম—করা ছাত্র ছিল। ভালো বক্তৃতা দিত, নাটক করত, আবৃত্তি করত, আবার সামনের কফি হাউসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত; সাহিত্য. শিল্প, সঙ্গীত, রাজনীতি—সিনেমার গল্প সবই ওদের আলোচনার সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু বিধাতার কি নির্মম পরিহাস দেখ—জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল না লম্বোদর। কত শত অপিসের দরজায় দরজায় ঘুরে পাতার পর পাতা শুধু দরখাস্তই করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। সমাজ, সংসার তাকে কিছু দিল না। চাকরি জুটল না তার। সে পেল উপহাস, বিদ্রুপ আত্মীয় পরিজনের ব্যঙ্গ! ভাবতে পারো, সুশ্রী সুন্দর একটি ছেলে ধীরে, ধীরে কালো, বিবর্ণ হয়ে গেল। শুধু তার দেহের রঙই বদলাল না, সম্পূর্ণ বদলে গেল চোখের রংও। মনের সুন্দর সূক্ষ্ম বৃত্তিগুলোকে সে গলা টিপে মেরে ফেলল। তৈরী হল নতুন মানুষ। তার আশ পাশের দুনিয়ার ওপর হিংস্র আক্রোশ আর বাঁচার জন্যে টাকা রোজগারের বেপরোয়া প্রবৃত্তি মিলে মিশে গিয়ে এক দৃঢ় সংকল্পের জন্ম হল তার মধ্যে। লম্বোদর মিত্র নয়, লম্বু মিত্তির,—পাড়ার গুণ্ডা,—টেরার। চোখে তার আগুন, শরীরে ইস্পাতের শক্তি। সে কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে নেবে, সেও বাঁচতে চায়-এমনি করেই। আদালত প্রশ্ন করলেন,—লম্বোদর, এরা কি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছেন বলতে চাও? এঁরা বলছেন, তোমার ভয়ে এঁরা পাড়ায় টিঁকতে

পারেন না। তুমি গুণ্ডা—। কথাটা সত্যি? লম্বোদর স্থির দৃষ্টিতে সাক্ষীদের দিকে চাইল। সবাইকে সে চেনে। হ্যাঁ বেশ ভালই চেনে। পাড়ার রমেন বসু। মহাজন সরকার। সুনীল বর্মন। রণদেব হালদার। এরা বর্মন—সুনীল বর্মনের মেয়ে। বেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল লম্বোদর। তারপর বলল,—রমেনবাবু, সরকার মশাই, বর্মন সাহেব ওঁরা সবাই ঠিক বলেছেন। সত্যি আমি গুণ্ডা—। তা ছাড়া আজ আর আমার কি পরিচয়? আমি মানুষের শত্রু। সমাজের কলঙ্ক। কিন্তু —একটু নেমে লম্বোদর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,—কিন্তু ঐ রমেনবাবুর মেয়ে হাসপাতালে যাবার দিন ট্যাক্সি পাচ্ছিল না। কোন ট্যাক্সি যেতে চাইছিল না। আমিই শেষে উপায় না দেখে জোর করে একটা ট্যাক্সি ওয়ালার কলার চেপে ধরে তাকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলুম। তাই মেয়েটি বেঁচে গেল। পাড়ার লোক বলেছিল,—বাবু লম্বু, তুই ওর প্রাণ দিলি। বেঁচে থাক্ বাবা—আধ ঘন্টা দেরি হলেই মেয়েটা যন্ত্রণার ধাক্কায় মরে যেত। —আর—ঐ মহাজনবাবুর মেয়ের লিউকিমিয়া হয়েছিল। আমিই মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের বলে-কয়ে অনেক কষ্টে ভর্তি করিয়েছিলুম সেদিন—। এই তো মাস—ছয় আগে। অবশ্য শর্মিলা বাঁচেনি —কিন্তু তার আমি কি করব? ওঁরা বললেন্ গুণ্ডার ছোঁয়া লেগেই মেয়েটা মরে গেল। কিন্তু শর্মিলা তো আমায় দাদা বলত, শ্রদ্ধা করত। আবেগে গলাটা বুজে এল—তারপর লম্বোদর হঠাৎ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবল। মনে হল কান্নার বেগ সামলাচ্ছে লম্বোদর। তারপরে মুখ তুলে চোখ দুটো হাতের চেটোর উল্টো দিক দিয়ে মুছে নিয়ে বলল,—থাক্ সে কথা! গুণ্ডার অবার মায়া, দয়া, ভালবাসা! ঐ রনদেব বাবুর সেজ ছেলে জ্যোতিষ—আমাদের বন্ধু,—যেদিন মারা গেল, জ্যোতিষের মা বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ্য করেনি। আমি উপায় না দেখে পাইপ বেয়ে বারান্দায় উঠে পড়ি। ধরে ফেলি তাঁকে। তা না হলে মাসীমাও মারা যেতেন সেদিন। গুণ্ডা না হলে পাইপ বেয়ে দোতলায় ওঠার মত সাহস আমার হল কি করে? —ঐ যে, সুনীল বর্মন—বাঙ্গালী সাহেব। কত সাহেবী কায়দা কানুন, বিলিতি চাল চলন। কিন্তু যেদিন রাত্রিবেলা—স্থিরভাবে বর্মনের দিকে চেয়ে চিৎকার করে হঠাৎ থেমে গেল লম্বোদর। সকলের দৃষ্টি পড়ল সুনীল বর্মনের ওপর। চমকে উঠে মাথা নীচু করল বর্মন সাহেব। লম্বোদর বলল,—সেদিন রাত্রে ওঁর পঁচিশ বছরের

মেয়ে এবার একটা জোয়ান ষণ্ডা মার্কা পাঞ্জাবী ছেলে বন্ধু মদ খেয়ে এসে ওর ওপর হামলা করতে গিয়েছিল। সেদিন কার ডাক পড়েছিল? সেই কে ওঁকে পরিবারের ইজ্জত বাঁচাতে হাণ্টার হাতে পদা আর হেমাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বর্মন সায়েবের বাড়ি? তারপর হাণ্টার পেটার শব্দ পাড়ায় অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল। হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে পাঞ্জাবীটা এষাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কিন্তু আমার হাতের চাপে ওর ডান হাতের কব্জিটা চির দিনের জন্যে ভেঙে গেল। যাবার সময় ছেলেটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়েছিল মেয়েটাকে। প্রচুর টাকা নিয়েও মেয়েটা না কি কথা রাখেনি, তারই এই ফল। অস্বীকার করতে পারেন বর্মন সাহেব? পাড়ার লোক থানায় যায় নি। যে সেদিন তাঁর মেয়ের, স্ত্রীর শুধু ইজ্জত নয়, প্রাণ বাঁচাল, সে তো গুণ্ডা হবেই – নিশ্চয়ই গুণ্ডা। একশো বার গুণ্ডা তা না হলে সেদিন রাত্রি বেলা সুনীল বর্মনের মেয়েকে পিছনে ঠেলে দিয়ে সেই পাঞ্জাবীটার রিভলবার ধরা হাতটা সোজা ওপর দিকে তুলে ধরতে পারতাম কি? গুলিটা সোজা কড়ি কাঠে না লেগে বর্মন সাহেবের মেয়ের কলিজার ভেতরে ঢুকে যেত। মাতালটা এষা বর্মনকে খতম করে তবেই যেত সেদিন। সেই এষা বর্মনও আমার বিরুদ্ধে আজ সাক্ষী দিতে আদালতে হাজির। চমৎকার!

—এ হচ্ছে দুনিয়া। দারুন উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে লম্বোদর। সারা কোর্ট ঘর জুড়ে সে কী ভীষণ নিস্তব্ধতা। কেমন অসহায় অস্বস্তি।

আদালত এবার সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু মিস্টার মিত্র, সমাজে তোমাদের আরো কত দায়িত্ব রয়েছে। তা পালন করছ না কেন? তাহলে তো এত গোলমাল থাকে না। দেশ সমাজ-সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তো তোমাদেরও। সে দায়িত্ব পালন করা উচিত নয় কি তোমাদের? লম্বোদর হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। দু'চোখ থেকে ঠিকরে আগুন বেরিয়ে এলো। ক্ষোভের, যন্ত্রনার আগুন! কঠিন স্বরে বলল,—আমাদের জন্য ও সমাজ-সংসারের তো দায়িত্ব রয়েছে –তা কি পালন করা হয়েছে? না হয়নি। করলে, বাবা আমাকে আইন পড়াতেন। রোজগার করে নিজের টাকায় পড়তে বলতেন না। দেশ আমার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়নি। আমি বেয়ারার চাকরির জন্যেও দরখাস্ত করেছি —পাইনি। — কিন্তু কেন? আমার কি যোগ্যতা নেই? তাই ঠিক করেছি, বাধ্য হয়েছি ঠিক করতে, জোর করে কেড়ে খাব। ঐ মনিলাল মুদিটা লুকিয়ে কালো-

বাজারে চাল বিক্রি করে বেশী দামে। তাই তার টাকা লুট করেছি। বাজে সস্তা সাবান দামী নাম—করা সাবানের প্যাকেটে মুড়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে পয়সা করেছে। বলুন—সে কি ভদ্র পোষাকের গুণ্ডা নয়? ক্রিমিন্যাল্ নয়? —না, এরা সব সৎ। শুধু আমরাই বদমাইশ—। আমাদের শাস্তি হবে—জেলে। বেশ, তাই হোক। এই বিচার, এই সমাজ,—এর প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, এর ভালোর, এর মঙ্গলের জন্য কিসের মাথা ব্যথা আমাদের? এই তো তুনিয়া—হায় ভগবান—বিচারে লম্বোদর ও হেমন্তর সামান্যই শাস্তি হল। কিন্তু সরকারের ব্যর্থ নীতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন আদালত। দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যাই যে এ সব অপরাধের অন্যতম কারণ—তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বন্ধুবর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেল এই ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা সেই গোপন চিঠিটার কি হল? পদ্ম হালদার? তার কি খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ এবার সেই কথাই বলছি শোন। চিঠিটা থেকে একটা অদ্ভুত জিনিস বের করল ফরেন্সিক। যার ফলে নাটকের শেষ অঙ্কটাও জানা হয়ে গেল। লম্বোদর মিস্ত্রিরের প্যাণ্টের ভেতর যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল সেটা পড়ে কোন কিছু বোঝা গেল না। অর্থাৎ সহজ ভাবে ঠিক যেমনটি লেখা ছিল সেটি পড়লে কোনই অর্থ পায় না। ধর, লেখা ছিল—। মকামল মবাঁকুমড়া থামবম। মজাম মকরমব। মহেমাকে মডাকবিম। মলামঠি মনিবি বিমকেলে—মিতি মপদাম। —কিছু বুঝলে? রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধনের' পায়ে ধরে সাধা, 'রা' নাহি দেয় রাধা'—তার চেয়ে এটা কিন্তু অনেক সোজা

—পাগলের প্রলাপ। ওরা কি মদ-টদ খায় নাকি? মাতালের কথা।

—না, মোটেই নয়। সহজ, সরল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক মাঝে মাঝে 'উল্টো' করে শব্দগুলো ব্যবহার করে কথা বলেন। যেমন, লকা টিছু বনে, অর্থাৎ কাল ছুটি নেব—উদ্দেশ্য, ঘরের আর কেউ যাতে বুঝতে নাপারে যে, উনি পরের দিন অফিসে আসছেন না—ডুব মারছেন। এটাও তাই। এই চিঠির লেখা থেকে যদি তুমি 'ম' অক্ষরটা বাদ দাও তাহলে কি দাঁড়ায় দেখ তো। কাল বাঁকুড়া যাব। মজা করব। হেমা ডাকবি। লাঠি নিবি বিকেলে। ইতি পদা। বন্ধুবর অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—সে কি। এযে রীতিমত ডাকাতি। তাহলে

পদ্ম হালদার কোথায় লম্বোদর জানত না বলছ—তোমরা সে কথা বিশ্বাস করলে কেন? ও নিশ্চয়ই জানত। ও মিথ্যেবাদী লায়ার নয়। আদালতে লম্বোদর বলেছিল, সে গুণ্ডা, চোর, বদমাইশ হাতে পারে। তবে বিশ্বাসঘাতক নয়, সে জানে পদা কোথায়। তবে বলবে না। কিছুতেই নয়। কিন্তু তবুও ধরা পড়ল পদ্মা হালদার। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার এসে হাজির হলেন হালদার-বাড়ি। পদ্মরামের বৃদ্ধা পিসিমা বললেন।

—বাঁকুড়ায় তো পদার মেজ বোনের শ্বশুর বাড়ি। সেখানেই যাবে বলেছিল। হরি পাড়া-কালী মুকুজ্জের বাড়ি। ধান চাল বেচত, এখন মুদির দোকান করে। বড়লোক তো বটেই। পুলিশ গেল বাঁকুড়ায়। কালী মুকুজ্জে কিছুই জানতেন না।

পদ্মরাম হঠাৎ রেল গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে চোখ ফাটিয়েছে তাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছেন তিনি। তাড়াতাড়িতে নিজের আসল নামটা ভুলে মধু হালদার বলে লিখিয়েছে পদ্ম। বাঁকুড়ার হাসপাতালে মধু ওরফে পদ্মর খোঁজ নিতে অসুবিধে হল না। এক চোখ বাঁধা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে পদ্ম।

—কেন? চোখ বাঁধা কেন—? পড়ে গিয়ে কি চোখে লেগেছিল?

—ন্ না। মনে আছে তোমার, মনিলাল বলেছিল, তাঁর ঘুঁসিতে একজনের চোখের ভ্রু কেটে গিয়েছিল। সেই ব্যক্তিই হচ্ছে এই পদ্ম হালদার। ট্রেন থেকে সে পড়ে যায়নি। মনিলালের হাতের আঙুলে আংটি ছিল। তাই চোটটা বিশেষ গুরুতর হয়ে পড়ে। মনিলালের ঘুঁসিতে পদ্ম হালদারের বাঁ চোখের কালো মনিটা গলে গিয়েছিল। —গভীর রাত্রে হঠাৎ হাসপাতালে তারই বিছানার অদূরে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠেছিল পদ্ম। অপরাধ করে ফেলার পর থেকেই ওর মানসিক উত্তেজনার সঙ্গে এসেছিল ভয়। ভয় থেকে—আতঙ্ক। —পালাবার চেষ্টা করেনি? বন্ধুবর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করল। —তা কি আর না করেছিল—ধরা পড়ে যায়। ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হল। মাস চারেক পরে পদ্মরাম সেরে গেল বটে, তবে সে তার বাঁ চোখটা হারাল। আদালতে তার শাস্তি কিছু কম হল। মনিলালের বাকি টাকাটা আর উদ্ধার করা গেল না। পদ্ম স্বীকার করল ও টাকাটা যে হাসপাতালে খরচ করে ফেলেছে।

আদালতে কালীবাবু বলেছিলেন চিকিৎসার জন্যে পদ্ম তাঁর হাতে আশী টাকা দিয়েছিল এ কথা সত্যি।

—তাহলেই দেখ, সজাগ দৃষ্টি আর একাগ্রতাই তদন্তের মূল কথা।

বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, মনিলালবাবুর কি হল? বাচলেন তো? —হ্যাঁ। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন যথারীতি। কিন্তু—কি? —শেষ পর্যন্ত পুলিশ ছাড়ল না। দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে হাজির করল মনিলালকে। —দুর্নীতি? সে আবার কী? কী দুর্নীতি মনিলালের?

—হ্যাঁ পদ্ম হালদার কোর্টে বলেছিল মনিলালের বাড়তি আঠাশ খানা বেনামী রেশন কার্ড আছে। পুলিশ তদন্ত চালিয়ে সেই কার্ডগুলো বের করে। বিচারে মনিলালের ফাইন হল। বাড়তি কার্ডের চালগুলোই মনিলাল কালো বাজারে চড়া দামে বেচত। এছাড়া বাজে সস্তা সাবান, দামী নামকরা সাবানের খাপ্তি প্যাকেটে মুড়ে বাজারে বিক্রি করত মনিলাল। অবশ্য হাতে নাতে সেটা ধরা গেল না। তাহলেও পুলিসের নজরে রয়ে গেল বন্ধুবর উত্তেজিত হয়ে বলল,—এই মনিলালের দলই আসল 'ক্রিমিন্যাল' কী বলো? তোমার কি মনে হয়?

॥ **দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** ॥ জন্ম কলকাতায়। প্রায় দুই দশকব্যাপী ফরেনসিক লেবরেটরীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় লেখক খুন, বলাৎকার ও গৃহদাহের বহু মর্ম্মস্পর্শী ঘটনার মর্মান্তিক কার্যকারণ অন্বেষণ ও আবিষ্কার করেছেন। আর দুর্জ্ঞেয় মনুষ্য চরিত্রের দুর্গম প্রদেশের আতলান্তিক গহ্বরের অবসাদ, ঈর্ষা, দ্বেষ ও দূরভিসন্ধির রহস্য উন্মোচনে লেখকের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা আমাদের অভিভূত করে।

কারণ অনুসন্ধানের অন্বেষণে তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা তাঁকে বিজ্ঞান সুবাসিত সত্যাশ্রয়ী গোয়েন্দা ধর্মী রচনায় এক উল্লেখ্য সুযোগ দান করেছে। লেখকের রহস্যঘন বাস্তবতা আশ্রিত "ফরেনসিক" গল্পমালা নিঃসন্দেহে বাংলা রহস্য সাহিত্যের মরাগাঙে এক অনবদ্য সংযোজন।



দ্বিখণ্ডিত

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

এক

আজকাল সমরবিভাগের অফিসারদের অনেকেই দেখা যায় রিটায়ার করে চাষবাসে মন দিচ্ছেন। দিল্লি থেকে হরিদ্বার যাবার রাস্তায় চিকারি নামে একটা গ্রাম পড়ে। গ্রাম থেকে তিন কি.মি. এগোলে একটা ক্যানেল। ক্যানেলের পারে চল্লিশ একর জমি নিয়ে মেজর হরগোবিন্দের খামার। ইনি অবশ্য সমর বিভাগে নামকরা ডাক্তার ছিলেন। কবছর আগে রিটায়ার করে এখানে চাষবাস করেছেন।

পুরো জমিটা কাঠের খুঁটি পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে। ক্যানেলের সাঁকো পেরিয়ে গেলে সামনেই খামারের গেট। গেটের মধ্যে ঢুকলে দেখা যাবে একতালা চারটে ইটের ঘর, টানা বারন্দা। আর একটু তফাতে গুদামঘর আর কৃষিযন্ত্রপাতি রাখার আটচালা। মেজর ডঃ হরগোবিন্দ যান্ত্রিক প্রথায় নিজেই চাষবাস করেন। বৃদ্ধ বলে মনেই হয় না, যদিও বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে।

তাঁর আরেক নেশা সমাজসেবা। এলাকার গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকের অসুখ বিসুখের চিকিৎসাও করেন। খামারের একটা ঘরে ডিসপেন্সারি

রয়েছে। কম্পাউণ্ডার আছে একজন। তার নাম রঘুরামাইয়া। চিকারির লোক। একজন রাঁধুনী আছে। তার নাম নারুলা। সে নৈনিতালের বাসিন্দা। রাঁধুনী হলেও সব কাজে সে পাকা।

এছাড়া আছে চাষবাসে সাহায্যের জন্যে দুজন লোক, অমরনাথ আর শিবু। দারোয়ান আছে একজন তুম্বেরিলাল। খামারের দিনরাতের বাসিন্দা বলতে এই পাঁচজন এবং মেজর ডঃ হরগোবিন্দ নিজে।

মেজর সায়েবের একমাত্র সন্তান বলতে মেয়ে, ধরিত্রী। সে থাকে দিল্লিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মাঝে মাঝে বাবার কাছে ছুটি কাটাতে আসে। মেজর সায়েবের স্ত্রী অনেক আগে মারা গেছেন।

মার্চের শেষদিকে গম কেটে নেওয়ার পর ধান চাষ করা হয়েছে। ভুট্টার ক্ষেতে মানুষ সমান উঁচু ঝার হয়েছে। বাইরে ঠিকা মজুরনীরা খামারে এসে মাড়াইকরা গম থেকে কুটো সাফ করছে। খামারে কাজের ব্যস্ততা এখন। মেজরসায়েব খামারের শেষদিকটায় ছোট পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাছের পোনা খেলে বেড়াচ্ছে। তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয় কুকুর রেক্স। অতিকায় এ্যালসেশিয়ান। সেও মনিবের মতো জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

মেজর হঠাৎ একটু নড়ে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন। বিকেল চারটে কুড়ি। ধরিত্রীর আসার কথা বিকেল চারটের মধ্যেই। গাড়ী নিয়েই আসবে সে। দেরী হচ্ছে কেন? ঘুরে ঘুরে—অনেক দূরে হাইওয়ের দিকে তাকালেন।

এই সময় রেক্স চাপা গরগর শব্দ করে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ভুট্টার ক্ষেতের দিকে দৌড়ল। মেজর ডাকলেন—রেক্স! রেক্স!

রেক্স গ্রাহ্য করল না। ভুট্টার ক্ষেতের ধারে গিয়ে সে অনবরত গরগর করতে লাগল। ক্ষেতের ওপাশে কাঁটাতারের বেড়া আছে। বেড়ার ওপাশে খানিকটা পাথুরে জমি—ঝোপজঙ্গলে ঢাকা। তার ওদিকে একটা জঙ্গলভরা টিলা। একসময় চিকারী উপত্যাকা সম্পূর্ণ অনাবাদী পড়ে ছিল। ক্যানেল হওয়ার পর চাষবাস শুরু হয়েছে কোথাও-কোথাও।

রেক্স নিশ্চয় কোন জন্তুজানোয়ার দেখেছে। মেজর সাহেব আরো কয়েকবার ডেকে তার দিকে পা বাড়ালেন। কাছাকাছি কোন লোক নেই।

ক্ষেতের ধারে গিয়ে রেক্সের পাশে গিয়ে মেজর হরগোবিন্দ বললেন—কী

হয়েছে রেক্স? রাগ করছ কার ওপর?

রেক্স ঘুরে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাল। তারপর ফের গরগর করতে লাগল।

মেজরসায়েব ওর গলায় স্নেহের থাপ্পড় মেরে বললেন—দুষ্টু ছেলে। ও কিছু না, কিছু না। খরগোস, নয়তো বনবেড়াল দেখেছে। নাকি সাপ দেখতে পাচ্ছ?

তারপর রেক্স একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। দুপা সামনে তুলে বিদঘুটে একটা শব্দ করে উঠল। মেজর হরগোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—বাস্টার্ড! স্কাউণ্ড্রেল! রোগ!

তারপর বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। একবার মাত্র। মেজসাহেব পড়ে গেলেন। রেক্স লাফ দিয়ে ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকল। ঢুকেই কিন্তু বেরিয়ে এল তক্ষুণি। মনিবের বুক শুকতে শুরু করল।

মেজরসায়েবের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল অমরনাথ। সে পাম্প চালিয়ে সামান্য দূরে ধানের জমিতে সেচ দিচ্ছিল। চিৎকারের পর বন্দুকের শব্দ এবং মেজরসাহেবকে পড়ে যেতে দেখে সে দৌড়ে চলে এল।

এসে দেখল মেজর হরগোবিন্দের কপালে একটা ছোট্ট ক্ষতচিহ্ন। ভুট্টা ক্ষেতের ধারে নালায় পড়ে আছেন। অমরনাথ বিকট হাঁকডাক করে খামারের লোকজনকে ডাকতে লাগল।···

পরদিন সকালে এই ঘটনা খবরের কাগজে বেরোয় এবং তখন আমি দিল্লিতে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার একটা এসাইনমেন্টে এসেছি। উঠেছি "হোটেল রঞ্জিতের" একটা সিঙ্গল স্যুটে। কম খরচে ব্রেকফাস্ট খেতে নীচের কমিউনিটি হলে এসে দেখা হয়েছে সর্বঘটে বিরাজমান আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে।—হ্যালো ওল্ড ঘুঘু! সত্যি কি আপনি? নাকি? আপনার ছদ্মবেশে কোন সাংঘাতিক বদমাসকে দেখছি!

কর্নেল হো হো করে হেসে বললেন—হ্যালো ডার্লিং! তুমিও জয়ন্ত চৌধুরীর ছদ্মবেশে নিশ্চয় কোন লম্পটপ্রবর নও! বাই দা বাই, জয়ন্ত, তোমার পাশে গতরাতে একঝাঁক সুন্দরীকে দেখে আমি ভয় পেয়ে আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছিলাম!

—গতরাতে আমাকে দেখেও আপনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন! দুঃখের ভঙ্গি করে বললুম। নিন, আড়ি নিন।

কর্নেল একটা হাত টেনে নিয়ে সস্নেহে বললেন—বৎস জয়ন্ত, যুবক-

যুবতীরা যখন মন খুলে আলাপ করছে, তখন সেখানে আমার মতো বৃদ্ধদের নাক না গলানোই ভাল। যাক্ গে, আমি তোমার জন্যেই এখানে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিলুম।

কোনার দিকের একটা টেবিলে আমরা বসলুম। দিল্লিতে এলেই আমার বরাবর বড্ড নিস্প্রাণ লাগে সবকিছু। কর্ণেলকে পেয়ে কি যে ভাল লাগছিল। কফি খেতে খেতে আবোলতাবোল নানান গল্পগাছা চলতে থাকল। তারপর বললুম—এবেলা আমার কোন কাজ নেই। চলুন, কোথাও বেরিয়ে পড়া যাক।

কর্ণেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেণ্ড। ওঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তারপর বললেন আমার বরাতটাই এই জয়ন্ত। যেখানেই যাই, যেন এক ইটার্ণাল মার্ডারার আমার সামনে একটা করে লাস ফেলে দিয়ে আড়ালে মুখ টিপে হাসে!

বুঝতে না পেরে বললুম—কেন? এখানে এসেই খুনের পাল্লায় পড়েছেন বুঝি?

—পড়ে গেছি বলতে পারো। কর্ণেল দুঃখিত মুখে বললেন। আজকের কাগজে আশা করি তুমি খবরটা দেখেছো, জয়ন্ত।

—দেখেছি। চিকারি না কোথায় একটা ফার্মে কে খুন হয়েছে। সে তো চল্লিশ কি. মি. দূরে। আপনার সঙ্গে ও কেসের কী সম্পর্ক?

কর্ণেল হাসলেন একটু।—আমার বরাত জয়ন্ত। মেজর ডাঃ হরগোবিন্দ আমার অনেক কালের বন্ধু। প্রায়ই লিখতেন চলে আসুন। দারুন জায়গা! এবং সত্যি বলতে কী, গত পরশু ওঁর টেলিগ্রাম পেয়েই প্লেনে কাল সন্ধ্যায় পৌঁছেছি। রাতে খাবার সুবিধে করতে পারিনি। তারপর তোমাকে দেখলুম। ভাবলুম, সকালে জয়ন্তকে ধরে নিয়েই রওনা দেব।

একটু খটকা লাগল। বললুম—টেলিগ্রাম পেয়েই মানে?

কর্ণেল চাপা স্বরে বললেন—ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। টেলিগ্রামে মেজর সাহেব যা লিখেছিলেন, তার মানেঃ আমার খামারে এলে এক বিচিত্র রহস্যের খোঁজ পেয়ে যাবেন। এক্ষুণি চলে আসুন। দেরী করলে মজা পাবেন না' ফুরিয়ে যাবে।...এখন বুঝলে জয়ন্ত? মেজর হরগোবিন্দের মতো রাশভারি মানুষ, সবসময় তাঁকে সিরিয়াস প্রকৃতির দেখেছি—তিনি এমন একটা টেলিগ্রাম করায় কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলুম। এ আমার স্বভাব। নাকি ইনটুইশান! তারপর আজ সকালের কাগজে মেজর সায়েবের হত্যাকাণ্ড

দেখেই চমকে উঠেছি।

—জানি কর্নেল! আপনার মাথার পোকাগুলো রহস্যের গন্ধে কট কট করে কামড়াতে থাকে।

—তা যাই বলো জয়ন্ত, এখন কিন্তু মেজর সাহেবের রহস্য কথাটা যে নিছক কথার কথা ছিল না, তা আশা করি বুঝতে পারছ।

—পারছি। আপনি তাহলে চিকারি খামার বাড়িতে যাচ্ছেন?

—আলবাৎ যাচ্ছি। এবং তুমিও যাচ্ছ।

—কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয়, জয়ন্ত। বরং তুমি তোমার কাগজের জন্য একটা বাড়তি স্টোরি পেয়ে যাচ্ছ—আমায় ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ডার্লিং· ·

একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। হোটেলের রিজার্ভেশন থাকল। শিগগির ফেরার ইচ্ছে ছিল আমার। তাই সঙ্গে বিশেষ জিনিসপত্র নিলুম না। কর্নেল অবশ্য সঙ্গের সব কিছু নিলেন। সেই প্রজাপতি ধরা জাল, বাইনোকুলার, কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত প্রকাণ্ড নোটবইটাও। আর ওঁর ক্যামেরার কথা না বললেও চলে। অন্ধকারে ছবি তুলতে পারা ওই অত্যদ্ভুত ইলেকট্রনিক ক্যামেরা সবসময় ওঁর গলায় ঝোলে।

কর্নেল এক বন্ধুর জিপগাড়ি আগে থেকেই ম্যানেজ করে রেখেছিলেন। সেই জিপে আমরা রওনা দিলুম।···

দুই

চিকারি খামারবাড়িতে গিয়ে যে ঘটনা শুনলাম, তা গোড়ায় বলেছি। মেজর হরগোবিন্দ প্রভাবশালী লোক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল। খামারবাড়ি পুলিশে ছয়লাপ। দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের রথী মহারথীরা সেখানে হাজির হয়েছেন। সি আই ডি ইনসপেক্টর অজিত লাল শাঠের সঙ্গে কর্নেলের আগেই পরিচয় ছিল। তাই পুলিশের দঙ্গলে ঢুকে পড়তে আমাদের অসুবিধে হল না। তার ওপর নিহত মেজর সাহেবের মেয়ে ধরিত্রী কর্নেলকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল। তারপর বুড়োর বুকে মাথা রেখে 'চাচাজী' বলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল। আমার মনটা নরম হয়ে গেল। হতভাগ্য মেয়েটা পৃথিবীতে একেবারে একা হয়ে গেল! হারানো মায়ের অভাব বাবা তাকে বুঝতে দেন নি একটুও। এবার ওর দুঃখে সান্ত্বনা দেবার আর কেউ রইল না। কর্নেল হয়তো ওর বাবার হত্যাকারী ধরিয়ে

দিতে পারবেন এই পর্যন্ত। তার বাবাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।

কর্ণেলের পাশে-পাশে থাকার ফলে পুলিশের তদন্তের ব্যাপারটা আমার কিছুটা লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হল। মেজরসায়েব পুকুর পাড়ের ঠিক নীচে ভুট্টাক্ষেতের গায়ে ছোট্ট নালায় গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, সেখানে আমরা আসার আগেই মোটামুটি তদন্ত হয়ে গেছে। ইন্সপেক্টর মিঃ সাঠে কর্ণেলকে নিয়ে আবার সেখানে গেলেন।

পুকুরটা খামারের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। চারকোনা ছোট্ট পুকুর। জল পাড়ের কিনারা অব্দি ভরা। চারদিকের পাড়ে পেয়ারা, আপেল, পীচ ইত্যাদি ফলের গাছ আছে প্রচুর। তবে গাছগুলো ঘন নয় বলে ভেতরে কেউ দাঁড়ালে বাইরে দূর থেকেও তাকে দেখা যাবে।

পুকুরের পশ্চিমপাড়ের শেষ প্রান্তে ঢালু তিনহাত চওড়া ঘাসে ভরা জমির নীচে নালা। নালাটা দুহাত চওড়া। সেখানে ডানপাশে কাত হয়ে মেজর সায়েব পড়েছিলেন। গুলিটা লেগেছিল ঠিক কপালের মধ্যিখানে। মিঃ সাঠের ধারণা, নালার পশ্চিমে ভুট্টোক্ষেতের ভেতর থেকে আততায়ী গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, ভুট্টাক্ষেতের জমিটা ভিজে হওয়া সত্ত্বেও কোথাও কোন পায়ের ছাপ নেই।

অথচ রেক্স ওই জমির দিকে তাকিয়ে গর্জন করেছিল এবং মেজর গুলি খেয়ে পড়ার পর সে ওই জমির মধ্যে ঢুকেই ফিরে এসেছিল। রেক্সের পায়ের দাগে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে!

রেক্স দু পা তুলে অদ্ভুত একটা ভঙ্গীই বা করেছিল কেন? মেজরসায়েব কাকে দেখতে পেয়ে কিংবা অনুমান করে গালাগালি করেছিলেন?

গতকাল বিকেল চারটে কুড়িতে ঘটনাটা ঘটেছে এবং এর যে বিবরণ গোড়ায় দিয়েছি, তা বাবুর্চি নারুলার বর্ণনা থেকে। নারুলা ওই সময় নাকি পুকুরের পুবপাড়ে অড়হর ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়েছিল এবং সব লক্ষ্য করেছে। এমনকি মেজরসায়েব যখন ঘড়ি দেখেন, সেও তার ঘড়িতে সময় দেখেছিল চারটে কুড়ি। ধরিত্রীর আসার কথা চারটেয়, তাও সে জানে। তার বিবৃতি থেকেই পুলিশ ঘটনাটা ওইভাবে সাজিয়েছে এবং আমি অবিকল সেভাবে বর্ণনা করেছি।

কিন্তু নারুলা আজ সকালে পুলিশের জেরার চোটেই ওইসব কথা কবুল করেছে। তার আগে পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা সে চেপে ছিল। এমনকি বন্দুকের শব্দ শুনে এবং দূর থেকে মেজরকে পড়ে যেতে দেখে অমরনাথ যখন

দৌড়ে যায়, তখনও সে পুবপাড়ে অড়হর ঝোপে দাঁড়িয়ে ছিল। কেন? তার জবাবে নারুলা বলেছে—হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম স্যার। একেবারে মাথার ঠিক ছিল না।

পুলিশ জেরা করা অব্দি হতভম্ব হয়ে থাকাটা কাজের কথা নয়। বিশেষ করে নারুলা যে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, তা দূর থেকে এক মজুরনী কুন্তীর চোখে না পড়লে সে হয়তো সব চেপেই থাকত। কেন? নারুলার ওই এক কথা। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম স্যার। মাথার ঠিক ছিল না।

কুন্তীর সাক্ষ্যেই নারুলাকে জেরা করা হয়েছে বোঝা যায়। তারপর তথ্য গোপনের অপরাধে তাকে গ্রেফ্তারও করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যখন গেছি, তখনও তাকে খামার থেকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। সরজমিনে আরও জেরা করার জন্য রাখা হয়েছে। এদিকে ফোরেন্সিক এক্সপার্ট'রা তখনও এসে পড়েন নি।…

ভুট্টাক্ষেতের ভেতরে সাবধানে ঢুকে গেলেন কর্নেল এবং মিঃ সাঠে। আমি আনমনে হাঁটতে হাঁটতে পুকুরের পশ্চিমপাড়ে এগিয়ে দক্ষিণপাড়ে গেলুম। ওদিকটায় আপেল গাছই বেশি। শেষ দিকটায় কাঁটাতারের বেড়া আছে। এখানে গাছগুলো বেশ ঘন। ঝোপের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যত পাতা, তত ফল।

সেই সময় চোখে পড়ল. একটা আপেল গাছের তলায় গোড়াঘেঁষে খানিকটা শুকনো পাতা জড়ো করা রয়েছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু হয়তো ছিল না সবগুলো গাছের তলাতেই শুকনো পাতা পড়ে আছে প্রচুর। কিন্তু এই গাছটার গোড়ায় জড়োকরা পাতাগুলো দেখে মনে হল, এভাবে তো আপনা আপনি পাতাগুলো জড়ো হওয়ার কথা না। অথচ ঝাঁটার দাগ নেই। মাটিটা শুকনো!

পাতাগুলোর কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে একটা শুকনো কাঠি দিয়ে সরাতে থাকলুম। তারপর আতঁকে উঠলুম। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে কড়া রোদ্দুর। সূর্যের আলো পাতার ফাঁকে এসে পড়েছে এবং ঠিকরে পড়ছে একটা রূপোলী রিভলবারের গায়ে।

ভাল করে পাতাগুলো যেই সরিয়েছি, আমার পেছনে পায়ের শব্দ শুনলুম। শব্দটা শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে যাচ্ছি, আচমকা মাথার পেছনে যেন একটা বিশাল পাহাড় এসে পড়ল। তীব্র যন্ত্রণা এবং মাথা ঘুরে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।…

কতক্ষণ পরে জানিনা, কানে এল দূর থেকে কে চেনা গলায় আমাকে ডাকছে জয়ন্ত! জয়ন্ত! আরও একমিনিট হয়তো দেরি হল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর চোখ খুলে অবাক হয়ে গেলুম। আপেল গাছের তলায় শুকনো মাটিতে শুয়ে আছি। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। তারপর মনে পড়ল ব্যাপারটা। তাকিয়ে দেখি, জড়োকরা পাতার মধ্যে রিভলবারটা নেই।...

তিন

খামারবাড়ীর একতলা চারটে ঘরের কথা আগেই বলেছি। গেটের দিকে শেষ ঘরটা অতিথিদের জন্যে ব্যবহার করা হয়। সেই ঘরে আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে থেকেছি—অর্থাৎ আমাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে বিকেল অব্দি। হয়তো ঘুমিয়েও থাকব। দিল্লির পুলিশের সঙ্গে যে ডাক্তার ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর নাম ডাঃ নওলকিশোর সিং। তিনিই আমাকে ওষুধপত্তর খাইয়েছেন। খোঁজখবর নিয়েছেন সবসময়। বিকেলে যখন উঠে বসলুম, তখন মাথায় ব্যাথা এবং আচ্ছন্নভাবটা আর নেই। কিন্তু ব্যাণ্ডেজটা রয়েছে।

দেখলুম ঘরে আমি একা। জানালার পর্দা সরিয়ে খামারবাড়ীর ভেতরটা লক্ষ্য করলুম। দূরে কর্ণেলকে দেখা গেল। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ টাকে বিকেলের লালচে রোদ চকচক করছে। অনবরত দাড়ি চুলকোচ্ছেন আর মিঃ সাঠের সঙ্গে কথা বলছেন। জনাকতক কনস্টেবল পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। খামারের জমিগুলোতে কোথাও কোন লোক নেই। সামনে প্রাঙ্গণে সম্ভবত খামারের কর্মচারীরা মাড়াইকরা গমের পাঁজার কাছে চুপচাপ দাড়িয়ে আছে।

পাশের শব্দ হতেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালাম। জীবনে এই প্রথম ঠেকে শিখেছি। কিন্তু না কোন বেরসিক আততায়ী একটুকরো পাথর নিয়ে আমার মাথার পিছনে আঘাত করতে ঘরে ঢোকেনি। ধরিত্রী এসেছে।

ধরিত্রী বলল—মিঃ চৌধুরী, এখন শরীর কেমন আপনার?

আসুন মিস সিং। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।...বলে বিছানায় হেলান দিয়ে বসলুম। ধরিত্রী কোনার সোফায় বসল। তার সুন্দর মুখে শোকের চিহ্ন স্পষ্ট। গাম্ভীর্য থমথম করছে। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তারও পরিচয় রয়েছে।

ধরিত্রী বলল—কফি এসে পড়বে এখনই। কফিটা খেয়ে নিন। আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

বললুম—আচ্ছা মিস সিং, যদি কিছু মনে না করেন—একটা প্রশ্ন করব।

ধরিত্রী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—না, না। মনে করার কি আছে? বলুন না।

—মেজরসায়েব, মানে আপনার বাবাকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা?

ধরিত্রী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নখ খুঁটতে খুটতে বলল—দেখুন মিঃ চৌধুরী, পুলিশও আমাকে এ প্রশ্ন করেছে। বলেছি, আমার মাথায় আসছে না। বাবার সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না। ছিল না, একথা আমি জোর দিয়েই বলব। হয়তো একটু সিরিয়াস টাইপ এবং রাগী বা জেদীও ছিলেন খানিকটা। তাই বলে তাঁর সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল না। থাকলে নিশ্চয় আমি জানতুম। বাবা কোন কথা আমাকে গোপন করতেন না।

—শুনলুম, গতকাল আপনার আসার কথা ছিল চারটে নাগাদ। সাড়ে পাঁচটায় এসে পৌঁছেছিলেন!

প্রশ্নটা গোয়েন্দার মতো হয়ে গেল নিশ্চয়। ধরিত্রী যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। আমার কাছে গোয়েন্দাদের প্রশ্ন সে হয়তো আশা করেনি। গম্ভীর হয়ে বলল—পুলিশেরও এই একই কথা। এর সঙ্গে বাবার মার্ডারের ঘটনার কি যোগাযোগ, আছে, বুঝতে পারছি না।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম। বললুম—না, না। জাস্ট মাথায় এল প্রশ্নটা। আপনি তো জানেন, আমি পুলিশ নই। সখের গোয়েন্দাও নই। খবরের কাগজের রিপোর্টার। এ নিছক কৌতূহল মিস সিং।

ধরিত্রী এ কথায় আবার একটু হাসল। বলল—দিল্লীতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে আটকে পড়েছিলুম। সেজন্যই দেড় ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। এতে কোন সিরিয়াস্ ব্যাপার নেই!

এই সময় যে কাফির ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল, তাকে দেখে হাঁ করে রইলুম। সেই বাবুর্চি নারুলা! ব্যাপার কী? তাকে ছেড়ে দিল যে পুলিশ?

নারুলা ট্রে রেখে দাঁড়াল। ধরিত্রী বলল—ওঁদের ডেকে নিয়ে এস। বলো, কফি রেডি।

নারুলা চলে গেল। বললুম—পুলিশ ওকে এ্যারেস্ট করেছিল। ছেড়ে দিল বুঝি?

ধরিত্রী বলল—হাঁ। বেচারার ওপর খামোকা সন্দেহ। ও খুব ভালোমানুষ। নিরীহ প্রকৃতির। বাবা ওকে খুব বিশ্বাস করতেন। সেই ছেলেবেলা থেকে নারুলা আমাদের ফ্যামিলিতে আছে। কোন সময় এতটুকু

অবিশ্বাসের কাজ করে নি।

—কিন্তু মার্ডারের ঘটনা চোখে দেখেও চেপে রেখেছিল।

—ওটা আপনাদের ব্যাখ্যার ভুল, মিঃ চৌধুরী। নারুলা বেচারা বরাবর ওইরকম ভীতু আর বোকা।...বলে ধরিত্রী উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। কর্ণেল, মিঃ সাঠে এবং ডাঃ সিং কথা বলতে বলতে আসছেন শোনা গেল। তাঁদের অভ্যার্থনা করতেই ধরিত্রী এগিয়ে গেল।

কর্ণেল ঘরে ঢুকে বললেন—হ্যাল্লো ডার্লিং! আশা করি এখন মগজের আচ্ছন্নতা সম্পূর্ণ কেটে গেছে! ডাঃ সিংয়ের চিকিৎসার প্রতি আমার আস্থা প্রচুর।

কর্ণেল হেসে উঠলেন হো হো করে। সবাই হাসলেন। সোফায় বসে ডাঃ সিং বললেন—ব্যাথা কমেছে তো মিঃ চৌধুরী?

ঘাড় নাড়লুম। মিঃ সাঠে বললেন—তাহলে কফি খেতে-খেতে অসমাপ্ত আলোচনাটা সেরে নেওয়া যাক। কী বলেন কর্ণেল?

কর্ণেল বললেন—স্বচ্ছন্দে।

ধরিত্রী কফিতে দুধ মিশিয়ে পেয়ালাগুলো প্রত্যেকের হাতে তুলে দিল। তারপর নির্দ্বিধায় বিছানায় আমার সামান্য তফাতে পা ঝুলিয়ে বসল।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ সাঠে বললেন—পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। ফোরেন্সিক এক্সপার্টদের রিপোর্ট এবং মর্গের রিপোর্ট'ও তাই বলছে। এদিকে জয়ন্তবাবুও একটা রিভলভার দেখে- ছিলেন আপেল গাছের গোড়ায়। শুকনো পাতার তলার ঢাকা ছিল। এখানে দুটো প্রশ্ন ওঠে। এক: রিভলবারের পাল্লার মধ্যে ছিলেন মেজরসাহেব। তাহলে নিশ্চয় তাকে কাছেই দেখতে পেয়েছিলেন। দুই: রিভলবারটা খুনী কাছাকাছি জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল। অকুস্থল থেকে মাত্র পঞ্চাশ বাট হাত দূরে। সে মার্ডার উইপন নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু সারাটা রাত গেল। গতরাতে অন্ধকারও ছিল। চাঁদ ওঠে রাত তিনটের পর। ওখানে রাতে কোন পুলিশও ছিলনা। ডেডবডি অলরেডি দিল্লি মর্গে পাঠানো হয়েছিল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। অথচ রিভলবারটা আজ দুপুর অব্দি কেন ওখানে রইল?...বলে মিঃ সাঠে কর্ণেলের মুখের দিকে তাকালেন। ফের বললেন এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কী কর্ণেল?

কর্ণেল বললেন গতকাল সন্ধ্যা থেকে আজ দুপুর অব্দি পুলিশের পক্ষ থেকে আশেপাশের জায়গাগুলো ভাল করে খুঁজে দেখার চেষ্টাই হয় নি। আগে এই ত্রুটিটা কি আপনি স্বীকার করবেন মিঃ সাঠে?

মিঃ সাঠে একটু হেসে বললেন—স্বীকার না করার কারণ দেখি না। আসলে কী হয়েছিল জানেন কর্ণেল? আমরা ধরেই নিয়েছিলুম, গুলি ছোড়া হয়েছে বন্দুক থেকে এবং আততায়ী ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে টিপ করেছিল। আমাদের ভুলের জন্যে দায়ী···

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন—নারুলার স্টেটমেন্ট।

—ঠিক বলেছেন। নারুলা ঘটনাস্থল থেকে আন্দাজ দেড়শো গজ দূরে মেজরসায়েবের একেবারে পিছনে ছিল। অড়হর ঝাড়টার কাছে দাঁড়ালে মেজর সায়েবের কাঁধ থেকে মাথাটুকুই দেখা যায়। তাছাড়া তখন নারুলার চোখের সামনে সূর্য। তার ভুলই দেখার কথা। তার ভুলেই আমাদের ভুল।

কর্ণেল বললেন—দ্যাটস কারেক্ট। মেজর সায়েবের কপালের মাঝামাঝি জায়গায় গুলি লেগেছিল। অথচ ভুট্টাক্ষেতে কোন পায়ের দাগ নেই। তার মানে আততায়ী ছিল তাঁর বাঁদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। এদিকে মেজর সায়েবের ডানপায়ের জুতোর ডগা নালায় গভীর দাগ ফেলেছে। এর একটিই কারণ হতে পারে। মুখ ঘুরিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে আততায়ীকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা আগে নালায় পড়ে যাবার কথা। বাঁ পা নালার গায়ে পড়ে ছিল। ঘষটানো দাগ রয়েছে।

মিঃ সাঠে বললেন—মেজর সায়েবের বাঁদিকে বেড়া অব্দি দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ষোল গজের সামান্য বেশি। নালাটা বেড়াঅব্দি গিয়ে পশ্চিমে ঘুরে ভুট্টাক্ষেতে ঢুকেছে। ঘটনাস্থল থেকে সাতগজ দূরে নালার ধারে-ধারে বেড়া পর্যন্ত ঘন অড়হর ঝোপ। আততায়ী অড়হর ঝোপেই ছিল ওৎ পেতে। অতএব রেক্সও বাঁদিকে ঘুরে তাকে দেখে গরগর করছিল। নারুলা এটাও গুলিয়ে ফেলেছে।

কর্ণেল বললেন—রেক্স দুপা তুলে অদ্ভুত ভঙ্গী করেছিল, মাইণ্ড দ্যাট।

মিঃ সাঠে চিন্তিত মুখে বললেন—ভেরি ইমপর্টান্ট পয়েন্ট। খামারের কেউ বলতে পারল না, কিংবা ইচ্ছে করেই বলল না হয়তো, রেক্স কাকে দেখে অমন ভঙ্গী করত!

ধরিত্রী কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছে দেখলুম। কিন্তু সে চুপ করে গেল।

ব্যাপারটা শুধু আমারই চোখে পড়ল। ডাঃ সিং বললেন—এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞানগম্যি বিশেষ নেই। তবে একটা কথা মনে হচ্ছে।

কর্ণেল বললেন—বলুন, বলুন।

ডাঃ সিং বললেন—আততায়ী রেক্সের সুপরিচিত।

মিঃ সাঠে বললেন—সে তো বোঝাই যায়। ওটা প্রথমেই আমরা ধরে নিয়েছি ডাঃ সিং! তাছাড়া সে মেজর সায়েবেরও খুব চেনা লোক। তাকে দেখে তিনি জোরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—মানে, বাস্টার্ড ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছিলেন। এত জোরে যে দেড়শো গজ দূর থেকে নারুলার কানে গিয়েছিল তা। তো সে কথা আপাতত থাক। গোড়ার কথায় ফিরে যাই। কর্ণেল, আমার দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার ধারণা কী, জানতে চেয়েছিলুম!

কর্ণেল অভ্যাসমতো দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন—আততায়ী বাইরে থেকে আসেনি। খামারেই ছিল। গুলি করার পর রিভলবারটা কয়েকগজ দূরে ডান দিকে অর্থাৎ পূর্বে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে আপেলগাছের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল এবং ভালমানুষ সেজে খামারের লোকের সঙ্গে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। এ ছাড়া কী বলা যায়?

—তাহলে সে রিভলবারটা রাতে কোন একসময় সরাতে পারত?

—পারেনি, তা বোঝাই যায়। কর্ণেল একটু হাসলেন।...ঘটনা ঘটে চারটে কুড়ি নাগাদ? পুলিশ আসে সাতটার একটু পরে। এই তিনঘণ্টা লাসের কাছে মজুর-মজুরনী এবং অমরনাথ আর শিবালু ছিল। নারুলাও ছিল। তাদের চোখ এড়িয়ে ওদিকে অস্ত্র সরাতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তারপর পুলিশ এসে তো সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আপনি এসেছিলেন কটায় যেন?

—সাড়ে সাতটায়। এসে আমি সবাইকে একে একে জেরা করার জন্যে ওই বারান্দায় বসিয়ে রেখেছিলুম। তারপর সারারাত ওই উঠোনে কনস্টেবল পাহারা ছিল। আমিও ওৎ পেতে বসে ছিলুম পাশের ঘরে। যদি কেউ কোন মতলবে বেরোয়, চোখে পড়তে পারে! কেউ বেরোয় নি। বেরুলেই চোখে পড়ত—আমার, অথবা সেপাইদের।

ডাঃ সিং বললেন—ওরা বাইরে বেরুবে ভেবেছিলেন কেন?

বুঝলুম ডাঃ সিং লোকটি একেবারে গবেট। আমার হাসি এসে গেল।

ডাঃ সিং আমার দিকে তাকালে বিব্রত বোধ করলুম। বললুম—খুব সঙ্গত প্রশ্ন, ডাঃ সিং!

মিঃ সাঠে হেসে উঠলেন। বললেন—মার্ডার উইপন পাওয়া যায়নি বলেই সবাইকে চোখে-চোখে রেখেছিলুম।

ডাঃ নাছোড়বান্দার মতো প্রশ্ন করলেন—কিন্তু যেই সূর্যদেব উঠলেন, নিশ্চয় চোখে-চোখে রাখাটা আর কনটিনিউ করা হল না?

না, লোকটা গবেট নয়। আমরাই ভুল। যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য বলা যায়। কর্ণেল গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন—রাইট, রাইট।

মিঃ সাঠে বললেন—অথচ ব্যাটা খুনী দিব্যি জয়ন্তবাবুর মাথায় পাথর ঠুকে অস্ত্রটি হাতিয়ে কেটে পড়ল।

বিব্রত মুখে-মিঃ সাঠে বললেন—মানে, জাস্ট একটুখানি ভুট্টাক্ষেতে ঢুকেছি কর্ণেলকে নিয়ে। সেই ফাঁকে লোকটা ওখানে হাজির হয়েছে চুপিচুপি।

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আচ্ছা স্যার, শুনলুম মেজর সায়েবের একজন কম্পাউণ্ডার ছিলেন। তিনি কোথায়?

মিঃ সাঠে বললেন—ও। রঘুরামাইয়া তো? সে গতকাল দুপুরে ছুটি নিয়ে গ্রামে গিয়েছিল। তাকে আজ সকালে ডেকে আনা হয়েছে। সন্দেহ-কিছুই পাই নি।

ডাঃ সিং বললেন—কর্ণেলসায়েব বলছেন, খুনী খামারেরই কেউ। কিন্তু খামারের কাকে দেখে রেক্স গরগর করবে? কাকে দেখেই পা তুলে অদ্ভুত ভঙ্গী করবে? এবং কেনই বা মেজর সাহেব তাকে দেখে গাল দেবেন!

কর্ণেল বললেন—খুব কড়া প্রশ্ন, ডাঃ সিং। কিন্তু আপনি যে বললেন, আমি নাকি বলেছি খুনী খামারেরই কেউ—ওটা ভুল শুনেছেন। আমি বলেছি, খুনী যেভাবেই হোক খামারেই ছিল। তাকে নারুলা, অমরনাথ, শিবালু বা দারোয়ান তুম্বেরিলাল কিংবা মজুরনীরা অবশ্যই দেখতে পাওয়া উচিত ছিল। অথচ কেউ নাকি দেখতে পায়নি। নাকি দেখেও চেপে যাচ্ছে!

মিঃ সাঠে বললেন—জেরা যথেষ্ট করা হয়েছে তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে না ওদের স্টেটমেণ্টে।

কর্ণেল বললেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুনী মাঝে মাঝে খামারে এসেছে। গতকালও কোন এক সময় থেকে সে খামারে ছিল। হয়তো আজ দুপুরে জয়ন্তকে অজ্ঞান করে রিভলভার নিয়ে সে কেটে পড়েছে।...বলেই কর্ণেল ঘুরে ধরিত্রীর দিকে প্রশ্ন ছুড়লেন—আচ্ছা ধরিত্রী, তোমার কাকা মিঃ অনন্তরাম-

এখন তো ক্যানাডায় আছেন, তাই না ?

ধরিত্রী ঘাড় নাড়ল।

—তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

—হয়েছে। ধরিত্রী জবাব দিল। জরুরী টেলেক্স পাঠানো হয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়।

কর্ণেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন—তাহলে আজ রাতে কিংবা আগামী কাল সকালে উনি এসে পড়তে পারেন।

এইসময় বারান্দায় শেকলে বেঁধে রাখা রেক্সের গর্জন আওয়াজ শোনা গেল। ধরিত্রী অমনি বাইরে চলে গেল। মিঃ সাঠে চিন্তিত ভাবে বললেন —তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই। খুনী বাইরে থেকে এসেছিল। খুন করার পরেও খামারে থেকে গিয়েছিল। কারণ মার্ডার উইপনটা যে কোন কারণেই হোক সরাবার সুযোগ পায় নি। এই তো আপনার সিদ্ধান্ত, কর্ণেল ?

কর্ণেল বললেন জাষ্ট এ প্রবেবিলিটি, মিঃ সাঠে। নিছক সম্ভবনা।

আমি বললুম কিন্তু গুলি করার পর খুনী রিভলবার লুকিয়ে রাখতে গেল কেন ? সে তো ওটা নিয়েই তক্ষুনি পালিয়ে যেতে পারত। মাঠের ওপাশে পাহাড় এবং জঙ্গল রয়েছে।

কর্ণেল মাথা দুলিয়ে বললেন দ্যাটস রাইট, জয়ন্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সে তা করে নি। খুনের পর রিভলবার লুকিয়েই রেখেছিল। অতএব খুনের পিছনে তার আরও উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই তার খামারে থাকার দরকার ছিল। অথচ কাছে অস্ত্র রাখার ঝুঁকি আছে। কারণ পুলিশ সবাইকে বডি সার্চ করবে। সবার জিনিষপত্রও সার্চ করবে। এ রিস্ক সে নেয়নি।

গুম হয়ে বললুম তাও বটে।…

চার

সত্যি বলতে কি, গতকাল অদৃশ্য খুনীর হাতের একটি মোক্ষম চাঁটি খাওয়ার পর আমার এমন আতঙ্ক হয়েছিল যে ঘর থেকে বেরুতেই ভয় পাচ্ছিলুম। রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দিলুম। সকালে কেটে পড়তে পারলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু কর্ণেল আমাকে ছাড়লে তো ?

অবশ্য রাতটা ভালয়-ভালয় কেটে গেল। কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা

ঘটল না। ডাঃ সিং সন্ধ্যার পর দিল্লি ফিরে গেছেন। কর্নেল মিঃ সাঠে এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা কিসব গুজগুজ করছিলেন অনেকটা রাত অব্দি। আমি তাতে নাক গলাইনি। বিছানায় শুয়ে বই পড়ে কাটিয়েছি। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে বাইরে রেকোর গর্জন শুনেছি। আর কর্নেলের নাসিকা গর্জন তো ছিলই।

…সকালে কর্নেল বললেন—এস জয়ন্ত, একটু ঘোরাঘুরি করে আসি। কাল থেকে বাইশটি ঘণ্টা তুমি ঘরের মধ্যে কাটাচ্ছো। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। মগজের জ্যাম ছাড়াতে খোলা হাওয়ার ঘোরাঘুরি করা দরকার।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম—কিন্তু ওই পুকুড়পাড়ের হাওয়াটা স্বাস্থ্যকর নয়। বরং অন্য কোথাও হাওয়া খেতে যাওয়া যায়। অন্তত যেখানে কোন ঝোপ-জঙ্গল নেই।

কর্নেল হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে বললেন—আমরা ঝোপজঙ্গলে ঢুকব না। এসই না। আমাদের জীপটা গ্যারেজ থেকে বের করে এনে দিল অমরনাথ। কর্নেলের স্টিয়ারিং এ বসে পড়লেন। অমরনাথ নিজের কাজে গেল। আমি কর্নেলের ডানপাশে বসলুম। আমাদের জিপ গেট দিয়ে বেরিয়ে ক্যানাল ব্রিজ পার হয়ে মাঠে রাস্তায় পড়ল। একফালি পাচের এই রাস্তা মেজর হরগোবিন্দের উদ্যমেই তৈরি। গতকাল সকালে এই রাস্তা দিয়েই আমরা দিল্লি থেকে এসেছিলুম!

তিন কি. মি. দূরে চিকারি গ্রাম। ছোট বসতি। কিছু দোকানপাটও আছে হরিদ্বারের দিকে যে বড় রাস্তাটা গেছে, এই গ্রাম তারই ধারে। বড় রাস্তা থেকে ডাইনে ঘুরে গ্রামের শেষপ্রান্তে জিপ থেমে গেল। একটা পিপুল গাছের তলায় কতকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। তারা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। কর্নেল হাসিমুখে পকেট থেকে একগাদা চকলেট বের করে তাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন। তারপর একজনকে বললেন—ভোমরলালের বাড়িটা কোথায়? একে ডেকে দেবে?

ওখানে উঁচুনীচু পাথরভর্তি জায়গায় কুঁড়েঘর রয়েছে অনেকগুলো। গরীব লোকের বসতি। ছেলেটি একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই যে! ভোমরলাল [illegible] হাঁটতে পারে না।

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। এস জয়ন্ত।

আমরা একটা খোলামেলা বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালুম। জিপ দেখে একটি মেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। মধ্যবয়সী মেয়ে। কর্নেল ওকে

বললেন—ভোমরলালজীর সঙ্গে দেখা করব, বোন।

ভয়পাওয়া গলায় মেয়েটি বলল—আপনারা পুলিশের লোক?

কর্ণেল হাসলেন।—না, বোন। আমরা অন্য একটা কাজে এসেছি। আমরা পুলিশ হব কোন দুঃখে? মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরে কী যেন ভাবল তারপর বলল—তাহলে কী কাজ?

কর্ণেল চাপা গলায় বললেন—আমরা দিল্লি থেকে এসেছি। সরকারের জমিজমা দফতরের লোক।

শুনেই মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠল। তক্ষুনি গুহার মতো পাথরের ঘরটার মধ্যে উঁকি মেরে কাকেও কিছু বলল। তারপর একটা খাটিয়া এনে উঠানের পেয়ারা গাছের তলায় রাখল। আমরা বসলুম। একটু পরে গুহাঘরের দরজা দিয়ে খটখটে বুড়ো একটা লোক লাঠি ধরে বেরিয়ে এল। আমাদের সামনে এসে সেলাম দিল তারপর মাটিতে বসে পড়ল। মেয়েটি তার পাশে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কর্ণেল বললেন—ভোমরলালজী, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলুম বলে আশাকরি কিছু মনে করবেন না। কয়েকটা কথা আপনার কাছে জানতে চাই।

ভোমরলাল বলল—আপনারা দিল্লি থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

সরকারের লোক?

—হ্যাঁ ভোমরলালজী।

—জমিজমা দফতরের অফিসার?

হ্যাঁ। আপনার কাছে...

বাধা দিয়ে ভোমরলাল বলল—আমার জমি ফেরৎ পাব, না পাব, আগে তাই বলুন হুজুর। কর্ণেল হাসলেন।—ফেরৎ পেতে হলে আগে আমার কথাগুলোর জবাব দিতে হবে ভোমরলালজী।

—বেশ বলুন।

—মেজর হরগোবিন্দ সিং আপনার কত বিঘে জমি কিনেছিলেন?

—কিনেছিলেন? বিলকুল মিথ্যে, স্রেফ ঝুটবাজী। ভোমরলাল প্রায় গর্জন করে উঠল।

কেন টাকা দিয়ে আপনার জমি কেনেন নি মেজরসায়েব?

জোরে মাথা দোলা'ল ভোমরলাল। তারপর বলল—উনি আমাকে

রাস্তার ফকির করেছেন হুজুর। শুধু আমাকে একা নয়। এই চিকারিবস্তীর আরও অনেকের জমির জবরদখল করে সবাইকে ফকির করে দিয়েছেন! আমরা কত দরখাস্ত করেছিলুম ওপরে। কোন ফল হয়নি। তারপর শুনলুম কি না দিল্লীতে সরকার বদল হয়েছে। আবার গতমাসে একখানা আর্জিতে সই করে পাঠিয়েছি। আপনারা এতদিনে এনকোয়ারীতে এলেন? তো বস্তিতে আরও সবাইকে ডাকুন। ডেকে সব শুনুন।

কর্ণেল বললেন—আপাতত আপনার কথায় শোনা যাক। কতবিঘে জমি ছিল আপনার?

—বারো বিঘে জমি হুজুর। আগে তো তেমন কিছু ফলত না। বছর তিনেক আগে ক্যানেল হল। তারপর সোনাফলা জমি হয়ে গেল। কিন্তু চাষ দিতে গিয়ে বাধা পেলুম মেজরসায়েব নাকি জমি সরকারের কাছে বন্দোবস্ত নিয়েছেন করে। অথচ আমরা কতপুরুষ ধরে ওই জমিতে চাষ দিয়েছি। খাজনাও দিয়েছি। কোন কসুর ছিল না।

—একটা কথার জবাব দিন। আপনি কি মেজরসায়েবের কাছে কোন-সময় টাকা ধার নিয়েছিলেন?

—আমি? টাকা ধার নিয়েছিলাম? কখনো না হুজুর।

—কোন কাগজে কখনও সই দিয়েছিলেন?

—সই তো আজ পর্যন্ত কত কাগজে টিপসই দিলুম।

—না। মানে মেজর সায়েবের কাছে কোন কাগজে টিপসই দিয়েছিলেন কি?

ভোমরলাল একটু ভেবে বলল—হ্যাঁ। দিয়েছিলুম বটে। সবাই মিলে দিয়েছিলুম বটে। সবাই মিলে দিয়েছিলুম। কিন্তু সে তো হাসপাতালের দরখাস্তে, হুজুর! মেজর সায়েব হরবখত এখানে আনাগোনা করতেন। আমাদের নিয়ে মিটিং করতেন। বলতেন, গাঁয়ের উন্নতি করতে হবে। হাসপাতাল বসাতে হবে।

কর্ণেল বললেন—হুম্। বুঝেছি। আচ্ছা, আপনি যখন টিপসই দেন, তখন গাঁয়ের আরও সবাই সেখানে হাজির ছিল—নাকি একা দিয়েছিলেন?

ভোমরলাল বলল—আমি তখন বস্তির মোড়ল ছিলুম, হুজুর! আগে আমার টিপসই নিয়ে গেলেন মেজর সাহেব। আপনি যেখানে বসে আছেন, সেখানে উনি বসে একটা কাগজে আমার সই নিলেন। তারপর বললেন—বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সই নিয়ে বেড়াচ্ছি ভোমরলালজী! কাকেও পাচ্ছি, কাকেও

পাচ্ছি না। খুব সময় লেগে যাচ্ছে। তো আমি বললুম—হুজুর মেজর সায়েব, আপনি হুকুম দিলে গাঁওবালাদের ডেকে পাঠাতুম। একসঙ্গে সবার সই পেতেন। উনি বললেন—থাক। আমার একটু কষ্ট হচ্ছে, এই তো? তোমরা সবাই কাজের লোক। আমিও কাজের লোক। আবার কখন আসার সময় পাই কে জানে!…

কর্ণেল বললেন—। আপনার ছেলেমেয়ে কটি, ভোমরলালজী?

—এক ছেলে, দুই মেয়ে হুজুর! বড় মেয়ের গাঁয়েই বিয়ে দিয়েছি। ওই যে দেখছেন, ওই বাড়িতে।

—কুন্তী তো? ওকে চিনি।

ভোমরলাল খুশি হয়ে বলল—আর এই আমার ছোট মেয়ে যমুনা। আমার কাছে থাকে। গত বছর বিধবা হয়েছে, হুজুর। ছেলেপুলে নেই। শাশুড়ীটা খুব বদমাস মেয়ে।

—তোমার ছেলের নাম কী যেন…

—মদনলাল হুজুর।

—হ্যাঁ, মদনলালই বটে। সে কী করে?

—ড্রাইভার, হুজুর। এই রাস্তায় বাস চালায়। বলে ভোমরলাল আরও গম্ভীর হয়ে গেল। ফের বলল—ছেলে তার বুড়ো বাবাকে দেখে না হুজুর; দেখছেন না, কী অবস্থায় আছি!

—মদনলাল থাকে কোথায়?

—দিল্লীতে। সেখানেই বিয়ে করেছে। ভাল কামাচ্ছে, হুজুর। আমাকে দেখাশোনা করে না!

ভোমরলালের মেয়ে যমুনা বলে উঠল—ঝুট বলো না, বাবা। দাদা দেখাশোনা করে না তো কে করে? তুমি ভারি নেমকহারাম তো? দাদার নিন্দে করছ! জানেন হুজুর? দাদা না থাকলে বাবাকে ভিক্ষে করে খেতে হত? দোষ তো বাবারই। দাদা কত বাবাকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছিল। বাবা যাবে না। বলে, শহরে থাকতে ভাল লাগে না। মাঠঘাটের আদমি কি শহরে গিয়ে থাকতে পারি?

ভোমরলাল বিব্রত হয়ে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলল—তোর দাদার বউটা যে বড্ড দেমাকী আছে। আমাকে টাকা দেয় তোর দাদা—তাই শুনে একবার এখানে এসে ঝগড়া করে গেল না? হুজুর। আমার ভাঙা কপালে ওই মেয়েটাই নিংড়ে দিয়েছে!

যমুনা বলল—দাদা বিগড়ে যাবার মানুষই না! জানেন হুজুর? রাতবিরেতে গাড়ি থামিয়ে দাদা বাবার খবর নিয়ে যায়। কালকেও দুপুরে এসে দশটা টাকা দিয়ে গেল। বলে গেল—আবার সন্ধ্যায় বাস নিয়ে যাবার সময় আসবে! বাবার কথা ধরবেন না হুজুর। আমার দাদা দেওতার মতো আদাম। বাবার মাথাটাই বিগড়ে গেছে।···

রুষ্টা যমুনা ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিব্রত ভোমরলাল শুধু মাথা নাড়তে থাকল। কর্ণেল বললেন--তাহলে আমরা উঠি, ভোমরলালজী।

—হুজুর, জমি ফেরত পাব তো?

—দেখা যাক্।···বলে কর্ণেল উঠলেন এবং পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

যমুনা দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কর্ণেল বললেন - যমুনাবোন। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে!

যমুনা এগিয়ে এসে বলল—বলুন, হুজুর।

—কুন্তীদিদিকে কি এখন পাওয়া যাবে?

—না হুজুর। দিদি মেজর সায়েবের খামারে কাজকর্ম করত এতদিন। পরশু রোজ মেজর সায়েব খুন হয়ে গেলেন। খামারে এখন কাজ বন্ধ। দিদি তাই কাজ খুঁজতে বেরিয়েছে কোথায়। ওর স্বামীও সঙ্গে গেছে।

—আচ্ছা যমুনাবোন, তোমার দাদাকে তো মেজর সায়েব কিছুদিন খামারে কাজ দিয়েছিলেন? ট্রাক্টার চালাত। তাই না?

যমুনা ঘাড় নেড়ে বলল— দিয়েছিল দয়া করে। তারপর ঝুটমুট চুরির বদনাম দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। খুব শয়তান লোকছিল মেজর সায়েব।

—তোমার দাদা কি প্রতিদিন বাস নিয়ে যাওয়া আসার সময় একবার করে বাবার সঙ্গে দেখা করে যায়? নাকি মাঝে মাঝে?

—রোজ একবার করে বাস নিয়ে যায়, তারপর ফিরে যায়। সকলে দিল্লী থেকে বাস নিয়ে এ রাস্তায় যায় তখন একবার আসে। আবার সন্ধ্যায় ফেরার সময় বাস থামিয়ে একবার আসে। রোজ দুবার! বাবা তবু ছেলের ওপর খাপ্পা! বুড়ো হয়ে মাথা বিগড়েছে কিনা!

—পরশু তোমার দাদা সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার এসেছিল। তাহলে?

—পরশু? না হুজুর! আসেনি। কাল দুপুরে একবার এসেছিল। টাকা দিল। বলল, পরশু বুখার হয়েছিল। তাই বাস চালায়নি। অন্য ড্রাইভার বাস নিয়ে গিয়েছিল।

—আজ সকালে এসেছিল? — না হুজুর!

—কাল সন্ধ্যায় এসেছিল ?

—জী না। হয়তো বুখার বেড়েছে, তাই আসেনি।

কাল দুপুরে যখন আসে, তখন বাস নিয়ে এসেছিল নাকি ?

যমুনা মাথাটা জোড়ে নাড়ল।—দুপুরে বাস কোথায় ? ওর বাস তো সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার—দুই দফা। কাল দুপুরে এসেছিল গায়ে জ্বর নিয়ে। চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছিল। টাকা দিয়ে কুন্তীদিদির বাড়ি গেল। তারপর আর দেখিনি দাদাকে।

কর্ণেল বললেন—ঠিক আছে বোন। আমরা চলি …

পাঁচ

আমাদের জিপ খামারের দিকে ফিরে আসছিল। আমি ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছি। কিন্তু কর্ণেলকে দু একবার প্রশ্ন করতে গেলেই উনি বলেছেন—এই খারাপ রাস্তায় আমাকে অন্যমনস্ক করলে এ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে ডার্লিং। সুতরাং আমাকে ষ্টিয়ারিং-এর দিকে মনোনিবেশ করতে দাও।

ক্যানেলের ব্রিজে পৌঁছে জিপ থামালেন কর্ণেল। তারপর নেমে বললেন—এস জয়ন্ত কিছুক্ষণ প্রকৃতির প্রতি মন দেওয়া যাক। কী অপর্ব দৃশ্য চার পাশে! অবলোকন কর, বন্ধু।

আমরা ব্রিজের শেষপ্রান্তে ক্যানেলের পাড়ে একটা শিরিস গাছের ছায়ায় গেলুম। ওখানে একটা পাথর রয়েছে। তার ওপর বসে কর্ণেল চুরুট ধরালেন। কিছুক্ষণ ধূমপান করার পর বললেন—জীবনে এমন বিচিত্র সমস্যায় কখনও পড়িনি জয়ন্ত। এ এক সাংঘাতিক সমস্যা বলতে পারো। আমার বিবেক দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে বললুম - তার মানে ?

—আমার বিবেকের একটা খণ্ড বলছে, নরহত্যা মহাপাপ। আবার অন্য খণ্ড বলছে, মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়াও মহাপাপ। আচ্ছা তুমিই বল তো জয়ন্ত, এ দুই মহাপাপের কোন্‌টাকে ক্ষমা করা যায়, কোনটাকে যায়না ?

—যাই বলুন, খুনখারাপি ক্ষমাতীত।

—কিন্তু মানুষকে প্রবঞ্চনা করে মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া কি ক্ষমার যোগ্য ?

—আহা, সেজন্যে তো আদালত আছে!

—গরীবের আদালত। সোনার পাথরবাটি জয়ন্ত। কর্ণেল আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন। ভেবে দেখ ডার্লিং! মেজর হরগোবিন্দ সিং দেশের রাজনৈতিক জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে অঢেল খাদ্যশস্য উৎপাদনের ছলে সরকারের ভূমিদফতরকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। বিশদফা কর্মসূচীর তকমা

এঁটে আমার বন্ধু মেজর হরগোবিন্দ করলেন কী, একদল মানুষকে প্রবঞ্চনা করে ভূমিহীন করে ফেললেন। তাদের ওই জমিতে ফসল ফলত খুব সামান্যই। কারণ চিকারীর ওইসব চাষীর ক্ষমতা ছিল না যে উন্নত প্রথায় চাষ করার খরচা বহন করে। কিংবা বলতে পারো আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষবাসের কৌশল তারা জানতই না। সেই অছিলাটা কাজে লাগালেন আমার বন্ধু। তাঁকে নির্বাধের মতো সাহায্য করল ভূমি দফতর। ভূমি দফতর দেখল, তাদের উন্নত চাষবাস শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচিত লক্ষ্যাপূরণই বড় কথা— সেটা যেভাবেই হোক। অতএব তারা মেজর সাহেবকে সাহায্য করতে দ্বিধা করল না। মাঝখান থেকে অজস্র ছোট চাষী খেত থেকে উৎখাত হয়ে গেল। ক্ষেতমজুরে পরিণত হল তারা। কী করুণ দৃশ্য জয়ন্ত! নিজেদের জমিতে তাদের একদিন ক্ষেত মজুর হয়ে কাজ করতে হল। তাদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ তো জয়ন্ত? বললুম—পারছি বইকি।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট আবার ধরিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি নিশ্চয়ই হত্যাকারীকে চিনতে পেরেছ, জয়ন্ত?

—ভোমরলালের ছেলে মদনলাল তো?

—ইউ আর এ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট মাই ফ্রেণ্ড। হ্যাঁ, সেই মেজর হরগোবিন্দকে হত্যা করেছে। প্রতিহিংসা!

—এখনও অনেক ব্যাপার আমার কাছে অস্পষ্ট, কর্নেল।

—মদনলালকে নেহাৎ বিবেকের বশে হোক, কিংবা বশ মানিয়ে হাতে রাখতেই হোক, মেজর হরগোবিন্দ তাকে খামারে চাকরী দিয়েছিলেন। কৃষি যন্ত্রপাতির কাজ শিখিয়েও দিয়েছিলেন। মদনলাল ট্রাক্টার চালাতে শিখেছিল। তারপর স্বভাবত ড্রাইভিংও শিখে ফেলেছিল। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য ছিল, মেজর সায়েবের কাছ থেকে তার বাবা এবং গাঁয়ের আর সব চাষীর টিপসই দেওয়া কাগজগুলো উদ্ধার করা। ওগুলো আর কিছুই নয়—ঋণপত্র। তমসুক যাকে বলে। হাজার-হাজার টাকা ঋণের তমসুকে মেজর হরগোবিন্দ ওই হতভাগ্য নিরক্ষরদের সই নিয়েছিলেন। যাই হোক, এক রাতে মদনলাল এই খামারের একটা ঘরে আলমারি ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাকে পুলিশে না দিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অনেক ঘাটে জল খেয়ে মদনলাল দিল্লিতে বাসড্রাইভারের কাজ যোগাড় করে নেয়। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল প্রতিহিংসা এবং তমসুক উদ্ধার—দুটোই। পরশুদিন ক্ষেতমজুর ও মজুরনীদের দলে বুড়ো মজুর সেজে সে খামারে কাজ করতে এসেছিল। কুন্তী তো বটেই, আর সব মজুর-মজুরনীও ব্যাপারটা জানত। তাদের সঙ্গে রীতিমতো পরামর্শ করেই মদনলাল মজুর সেজে খামারে ঢোকে। বিকেলে এক ফাঁকে সে পুকুরের

দক্ষিণ পাড়ে গিয়ে মেজর সায়েবকে খুন করে। তারপর রিভলবার লুকিয়ে রাখে আপেলগাছের আড়ালে। তাড়াতাড়িতে শুকনো পাতা ঢাকা দিয়েছিল। কানে গুলির শব্দ শুনে লোকেরা দৌড়ে আসছে। এদিক তার দ্বিতীয় কাজ বাকি। ঋণপত্র উদ্ধার। মেজরসায়েবের লাস নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত, তখন সেই ফাঁকে সে গিয়ে আলমারি ভাঙবার দ্বিতীয় চেষ্টা করবে ভেবেছিল। কিন্তু ধূর্ত নারুলার চোখ তার দিকে ছিল। নারুলা তাকে চিনতে পেরেছিল। তাকে মজুরদের দল থেকে পুকুরপাড়ের দিকে যেতে দেখেই নারুলা অড়হরক্ষেত অব্দি অনুসরণ করেছিল। নারুলা ঢিকারির লোক। গাঁয়ের লোকের ভয়েই কথাটা চেপে ছিল। যাই হোক, খামারে ফোন থাকায় পুলিশ এসে পড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে। তার আগে মেজরসায়েবের মেয়েও এসে গিয়েছে। নারুলার চোখে পড়ায় মদনলাল আলমারি ভাঙবার সুযোগ পায়নি। ভেবেছিল ঠিক আছে নারুলার সঙ্গে বোঝাপাড়া করে নেবে। তারপর তো নারুলা তার কথায় অগত্যা রাজি হয়। ও ঘরের চাবি নারুলার কাছে থাকে। আলমারির চাবির হদিসও সে জানে। রাতে কাজটা করে ফেলবে মদনলাল। কিন্তু পুলিশ এসে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল। প্রথমে বোকামি করল কুন্তী। সে মুখ ফসকে হোক, কিংবা নারুলার কাঁধে দায় চাপাবার জন্যে হোক, নারুলা যে অড়হর ঝোপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বলে ফেলল পুলিশকে। নারুলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মদনলাল সুযোগ হারাল। এদিকে খামারবাড়ি জুড়ে তখন পুলিশ ভর্তি। মজুর-মজুরনীদের জেরা শুরু হয়েছে। সবাইকে আটকানো হয়েছে। আমরা এসেও বেচারাদের দেখেছি।

প্রশ্ন করলুম—তাহলে নারুলা জেরার চোটে সব কবুল করেছে?

কর্ণেল বললেন—সবটা নয়। খানিকটা। সে তো আগেই শুনেছ তুমি। মদনলালের কথা সে বলেনি। এদিকে মদনলালকে চিনত নারুলা ছাড়া আরেকজন। সে হল কম্পাউণ্ডার রঘুরামাইয়া। সে ছুটিতে ছিল। বাকি কর্মচারীরা এসেছে সম্প্রতি। মেজরসায়েব খুব কড়াধাতের লোক ছিলেন। হরদম পুরণো লোক তাড়িয়ে নতুন লোক আনতেন। দয়োয়ান তুম্বেরিলালও এসেছে গতমাসে। আগের দারোয়ানকে তাড়িয়ে দিয়ে তাকে বহাল করা হয়েছিল।

মদনলাল তাহলে গতকাল দুপুর অব্দি খামারে ছিল?

—ছিল। আমরা এসেও তাকে মজুর-মজুরনীদের সঙ্গে দেখেছি। সত্যি বলতে কী, আমার ব্যাপারটা খারাপ লেগেছিল। ও বেচারা গরীব মানুষ। খামোকা আটকে রাখার কী মানে হয়। আমিই মিঃ সাহুকে বললুম, ওদের

ছেড়ে দিন। জেরা করে যা জানার তা তো জানা হয়েছে, আর আটকে রেখে লাভ কী? তখন ওদের যেতে দেওয়া হল।

মদনলাল তাহলে রিভলবারটা নিয়েই কেটে পড়তে পারল?

—পারল বইকি। ওদের বডি সার্চ করা হয়েছিল সেই একবার। পরশু সন্ধ্যায় গতকাল দুপুরে যাবার সময় ওদের আর সার্চ করার কারণ ছিল না। কাজেই মদনলাল কেটে পড়ল অস্ত্র নিয়ে।

—কিন্তু আপনি ভোমরলালের ব্যাপারটা কী ভাবে জানলেন?

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—মজুর-মজুরনীদের হাবভাব দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল- যেন কী চেপে রেখেছে ওরা। কুন্তীর দিকে তাকাতেই সে বিব্রত হয়ে মুখ নামাল। তারপর চাপা গলায় বলল—হুজুর! আমাদের খামোকা কষ্ট দিচ্ছেন আপনারা। উপরওলা যাকে সাজা দেবার দিলেন। এখন আমাদের আটকে রেখে কী হবে? বালবাচ্চা ভুখা আছে। আমাদের ছেড়ে দিন! তো বুঝলে জয়ন্ত? ওর ওই "উপরওলা যাকে সাজা দেবার দিলেন" কথাটা কানে বড় হয়ে বেজেছিল আমার। কৌশলে কথা বলা শুরু করলুম। বেরিয়ে এল এই খামারের জমির রহস্য। ভোমরলালের নাম জানলুম। ওরা চলে যাবার পর মেজর সায়েবের আলমারি হাতড়ে তমস্সুক-গুলো বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মদনলালের কথা তখনও জানতে পারিনি। যদিও ততক্ষণে আঁচ করেছিলুম যে এই হত্যাকাণ্ডে প্রতিহিংসার ব্যাপার থাকা খুবই সম্ভব। মদনলালের কথা একটু আগে আমরা জানতে পেরেছি জয়ন্ত। তাই না?

—নারুলাকে হঠাৎ গতকাল ছেড়ে দিল কেন পুলিশ?

—নারুলা মদনলালের নাম বলেনি বটে, কিন্তু আমার মুখে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল, মেজর সায়েব কত লোককে চাকরি দিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়েছেন—হয়তো তারাই কেউ শোধ নিল! ওকে জিগ্যেস করলুম—কাকে চাবুক মেরেছিলেন, নারুলা? নারুলা বলল—একজনকে নয়, হুজুর। কতজনকে চাবুক খেতে হয়েছে। একজনকে তো আলমারি ভেঙে চুরির দায়ে চাবুক মারা হয়েছিল!...বুঝলে জয়ন্ত? নারুলার সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গভাবে কথা বলার জন্যে মিঃ সাঠেকে বললুম, ওকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিন। ঘরে বন্দী করে রাখা লোকের মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে। ছেড়ে দিন। কিন্তু নজরবন্দী থাক। কাজ কর্ম করুক। খামারের বাইরে যেন না যেতে পারে। তাহলে নারুলার সঙ্গে গল্প করে অনেক কিছু জানা যেতে পারে। তো তাই করা হল। কাল বিকেলে নারুলাকে নিয়ে গল্প স্বল্প করতে করতে অনেক তথ্য জানতে পারলুম। কিন্তু মহা ধড়িবাজ লোক—কিছুতেই মদনলালের কথা বলল না। তখন নেহাৎ অনুমানের ভিত্তিতে ব্যাপারটা দাঁড় করালুম। এবার

বোঝা যাচ্ছে, আমি হাণ্ডেড প্যাসেণ্ট কারেক্ট।

মিঃ সাঠে গেট দিয়ে বেরিয়েছেন দেখা গেল। কর্ণেল চাপা স্বরে বললেন—কিছু ফাঁস করবে না জয়ন্ত। আমরা এখনই কেটে পড়ব : পুলিশ নাকলাকে আরও জেরা করবে এবং নির্ঘাৎ বাক্টিটা সে উগরে দেবেই। একেত্রে আম দ্বিখণ্ডিত বিবেক নিয়ে মনোকষ্টে ভুগি কেন?

বললুম—কিন্তু মেজর হরগোবিন্দ আপনার বন্ধু ছিলেন, কর্ণেল!

—ডার্লিং, এতদিনে সব শোনার পর আমি ওই বন্ধুত্বের জন্য বিব্রত বোধ করছি। তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।···বলে বুকে ক্রস এঁকে কর্ণেল পা বাড়ালেন।

মিঃ সাঠে কাছে এসে বললেন—কর্ণেল সরকার। আপনার অপেক্ষা করছিলুম। খুনীকে আমরা ধরে ফেলেছি। দিল্লি থেকে এইমাত্র ফোনে খবর এল। তার কাছে রিভলবারটাও উদ্ধার করা হয়েছে। লোকটা কে জানেন? লোকটা···

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন—মদনলাল তো?

অবাক হয়ে মিঃসাঠে বললেন—আপনি কীভাবে জানলেন? আশ্চর্য তো

কর্ণেল মৃদু হেসে বললেন—আমার প্রতি আপনি এখনও আশ্চর্য শব্দ! ব্যবহার করছেন শুনে আমিই আশ্চর্য হচ্ছি। এটা গর্ব বলে মনে হবে। কিন্তু মাঝে মাঝে এই গর্ব প্রকাশের সুযোগ পাই বলেই হয়তো আমি গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াই····

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : জন্ম ১৯৩০ সালে মুর্শিদাবাদের কান্দির খোসবাসপুর গ্রামে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুস্তাফা সিরাজ একজন স্বতন্ত্র ভঙ্গির লেখক। গ্রাম বাংলার ধূলি মলিন মাঠে, ঘাটে অতিক্রান্ত যৌবন লেখক তাঁর গ্রামীন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল ফলান তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জল্য ও সরসতা আমাদের চমৎকৃত করে। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে মানব মানবীর জীবনের দ্বন্দ্ব, ও অন্তর্লীন সংঘাত এক নতুন শৈল্পিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। তারাশঙ্করের পথ পরিক্রমায় পদচারণ তাঁকে কিয়ৎকালের মধ্যে স্বকীয়তায় উত্তীর্ণ করেছে। পরিণত বয়সে লেখক নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতা সুবাসিত বহু গল্প, উপন্যাস ও গোয়েন্দা কাহিনীও লিখেছেন। লেখকের "ঘটনা যখন রহস্য জনক" ইত্যাদি গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পও আমাদের আকৃষ্ট করে। তারাশঙ্কর ও টমাসহার্ডির মত তাঁর সাহিত্যের ভাষায় গ্রামজ শব্দের সংযোজন ঘটেছে বার বার।

মণ্ডলবাড়ীর মৃত্যু রহস্য

প্রবুদ্ধ

—লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে চাঞ্চল্য জাগলো।

স্থানীয় এম-এল-এ স্বয়ং এসেছেন গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। গদাধর মণ্ডলের স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পাশাপাশি শয্যায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

আজই সকালের ব্যাপার। প্রাতিবেশী দীনু কর্মকারের চোখেই দশ্যটা প্রথম পড়ে। দীনু এসেছিল তার প্রাপ্য আট আনা পয়সা নেবার জন্য। আজকেই দেবার 'কড়ার' ছিল। আধুলি নেবে কি, কপাট ঠেলে সস্ত্রীক মণ্ডলকে 'হাঁ' করা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের মুখই হাঁ হয়ে গেছলো। তবু ডাকাডাকি করছে, শেষে হাত দিয়ে দুজনকেই নাড়িয়েছে। দুজনেই মরে কাঠ দীনুও কাঠ, —ভয়ের চোটে।

গদাধরের বাড়ীর অনতিদূরে থাকেন স্থানীয় এম-এল-এ রনজিৎ ঘোষ। বুদ্ধি করে দীনু তাঁকেই খবরটা দিয়েছে। রনজিৎ বাবু এসেছিলেন। ঘরে ঢুকে মৃতদেহ দুটো দেখে কেমন উদাস হয়ে গেছলেন। এই তো জীবন! পরক্ষণে সম্বিত ফিরে আসতেই একটা ট্যাক্সি করে সোজা লালবাজারে চলে এসেছেন গোয়েন্দা বিভাগে। স্বয়ং ঝানু এম. এম. এ-র লালবাজারে উপস্থিতিতে এই মৃত্যুটা ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো।

খুন-খারাবি না হয়ে যায় না তাই রনজিৎবাবু না বল্লেও বুদ্ধি করে বড় কর্তা শিক্ষিত কুকুরের সঙ্গে নিলেন। জীপে রনজিৎবাবু আর কর্তা তো থাকলেনই, অধিকন্তু আরও দুজন সেপাই চল্লেন ঘটনাস্থলে। পথে যেতে যেতে রনজিৎবাবুর কাছ থেকে বিশেষ কিছু খবর আদায় করা গেল না, দীনু যা দেখেছে, রনজিৎবাবুও তাই দেখেছেন, এর বেশী নয়। ভদ্রলোক বেশ চাপা, বড়কর্তা ভাবলেন—মুখে কিছু না বল্লেও অনেক কিছু জানেন মনে হচ্ছে। যাক, স্বচক্ষে দেখে স্বকর্ণে শুনে সব সন্দেহ ভঞ্জন করলেই চলবে, —ভাবলেন তিনি।

একটু পরেই জীপ পৌঁছে গেল মণ্ডলবাড়ীর সামনে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কি সব বলাবলি। পুলিশ দেখে সবাই চুপ মেরে গেল। জনতার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হলেন বড়কর্তা। কুকুরকে কাজে লাগলে আসাফল্য নাও হতে পারে। তাছাড়া, অপরাধ বিজ্ঞানে বলে, অপরাধ রুপরাধ করার পর অপরাধী কৌতুহলবশতঃ ঘটনা স্থলের আশেপাশে ঘুরঘুর করে।

তবু একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যদি এদের মধ্যে কাউকে আসামী বলে সন্দেহ হয়। এদের মধ্যে ফতুয়াপরা একটি লোককেই বেশ শক্তিমান বলে মনে হচ্ছে। ভুঁড়িও উঁকি মারছে তেল চিকচিকে দেহে। গলায় একটা সোনার মফচেন জিজ্ঞেস করে রনজিৎবাবুর কাছ থেকে জানলেন, ইনি এখানকার মার্চেন্ট বদ্রীদাস ঝুন ঝুন ওয়ালা; বহুদিনের বাসিন্দা, ছ'খানা রেশন সপ, একটা সরষের তেলকলের মালিক। তাছাড়া বন্ধকী কারবারও রয়েছে ওঁর। মালদার লোক। না, মালদহের বাসিন্দা নয়, খোদ রাজপুতনায় আদি বাড়ী। বাকী লোকগুলোর হাড় জিরজিরে দেহ, রুক্ষ বেশবাস। তবু বলা তো যায় না, এদেরই কেউ হয়তো কোনো আক্রোশবশতঃ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সস্ত্রীক গদাধর মণ্ডলকে হত্যা করে বংশনাশ করেছে তার। খুটিয়ে খুটিয়ে লাশ দুটোকে দেখলেন বড়কর্তা। দেহের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, যাতে অন্ততঃ সর্পদংশন বলেও মনে হতে পারে। চোখ দুটো যেন কিসের আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। রান্নাঘর খুঁজে এমন কোনো খাদ্যও পাওয়া গেল না যাতে 'ফুড্—পয়জন' বলে সন্দেহ ঘটে। তাছাড়া মৃতের পেট বেশ খালি-খালি। তবে কি কোনো গৃহবিবাদ স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর হেতু?

—গোয়েন্দা সন্দিহান হন।

অবশেষে জনতার মধ্যে কিছু লোককে বাছাই করে তাদের বক্তব্য শুনেন তিনি। বদ্রীদাস ঝুন ঝুন ওয়ালাও বাদ যায় না। অমন একটা সমর্থ যুবতী বৌয়ের মৃত্যুতে যেন বদ্রীদাসই বেশী ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হোল। মৃত্যুর কারণ সঠিক করে কেউ বলতে পারলো না, তবে একটু জানা গেল, স্বামী-স্ত্রী একমাস যাবৎ ঘরে ছিল না, কোথায় খাটা-খাটুনি পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেছলো। গতকাল সন্ধ্যাতেই ফিরেছিল। পথে দীনু কর্মকারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবে কি ওরা কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে করে এনেছে ভেবে রাতের অন্ধকারে কেউ মেরে ফেলেছে?—গোয়েন্দা বড় চিন্তিত হলেন। তাই 'শিক্ষিত' কুকুরটাকে ছেড়ে দেওয়া হল কিন্তু না কারুর হাতই কামড়ে ধরলো না কুকুরটা। অগত্যা লাশ দুটোকে জীপে তুলে এনে শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করে লালবাজারে ফিরে এলেন বড়কর্তা।

পরদিন রনজিৎ ঘোষ এম-এল-একে পুনরায় লালবাজারে দেখা গেল। মণ্ডলদের মৃত্যুর কারণটা তিনি জানতে এসেছেন। তাঁর এলাকার লোকেরা ক্ষেপে আছে—সেই গরজেই তিনি এসেছেন। বড়কর্তাকে বেশ চিন্তাক্লিষ্ট দেখা গেল। এই রনজিৎ ঘোষই কি অপরাধী? এত লোক থাকতে তাঁরই বা এত গরজ কেন? কিংবা এমনও হতে পারে, এই ভদ্রলোক হত্যার

ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। স্যার হোক এম-এল-এ বলে কথা তাই খাতির করে বসিয়ে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আনতে পাঠালেন গোয়েন্দা।

একটু পরেই রিপোর্ট এলো। দেখেই চমকে ওঠেন গোয়েন্দা। "না না, এ হতেই পারে না।" চেঁচিয়ে বলেন তিনি, "সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমাদের মান ইজ্জত সব যাবে। সে সঙ্গে আমার চাকুরীও।"

"কি হয়েছে স্যার?" শান্তকণ্ঠে রনজিৎ বাবু প্রশ্ন করেন।

"এই দেখুন রিপোর্টে কি লিখেছে," বড়কর্তার দাঁত খিচুনি।

"আমিও তাই জানতাম," রনজিৎ বাবু বলেন, "আমি ঠিক এই সন্দেহ করেছি।"

"করেছেন তো মাথা কিনেছেন," তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন বড়কর্তা, "জানতেন তো, বলেন নি কেন? তা হলে এত কষ্ট করে যেতাম না, ব্যাপারটা স্থানীয় থানার দারোগার ওপরই ছেড়ে দিতাম।"

"তা তো দিতেন, কিন্তু তাতে মৃত্যুর আসল কারনটা কি চাপা পড়তো না? তাই তো স্বয়ং আপনাকে নিয়ে গিয়ে 'অনাহারে মৃত্যুর' একটা প্যাকাপোক্ত 'রেকর্ড' করিয়ে নিলাম। বিধান—সভায় কত বক্তৃতা দিয়েছি, তথ্যসহ পরিসংখ্যান দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীমশাই ফুৎকারে তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিশেষ ক'রে সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলায় অনাহারে মৃত্যু অসম্ভব তাঁর কাছে। আশা করি এবারে আর অস্বীকার করতে পারবেন না, কি বলেন? আচ্ছা, চলি স্যার! আমাকে আবার এই অনাহারে মৃত্যুর একটা সার্টিফায়েড কপি বের করতে হবে।"

॥ **প্রবুদ্ধ** ॥ জন্ম মেদিনীপুর জেলার বিভীষণপুর গ্রামে। মূলত: হাসির গল্পের লেখক হিসাবেই পরিচিত। প্রবোধচন্দ্র বসু "প্রবুদ্ধ" ছদ্মনামে গল্প লেখেন। লেখকের "বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেকটিভ" হেসে খুন" ইত্যাদি গ্রন্থ হাসির সাথে রহস্য ও রোমাঞ্চের স্বাদ এনে দিয়েছে। তাঁর গোয়েন্দা গল্পের ভীতি বিহ্বল পরিবেশে হাসির ছোঁয়া এক অভিনব শিল্প সৌকর্যের পরিচায়ক। লেখকের তিন পকেট হাসি (কার্টুন সহ), দুই পকেট হাসি, এক পকেট হাসি ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক পরিচিত।



নিক্কণ

অমরেন্দ্র দাস

অন্তসত্ত্বা মেয়ের মত গভীর ম্লান রাত্রি। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই শুধু মাঝে মাঝে প্রেত হাওয়া আর নানারকম রাত্রি পোকাদের একটানা ভয়াবহ অদ্ভুত করুণ শব্দ। কালো মিশমিশে অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ওঠেনি এখনও, বোধহয় আমাবস্যা পক্ষের জন্যে চাঁদের অগস্ত্যযাত্রা হয়েছিল।

যে পাড়ার কথা বলছি সেখানে সর্ব্বজিৎ নতুন ভাড়াটে এসেছে। অনেক দিন ধরে চীৎপুর রোডের এক মেসে কাটিয়ে একটু নির্জনতার জন্যে এ পাড়ায় এসে একটা চিলের ছাতের ঘর ভাড়া নিয়েছিল। সর্ব্বজিৎ নিজে লেখক। লিখে তার পেট চলে। লেখার জন্যে তার সর্বদা একটা সুন্দর নির্জ্জনতা প্রয়োজন ছিল আজ অনেকদিনের পর এই তিনতলা বাড়ীর ছাতে একটা এককোনা ছোট্ট ঘর পেয়ে তার খুসীর অন্ত নেই। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে হঠাৎ গভীর রাত্রি হলে একটা শব্দ শুনে তার দেহের লোমকূপেতে যে চাঞ্চল্য জাগে সেটা সে কিছুতে বরখাস্ত করতে পারে না।

গভীর রাত্রির বুকে যখন পাড়ার মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে, সবাই যখন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে তখন—তখন হয়ত সর্বজিৎ একমনে একটা

মোমবাতির কম্পমান শিখায় পাতার পর পাতা নায়ক নায়িকার জীবনে উত্থান পতনের ইতিহাস রচনা করে চলেছে। বাস্তব জগতের কথা হয়ত ভুলে গেছে। হয়ত নায়িকার দুঃখে তার মনটা আর্দ্র, কিংবা হয়ত নায়কের দীর্ঘ প্রেমের চিঠির মধ্যে রোমান্স সৃষ্টি করে চলছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলবারই হয়ত তার সময় নেই। হঠাৎ কানের মধ্যে কে যেন মিষ্টিসুরে চুড়ির নিক্কণ তুল্ল। কে?

সর্ব্বজিতের গতি গেল থেমে। মাথাটা তুলে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে নেড়া ছাতের দিকে তাকাল। গভীর স্তব্ধ রাত্রি। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে ঘরের মধ্যে। অন্ধকার আকাশের বুকে চুমকি তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। একটু বিস্মিত হয়ে আবার ও. লেখার গভীরত্বে ঢুকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আবার কে যেন কানের কাছে এসে হাতের চুড়ির মিষ্টি শব্দ তুলে সর্ব্বজিৎকে সজাগ করে দেয়। সর্ব্বজিতের মনে আবার দোলা দেয়, দেহের লোমকূপে জাগে শিহরণ। কেমন যেন লোমকূপগুলো তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে উঠে। নিস্তব্ধ নির্জন নিঃসঙ্গ এই চিলের ছাতের ঘর, সর্ব্বজিৎ একাই এ ঘরে বাস করে। হোটেলে খায় আর ঘরের মধ্যে শোয়। একা থাকার জন্যে ভয় অবশ্য তার করে না কিন্তু এই নির্জ্জন চিলের ছাতের ঘর। এতবড় বাড়ী, কোন ঘরের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বাড়ীওয়ালা ভাড়া দেওয়ার জন্যে এ ঘরখানা তৈরী করেনি, এমনি একটা ছোট মত আস্তানা করে রেখেছিল। সর্ব্বজিৎ কেমন করে জানি এর সন্ধান পেয়ে বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে এটা আদায় করেছে।

ওপরে টালি আর দেয়ালগুলো ইটের। সিঁড়ির শেষ ধাপে ঘরটা তৈরী করা হয়েছিল, সেইজন্যে ঘরের খাড়াইটা খুব বেশী বড় নয়। সর্ব্বজিৎ লম্বা নয় বরং বেশ বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি। কিন্তু সেই টানটান হয়ে দাঁড়ালে তার মাথায় টালির ছাতটায় ছোঁয়া লাগে। প্রথম উত্তেজনায় ঘর ভাড়া করে পরে কিন্তু ঘরটা ভাল করে দেখে আর সর্ব্বজিতের ভাল লাগেনি। লেখক মানুষ, ভাবুক ভোলার জন্যে নোংরামোটা অবশ্য গা সওয়া। কিন্তু প্রতিমাসে কুড়ি টাকা ভাড়ার পরিবর্ত্তে ঘরটা নিয়ে দেখল তার লোকসানই হয়েছে। কোন মানুষ নামে জীবই একদণ্ড ঘরে টিকতে পারে না, কেমন যেন ভ্যাপসা ধরণের গন্ধ। বাড়ীওয়ালা কতকগুলো বাড়ী সারানোর যন্ত্রপাতি, চুণবালি সরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু জিনিষপত্তর সরালে কি হবে, ঘরের মেঝে দেখে নির্জনতার সম্বন্ধে এত জল্পনা-কল্পনা এত স্বপ্ন, সব তার মন থেকে বুদ্বুদের মত অপসারিত হযে গেল। কতকগুলো ইটের টুকরো পেটা মেঝে। পিঠ দিয়ে কোন সময় শুতে গেলেই গায়ে বর্শার

মত ফুটে ওঠে। তার ওপর দেয়ালে কোন বালি ধরান নেই। ফাঁক ফাঁক দাঁত বের করা ইটগুলো হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। আগে দেখেশুনেই ঘরটা ভাড়া নেয় সর্ব্বজিৎ। তখন মনে ছিল একটা গভীর উত্তেজনা, 'যাক নির্জ্জনতা এবার পাওয়া গেল। ঢালাও চিন্তা করো আর লেখো'। কিন্তু ঘরের চেহারা দেখে চিন্তার কথা ভুলে দুশ্চিন্তাই মনে এসে বাসা বাঁধে। তারপর বাড়ীওয়ালাকে লাইটের কথা বলতে তিনি আকাশ থেকে পড়ে যান—বলেন কি মশাই! আপনি কি স্বপ্ন দেখেছেন নাকি? ছাতে লাইট?

সর্ব্বজিৎকে আবার খানিকটা আশ্চর্য্যভাব নিয়ে ফিরে আসতে হয়, মনে মনে খানিকটা নিজেই সান্ত্বনা তৈরী করে নিয়ে চুপ করে যায়। তবু ভাল, মেসের মেছোহাটার চেয়ে অনেক গুণে ভাল। তারপর বাক্স বিছানা এনে সেই ঘরে কায়েমী করে নেয়। সেইদিনই প্রথম

গভীর রাত্রে মোমবাতির কম্পমান হলদে আলোর সামনে সর্ব্বজিৎ বসে তন্ময় হয়ে একটা গভীর মনস্তত্বমূলক গল্প লিখছে। রাত্রি গভীর, সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের রহস্যময় আলো এসে ছাতের ওপর পড়ে ঘরে ঠিকরোচ্ছে। সেদিনও বাতাসে একটা চাপা হিসহিস শব্দ মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতাকে আলগোভাবে গলা টিপে ধরছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই, সব ঘুমিয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে বড় রাস্তা থেকে গাড়ী যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ এসে কানের পর্দ্দাকে জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তবু সে মাঝে মাঝে, তারপর আবার স্তব্ধতা। আর আসছে পাশের বাড়ীর বারন্দার অজস্র ফুলের গাছ থেকে কি ফুলের যেন মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ সর্ব্বজিতের কলম থেমে যায়। কে যেন কানের কাছে চুড়ির নিক্কণ তুলে সরে গেল। প্রথম মনের ভুল ভেবে সর্ব্বজিত আবার লেখায় মন দিল। কিন্তু আবার…।

আস্তে আস্তে সর্ব্বজিৎ কলমটা রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাইরে চওড়া নেড়া ছাত, কোন পাঁচিল নেই, চাঁদের আলো এসে পড়েছে। পাশাপাশি আরও কয়েকটা বাড়ীর ছাতের দিকেও সর্ব্বজিৎ তাকায় যদি কিছু দেখতে পায় এই আশায়। যদি কোন মেয়ের কাপড়ের আঁচল কিংবা চুলের অংশ। নতুন এ বাড়ীতে আসা। এ বাড়ী বা এ পাড়ার সে কিছুই জানে না। হঠাৎ মনের মধ্যে ধক্ ধক্ করে একটা প্রশ্ন জেগে উঠে। তবে কি সে যে ঘর ভাড়া করেছে সে ঘরের কোন দোষ আছে! কোন মেয়ের আত্মা এই ঘরের চারিদিকে মুক্তির জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একা এই চিলের ছাতের নিস্তব্ধ রাত্রে সর্ব্বজিতের দেহের লোমকূপগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠে।

ও ঘরে চলে এসে মোমবাতির আলোর সামনে বসে ভাবতে থাকে,

এমন শঙ্কার ভাব নিয়ে একা এই তিনতলার ছাতের ঘরে কি করে রাত্রি কাটান যায়! অথচ এই নির্জন ঘরে একা থাকবে বলে সে ঘরটা ভাড়া নিয়েছে। এখন কিন্তু যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে হাঁফিয়ে মরবার যোগাড়।

ক্রমাগত চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার কানের মধ্যে ঢুকে কেমন যেন রাত্রিটাকে সর্ব্বজিতের কাছে ভয়াবহ করে তুলতে থাকে। সে রাতটা কোনরকমে রহস্যময়তার আবরণ উন্মোচন করতে না পেরে নিরুদ্বেগে কাটাতে পারলনা। পরদিন বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে ঘরটার সম্বন্ধে। —কোন উপদ্রব হয় কি না?

শুনে বাড়ীওয়ালা রাঘববাবু আকাশ থেকে পড়লেন, বলেন কি? এমন অপবাদ কেউ যে দেয়নি মশাই। কিন্তু এ শব্দটা তাহলে কিসের?

বাড়ীওয়ালা রাঘববাবু মৃদু হেসে বলেন, ও বোধহয় আপনার বয়সের দোষ। বিয়ে থা করেননি, সেই জন্যে বোধহয়……।

সর্ব্বজিতের রাগ ধরে যায়। লোকটা আচ্ছাই ত, রসিকতা করবার আর সময় পেল না। কিন্তু মুখে সে কিছু বল্ল না। নিশ্চিত হয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। শব্দটা তাহলে আসে কোথা থেকে?

দ্বিতীয় দিন রাত্রি থেকে বেশ কয়েকদিনের রাত্রি ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে গত হল। কিন্তু কিছুতেই চুড়ির মৃদু ঝঙ্কারের রহস্য উদ্ধার করতে পারেনা সর্ব্বজিৎ। দিনের বেলা লোকজনের গণ্ডগোলে কোন শব্দ শোনা যায় না। এমন কি রাত্রিবেলাতেও যতক্ষণ লোকজনেরা জেগে থাকে, সর্ব্বজিৎ লক্ষ্য করেছে কোন শব্দ নেই। কিন্তু একটু নিস্তব্ধ হলেই কেমন যেন শব্দটা কানের অতি কাছে এসে নিক্কন তোলে। কিন্তু কোন অস্তিত্বের আবির্ভাব নেই। শুধু অদৃশ্য নিক্কনের মৃদু চাপা শব্দ। অন্ধকারে শুয়ে শুয়েও সর্ব্বজিৎ অনুভব করে তার অতি কাছে, একেবারে বুকের কাছ বরাবর কে যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে হাতের চুড়ির শব্দ দিয়ে তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। যেন শুয়ে শুয়ে রক্তে কিসের ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে, গলায় মুখে চোখে ঘাম জমে, রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। অজানা ভয়ে সর্ব্বজিতের ঘুমই হয় না। কেবল মনে হয়, কে যেন অন্ধকারে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিভীষিকাময়ী কোন অশরীরি। লোলুপ তার চাউনি, কুটিল তার মন কিংবা সুন্দরী কোন মায়াবিনীর বিবর্ণ ঠোঁটের চটুল হাসি।

সর্ব্বজিৎ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে শুয়ে কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে উঠল। বয়স তার বেশী নয়, এখনও যৌবনের রক্ত ধমনীতে, মেয়েদের আলিঙ্গনের আকাঙ্খা দেহের পরতে পরতে। বিশেষ করে সে লেখক; নারী পুরুষের জীবন নিয়েই তার কারবার। কিন্তু কে এ? এই প্রশ্নটাই বার বার তার কণ্ঠে অনুচ্চারিত

হয়ে মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি দিয়ে ফিরে। রাতের এ রহস্যালোকে এই অদৃশ্য নারী ঝঙ্কার তুলে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে তার কাছ থেকে কি চায়?

কে এই অদৃশ্য নারী?

মশার পঞ্চম লয়েব সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীতের জলসা কানের কাছে সুর সৃষ্টি করে চলেছে। বাইরে মাঝে মাঝে কোথা থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা ডেকে নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো করছে। নীচের দোতলার বাসিন্দারা এখন সব ঘুমে অচেতন। আর ঘুমে অচেতন না হলেও নিচের কোন ঘরের কোন শব্দই ওপরে এই চিলের ছাতের ঘরে আসে না। তবে পাশে নয় একটু দূরে একটা চারতলা বাড়ীর সর্বউপর তলার একটা ঘর থেকে কিছুটা সপ্রাভ সবুজ আলোর দ্যুতি চোখে পড়ে। নতুন ঘরে আসার পর থেকে রাতগুলো যেন আর সর্ব্বজিতের কাটতে চায় না। ভয় নয় একটা অজানা রহস্যের আশঙ্কায়। একটা বিভীষিকাময় আতঙ্কে কেমন যেন তার লেখার সব খেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, লেখা নিয়ে বসলেও লেখা হয় না। কেবলই মনে জাগে চুড়ির শব্দ। কে যেন পিছনে এসে কাপড়ের খসখস শব্দ জাগিয়ে চুড়ি বাজিয়ে তার অস্তিত্ব জানায়। সর্ব্বজিতের কলম যায় থেমে। চোখে মুখে জেগে ওঠে বিস্ময়। চোখ ভাবালুতা নিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যমার্গে চেয়ে থাকে। যখন এইরকম পরিস্থিতি।

হঠাৎ একদিন চলতি পথে সর্ব্বজিতের সঙ্গে দেখা লালবাজারের স্পেশাল পুলিশ ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা বন্ধুবর বিমান বিহারী বোসের। তাকে একটা রেষ্টুরেন্টে ধরে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সব আদ্যোপান্ত বলল সর্ব্বজিৎ। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বিমান বিহারীর যথেষ্ট সুনাম ছিল গোয়েন্দা হিসাবে। সে কথা সর্ব্বজিৎ জানত। পুরানো বন্ধুত্বের নজীর তুলে সর্ব্বজিত বিমান বিহারীকে চেপে ধরল। ভাই, ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা অথচ নিশ্চিন্তও হতে পারছি না। যে লেখার জন্যে নির্জন ঘর ভাড়া নিলাম সেই লেখাই আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ বিভাগের লোক। একটু গাম্ভীর্য এনে মুখে একটু চিন্তা করে তারপর বলে, আচ্ছা, এক কাজ কর! তুমি বলছ চুড়ির শব্দটা হয় রাত্রে আমার কাল ছুটী আছে। কাল রাত্রে তোমার ঘরে থাকবার নিমন্ত্রণ নিলাম ব্যাপারটা নিজের চোখে ও কানে শুনতে হবে। তারপর যা কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সর্ব্বজিৎ উদ্বিগ্নভাব নিয়ে বলে, কিছু অনুমান করতে পারছ?

বিমান বিহারী হেসে বলে, কিউরিসিটি ক্রিয়েট কর না। তোমার অহেতুক মানসিক আতঙ্ক কি কোন মানুষের চক্রান্ত! কিংবা......। এই বলে বিমান বিহারী হাসল, বলে, তোমরা হয়ত ভূত প্রেতের কথা বলবে তবে ওটা আর আমি বলব না, কারণ আমি ওটা বিশ্বাস করি না।

এই বলে সেদিন বিমান বিহারী বিদায় নিল। বলে, বাসার ঠিকানাটা নোট বইতে টুকে নিয়ে, কাল রাত্রি দশটা নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে তোমার বাসায় পৌঁচচ্ছি। সর্ব্বজিত একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আমার ঘরে রান্নার এ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলে তোমায় খেতে বলতাম, কিন্তু...। বিমান বিহারী হেসে বল্লে, থাক থাক আর সৌজন্য প্রকাশ করতে হবে না। বিয়ে থা করে এটা একদিন পূরণ করে নিও।পরদিন রাত্রি দশটার সময়ই বিমান এসে উপস্থিত। হাতে একটা তিনব্যাটারীর টর্চ, রিভলবার ও একটা লাইটিং ক্যামেরা। দেখে সর্ব্বজিত বিস্মিত হয়ে বিমান বিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বল্ল, একি, তুমি যে দেখছি একেবারে তৈরী হয়েই এসেছ? বিমান হেসে বল্ল, বলা ত যায়না। আমাদের কাজে বেরুলে সর্বদা তৈরী হয়েই বেরুতে হয়। এইবলে আস্তে আস্তে সব জিনিষপত্তরগুলো এক জায়গায় রেখে মেজেতে বসে বিমান।

তারপর এ কথা সে কথা রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, দেশবিদেশ, পুলিশ অফিসের গল্প করতে করতে রাতের গভীরতা নেমে এল। বিমানের নির্দেশে মোম বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে ওরা একসময় নিঃশব্দ বিছানায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, দরজাটা বন্ধ। কোন জানালা নেই ঘরে। নিস্তব্ধ থমথমে গভীর রাত্রি। দু'জনে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যদি শুনতে পায় কারও অস্তিত্ব, চুড়ির নিক্কন কিংবা কাপড়ের খসখসানি। বিমান শুয়ে হাতের মুঠিতে টর্চটা ধরে আছে, মনে তার দারুন উত্তেজনা। সর্ব্বজিতও অপেক্ষা করছে প্রতিদিনের মত সেই চুড়ির শব্দ শোনবার জন্য।

ওদের অবস্থা বর্ণনাতীত। এখুনি যদি কোন আরশোলা, ইঁদুর অন্ধকারে লাফিয়ে ওঠে তাহলে দুজনে হয়ত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠবে।

এমন একটা পরিস্থিতি, মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারটা লিকলিকে তার দু' বাহু নিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চুড়ির মৃদু শব্দ। সর্ব্বজিৎ চাপাস্বরে বল্ল, ঐ আবার শব্দ এবার যেন মনে হল খুব কাছে, একেবারে পাশে যেন কে চুড়ি দোলাচ্ছে। সর্ব্বজিত আবার চাপাস্বরে বল্ল, শুনতে পাচ্ছ? বিমান হাত চেপে ধরল—চুপ। আর শব্দ নেই, আবার সব নিস্তব্ধ।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোন সাড়াশব্দ নেই। সর্ব্বজিতের ঘরের অখণ্ড নীরবতা। সর্ব্বজিত ভাবে বিমান হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ও একটু ঠেলা দেয়, ঘুমুলে বিমান? বিমানের সাড়া পাওয়া গেল। গম্ভীর স্বরে বল্ল, না। ভাবছ কিছু? না শুনছি আর কোন শব্দ পাওয়া যায় কি না?

সর্ব্বজিত জিজ্ঞাসা করে, কিছু বুঝতে পারছ? হটাৎ একটা পায়ে চলা দুপদাপ শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। ওরা কথা বন্ধ করল। শব্দটা মনে হল খুব কাছে কে যেন পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে খুব কাছ দিয়ে চলে গেল।

সর্ব্বজিত চাপা স্বরে বল্ল, একবার উঠে টর্চ টা নিয়ে দেখব? বিমান একটু চুপ করে থেকে তারপর বল্ল, না কোন দরকার নেই, ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে একবার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করে তারপর বলব আসল রহস্যটা।

সর্বজিত একটু বিস্মিত হল কিন্তু বন্ধুবরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু ভাবতে থাকে সে রহস্যটা কি, যে রহস্যটার সমাধান বিমান এত সহজে করল। এমন কি সে রাত্রে তার ঘুমই এল না। মনে ত কয়েকদিন ধরে একটা শঙ্কার ভাব ছিলই তার পর বিমানের হঠাৎ রহস্যভেদের ব্যাপার! কৌতুহলটা গলার কণ্ঠা পর্য্যন্ত নিয়ে উদ্বেগে সারারাত কাটাল তারপর সকালবেলা বাড়ীওয়ালা রাঘববাবুর কাছে বিমানকে নিয়ে গেল সে।

রাঘববাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিমান জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনার এ বাড়ীর ভিত কি আশেপাশের অন্যান্য বাড়ীর সঙ্গে এক? কেন বলুন ত? না বলুন না। তাহলে একটা রহস্যের সমাধান হয়ে যায়। রাখালবাবু বলেন, হ্যাঁ' এ বাড়ীর সঙ্গে পাশের চারটে বাড়ীর ভিত এক। এ কটা বাড়ী এক দিন একজনের ছিল কিনা?

বিমান এবার সর্বজিতের দিকে ফিরে বলে—তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? চারটে বাড়ীর ভিত এক থাকার জন্যে এই রকম শব্দ শোনা যায়। দিনের বেলা শুনতে পাওনা, দিনের বেলা বাইরের গোলমাল শব্দটাকে ঢেকে রাখে। রাত্রিতে নিস্তব্ধ হলে সে শব্দটা প্রতিধ্বনি করে যায়। আর চুড়ির শব্দ শোনা যায় বেশী কারণ মেয়েদের হাতগুলো সর্বদাই নড়ে। আর তাছাড়া তোমার মনে চুড়ির শব্দটাই বেশী করে গেঁথে গিয়েছিল বলে সেইজন্য অন্য কোন শব্দ কানের মধ্যে যেত না। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে অন্য শব্দও শুনতে পেতে। এই বলে বিমান একটু হেসে বলে, আর একটা কারণ তুমি দিনরাত সাহিত্য করতে মেয়েদের কথা ভাবতে, সেই জন্যে চুড়ির শব্দটাই তোমার মনে কেটে বসেছে বেশী করে।

সর্বজিৎ হেসে বল্লে, ধন্যবাদ বন্ধু, তোমার গোয়েন্দাজীবন সত্য সার্থক হোক। এবার আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

॥ **অমরেন্দ্র দাস** ॥ জন্ম ১৯০০ সালে কলকাতায়। আবাল্য চব্বিশ পরগণার হরিনাভি গ্রামে, বর্দ্ধিতমানুষ অমরেন্দ্র দাস মশাই ১৯৫৭ সাল হতে আজ পর্যন্ত প্রায় অর্দ্ধ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। গান লিখে সাহিত্যের জগতে অনুপ্রবেশ ঘটলেও গোয়েন্দা, হাসি, ও রহস্য ছাড়াও যে লেখাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা তা হচ্ছে ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী। তাঁর জেবুন্নিসা, বেগম রিজিয়া, নর্তকী নিকী, শ্রমতী সংবাদ, ক্রীতদাসী, নুপুরচন্দ ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক খ্যাত।



ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ

অদ্রীশ বর্ধন

'গোয়েন্দা আমরা প্রত্যেকেই,' দাঁতে কামড়ানো চুরুটের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। 'প্রাত্যহিক জীবনে কে গোয়েন্দা নয় বলতে পারো?'

চাইনিজ শ্রিম্প বল খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল কবিতা, সাদা বাংলায় চিংড়ি পকৌড়া। পাকস্থলী পরিপূর্ণ হওয়ার পর শুরু হয়েছে নির্ভেজাল আড্ডা।

'মেয়ে—গোয়েন্দা অবশ্য ঘরে ঘরে, সোয়ামীদের ওপর নজর রাখার সময়ে,' মুচকি হেসে চুটকি ছাড়ল কবিতা: 'যেমন আমার ঘরে আমি গোয়েন্দা।'

ইন্দ্রনাথ রসিকতার মুডে ছিল না। তাই একতাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'যেমন ধরো উকিল, ডাক্তার, অফিসার, ব্যবসাদার, রিপোর্টার। হোয়াইট হাউসের ভিৎ কাঁপিয়ে ছাড়ল ছজন রিপোর্টার। গিয়েছিল

চুরির ঘটনার খোঁজে—পেলো সাপের সন্ধান। শুরু হল গোয়েন্দাগিরি। টেলিফোনে খবর নিতে হবে? প্রশ্ন করে চুপ করে থাকো দশ সেকেণ্ড। জবাব না এলে বুঝতে হবে প্রশ্নের জবাব হল 'হ্যাঁ।' টেলিফোনও যখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন হোয়াইট হাউসের 'কেউকেটা'টির সঙ্গে দেখা করার সঙ্কেত জানানো হত ঝুল বারান্দার কোনে ফুলদানি বসিয়ে। দেখা সাক্ষাতের সময় জানানো হত পরের দিনের নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০ নম্বর পৃষ্ঠায়। সেই পৃষ্ঠায় ঘড়ির কাঁটা এঁকে গোপন সংবাদদাতা জানিয়ে দিতেন কোথায় কখন দেখা পাওয়া যাবে তাঁর। আশ্চর্য, তাই না? গোয়েন্দা সাংবাদিকদের দৌলতেই সিংহাসনচ্যুত হলেন বহু কু-কর্মের নায়ক প্রেসিডেণ্ট নিকসন।'

আমি বললাম, 'নতুন কথা কিছু শুনছি না।'

ভুরু তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিকসনের ছিদ্র অন্বেষণ করে শুধু একখানা বই লিখেই বব আর কার্ল আজ পর্যন্ত পিটেছেন এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা। বই লেখার আগেই প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। প্লেবয় পত্রিকা লেখাটা ছেপেছে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে। ফিল্ম প্রোডিউসার সিনেমা করবেন বলে দিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষ ডলার। পেপার ব্যাক বার করার জন্যে নীলাম করে বইটার দাম তুলে দিয়েছেন দশ লক্ষ ডলার পর্যন্ত। পুলিৎজার পুরস্কার পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন ওঁরা। মৃগাঙ্ক, ইচ্ছে যায় আমার কেসগুলো বব আর কার্লের হাতে তুলে দিই। কলমের জোর থাকলে কি না হয়।

মাথা গরম হয়ে গেল আমার: 'নিজেকে বিরাট মনে করছিস মনে হচ্ছে? আমার না হয় কলমের জোর নেই, তোর ও গোয়েন্দাগিরির জোর এমন কিছু নেই যে রাতারাতি পৃথিবী—বিখ্যাত হবি। এত অহঙ্কার ভাল নয়। পতনের পূর্ব লক্ষণ।'

যেন শুনতেই পায় নি, এমনি ভাবে জানলা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আত্মগত ভাবে বলে চলল, 'যত ভাবি, ততই অবাক হই। গোয়েন্দা কে নয়? সব মানুষই নিজের নিজের পেশায় অল্প বিস্তর গোয়েন্দা। চিন্তাকে যে ডিসিপ্লিনে আনতে পেরেছে, বুদ্ধিকে যে একাগ্র করতে পেরেছে, পর্যবেক্ষনকে যে প্রয়োগ করতে পেরেছে—গোয়েন্দা হবার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে আছে। ভাল ডাক্তারকেও ফাঁদ পেতে রোগকে সন্ধান করতে হয়। এই রকম একটি চরিত্র থেকেই শার্লক হোমস এবং

সুবিখ্যাত ডিডাকটিভ মেথডের সৃষ্টি করেন কোনান ডয়াল। অফিসার যদি অন্ধ হয়, কারবারী যদি ভোঁতা বুদ্ধি হয়, তাহলে লুঠেরা জোচ্চোররা দুদিনেই রাজা হয়ে বসত। বুদ্ধির লড়াই চলছে সর্বক্ষেত্রে। এরকম টুকটাক অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। অফিসার নিজেই গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানির।'

'তা ঠিক,' সায় দিল কবিতা: 'প্রবঞ্চকরা দুষ্ট জীবাণুর মতই কিলবিল করছে আশেপাশে। যে যত ভাল গোয়েন্দা, সে তত নিরাপদ। কথাগুলো দামি কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার নিরীহ সোয়ামীকে ঠেলু দিয়ে কথা বলার কি দরকার বলতে পারো?'

'কেন বলব না বলতে পারো?' চুরুট নামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'স্ট্যানলী গার্ডনার, সিরিল হেয়ার—এঁরা প্রত্যেকেই পেশায় উকিল। তাই তাঁদের গোয়েন্দা গল্পে অত ধার। কোনান ডয়াল, নীহার গুপ্ত পেশায় ডাক্তার—তাই লেখাও ক্ষুরধার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জি-কে চেস্টারটন সাহিত্যের সম্রাট—গোয়েন্দা গল্পেও তার আভাস। কিন্তু আমাদের মৃগাঙ্ক রায়ের কি গুণ আছে বলতে পারো। না, না, চটলে চলবে না। গুণীর কাছে প্রশস্তির চেয়ে সমালোচনার কদর বেশি।'

'কিন্তু এর নাম ছিদ্রান্বেষণ—সমালোচনা নয়।' মুখ টিপে হেসে বলল কবিতা।

'ছিদ্র অন্বেষণ করাই তো আমার কাজ।' চুরুট ফের কামড়ে ধরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নিশ্ছিদ্র চক্রান্তে ছিদ্র খুঁজে বার করার সাধু নাম হল গোয়েন্দাগিরি। 'সত্য' আর 'ছিদ্র' এক্ষেত্রে একই টাকার এপিঠ ওপিঠ।'

মুখ লাল করে বললাম, 'এর শোধ আমি তুলব, ইন্দ্র। এখন থেকে তোকে 'ছিদ্রান্বেষী' ইন্দ্রনাথ বলেই চালাব—'সত্যান্বেষী' নয়।'

অট্ট হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ভালই তো, তাতে এক ঢিলে দু'পাখি মরবে। তোর ভাষায় গ্ল্যামারের অভাব প্রকাশ পাবে। আর, এতদিন বাদে আমার কপালে একটা খেতাব অন্তত জুটবে।'

এমন সময়ে কবিতা বলল সবিস্ময়ে, 'ওকি অবনীবাবু, নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

রাগ জল হয়ে গেল দরজার দিকে তাকাতেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চাটুয্যে দাঁড়িয়ে সেখানে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে

আছেন বাঁ-নাকের বাম ছিদ্র। অনুনাসিক কণ্ঠে, 'দেঁখছি ডাঁম ফুঁটোয় নিশ্বেঁস পঁড়ছে কিঁনা।'

তাজ্জব হয়ে বললাম, 'সে আবার কী?'

নাক ছেড়ে দিয়ে বাঁ-পা আগে বাড়িয়ে ঘরে পদার্পণ করলেন অবনীবাবু। বললেন, 'শাস্ত্র তো মানেন না। মানলে এত দুর্ঘটনা দেশে ঘটত না।' সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ, 'ইভা আর পিঙ্গলার ব্যাপার মনে হচ্ছে?'

ভীষণ খুশি হলেন অবনীবাবু: 'যাক্, জানেন তাহলে। শুভকর্মে চন্দ্রনাড়ী প্রশস্ত। মানে, বাঁ-নাকে নিশ্বেস পড়লেই শুভকর্ম করা উচিত।'

'এখন কোন্ নাকে পড়ছে দেখলেন?'

'বাঁ-নাকে। সেইজন্যেই তো বাঁ-পা ফেলে ঢুকলাম মশায়।'

'অশুভ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন মনে হচ্ছে?'

টাক চুলকে বললেন অবনীবাবু, 'আর বলেন কেন, একবারে নিশ্ছিদ্র প্লট মশাই—স্কাউন্‌ড্রেলটাকে ধরেও ধরতে পারছি না।'

অপাঙ্গে আমার পানে চাইল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'ছিদ্র খুঁজতে হবে তো? বলুন, বলুন, ছিদ্রান্বেষী হাজির।'

বলব কি মশায়, রাত দুটোর সময়ে সে কি উৎপাত! ঝন-ঝন-ঝন। বুঝছেন তো কিসের উৎপাত? টেলিফোন। টেলিফোন! যতক্ষণ মরে থাকে, ততক্ষণ ঘুমিয়ে খেয়ে জিরিয়ে বাঁচি মশায়। জ্যান্ত হলেই প্রানান্ত!

যাক, যা বলছিলাম। রাত দুটোর সময়ে আরম্ভ হল টেলিফোনের বাঁদরামি। ঠিক যেন ঘুংড়ি কাশি। ইচ্ছে হল দিই ব্যাটাকে এক ডোজ 'স্পঞ্জি' খাইয়ে। হোমিওপ্যাথি বিদেশ থেকে এসেছে বলে এত হেনস্থা করবেন না। গরু হারালে শুধু গরু খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদবাকি সব হয়। মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেছেন...

যাচ্চলে! যা বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম।...ও হ্যাঁ, নিশ্ছিদ্র প্লট। রাত দুটো। টেলিফোন। ঘুম ভাঙতেই তেড়েমেড়ে রিসিভার খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে? কে? এত রাত্রে কিসের দরকার?

অমনি মিষ্টি গলায় তোৎলা স্বরে ককিয়ে উঠছিল একটা মেয়েছেলে: 'অবনীবাবু? বাঁ-বাঁচান! ওরা আ—আ—আমাকে কিডন্যাপ করতে আসছে।'

সে এক জ্বালা মশায়। ভগবান তোৎলাদের মেরেছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে বলুন দিকি মাথা গরম হয় না?

যাই হোক, হড়বড় করে তোৎলাতে তোৎলাতে মেয়েটা বললে পার্ক টেরেসের দশতলার ফ্ল্যাট থেকে গায়েব করতে আসছে ডাকাতরা। এক্ষুনি না এলেই নয়।

কথার শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না, কড়—ড়—ড় করে গেল লাইনটা কেটে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে মরছি; অথচ টেলিফোনটা পর্যন্ত নিখুঁত বানাতে পারি না। মাইক্রোস্কোপ আনাই বিলেত থেকে। ঘেন্না ধরে গেল মশাই দেখে-শুনে।

ওই রকম টেলিফোন পেলে চুপচাপ থাকা যায় না। দূরভাষিণীর মুণ্ডপাত করতে করতে ধড়াচূড়া এঁটে নিলাম। পার্ক স্ট্রীটেই যখন বদলি হয়েছি, তখন পার্ক টেরেসে না গিয়েও তো থাকা যায় না। বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আবার উৎপাত। ফের টেলিফোন।

এবার অবিকল সেই রকম মেয়েলি গলা। সেইরকমই মিষ্টি, কিন্তু যেন সর্দিবসা—মানে আপনাদের ছেলেছোকরাদের ভাষায় সেক্সি। শুধু যা তোৎলা নয়।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। প্রথম মেয়েটার নাম হিমি, দু নম্বর মেয়েটার নাম হিমা; হিমি নাকি হিমার ছোটবোন। হিমা কান্না কান্না গলায় বললে, এখুনি নাকি হিমিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে মেয়েচোরেরা। ঠিকানাও বলে দিল। একই ঠিকানা। পার্ক টেরেসের দশতলা।

দুজন সেপাই আর একজন অফিসারকে নিয়ে ছুটলাম তক্ষুনি। নির্জন রাস্তা। পার্ক স্ট্রীটে অবশ্য রাত বলে কিছু নেই। দশতলা পার্ক টেরেসের সামনে আসতে না আসতে দেখলাম, সত্যি সত্যিই একটা মেয়েকে কাঁধের ওপর ফেলে বেরিয়ে আসছে একজন লোয়ার ক্লাসের লোক। পেছনে আরও দুজন। ওরা এসে দাঁড়াল একটা উইলিজ জীপের সামনে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোড় ঘুরল আমার জীপ। ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। টহলদারি পুলিশকার হলে অত জোরে ছুটত না। ধড়িবাজ মেয়েচোরেরা তা বুঝেই বোধ হয় মেয়েটাকে ফুটপাতে ফেলেই ফের ঢুকে পড়ল পার্ক টেরেসে।

মহা ফাঁপরে পড়লাম তাই দেখে। মেয়েটাকে সামলাবো, না স্কাউনড্রেলগুলোর পেছন দৌড়াব। বুড়ো বয়েসে আমি তো আর ছুটতে পারি না। পার্ক টেরেসে বাড়িখানাও চাট্টিখানি কথা নয়। ফ্ল্যাটের সংখ্যাই তো আড়াইশ। শয়তান তিনটে কোথায় লুকিয়েছে দেখতে হলে আরো

সেপাই চাই। আমি তাই মেয়েটাকে জীপে চাপিয়ে একজন সেপাই নিয়ে ফিরে এলাম থানায়। পরে ভ্যান ভর্তি সেপাই পাঠালাম বটে—কিন্তু ওদের আর টিকি দেখতে পেলাম না। উইলীজ জীপটাও নাকি চোরাই জীপ।

চুলোয় যাক সে কথা। ফ্যাসাদের শুরু হল থানায় ঢুকতেই দেখি কি আমার অফিস ঘরে বসে অবিকল, ওইরকম চেহারায় একটা মেয়ে। বলব কি মশায়, ঠিক যেন সন্দেশের ছাচে তৈরী মুখ চোখ। যমজ। বুঝেছেন? বৌমা, অমন চোখে বড় বড় করে তাকিও না মা। আরো আছে। শেষ-কালে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতেও পারে।

অজ্ঞান মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম। যমজ বোনের পরিচয়ও পেলাম। হিমি আর হিমা। বড়লোকের মেয়ে মশাই। আহুরে আহুরে চেহারা। আইবুড়ো। অথচ বাপ এখনই দশতলা বারোতলা বাড়িতে একটি করে ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। ব্ল্যাকমানির খেলা তো, বলবার কিছুই নেই। মেয়েগুলিও হয়েছে তেমনি।

মরুকগে! ওদের কথা শুনব বলে বসতে না বসতেই রাত বিরেতে আর এক আপদ। বলুন দিকি, কি আপদ? কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। মৃগাঙ্কবাবু অবশ্য আমাকে নিয়ে ঠেসে ক্যারিকেচার লিখছেন কিন্তু বললে রাগ করবেন জানি ওঁর কল্পনা শক্তিও তো তেমন নয়।

বৌমার মুখ ভার হল কেন? আসল কথা না বলে, বাজে কথা বলেছি বলে? বুড়ো হয়েছি তো। রিটায়ারের সময় হয়ে এল। এখন একটু কালতু কথা বলে ফেলি। কিছু মনে কোর না। কি বলেছিলাম? ও হ্যাঁ। আর একটা আপদ। ধরতে পারেন নি তো কি আপদ? মেয়েছেলে মশায়, আর একটা মেয়েছেলে! ভোর চারটের সময়ে হন্তদন্ত হয়ে থানায় ঢুকল আর একটা মেয়েছেলে। অবিকল অন্য দুজনের মত দেখতে।

বললে না পেত্যম যাবেন মশায়, থানাশুদ্ধ লোক ব্যোমকে গেল তিন তিনটে একই ছাঁচের সন্দেশ দেখে। সরেশ সন্দেশ। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনো দেখিনি হোল লাইফে। যমজ পর্যন্ত দেখেছি, কিন্তু—কিন্তু তিনটে মেয়ে একই ডিম ফুটে বেরোন কি বলা উচিত মৃগাঙ্কবাবু?—যমজ? ঠিক, ঠিক। যমজ! যমজ বোনই বটে। নামও শুনলাম তিন নম্বরের। হিমু, মানে, হিমি, হিমা আর হিমু হল তিন বোন। তিনজনেরই তিনটে খান দানি ফ্ল্যাট। তিনজনেই আইবুড়ো। তিনজনেই ফ্ল্যাটে পৌঁছেছে অনেক

রাত্রে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিউটি কনটেষ্ট থেকে। তিনজনেই ড্রেসিং টেবিলে একটা করে চিঠি পেয়েছে। তিনজনের চিঠিতেই লেখা আছে—বাপের পকেট থেকে লাখখানেক টাকা খসিয়ে না আনলে, খাঁচায় পোরা হবে সেই রাতেই। রাজী থাকলে জানলায় টর্চের আলো জ্বেলে রাখতে হবে এক মিনিট—রাত ঠিক ছটোর সময়ে।

রূপকথা শোনাচ্ছি, ভাববেন না যেন। খাস কলকাতায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা মোহন সিরিজকেও টেক্কা মারতে পারে মশাই।

সাঙ্কোপাঞ্জা শুধু রোমাঞ্চের পাতায় কেন, এই শহরেই আকছার পাবেন। হিমি, হিমা, হিমুর কাহিনীও স্ট্রেঞ্জার ছান ফিকশ্যন। মানে, তিন তিনটে ব্যাচেলর মেয়ে-ব্যাচেলর কিনা ভগবান জানেন—একা একা ফ্ল্যাটে থাকে—বাপ মা অন্য বাড়িতে ফুর্তি করে নাগর নাগরী নিয়ে—এ ভাবা যায় না!

এই দেখুন, আবার আলতু—ফালতু বকতে আরম্ভ করেছি। দেখছি, আমার নিজেরই ব্যারা—কার্বাত খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই, বাচালতার দাওয়াই মশাই।

যাচ্চলে, আবার সব গুলিয়ে গেল। ও হ্যাঁ...হিমা আর হিমু চালাক মেয়ে। চিঠি পেয়েই টর্চ জ্বালিয়ে সঙ্কেত করেছে জানালায়। হিমি করে নি। ভয়ের চোটে সটান ফোন করেছে আমাকে। তারপর টেলিফোন পেয়েই ওরা ছজনেই ছুটে এসেছে থানায়। এবার শুনুন, আসল কারবারটা!

তার আগে মালক্ষ্মী, একটু চা-টা হবে? কফি-টফি না হলে গলাটা ইদানিং বড্ড শুকিয়ে যায়। আসছে? বেশ! বেশ! মালক্ষ্মী আমাদের সাক্ষাৎ শচী দেবী—মৃগাঙ্কবাবু ভাগ্যবান ব্যক্তি। আমার গিন্নিটি হয়েছে বেয়াড়া টাইপের। কেউ চা চাইলেই এমন মুখখানা করবে, যেন ঘরে চিনি নেই।

গেল যা! আবার অন্য লাইনে চলে এসেছি। সেদিন একটা আমেরিকান নাটক দেখলাম মশাই। আমার হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। এক বুড়ো আর এক বুড়ি। ছজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। ছজনেই খালি ভুলে যায়। ছজনেই এক পার্টনারের স্মৃতি, আরেক পার্টনারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। আমার হয়েছে......

ধুত্তের! কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ···আসল কারবারটা। আসল

কারবারটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। হিমি, হিমা আর হিমুর মা'টি হলেন আর এক শচী দেবী। এই···এই···এই ছাখো মা! কি বলতে কি বলে ফেললাম। ইন্দ্রজায়া শচী দেবীর একটা মস্ত তুর্নাম আছে, জানো তো? যখন যার, তখন তার পুরোন ইন্দ্রকে হঠিয়ে স্বর্গটা যে দখল করবে, শচী দেবী হাসি হাসি মুখে অমনি তার হেঁসেল ঠেলতে আরম্ভ করে দেবেন। হিমি, হিমা, হিমুর জননীটি অনেকটা তাই। মানে, সোসাইটি গার্ল। গার্ল এককালে ছিল—এখন পাক্কা লেডী। ফাংসন, মিটিং, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। স্বামীর নাম? এখনো বলি নি? হ্যাঁ, হ্যাঁ! এই জন্যেই বোধ হয় ডি-সি পোস্টে প্রোমোশনটা আটকে গেল আমার। ভদ্রমহিলার স্বামী মস্ত কারবারী। কোচিন থেকে নারকেল এনে কলের ঘানিতে নিয়ে তেল বার করে সাপ্লাই দেন নানান কোম্পানিতে। বি, এম পি তেলের নাম শোনেন নি? খাঁটি নারকেল তেল বলতে আর কেউ নেই এদেশে।

কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়ার পর ভদ্রলোকের মতিভ্রম হয়েছে বোধ হয়। বিশেষ করে প্যারালিসিসে কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথায় নাকি ভূত চেপেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবসার পরিকল্পনা ফাঁদছেন। মানে, শেষ পর্যন্ত কারবারটাকে তুলে দেওয়ার মতলব আর কি।

একটা প্ল্যান শুনবেন? কোচিন আর সিলোন থেকে জাহাজ ভর্তি নারকেল এনে নাকি পোযাচ্ছে না। ঠিক করেছেন, চাষ করবেন নিজের দেশেই। সুন্দরবনে নারকেল ফলিয়ে দেশের চেহেরা পাল্টে দেবেন। হাসবেন না! হাসবেন না। প্ল্যানটা একে বারে অবাস্তব নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধবে কে? পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের গায়ে যে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, সেখানকার নোনা মাটি আর আবহাওয়া নাকি নারকেল চাষের উপযুক্ত। উনি ঠিক করেছেন সেখানে এক লাখ নারকেল চারা লাগাবেন। মোটামুটি আট থেকে দশ বছরের মধ্যে ফল দেবে এক একটা নারকেল গাছ। গাছ যতদিন বাঁচবে, ফলও তদ্দিন মিলবে। একলাখ চারার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার চারাও যদি বেঁচে থাকে, মন্দ কি? গাছ পিছু বছরে মাত্র একশ' থাকার নারকেল ধরলেও, বছরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা নীট লাভ।

শুধু কি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা? নারকেল তেল, নারকেল দড়ি ইত্যাদির

জন্যেও কলকারখানা গড়ে তোলা যাবে ওখানে। ফলে, সুন্দরবন অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনে হঠাৎ ক্রাইম বেড়ে যাওয়ার কর্তাদের গরম মাথাও ঠাণ্ডাও হয়ে যাবে। হাতে পয়সা এলে চুরি—ডাকাতির সাধ কার থাকে বলুন ?

গর্ভণমেণ্ট প্রকল্পটি লুফে নিয়েছেন। রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমিও দিয়েছেন। তাইতেই লেগেছে গৃহ বিবাদ। মানে, বি-এন-পি অয়েল মিলের মালিক সনাতন প্রসাদের সঙ্গে তার বিদুষী বিবি অহল্যার।

নামখানা শুনেছেন ? অহল্যা। মেয়েদের মুখে শুনলাম মা নাকি সত্যিই অহল্যা—রূপের দিক দিয়ে। বাবা ওই রূপ দেখেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে ছিলেন অহল্যাকে। মেয়েদের জৌলুষ দেখলেই অবশ্য খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মায়ের ছিটে ফোঁটাও নাকি ওদের বরাতে জোটেনি।

কি বলছিলাম মা লক্ষ্মী ? কর্তা—গিন্নীর ঝগড়ার কথা, তাই না ? সুন্দরবনে নারকেল চাষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই খিটিমিঠি লেগেছে বাপ—মায়ের মধ্যে, বলল যমজ মেয়েরা। সনাতন প্রসাদ নাকি নিজে তো মরতে বসেছেন, মরার আগে কারবার পর্যন্ত মেরে যাবেন। যাকৃগে, সেসব ঘরোয়া কেচ্ছা। মেয়ে তিনটের ওপর এই সময়ে নেকনজর পড়ল কোন হারামজাদাদের, জানবার জন্যে শুরু করলাম তদন্ত। সে রকম তদন্ত, কিছু মনে করবেন না ইন্দ্রনাথ বাবু, আপনিও পারবেন না। অত ঝক্কি সইবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মৃগাঙ্কবাবু অবিশ্যি রুটিন তদন্ত বলে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন আমাদের পদ্ধতিকে। কিন্তু রুটিন তদন্ত একবার করতে আসুন না। কাছা খুলে যাবে।

তদন্তের ফিরিস্তি দেব না। তবে কি জানেন, তদন্তই সার হল। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মত আর কি। মেয়ে তিনটিকে কিছুতেই ফ্ল্যাট থেকে সরানো গেল না। সনাতন প্রসাদের স্পেশ্যাল রিকোয়েস্টে কনস্টেবল বসিয়ে রাখলাম ফ্ল্যাটের গোড়ায় দিন কয়েকের জন্যে। কিন্তু সাতটা দিনও গেল না।

এবার আসছি আসলেরও আসল ব্যাপারে। রিয়াল মিস্ট্রি এইখানেই। কান খাড়া করে শুনুন মৃগাঙ্কবাবু। দয়া করে, নেক্সট গল্পে আমাকে একটু ক্রেডিট দেবেন।

সনাতন প্রসাদের ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন আগে বিশ্রী লেবার মুভমেন্ট

হয়ে গিয়েছিল। জানেন তো, আজকালকার শ্রমিক-কর্মচারিরা কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। ম্যানেজমেন্টকে যা খুশি তাই করতে দেয় না। ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সনাতন প্রসাদ তার ধার ধারেন নি। সুন্দরবনে নারকেল চাষ প্রসঙ্গে সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে নেমেছেন। ফলে, আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কারখানায়। লীডাররাও কিছু একটা না পেলে লেবার তাড়াতে পারে না। এই ইস্যু নিয়ে ওরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কারখানায় যে, সনাতন প্রসাদের প্রাইভেট কোয়ার্টারের সামনে সি-আর-পি বসাতে হল চৌপর দিনরাত।

আরও খবর পেয়েছি মশাই। অহল্যা দেবী নিজেও নাকি কারখানার লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। লীডারদের ডেকে উস্কে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। শ্রমিকদের চাপে যেন স্বামীরত্ন ভড়কে যান এবং নারকেল চাষ শিকেয় তুলে রাখেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার। দেখে দেখে চোখ পচে গেল।

হঠাৎ হিমি—হিমা—হিমুর কেস টেকআপ করার সাতদিন পরে, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সেদিন রাত্রে একটা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্নে গিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। আত্মীয় বাড়ির নেমন্তন্ন। মাঝরাতে লগ্ন। তাই ঠিক করেছিলেন, ভোররাতে ফিরবেন। রাত ন'টার সময়ে সেজে গুজে নিচে নেমেছিলেন। কারখানার পাশেই ওঁদের কোয়ার্টার। সি-আর-পি'দের বলেছিলেন, কর্তা একলা রইল। যেন একটু নজর রাখা হয়। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, আলো জ্বলছে তিন তলায়। বলেছিলেন, 'একটু বরং দাঁড়িয়ে যাই। আলো নিভিয়ে উনি শুয়ে পড়লে যাব।' ড্রাইভারও দেখেছে আলো জ্বলছে। তারপর সবার সামনেই আলো নিভে গেল। অর্থাৎ সনাতন প্রসাদ মাথার কাছে বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমের আয়োজন করছেন। তিনতলায় আর কেউ থাকে না—অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা ছাড়া। সনাতন প্রসাদ কাউকে বিশ্বাস করেন না রাত্রে—কুকুর ছাড়া।

অহল্যা দেবী তিনতলার দরজায় নিজে চাবি লাগিয়েছিলেন। একটা চাবি ছিল ভেতরে—সনাতন প্রসাদের বালিশের তলায়। দরজায় ইয়েল লক লাগানো। একবার চাবি লাগালে নিশ্চিন্ত। বিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন বলে কাছে হ্যাণ্ডব্যাগ রাখেন নি। তাই চাবির গোছা রাখতে দিয়েছিলেন

ড্রাইভারকে। বিদুষী বিবি তো—আপটুডেট লেডী। আঁচলে চাবি বাঁধলে ইজ্জত চলে যায়।

পরের দিন সকালবেলা কুকুরের হাঁক—ডাকে চমকে উঠল কারখানার দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে সি-আর-পি পর্যন্ত। চাকরবাকররা দোতলা থেকে ছুটে গেল তিনতলায়। সবাই শুনলে, অ্যালসেসিয়ান কুকুরটা ভেতর থেকে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর ভীষণ চেঁচাচ্ছে। কোনদিন কিন্তু এভাবে চেঁচায় না সে।

আচ্ছা জ্বালা তো। দরজা খোলার ও উপায় নেই। চাবি মেম-সাহেবের কাছে। ঘরে আলোও জ্বলছে। কিন্তু সাহেব তো কুকুরটাকে ধমক দিচ্ছেন না।

ভোর ছ'টায় এসে পৌঁছলেন অহল্যা দেবী। কুকুরের হাঁক-ডাক শুনে আর দরজার সামনে চাকর-বাকরের জটলা দেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন করিডরের দিকে। তারপর ফিরে এসে গেলেন বেডরুমে।

চাকরবাকররা ছুটে গেল চিৎকার শুনে। দেখল, সনাতন প্রসাদ মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। চোখ খোলা। মুখের ওপর মাছি উড়ছে।

জানেন তো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ডাক পড়ল এই ঘাটের মড়া অবনী চাটুয্যের। চুলচেরা রুটিন তদন্ত করে তো মশাই বিলকুল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঘর বন্ধ। চাবি ড্রাইভারের কাছে। আর একটা চাবি সনাতন প্রসাদের বালিশের তলায়। বিয়েবাড়ির সবাই সাক্ষী —অহল্যা দেবী আর ড্রাইভার দুজনেই বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। সনাতন প্রসাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। বেড সুইচ টিপে না হয় আলো নিভিয়েছিলেন রাত ন'টায়। কিন্তু আলোটা জ্বালল কে? সারারাত আলো জ্বলেনি—সি-আর-পি'রা সাক্ষী। ভোরবেলা বন্ধ ঘরে আলো জ্বালল কে! সনাতন প্রসাদ? কি যে বলেন! তিনি তো তখন মরে ভূত। ময়না তদন্তে দেখা গেল, তিনি হার্টফেল করেছেন রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। মানে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেই স্থূল শরীর ত্যাগ করেছেন। আলো তাহলে জ্বালল কে? ভূত? অ্যালসেসি-য়ানের পক্ষেও সম্ভব নয় দাঁতে কামড়ে আলো জ্বালানো। যে ক্ষেত্রে সুইচে দাঁতের দাগ থাকত। মনিব মারা গেছে বুঝেই সে দরজা খুলতে চেষ্টা

করেছে, চেঁচিয়েছে—সুইচ টিপে আলো নিশ্চয় জ্বালায় নি। কে টিপল বেড সুইচ? তবে কি সি-আর-পি'রা মিথ্যা বলেছে? আলো সারারাত জ্বলেছিল, কিন্তু ব্যাটারা ঘুমোচ্ছিল বলে দেখেনি? এখন মানতে চাইছে না?

একটা স্ট্রোকের ফলেই শুয়ে পড়েছিলেন সনাতন প্রসাদ। চিন্তা ভাবনাও ইদানিং খুব বেড়েছিল। হার্ট আর অত ধকল সইতে পারেনি। ফাইনাল স্ট্রোকেই শেষ হয়ে গেছেন। বিধাতার কি লীলা! এত টাকার মালিক! মৃত্যুকালে মুখে জলটুকুও পেল না। কারও দেখাও পেলনা। তা না হয় হল, কিন্তু আলোটা জ্বালল কে?

না, না, যা ভাবছেন, তা নয়। আলো যে জ্বেলেছে, তার নাম জানতে আমি আসি নি। শোনাতে এসেছি। বুঝলেন না? কে আলো জ্বেলেছে, সবাই মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছি। না না, আমাকে বলতে দিন··· পুলিশ গোয়েন্দারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। আমাদেরও ব্রেন আছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে অহল্যা দেবীর একটু গুপ্ত প্রণয় ছিল। ভদ্রলোক খুব সুরৎ। বিলেত-ফেরৎ। ব্যাচেলার। আর কি চাই বলুন? আরো খবর পেয়েছি—পতিদেবতাকে রোজ স্বহস্তে ওষুধ খাওয়াতেন অহল্যা দেবী। এ ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতেন না সনাতন প্রসাদ। শুনবেন আরো? সনাতন প্রসাদের হার্ট হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছিল বলে একটা ওষুধ দেওয়া হত আর পাঁচ ফোঁটা মানে অমৃত, দশ ফোঁটা মানে বিষ—হার্টের রুগীর পক্ষে। দোহাই মৃগাঙ্ক-বাবু, ঔষুধটার নাম জিজ্ঞেস করবেন না। আপনারা—লেখকরা বড় অবিবেচক হন। যা শুনবেন তাই লিখবেন, তারপর আরো একশোটা খুনের কেস নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আমার মত অনেক বান্দাকে। একটু বুঝে-সুঝে লিখবেন মশাই। জানেন তো শতং বদ মা লিখ।

আচ্ছা মুশকিল তো, আবার বেরুটে চলে গেলাম। আসল কথাটাইতো বলি নি। বিয়ে বাড়িতে খাওয়ার আগে কর্তা-গিন্নীতে বেশ খানিকটা বচসা হয়েছিল চাকর-বাকররা শুনেছিল। চড়া গলায় ধমক দিয়ে ছিলেন সনাতন প্রসাদ। অহল্যাও দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই সেজেগুজে হোল নাইট বাইরে থাকবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অহল্যা। যাবার আগে সেই বিশেষ ওষধটা খাইয়ে গিয়েছিলেন কর্তাকে রোজকার মত রাত ন'টায়।

এখন কথা হচ্ছে, ক' ফোঁটা খাইয়ে ছিলেন? আমি বলব দশ ফোঁটা মানে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়ে ছিলেন সনাতন প্রসাদ। প্রমাণ এখনও পাইনি,

কিন্তু বিষয় মানেই বিষ—বিষের লোভে সবই সম্ভব। আর এখানে তো নাগর জুটেছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? সুতরাং পতিদেবতাকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন ধরে নিলাম। কিন্তু আলোটা কিভাবে জ্বলল সেইটাই তো বুঝতে পারছিনা।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনো শেষ হয় নি। আরো একটা জবর খবর শুনিয়ে দিই। শোনবার পর কিন্তু চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে মা-লক্ষ্মী। সাবধান! সাবধান!

হিমি হিমা—হিমু, এই যমজকে ফ্ল্যাট থেকে লোপাট করার ষড়যন্ত্রটি কে এঁটেছিল জানেন? কল্পনা করুন তো। পারলেন না তো? দুয়ো দুয়ো! স্বয়ং গর্ভধারিণী মশাই। অহল্যা দেবী নিজে লোক লাগিয়ে মেয়েদের লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কেন? কেন আবার—মেয়েরা কোন গতিকে জেনে ফেলেছিল মায়ের হাতে বাবার জীবন বিপন্ন হলেও হতে পারে। অথচ সেকথা সবাইকে বলা যায় না। তাই ওরা ঠিক করল আমার দোর ধরবে। অহল্যা দেবী চলেন শিরায় শিরায়। মেয়েদের মতলব টের পেয়ে পুলিশের নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য ইচ্ছে করেই মেয়েদেরকে গায়েব করতে আরম্ভ করলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। অর্থাৎ সেই রাতে আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন অহল্যা দেবী তার ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে। মেয়েরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ উৎপাতে। বাপের কথা খেয়াল রইল না।

তার সাতদিন পরেই কাজ হাসিল করে ফেললেন অহল্যা দেবী। তিনি জানেন, মেয়েরা বাপকে বাঁচাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাকে ফাঁসাতে চায় নি। পুলিশের লোক কাছে এলেও তারা মায়ের নাম করত না। বাবা মারা যাওয়ার পর তো আরো বোবা হয়ে যাবে। সনাতন প্রসাদ মারা যেতেনই না হয় দু' দিন আগেই তাঁর কষ্ট ঘুচিয়ে দেওয়া হল। মাকে ফাঁসিয়ে ঘরোয়া কেলেঙ্কারী ফাঁস করে আর লাভ আছে কী?

বলব কি মশায়, গোটা ফ্যামিলিটাই যেন কেমনতর। সব ছাড়া ছাড়া। অথচ তালে হুঁশিয়ার। মা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত কেউ একটি কথাও ফাঁস করেনি। কিন্তু আমার নাম অবনী চাটুয্যে। ঠেঙিয়ে নকশালি তাড়িয়েছি। কি বললেন? খুব বাহাদুরি করেছি? চাকরি মশাই, চাকরি! চাকরি করতে গেলে নিজের ছেলেকেও মাটিতে পুরতে হয়, নকশাল তো ছার!

এখন বলুন, প্লটটা নিশ্ছিদ্র কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, সনাতন প্রসাদ-

এমনি এমনি মরেন নি। কিন্তু শালা কিছুতেই তা প্রমাণ করতে পারছি না। নিশ্ছিদ্র প্লটে একটা ছিদ্রও আবিস্কার করতে পারছি না। একি গেরোয় পড়লাম বলুন তো? আলোটা কে জ্বেলেছে, তা তো জানি। কিন্তু জ্বালল কি করে তাইতো বুঝছি না। বেশ বুঝছি, ছিদ্রটা ওইখানেই। ওই ছিদ্রটা আবিস্কার করতে পারলেই ফাসিয়ে দেব অহল্যা দেবীকে।

ম্যারাথন বক্তৃতা থামতেই কবিতা বললে, 'আপনার কফি জুড়িয়ে গেল। চাইনিজ শ্রিম্প বলগুলো পর্যন্ত ইটের গুলি হয়ে গেল।'

'অ্যাঁ! কখন এল এসব? বলো নি তো?' আৎকে উঠে প্লেট ভর্তি চিংড়ি পকোড়া আক্রমণ করলেন অবনী চাটুয্যে।

'বলতে দিলেন কই? যতবার মুখ খুলতে গেলাম, ততবারই তো দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন।'

মুখ ভর্তি পকোড়া নিয়ে অঁ-অঁ অঁ-অঁ করে কি যেন বললেন অবনী চাটুয্যে, বোঝা গেল না।

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বলল, 'আস্তে আস্তে খান, বিষম লেগে যাবে। খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরটা দেখে আসি।'

কোৎ করে গিলে নিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'কার ঘর?'

'সনাতন প্রসাদের।'

'হা পোড়া কপাল! সপ্তকাণ্ড রামায়ন শুনে সীতা কার বাবা! আরে মশায়, এখনো বুঝলেন না রুটিন-তদন্তে আমরা কিছুই বাদ দিই না?'

রুটি আর লুচির মধ্যে যা তফাৎ, আপনার রুটিন তদন্ত আর আমার লুচি—ন তদন্তেও সেই তফাৎ অবনীবাবু।'

'মানে? মানে? মানে? এত অবিশ্বাস আমার ওপর কেন?' বলেই খপাৎ করে আরো দুটো পকোড়া মুখ গহবরে ঠেসে দিলেন অবনীবাবু।

দেখবেন, শ্বাসনালীতে যেন আটকে না যায়।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'আপনি এত সুন্দর ভাবে সব কথা বললেন যে, অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না। জ্বলন্ত বর্ণনা থাকে বলে—আপনার বর্ণনাও তাই। বায়োস্কোপের ছবির মত সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই একটা খটমট জায়গা ভেরি ফাই করতে চাই।'

মুখভর্তি পকোড়া চিবানো বন্ধ করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অবনীবাবু। ভাবখানা—খটমট জায়গাটা আবার কোথায় দেখলেন মশায়?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে, অহল্যা দেবী বিয়েবাড়ি থেকে এসে দরজা খুলেই কিন্তু বেডরুমে যান নি—যা সবাই যায়। উনি কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেলেন কেন?

চোখ দুটো আস্তে আস্তে ছানাবড়ার মত করে ফেললেন অবনীবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরো বললে, 'উনি কি তা হলে জ্ঞান পাপী? উনি কি জানতেন, শোবার ঘরে স্বামীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে? কুকুরের অস্বাভাবিক চেঁচামেচির পর দরজা খুলেই ওঁর উচিৎ ছিল অসুস্থ স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া। কিন্তু কেন উনি করিডরে গেলেন, আমি গিয়ে দেখতে চাই।'

কণ্ঠনালী দিয়ে মস্ত ডেলাটাকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললেন অবনীবাবু, 'একটু দাঁড়ান। আর মোট চারটে আছে।'

ইন্দ্রনাথ আগে থাকতেই শিখিয়ে পড়িয়ে রেখে ছিল অবনীবাবুকে।

সনাতন প্রসাদের ঘরে ঢুকে তাই অবনী চাটুয্যে সোজা চলে গেলেন বেডরুমে। অহল্যা দেবীকে আবোল তাবোল কথায় আটকে রেখেছিলেন সেখানে।

ইন্দ্রনাথ গেল করিডরে ঢুকেই বাঁ দিকে। শেষপ্রান্তে একটা কাঠের বাক্স। অ্যালসেসিয়ানের শোবার জায়গা। বাক্সটা তখন খালি। কুকুর বেড়িয়েছে চাকরের সঙ্গে হাওয়া খেতে।

ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কি করতে হবে। তাই হেঁট হয়ে কাঠের বাক্সটা সরিয়ে রাখল পাশে।

বাক্সর তলায় একটা ময়লা লিনোলিয়াম পাতা। লিনোলিয়ামটাও তুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ।

তলায় একটা কাঠের পাঠাতন। লম্বায় একফুট, চওড়ায় একফুট, দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের ঢাকনির গায়ে পেন্সিল ঢোকানোর মত একটা ফুটো।

ছিদ্রপথে কড়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাটাতনটা উঠিয়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ। মেঝের চৌকোণা গর্তে একটা বাক্স বসানো। ইলেকট্রিক মিটার আর যেন সুইচের জঙ্গল সেখানে। হালফ্যাসানের বাড়ি তো—দেওয়ালের গায়ে কিছু নেই।

পকেট থেকে টর্চ বের করে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ। কাঠের ঢাকনির যেখানে ফুটো, ঠিক তার তলায় কাঠের গায়ে দুটো ছোট ছোট ছিদ্র।

যেন স্ক্রু লাগানো ছিল। যেন সুইচের মাথা থেকে দুটো তার বেরিয়েছে। একটা তারে কিন্তু ব্ল্যাকটেপ জড়ানো।

সন্তর্পণে ব্ল্যাকটেপ খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ তার না ছুঁয়েই। তারটা সত্যিই কাটা। দুটো প্রান্ত জুড়ে ব্ল্যাক টেপ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

বাক্সের তলায় ছোট্ট একটা টুকরো। সোলার ছিপির টুকরো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

ফিরে এল শোবার ঘরে। অহল্যাদেবী গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে শুনছেন অবনীবাবুর ফালতু বক্তিমে।

ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে অপূর্ব সুন্দরী। খুঁত কোথাও নেই। বয়স হয়তো তিরিশ মনে হচ্ছে, আরো কম।

ইন্দ্রনাথকে দেখেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অবনীবাবু। চোখের মধ্যে প্রশ্ন ফুটিয়ে জানতে চাইলেন—হল কিছু ?

গম্ভীর মুখে—পলকহীন চোখে অহল্যা দেবীর পানে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'নমস্কার, আমার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার কাছে শুধু দুটি জিনিস চাইতে এলাম।'

প্রতি নমস্কার করলেন অহল্যা, 'বলুন।'

'একটা কলিংবেলের টেপা সুইচ। আর একটা ছোট সোলার ছিপি।'

নিমেষ মধ্যে নিরক্ত হয়ে গেলেন অহল্যা।

অবনীবাবুর পানে ফিরে বলল ইন্দ্রনাথ, 'এখন গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

আবার চিংড়ি পকোড়া। আবার কফি। আবার সরগরম বৈঠক।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'ছিদ্রান্বেষী ছিদ্র খুঁজতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছিদ্র বের করে ফেলল।'

'কেসটা কিন্তু এখনো আমার কাছে পরিষ্কার হয় নি।' উৎকট গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

'ইহজন্মে হবে না। অবনীবাবু নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্রটা তাঁর অজান্তেই শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তোরা প্রত্যেকে শুনেছিস। আমিও শুনেছি। কিন্তু ওই যে বললাম, যার চিন্তার ডিসিপ্লিন, বুদ্ধির একাগ্রতা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ শক্তি আছে—সে ছাড়া গোয়েন্দা হওয়া কাউকে সাজে না। তাই নিশ্ছিদ্র প্লটের ছিদ্র আমার মাথায় এসে গেল, তোদের মাথায় এল না।'

কবিতা একদম না ঘাঁটিয়ে ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, 'হার মানছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর সাসপেন্সে রেখো না। প্রেসার উঠে যাচ্ছে।'

প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, আমি এইখানে বসেই আঁচ করেছিলাম, আলোর তারে এমন কিছু কারচুপি করা হয়েছিল যা অহল্যা দেবীর অনুপস্থিতিতে আপনা থেকেই আলো নেভাবে বা জ্বালাবে। ঘরের মধ্যে প্রাণী ছিলেন দুজন। সনাতনপ্রসাদ আর কুকুর। সনাতনপ্রসাদ চলৎ-শক্তিহীন এবং আলো যখন জ্বলেছে বা নিভেছে—তখন তিনি মৃত। জীবিত প্রাণী বলতে রইল শুধু কুকুরটা। কুকুরটার সঙ্গে আলো জ্বলা নেভার কোন সম্পর্ক নেই তো? অহল্যা দরজা খুলে ঢুকেই কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেছিলেন কেন? করিডরেই কারচুপিটা নেই তো? হতে পারে কুকুরটা না জেনেই পুশ বাটমে চাপ দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে আবার জ্বালিয়েছে। কিন্তু নিভেছে রাত্রে—কুকুরের শোবার সময়। জ্বলেছে ভোরে কুকুরের ওঠার সময়। তবে কি শোবার জায়গা-টাতেই টেপা সুইচটা আছে।

'তাই তিনতলায় গিয়ে আমি আগে গেলাম করিডরে। দেখলাম, সত্যিই কুকুরের শোবার বাক্স রয়েছে সেখানে। সুসংবদ্ধ চিন্তা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তির প্রথমটি যদি সঠিক হয়, পরেরগুলোও সঠিক হতে বাধ্য। তাই বাক্স সরাতেই কি—কি পেলাম তা আগেই বলেছি।

'যেন সুইচের একটি তার কেটে, সেই তারে বাড়তি তার জুড়ে এনে লাগানো হয়েছিল একটা টেপা সুইচে। সুইচটা স্ক্রু দিয়ে লাগানো হয়েছিল কাঠের ডালার ছোট্ট ফুটোর ঠিক তলায়। সুইচের ভেতরে কনট্যাক্ট প্লেট দুটোকে ইচ্ছে করে বেঁকিয়ে এমন জায়গায় রাখা হয়েছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে কুকুর শুলেই ঢাকনি চেপে বসবে সুইচের ওপর। ফলে কনট্যাক্ট কেটে যাবে। মানে আলো নিভে যাবে। কুকুরটা বাক্স থেকে নেমে এলেই ডালাটা সুইচের ওপরে উঠে যাবে—আলো জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ সুইচ বাটম টিপে ধরলে আলো জ্বলে, ছেড়ে দিলে নেভে। এই সুইচে ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল! টিপলে নিভবে, ছাড়লে জ্বলবে।'

'কিন্তু ছিপিটার ভূমিকা কি?' শুধোলাম আমি।

'কাঠের ঢাকনিটা সুইচের মাথায় ঠেকছিল না বলেই ফুটো দিয়ে লোহার ছিপি এঁটে দিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। ছিপির তলাটাই সুইচের ওপর চেপে বসে আলো নিবিয়েছে কুকুরের শোবার সময়ে। ঘরে ঢুকেই ঐছিপিটা সরিয়ে নেবেন বলে অহল্যা দেবী সংগে করিডরে গিয়েছিলেন। পুশ বাটম সরিয়েছে পরে ধীর সুস্থে?

বিমূঢ় কণ্ঠে কবিতা বললে, 'দরজা বন্ধ করে অহল্যা দেবী নিচে নামার আগেই তো কুকুরটা বাস্কে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারত! তাহলে আলো নেবার ব্যাপারে সি-আর-পি'দের সাক্ষী রাখা যেত না?

হাল ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, 'জন্মে এমন দেখি নি। আরে বাবা, খান কয়েক বিস্কুট শোবার ঘরে ছড়িয়ে এলেই তো হল! কুকুর বিস্কুট না খেয়ে শুতে আসবে না। ততক্ষণে অহল্যা দেবী নিচে পৌঁছে যাবেন। সি-আর-পি' দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন—ঘরে আলো জ্বলছে। হয়েছে তাই। সব কবুল করলেন অহল্যা দেবী।'

যমজ মেয়ে তিনটে?' বোকার মত জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম আমি? সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠেছিল কবিতা: মরণ আর কি? সে খোঁজে তোমার দরকার কী?'

অদ্রীশ বর্ধন ॥ জন্ম ১৯৩২—কলকাতায়-সারপেনটাইন লেনএ। গততিনের দশকের বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান, ঝঞ্ঝা, ক্ষোভ আর মান্দাক্রান্ত হতাশার দিনগুলিতে জন্মগ্রহণ করেও বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প ছাড়াও যে বিষয়ে লেখকের অপ. কৌতূহলও অপরিসীম আগ্রহ তা হচ্ছে কল্পনা মিশ্রিত, প্রযুক্তি পৃক্ত রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীর আলেখ্য রচনা। তাই বিজ্ঞান ভিত্তিক রহস্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনায় লেখকের পারদর্শীতা অনস্বীকার্য। তবে গোয়েন্দা গল্পের চটুল, চতুর ও তির্যক ভাষা বিন্যাসের আড়ালেও এক ঘনীভূত রহস্যের মায়াজাল বিস্তারে অদ্রীশবাবুর স্বাভাবিক কুশলতা আমাদের চমৎকৃত করে। লেখকের ছিন্নমনের হাহাকার, মোমের হাত, কংক্রীট বুট ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক খ্যাত।



কফির কাপ

অনীশ দেব

"আমার বরাবর ধারণা ছিল, সাধারণত ডিটেকটিভ গল্প-উপন্যাসেই বন্ধ-ঘরের রহস্যের দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

সার্জেন্ট মুখোটির স্বরে স্পষ্ট বিষন্ন সুর, যেন পুলিশের প্রতি অবিচারের জন্য তিনি গোটা পৃথিবীটাকেই দোষারোপ করছেন।

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার, যাঁকে লক্ষ্য করে এই মন্তব্য করা হয়েছে—দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হলেও অপরাধ চর্চায় এখনও অবসর নেন নি। মাঝে মাঝে মহামূল্য উপদেশ তাঁর কাছ থেকে পুলিশ বিভাগ, বিশেষ করে সার্জেন্ট মুখোটি, পেয়ে থাকেন।

কপালে চিন্তার ভাঁজ ফুটিয়ে মাপা স্বরে তিনি বললেন, 'বুঝলে, মুখোটি, রহস্য জাতীয় গল্প উপন্যাসেই যে এ ধরনের রহস্যের সূত্রপাত, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তোমাদের গুরুদেব, জন ডিকসন কার অথবা কার্টার ডিকসন তো সারাটা জীবন এই অসম্ভব-রহস্য নিয়েই গল্প লিখে গেলেন। তবে বাস্তব জীবনেও মাঝে-সাঝে গল্প-উপন্যাসের ছোঁয়া পাওয়া যায় বৈকি। সোজা কথায় বলতে গেলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনেক বিচিত্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত অপরাধের জন্ম হয়েছে সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত বিচিত্র কোন গল্প উপন্যাস থেকেই। অনেক সময় দেখা গেছে গল্পের সঙ্গে বাস্তবের পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ মাপে মাপে মিলে গেছে।'

'তার মানে, এখন শুধু আপনাদের ভাষায় গর্দভস্য গর্দভ পুলিশকে বুদ্ধিতে হারালেই সখের গোয়েন্দাদের চলবে না, একই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ রহস্য-গল্প লেখকদেরও বুদ্ধির দৌড়ে পেছনে ফেলতে হবে।' অনুযোগের সুরে বললেন সীতারাম মুখোটি, 'আমার তো মনে হয় না, আপনি কখনও ওসব ছাতামাথা 'কেরাইম' গপ্পো পড়ে নিজের সময় নষ্ট করেছেন?' মুখোটি প্রত্যাশা নিয়ে যোগ করলেন।

'বরং ঠিক তার উল্টো।' সার্জেন্টকে হতাশ করে জবাব দিলেন চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার, 'রহস্য গল্প আমার ভাল লাগে, বিশেষ করে যে গল্পে বুদ্ধির ছাপ থাকে, থাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর বর্তমান অবস্থায় তো আরও বেশি ভাল লাগে।' বলে তিনি চোখ নামিয়ে তাকালেন নিজের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ের দিকে। তারপর পা'টাকে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে সামনের সোফায় আরামী অবস্থায় রাখলেন।

'আমারও দুর্ভাগ্য, আপনারও দুর্ভাগ্য।' মুখোটি বললেন, 'বর্তমান রহস্যে আপনার সাহায্য আমার বিশেষভাবে দরকার ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় আপনার সেরা নেশা, পাখি দেখা পর্যন্ত বন্ধ তো আমাকে আর দেখবেন কি! কি দরকার ছিল মশাই, পাহাড়ে পাহাড়ে দৌড়ে উড়ন্ত পাখিকে দূরবীণ নিয়ে তাড়া করবার? হাতের কাছে কাক চড়ুই-শালিক কি ছিল না!'

'রাগ কোরো না, মুখোটি।' হাসলেন চ-হ-স, 'তোমার রহস্যটা শোনাই যাক না? হয়তো কোন সাহায্যে এলেও আসতে পারি।' একটু থেমে তিনি আবার যোগ করলেন, 'আরে ভায়া, আমার মাথায় তো আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা নেই!'

সীতারাম মুখোটির গালে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা গেল।

'তা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। স্বীকার করলেন তিনি, 'আপনার বুদ্ধির সাহায্যই আমার দরকার। কিন্তু এ কথাটা তো মানবেন যে, আপনার বিজ্ঞানী চোখে যে সূত্রগুলো সূত্র বলে মনে হয়, তা আমার কাছে নেহাৎই অর্থহীন। সেই জন্যেই ঘটনাস্থলে আপনার যাওয়া দরকার ছিল।'

'মানছি, কিন্তু তোমার চিন্তা নেই। তুমি দেখেছ অথচ খেয়াল করো নি,

এমন তথ্যও তোমার কাছ থেকে আমি ঠিক বের করে নেব। সুতরাং যাবতীয় তথ্য আমাকে শোনাও; হোক শুরু তোমার গল্পের।'

সার্জেণ্ট মুখোটি কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্য, তারপর তাঁর বিবৃতি শুরু করলেন পুলিশী স্বরে।

'মৃত ব্যক্তির নাম চণ্ডীদাস অ্যাডভানি—বাষট্টি বছর বয়েসের এক অকৃতদার পুরুষ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তিনি সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কাপের গায়ে তাঁর, শুধু তাঁরই, হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। একটা বন্ধ ঘরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর আগে পুরো আধ-ঘণ্টা কেউই তাঁর কাছাকাছি ছিল না। এর পর থেকে আমাদের সুকুমার রায়ের পদ্ধতিতে এগোতে হবে—' হেসে মন্তব্য করলেন মুখোটি, 'কারণ এর পর আপনাকে কিভাবে কি বলব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'ঠিক আছে।' উদার স্বরে চ-হ-স বললেন, 'সুকুমার রায়ের হযবরল পথই সময়ে সময়ে শ্রেষ্ঠ পথ। তুমি বলছ দরজা বন্ধ ছিল। কিভাবে?'

'ভেতর থেকে; একটা ভারি পেতলের হাঁসকল লাগানো ছিল।'

'এটা খুব একটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়। হাঁসকলের হাতলের সঙ্গে সুতো অথবা তার বেঁধে এ ধরণের দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায়।'

'এক্ষেত্রে তা করা হয় নি।' হতাশ দুঃখিত স্বরে বললেন মুখোটি, 'প্রথমত, দরজার জোড়ের মুখটা খাঁজ কাটা; আর দ্বিতীয়ত, বন্ধ করবার পর দু-পাল্লার মাঝে কোনরকম ফাঁক থাকে না, যা দিয়ে একটা তার গলানো যেতে পারে। তাছাড়া কোন তার বা সুতোও আমরা পাই নি। আর আমরা যাকে সন্দেহ করছি, সে যে একফাঁকে তারটা বা সুতোটা সরিয়ে ফেলবে তারও কোন উপায় ছিল না।'

'ভাল কথা। ঘরে জানলা-টানলা আছে?'

'একটা কাচের জানলা আছে, ঘরের পেছন দিকে। সেটা পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আজ অনেক বছর। আর সেটা নিয়ে যে কোনরকম ডাক্তারী করা হয় নি, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

জানালার প্রতিটি ইঞ্চি আমি নিজে আতস্ কাঁচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'জানলার কাচটা কেটে আবার পুডিং দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় নি তো ?' বৃদ্ধ অধ্যাপকের চোখের তারায় দুষ্টুমি ঝিলিক মেরে উঠল. 'মাস কয়েক আগে এ ধরনের একটা রহস্য গল্প পড়েছিলাম .'

'কোন আশা নেই। জানলার ফ্রেমে লাগানো পুডিং-এর অবস্থা পুরোনো, ফাটা-ফাটা, শুকনো, কিন্তু এখনও কাচ ধরে রাখবার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে।'

'তা জানলাটা পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কেন ?'

'অ্যাডভানি মুক্ত বায়ু-টায়ু বিশেষ পছন্দ করতেন না, এবং তাঁর সব ব্যাপারেই কেমন একটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ভাব ছিল। নিজেকে বিরাট এক বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারক বলে তিনি মনে করতেন। যদিও সেরকম কিছু অবিষ্কার করতে পারেন নি। তাঁর ল্যাবরেটরিটা পুকুর পাড়ে একটা ঘর নিয়ে তৈরী। ওই ঘরে থাকত তাঁর যাবতীয় গবেষণার সরঞ্জাম। যখনই অ্যাডভানি বাইরে যেতেন, ঘরের এক এবং একমাত্র দরজায়, যেটা নিয়ে একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি, বাইরে থেকে তালা এঁটে দিয়ে যেতেন। আর যখন বৈজ্ঞানিকপ্রবর ভেতরে কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন দরজায় হাঁসকল এঁটে দিতেন ভেতর থেকে।'

চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার ভুরু কোঁচকালেন।

'এখানে মনে হয় আমার প্রশ্ন করা দরকার, তুমি এত সব দেখেশুনেও ব্যাপারটা আত্মহত্যা নয় বলে সন্দেহ করছ কেন ?'

সীতারাম মুখোটির ঠোঁট ছোট হল। পরমুহূর্তেই তিনি বললেন, 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়—তাছাড়া চণ্ডীদাস কোন স্বীকারোক্তি লিখে যান নি। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, আত্মহত্যা সব সময়েই তার সমাধান রেখে যায়। সবশেষে, চণ্ডীদাস অ্যাডভানি বিরাট সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যখন এত অর্থের টোপ রয়েছে, তখন রাঘব বোয়ালরা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবেই।'

'বিশেষ কোন রাঘব বোয়ালকে কি তোমার মনে ধরেছে ?

'সে আর বলতে। বুড়োর একটা ভাইপো আছে। যখন মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়, তখন সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। এখন এই ছোকরাই সাড়ে আট লাখ টাকার মালিক এবং সে টাকা কিভাবে ওড়াতে হবে সে বিদ্যেও তার ভালই জানা আছে।'

'এই ভাইপো তাহলে ল্যাবে ছিল! সবিস্তারেই সে ঘটনা শোনা যাক।'

ভাইপোর নাম রাজন অ্যাডভানি। সে স্বীকার করেছে যে, দুপুরে কাকার সঙ্গে তার ল্যাবে দেখা হয়েছে। কখনো সখনো সে কাকাকে গবেষণার কাজে সাহায্য করত এবং সুযোগ বুঝে দু-দশ টাকা আদায় করতে ছাড়ত না। খুব বেশি দাঁও সে কখনও মারতে পারে নি, কারণ বুড়ো অ্যাডভানির হাতের মুঠো বঙ্কিম ব্রেসিয়ারের ইলাস্টিকের চেয়েও শক্ত।' হাসল মুখোটি, বলল, 'যাই হোক, দেড়টার সময় সে জীবিত চণ্ডীদাস অ্যাডভানির কাছ থেকে বিদায় নেয়—অন্তত সে তাই বলছে। সে বেরিয়ে যেতেই বুড়ো দরজার ভেতর থেকে হাঁসকল এঁটে দেয়। তারপর রাজন চলে যায় পুকুর পাড়ে। সেখানে স্থানীয় লোকেরা কেউ কেউ প্রায়ই মাছ ধরতে আসে। সে দুপুরেও সেরকম একজন মৎস্যপ্রত্যাশী ছিপ নিয়ে সেখানে বসে ছিল। সুতরাং বুড়োর দরজা থেকে প্রায় একশো গজ দূরে বসে সেই লোক-টার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় রাজন। বুঝতেই পারছেন, নিস্তব্ধ দুপুরে আশেপাশে বিশেষ লোকজন ছিল না।

'মোটের ওপর, সে আধঘণ্টা মত ওই লোকটির সঙ্গে গল্প করে, তারপর চলে যায়। কিন্তু যাবার আগে লোকটিকে সে বলে যায়, মাঝে মাঝে বুড়ো অ্যাডভানির দরজার দিকে নজর রাখতে। এবং এই ব্যাপারটাই আমার কাছে সন্দেহজনক ঠেকছে। ছোকরা নির্ঘাৎ নিজের অ্যালিবাই তৈরী করছিল।'

'এই রকম অদ্ভুত অনুরোধের কি কারণ দেখিয়েছিল সে?'

'লোকটাকে রাজন বলে, কয়েকদিন হল পাড়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা তার কাকাকে বিরক্ত করছে—ওরা সুযোগ পেলেই বন্ধ দরজায় ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। যদি সে বাচ্চাগুলোকে সেই অপকর্ম করতে দেখে এবং

ওদের চিনে রাখতে পারে, তাহলে রাজনের কাকা তাকে কুড়ি টাকা বকশিস দেবেন।'

'নিতান্ত অবাস্তব নয়।' সামান্য হেসে বললেন অধ্যাপক চ-হ-স, 'মানতেই হবে, রাজন ছোকরার কল্পনা শক্তি আছে—যদি অবশ্য সে ওই গল্পটা বানিয়ে থাকে।'

'সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যাকগে, তারপর সবই খুব স্পষ্ট। রাজন কাকার কাছ থেকে চলে আসে তাঁর মৃত্যুর আধঘন্টা আগে, এবং ওই সময়ের মধ্যে দরজার কাছে সে আর ফিরে যায় নি—সাক্ষী সেই মৎস্যশিকারী! কারণ সে নগদ কুড়ি টাকার লোভে মাছ ধরা শিকেয় তুলে দরজায় চোখ সেঁটে বসেছিল।

'তারপর, পুকুর পাড় ছেড়ে রাজন চলে যাবার মিনিট পনেরো পরে, সেই লোকটা রাজনকে আবার দেখতে পায় বুড়ো অ্যাডভানির দরজার সামনে। সে দরজায় ধাক্কা মারছে আর চীৎকার করছে। অবশেষে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পুকুর পাড়ের লোকটাকে ডাকে। সে উঠে দরজার কাছে যেতেই রাজন বলে সে জানলা দিয়ে দেখেছে, তার কাকা হয় অজ্ঞান হয়ে, নয় মরে পড়ে আছেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, জানলাটা ঘরের পেছন দিকে। সুতরাং রাজন জানলা দিয়ে সত্যি সত্যিই উঁকি মেরে দেখছে কিনা সেটা কারো পক্ষেই দেখা সম্ভব নয়।

'অতঃপর তারা দুজনে দরজা ভেঙে ফেলে—ভারী পেতলের হাঁস কলকে যুদ্ধে হারাতে দুজনের শক্তিরই প্রয়োজন হয়েছিল—এবং চণ্ডীদাস অ্যাডভানিকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে। তাঁর হাতের কাছেই ছিল কফির কাপ—বিষাক্ত। জানলার কাছে টেবিলে তিনি উপুড় হয়ে পড়েছিলেন।'

'এমনও তো হতে পারে, রাজন কাকাকে ছেড়ে পুকুর পাড়ে যাবার আগেই তিনি খুন হয়েছিলেন?'

'ওটাই তো আমার মনে খচখচ করছে।' অসন্তোষের সুরে বললেন মুখোটি, 'টেবিলে এক কাপ কফি রাখা ছিল, ফুটন্ত কফি। অর্থাৎ, সদ্য সদ্য কাপে ঢালা হয়েছে—এবং সায়ানাইড ছিল ওই কফিতেই। সায়ানাইড

খাবার জন্যে ঠাণ্ডা জলে বুড়োর মন উঠল না, গরম তাজা কফি তৈরী করতে হল!

'এখানেই শেষ নয়,' অবিশ্বাস-বিস্ময়ের সুরে বললেন মুখোটি, 'অ্যাসট্রের ওপর একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট পর্যন্ত রাখা ছিল। দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, বড়জোর মিনিট কয়েকের বেশি সিগ্রেটটা ধরানো হয় নি।' মুখোটি অধ্যাপকের দিকে তাকালেন, তাঁর মুখমণ্ডলে অসহায় এক বিশাল প্রশ্ন-চিহ্ন।

'হু-ম-ম্,' আপন মনেই উচ্চারণ করলেন চ-হ-স, 'বুঝতে পারছি, তোমার মাথাব্যথার কারণটা কি।'

'ব্যাপারটা যদি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা বলেই ছাড়পত্র পায়, তাহলে একই সঙ্গে চরম গর্দভ বলে আমাদের এক মানপত্র লাভ হবে।' অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বললেন সার্জেণ্ট মুখোটি, 'আসলে ওই ভাইপোর বাঁকা হাঁসি আর ধূর্ত চকচকে চোখ আমি সহ্য করতে পারছি না। ওই শালাই যেভাবে হোক ঘটঘট করে এ কাণ্ড বাঁধিয়েছে, আর আমি চাই ব্যাটাকে কব্জা করতে!'

'উত্তেজিত হোয়ো না, মুখোটি।' অধ্যাপক চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর অন্যমনস্ক সুরে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই শার্লক হোমসের গল্প পড়েছ?'

সীতারাম মুখোটি থ হয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'আমি ভাবছি তার দাদা, মাইক্রফটের কথা।' হেসে বললেন চ-হ-স।

'মাইক্রফট্?'

'আমার বর্তমান অবস্থার মত সেও ছিল চলৎশক্তিহীন। সে ছিল বেঢপ মোটা, আর প্রচণ্ড অলস। তাই চেয়ার ছেড়ে নড়ত না। কিন্তু চেয়ারে বসে বসেই কতগুলো জটিল রহস্যের সমাধান সে করেছিল; শুধু তার ভাই শার্লক তদন্ত-সংক্রান্ত পরিশ্রমের কাজগুলো করে প্রয়োজনীয় তথ্য তার হাতে এনে দিয়েছিল।' ধন্ধময় হাসি হেসে সীতারামের দিকে তাকালেন চ-হ-স, 'আমরাও সেরকমটা করলে কেমন হয়?'

'আমাকে যা বলবেন তাতেই আমি রাজী।' সার্জেণ্ট মুখোটি বললেন,

'পরিশ্রমের কাজ-টাজগুলো আমি ভালই পারি। মাঝে মাঝে মনে হয়, ও ছাড়া আর কোন কাজই আমার দ্বারা হবে না।'

'বাজে কথা বোলো না। তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি এবং কল্পনাশক্তি আছে।' ব্যস্ত স্বরে তাঁকে আশ্বাস দিলেন চ-হ-স, 'এখন তোমাকে যা করতে হবে, তা হল এই : চণ্ডীদাস অ্যাডভানির ল্যাবরেটরির কতকগুলো বড়সড়, স্পষ্ট ফটো আমাকে এনে দেবে—বাইরের এবং ভেতরের চার দেওয়ালের ফটো। আর ল্যাবরেটরি থেকে বিভিন্ন দিকের তোলা ছবি। পুকুরটা যেন বাদ না পড়ে।' অধ্যাপকের চোখে তাৎক্ষণিক মেঘের ছায়া। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ঠিক জানো হাঁসকলটা পেতলের, অন্য কোন ধাতুর ওপর নিকেল করা নয়?'

'নিকেল করা? না, না; কিন্তু একথা—' দাঁতে ঠোঁট চেপে থেমে গেলেন মুখোটি। তারপর নিশ্চিত স্বরে প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঠিক আছে, আমি পাকা খবর নিয়ে আসব।'

'খবরটা পেলেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। ল্যাবে কোন ফোন আছে?'

'আছে।'

'তাহলে ওখান থেকেই আমাকে ফোন করবে। আর ছবিগুলো হাতে পেলেই নিয়ে চলে আসবে।'

'ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আপনাকে ফোন করছি। ছবিগুলো সম্ভবত কাল বিকেলের আগে হাতে পাব না।'

'ঠিক আছে।' চ-হ-স বসে বসেই সীতারাম মুখোটিকে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখলেন।

সার্জেন্ট মুখোটি চলে যেতেই বৃদ্ধ অধ্যাপক পরনের পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে একটা ক্যাডবেরী চকলেট বের করলেন। তার কিছুটা অংশ খাওয়া। সেটা থেকে এক কামড় নিয়ে চিবোতে শুরু করলেন তিনি। থেকে থেকেই তাঁর ভুরুর বুনুনি জটিল হয়ে উঠতে লাগল, চিন্তার সূক্ষ্ম ভাঁজের অরণ্য হয়ে উঠল যেন।

দু' ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট পরে মুখোটির ফোন এল।

'হাঁসকলটা দেখে পেতলেরই মনে হচ্ছে।' তিনি ফোনে জানালেন, অন্তত লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম অথবা সীসে যে নয়, সেটুকু বলতে পারি।'

'হুমফ্।' চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার এই বিজাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে মনের হতাশা প্রকাশ করলেন, 'বড়ই দুঃখের কথা।' এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি আবার বললেন, গলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ, 'আমি চাই, তুমি হাঁসকলটা চেঁছে তোমার ওই পাশুপত অস্ত্র আতস কাচ দিয়ে ভাল করে ওটা পরীক্ষা করে দেখ। সেরকম কিছু পেলে আমাকে ফোন করে জানিও।'

'ওটা চেঁছে কিসের খোঁজ আমাকে করতে হবে?' অস্বস্তি ভরা স্বরে জানতে চাইলেন সীতারাম মুখোটি।

'শুধু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করো, তারপর দেখ কিসের সন্ধান পাও।' উত্তর দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখলেন অধ্যাপক চ-হ-স।

আধ ঘণ্ট পরে সার্জেন্ট মুখোটি আবার ফোন করলেন; তাঁর স্বরে উত্তেজনার হালকা আমেজ। 'জানি না কি করে আপনি জানলেন,' তিনি বললেন, 'কিন্তু হাঁসকলটা নিয়ে কেউ একজন নির্ঘাৎ নটখট করেছে। দেখে মনে হচ্ছে, ওটার গায়ে একটা গর্ত করে অন্য ধরনের কোন ধাতুর বল সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আঃ—' চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার পরিতৃপ্তির সুরে বললেন, 'ওই ধাতুর বলটা যে কাঁচা লোহার, সেকথা সহজেই বাজী রেখে বলতে পারি। প্রথম প্রকল্পের তাহলে প্রমাণ পাওয়া গেল।'

'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি বলুন তো?' মুখোটি আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলেন।

'ছবিগুলো হাতে পেলে সে কথা বলব।' বললেন চ-হ-স, 'কাল তাহলে ছবিগুলো নিয়ে এসো, কেমন?'

'সে-না হয় আনলাম। কিন্তু—'

'আগামী কাল।' একরোখা উত্তর শোনা গেল, 'এখনও সব পরিষ্কার হয় নি। কুয়াশা এখনও থেকে গেছে।' আবার ফোন নামিয়ে রাখলেন অধ্যাপক।

পরদিন, বিকেলের কিছু আগেই, একরাশ গ্লসি পোষ্টকার্ড প্রিণ্ট নিয়ে হাজির হলেন সার্জেণ্ট সীতারাম মুখোটি। চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার সেগুলো নিয়ে অধৈর্যভাবে পরপর দেখে গেলেন, অবশেষে ল্যাবের ভেতরের একটা ছবি তুলে নিলেন। সেটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করে প্রায় আক্ষেপ করে উঠলেন তিনি।

'কি হল ?' সার্জেণ্ট মুখোটি প্রশ্ন করলেন।

'টেবিলটা!' চ-হ-স'র স্বরে একরাশ বিরক্তি, 'টেবিলটা জানালা থেকে বড় বেশি দূরে রয়েছে। ইস, যদি জানলার কোল ঘেঁষে টেবিলটা থাকত... আচ্ছা, দরজা বন্ধ করার পর নিশ্চয়ই কফি এবং সিগারেট ভেতরে রেখে আসার কোন উপায় সেখানে ছিল না ?' প্রত্যাশা নিয়ে প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

'উঁহু—ওই একটিমাত্র দরজা ব্যতিরেকে ন্যায্য পন্থা।' সীতারাম মুখোটি জানালেন।

'একটা ভাল সম্ভাব্য তত্ত্ব বানের জলে ভেসে গেল।' বললেন চ-হ-স, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'ভাল কথা, কফির কেটলিটাও কি গরম ছিল ?'

'নিশ্চয়ই।' সীতারাম বললেন, ওটা একটা বুনসেন বার্নারের ওপর ট্রিপল স্ট্যাণ্ডে বসানো ছিল।'

শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন চ-হ-স। বললেন, আমাদের হত্যাকারী—জানি না সে কে—যদি রাজনই হয়ে থাকে—মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। তবে দুঃখের কথা, তার প্রতিভা বিকৃত পথে চালিত হল। অল্প গরম কফির কেটলি আর ফুটন্ত গরম কাপের কফি, এই দুটোর মধ্যেকার গলদটা যাতে কারো নজরে না পড়ে সে জন্যে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে ছোকরা। তাই কেটলিটাকে বার্নারে বসিয়ে গেছে আগে থাকতেই—দূরদর্শী বটে !'

ঈষৎ সন্দিহান চোখে তিনি ছবিগুলো পরীক্ষা করলেন। হঠাৎই তাঁর চোখের দৃষ্টি সূক্ষ্ম হয়ে এল।

'ল্যাবের পেছনে এটা কি—একটা থামের ওপর বসানো ? দেখে তো অ্যাষ্ট্রনমিক্যাল টেলিস্কোপ বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই ধরেছেন।' মুখোটি বললেন, 'চণ্ডীদাস জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও একটু আধটু নাড়াচাড়া করতেন। লোকে বলে, তিনি নাকি একটা নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন।'

'আর এটা একটা প্রতিসারক (Refractor) মনে হচ্ছে ?'

'হতে পারে। আমি ওগুলোকে বিশেষ আমল দিই না।'

'এবারে দাও, মুখোটি। আমি এই যন্ত্রের প্রস্তুতকারকের নাম জানতে চাই। কিন্তু খবরদার, ওটাতে হাত দিও না : হয়তো আঙুলের ছাপ-টাপ পাওয়া গেলেও যেতে পারে।'

'কার আঙ্গুলের ছাপ ? আর ছাপ পেলেই বা কি ? জানি না এ ক'দিন ধরে আপনার মগজে কি সব হযবরল খেলছে।' সার্জেন্টর মুখে হতাশা ও বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট।

'আমি নিজে নিশ্চিত হলেই তোমাকে সব বলব—তার আগে নয়।' বৃদ্ধ অধ্যাপক মুখোটিকে শান্ত করলেন, 'কারণ আমি চাই না, তুমি ভাব যে আমার বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। যাও, লক্ষ্মী ছেলের মত টেলিস্কোপটা একবারটি পরীক্ষা করে এসো। কোম্পানির নামটাম লিখে এনো। যদি নামটা না পাও, তাহলে ওটার অবজেকটিভের ডায়ামিটারটা মেপে এনো— মানে টেলিস্কোপের মাথায় যে বড় লেন্সটা বসানো থাকে। কিন্তু, সাবধান, হাত দিও না। বুঝেছ ?'

'যথা আজ্ঞা।' বললেন মুখোটি। তারপর সংক্ষিপ্ত হেসে যোগ করলেন, 'স্যার, মাইক্রফট্ !'

অধ্যাপক চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার চোখ পিটপিট করলেন। এই প্রথম সীতারাম তাঁর সঙ্গে সম্বোধনে রসিকতা করল। ভাল! তাদের দুজনের সম্পর্কে লৌকিকতা যত কম উপস্থিত থাকে, ততই ভাল। তাতে কাজের সুবিধে হয়।

'তবে যাবার আগে,' চ-হ-স'র উজ্জ্বল চোখ চোখে রেখে বললেন সার্জেন্ট মুখোটি, 'ওই হাঁসকলের কেলোর কীর্তিটা আমি জানতে চাই। ওটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কোন সন্দেহ নেই !'

'না', নেই। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখতে চাই নি।' অধ্যাপক বললেন, 'ওই দেওয়াল আলমারিটা খোলো ; ওটার দ্বিতীয় তাকে যে জিনিসটা আছে, সেটা নিয়ে এসো।'

সার্জেণ্ট মুখোটি তাঁর আদেশ পালন করলেন, এবং অধ্যাপককে ভুল বোঝার জন্য একটু লজ্জা পেলেন।

'আচ্ছা,' চ-হ-স বললেন, এটা হল একটা চুম্বক—বেশ বড়সড়ই বলতে হবে। এটার ওজন সোয়া দু কেজি; এবং এর ক্ষমতা হল দু হাজার গস (Gauss)। যার অর্থ; একটা পুরু কাঠের দরজার এপিঠ থেকে ওপিঠের লোহা বসানো পেতলের হাঁসকলকে আকর্ষণ করে ঘাটে লাগানর শক্তি এর আছে—অন্তঃত আমার তাই মনে হয়। হাঁসকলটার গায়ে তেল লাগানো ছিল কিনা খেয়াল করেছ? তাহলে চম্বুক ব্যবহার করার সময় ওটা মাঝপথে কোথাও আটকে যাবে না, মসৃণভাবে কাজ করবে।'

'এখন মনে পড়ছে ; সত্যিই তেল লাগানো ছিল!' বিস্ময়ে বলে উঠলেন মুখোটি, 'তাহলে আসল প্যাঁচটা এই! ওঃ, আমার মত গর্দভ দুনিয়ায় দুটো নেই! রাজনকে শুধু যা করতে হয়েছে তা হল; বাইরে এসে দরজা বন্ধ করা—তখন চণ্ডীদাস অ্যাডভানি ঘরের ভেতরে মৃত—এবং এ ধরণের একটা চুম্বক দরজার নির্দিষ্ট জায়গায় ঠেকিয়ে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।' ভারি চুম্বকটাকে উত্তেজনায় এ-হাত ও-হাত করতে লাগলেন সীতারাম। তারপরই তাঁর মুখে আঁধার নেমে এল; 'কিন্তু ওই কফি আর সিগ্রেটের প্যাঁচ তো এখনও খোলা হয় নি। আমারা ভাল করেই জানি, প্রায় আধ ঘণ্টা রাজন ল্যাবে ছিল না। সে সময়ে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবার কথা; আর সিগ্রেটের ধোঁয়াও ঘরে থাকার কথা নয়।'

'অসুবিধেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।' বললেন অধ্যাপক, 'সেই জন্যেই তো ভেবেছিলাম, টেবিলটা জানলার কোল ঘেঁষে রয়েছে! ভাল কথা,' তিনি জানতে চাইলেন, 'সেই দিনটা কিরকম ছিল বল তো—মানে আবহাওয়া কি রকম ছিল?'

'একদম পরিষ্কার ; ঠাণ্ডা, রোদ ঝলমলে দিন। একমাত্র বুড়ো চণ্ডী-দাসের মত লোকই ওরকম দিনে বন্ধ ঘরে বসে কাটাতে পারেন। নইলে অন্তত মুক্তবায়ু সেবনের আশায় ঘরের জানলা যে কেউই খুলে রাখবে।'

'নিশ্চিন্ত হলাম।' চ-হ-স বললেন, 'এবারে যাও, লক্ষ্মী ছেলের মত টেলিস্কোপটা পরীক্ষা করে এসো।'

সীতারাম মুখোটি আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপকের নিরভিব্যক্তি মুখমণ্ডল তাঁকে নিরস্ত করল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সার্জেণ্ট নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন চ হ স একটা বাইনো-কুলার মাইক্রোস্কোপ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন ; বোঝা গেল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি চেয়ার পেছনে ঠেলে চোখ তুললেন। মুখ দিয়ে স্বস্তির একটা শব্দ করে ভুরু উঁচিয়ে নীরব প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার ?'

'কি ব্যাপার !', নীরব প্রশ্নের সরব ভাষান্তর করলেন চ হ স।

'কোম্পানির নাম ওটার গায়ে খুঁজে পেলাম না। তবে অবজেকটিভের ডায়ামিটারটা মেপেছি—পাঁচ ইঞ্চি।'

'বেশ। পাঁচ ইঞ্চি অবজেকটিভের ফোকাল লেংথ (focal length) ষাট থেকে নব্বই ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে।'

'এ থেকে আমরা কি জানতে পারছি ?' সার্জেণ্ট মুখোটির কণ্ঠস্বরে বিদ্রোহের সুর। অধ্যাপকের বাড়ি আর অকুস্থল করে করে তিনি ক্লান্তির সীমায় এসে পৌঁছেছেন। এখন কেসটিকে যে কেন আত্মহত্যা বলে রেহাই দেন নি, সে কথা ভেবে তাঁর রীতিমত দুঃখ হচ্চে। শুধু অসীম ধৈর্য এবং একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশের স্বভাব তাঁকে এখনও চ হ স'র সঙ্গে যুক্ত রাখতে পেরেছে।

'পুরো ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছিল, তাহলে শোনো।' চ হ স'র স্বরের অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই, 'রাজন গেল তার কাকার সঙ্গে দেখা করতে ; হয়তো তাঁর সঙ্গে ল্যাবে একটু কাজকম্মও করল। তারপর তাঁরা কফি খেলো—প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক, অথবা রাজনের পীড়াপীড়িতে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে তাকে সাজানো আছে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ—

তোমার ছবি থেকেই তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সুতরাং বুড়ো কাকার সায়ানাইড মিশিয়ে দেওয়া রাজনের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ। যে মুহূর্তে তার কাকা লুটিয়ে পড়ল, ছোকরা কাপের গা থেকে নিজের আঙুলের ছাপ মুছে ফেলল, চণ্ডীদাসের আঙুলের ছাপ তাঁর হাত চেপে বসিয়ে দি এবং দরজা বন্ধ করে বাইরে এল। কিন্তু তার আগে সে কাচের অ্যাস ওপর একটা গোটা সিগ্রেট না ধরিয়ে রেখে আসতে ভুলল না।

'বাইরে এসে, অত্যন্ত শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে—কোন প্রত্যক্ষদর্শী চোখে ধুলো দিতে—সে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াল, এবং সম্ভবত ত কাকারই ল্যাব থেকে নিয়ে আসা চুম্বকটা দিয়ে বাইরে থেকে হাঁসকল এঁটে দিল। আমার ধারণা, আগে কোন একদিন, তার কাকার অনুপস্থিতিতে সে হাঁসকলের গা থেকে খানিকটা পেতল বের করে কাঁ লোহা ঢুকিয়ে, যাতে চুম্বকটা ঠিক মত কাজ করে।

'এবার সে গেল সেই মৎস্যশিকারীর কাছে নিজের আধ ঘণ্টার অ্যালিবাই তৈরী করতে। তারপর সে অ্যাডভানির ল্যাবে ফিরে এল পেছন দিক দিয়ে—যেখানে কেউই তাকে দেখতে পাবে না, এমন কি তার অ্যালিবাইয়ের সাক্ষী সেই লোকটিও নয়। খুলে নিল টেলিস্কোপের অবজেকটিভ লেন্সটা—যেটা সে আগেই ঢিলে করে রেখেছিল—রাজনের বুদ্ধিদীপ্ত কর্মশক্তি দেখে এটা আমার নিছকই অনুমান। বন্ধ জানলা থেকে ফুট তুয়েক দূরে দাঁড়াল। তারপর সেই লেন্সের সাহায্যে প্রখর সূর্যের আলো ফোকাস করে কেন্দ্রীভূত করল ঘরের মধ্যে—'

সীতারাম মুখোটির ঠোঁটজোড়া বিস্ময়ে ফাঁক হল। একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে।

তাঁর বিস্ময়কে আমল না দিয়ে ভুরু কোঁচকালেন চ-হ-স। ব চললেন, সাধারণ কোন ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে এ কাজ হত না, যদি টেবিলটা জানলার একেবারে গা ঘেঁষে থাকত। কিন্তু অবজেকটিভ লেন্সটি ফোকাস দূরত্ব ষাট থেকে নব্বই ইঞ্চির মধ্যে। সুতরাং টেবিল কিছুটা দূ থাকলেও কফির কাপ ও সিগ্রেট লক্ষ্য করে সূর্যের আলো ফোকাস করা

সুবিধে নেই। জানলার কাচে কিছুটা তাপ শুষে নেবে ঠিক কথা, তা স ও কাপের কফিকে ফুটন্ত অবস্থায় আনবার জন্যে বা সিগ্রেট ধরাবার জন্যে যথেষ্ট তাপ তখনও অবশিষ্ট থাকবে।

'পরক্ষণেই ক্ষিপ্রগতিতে দরজায় আসা, প্রচণ্ড ধাক্কা মারা, পুকুরপাড়ের দিকে দরজা ভাঙতে ডাকা—অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং নিখুঁত! কি বলো, মুখোটি?'

'আপনার কথা মতই যে সব কিছু ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।' খিন্নভাবে মাথা নাড়লেন সীতারাম মুখোটি, 'কিন্তু আদালতে এসব প্রমান করবো কি করে?'

'কেন,' বললেন বৃদ্ধ অধ্যাপক, 'তোমার গর্ত করা পেতলের হাঁসকলই তো রয়েছে?'

'শুধু ওতে কাজ হবে না বলেই আমার ধারণা।'

'টেলিস্কোপের গায়ে হাতের ছাপ?'

'তেমন জোরালো প্রমাণ নয়।' নীরবনভাবে সার্জেন্ট জবাব দিলেন, কারণ ছোকরা তো গবেষণার কাজে কাকাকে সাহায্য-টাহায্য করত—সুতরাং টেলিস্কোপে তার হাতের ছাপ পড়তেই পারে।'

'হুঁ—' চন্দ্রগুপ্ত হর্ষবর্ধন সমাদ্দার বললেন, 'তোমার ভাগ্য যদি নেহাৎ মন্দ না হয়, তাহলে অবজেকটিভের ভেতরের দিকে কিছু ছাপ পেলেও পেতে পারে। সেই ছাপের নির্দোষ ব্যাখ্যা নেওয়া খুব শক্ত হবে। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কখনো অবজেকটিভ টেলিস্কোপ থেকে খোলেন না। তাতে সেটা নতুন করে আগের অবস্থায় লাগানো বেশ কঠিন হয়ে পড়ে, এছাড়া রয়েছে ধুলো লেগে যাওয়ার ভয়—অর্থাৎ; ওটাতে হাত না দেবার এমনি আরও গোটা দশেক কারণ রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ঠিক মত চেপে ধরলে ছোকরা ভেঙে পড়বে। সে এখনও স্বপ্নেও ভাবে নি; তুমি তাকে সন্দেহ করছ; জেনে গেছ তার কুটিল ফন্দী। তার ওপর সে এখন বেশ নিশ্চিন্তে; অহঙ্কারে রয়েছে। আচমকা আঘাত সইতে পারবে না।'

অধ্যাপকের রোগা মুখের দিকে তাকিয়ে সীতারাম মুখোটি লক্ষ্য

করলেন তাঁর ভুরুর কাঁপুনি; চোখের চাপা কৌতুক। বর্তমানে অবস্থা শুধু রাজন অ্যাডভানিরই নয় দেখছি—মজা পেয়ে ভাবলে কিন্তু মুখে বললেন; 'সে যাই হোক; আপনার ভাগের কাজে আপ ফাঁক রাখেন নি। হলফ করে বলতে পারি; অন্য কোন মাই চেয়ে ভাল করতে পারত না।'